অনুবাদ: সত্য গুপ্ত
সম্পাদনা: শুভময় ঘোষ

তৃতীয় সংস্করণ

М. ГОРЬКИЙ

В ЛЮДЯХ

Повесть

(На языке бенгали)

১

অবশেষে শিক্ষানবিশী। শহরের সদর রাস্তার উপরে এক 'শৌখিন জুতার' দোকানের 'বয়'।

মনিব আমার বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার মানুষটি; রেখায় ভরা বাদামী মুখ, সবজে দাঁত, পানসে ঘোলাটে চোখ। মনে হল লোকটা অন্ধ—নিশ্চিত হবার জন্যে আমি ভেংচি কাটি।

'এই মুখ ভেংচাবি না বলে দিচ্ছি,' শান্ত কড়া গলায় মনিব জানায়।

ঐ দুটো ঘোলাটে চোখ আমায় দেখছে, এ কথা ভাবতেই রাগ হয় আমার। বিশ্বাস করতে পারি না, হয়ত বা আন্দাজেই ধরে নিয়েছে যে আমি ভেংচি কাটছি।

'একবার বলে দিয়েছি না যে মুখ ভেংচাবি না,' আরো ধীর শান্ত গলায় মনিব বলে। পুরু পুরু ঠোঁট দুটো যেন নড়েও না।

'আর ঐ হাত চুলকানো বন্ধ কর্।'

মনে হয় ওর শুকনো হিস্‌হিসে গলার স্বর যেন আমার পিছনে।

গুড়ি মেরে ঘোরে: 'কাজ করছিস শহরের সদর রাস্তায় সেরা জাতের দোকানে, সেটা খেয়াল রাখিস! বয়কে দোরগোড়ায় প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে...'

প্রস্তর-মূর্তি যে কি বস্তু সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই আমার, তাছাড়া হাত চুলকানোও বন্ধ করা যায় না, কারণ, আমার দুটো হাতই কনুই পর্যন্ত খোসচুলকুনিতে ভরা। চুলকুনির গোটাগুলো যেন আমার চামড়ার ভিতরটা নির্মম ভাবে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

আমার হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে মনিব জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে কী কাজ করতিস?'

কী করতাম বলি; শুনে পাকা চুলে ভরা গোল মাথাটা নাড়তে নাড়তে সে খোঁচা দিয়ে বলে:

'ধাঙ্গড়ের কাজ—ভিক্ষে করার চাইতেও খারাপ, চুরির চাইতেও জঘন্য।'

আমি বলি, 'চুরিও করেছি।' বলার ভিতরে একটু গর্ববোধের ভাব যে ছিল না তা নয়।

শুনে যেন বেড়াল থাবার উপর ভর দিয়েছে, সে দুহাতের উপর ভর দিয়ে কাউণ্টারের উপর ঝুঁকে ঘোলাটে চোখের স্থির শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল:

'কী ব-ল-লি! চুরি করে-ছিলি?'

কী ব্যাপার, কেমন করে কী চুরি করেছিলাম খুলে বলি।

'আচ্ছা, ও ব্যাপার নয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমার দোকানের জুতো বা টাকাকড়ি যদি চুরি করিস, তবে বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত জেল খাটিয়ে ছাড়ব...'

খুব শান্ত গলায়ই কথাটা বলে, কিন্তু দারুণ ভয় লাগে আমার। মনটা তাতে আরো যেন বেশি বিরূপ হয়ে উঠে ওর উপরে।

মনিব ছাড়া আরো দুজন কর্মচারী আছে দোকানে। আমার মামাতো ভাই সাশা—ইয়াকভের ছেলে আর বড়ো সাকরেদ—ফিটফাট, পা-চাটা, রাঙা-মুখ লোকটা। সাশার গায়ে বাদামি রঙের একটা ফ্রক কোট, কড়া ইস্ত্রি করা শার্ট, গলায় টাই। দেমাকে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

দাদু প্রথম যে দিন আমাকে নিয়ে আসেন মনিবের কাছে, সাশাকে ডেকে বলেছিলেন আমাকে কাজকর্ম একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে। সাশা চাল দেখিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল:

'আগে ওকে আমার হুকুম মেনে চলতে শিখতে হবে!'

হাত দিয়ে ঠেলে আমার মাথাটা একটু নুইয়ে দিয়ে দাদু বলেছিলেন: 'ওর কথা শুনে চলিস, তোর চাইতে বয়সেও বড়ো আর চাকরিতেও উপরে।'

ভারিক্কি চালে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল সাশা:

'ঠাকুর্দার কথা মনে থাকে যেন!'

প্রথম দিন থেকেই সাশা মর্মান্তিক ভাবে আমার উপরে তার পদমর্যাদার সুযোগ নিতে আরম্ভ করল।

'তোর চোখ পাকানো থামা, কাশিরিন,' সাশাকে ধমকে দিয়েছিল মনিব।

'আমি—কই চোখ তো পাকাই নি,' প্রত্যুত্তরে মাথা নিচু করে সাশা বলেছিল। কিন্তু মনিব ছাড়ে নি:

'তাছাড়া অমন করে মুখ গোমড়া করে থাকবি না, খদ্দেররা তোকে ছাগল বলে ভুল করতে পারে...'

খোশামুদে হাসি হেসে উঠল বড়ো সাকরেদ, মনিবের কুৎসিত ঠোঁট দুটো প্রসারিত হল, আর দারুণ লাল হয়ে উঠে সাশা কাউণ্টারের আড়ালে মুখ লুকল।

এ ধরনের কথাবার্তা বিশ্রী লাগত আমার। ওরা এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করত যে মাঝে মাঝে আমার মনে হত যেন ওরা বিদেশী ভাষায় কথা বলছে।

যখনই কোনো মহিলা দোকানে ঢুকতেন, মনিব পকেটের ভিতর থেকে হাত বের করে আলতো ভাবে গোঁফে তা দিতে শুরু করত। একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত মুখে আর গাল দুটো ভরে যেত রেখায়, কিন্তু তার ভাবলেশহীন ঘোলাটে দুটো চোখে কোনো ভাবান্তর ঘটত না। বড়ো সাকরেদ উঠে দাঁড়াত খাড়া হয়ে, দুটো কনুই দুপাশে চেপে ধরে তোষামোদের ভঙ্গীতে হাত কচ্‌লাত। সাশা তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো লুকোবার চেষ্টায় চোখ পিট্‌ পিট্‌ করত। আর আমি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে গোপনে হাত চুলকোতে চুলকোতে বিক্রির সমারোহ দেখতাম।

কোনো মহিলার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ে জুতা পরিয়ে দেখবার সময় বড়ো সাকরেদ অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতের আঙুলগুলো টান টান করে দিত। হাত দুটো কাঁপত থর থর করে আর এমন ভাবে পা ছুঁত, যেন ভয় পাচ্ছে পাটা ভেঙ্গে ফেলে। পাটা অবশ্য সাধারণত বেশ মোটা সোটাই থাকত, দেখাত যেন কাঁধ ঝোলান উল্টে রাখা বোতল।

একবার এক মহিলা ঝট্‌কা মেরে পা নেড়ে বললেন:

'উহু, ভীষণ সুড়সুড়ি দিচ্ছেন যে!'

'ওটা নিছক শিষ্টতার জন্যেই,' সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল বড়ো সাকরেদ।

মেয়েদের সামনে এমন ভাবে ঘুর ঘুর করত বড়ো সাকরেদ যে দেখলে হাসি পেত। হাসি চাপতে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হত আমাকে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখার লোভও সামলাতে পারতাম না, এমনই অদ্ভুত, এমনই হাস্যজনক বড়ো সাকরেদের কলাকৌশল। মনে হত অমন আলতো ভাবে আঙুল টান টান করবার নৈপুণ্য বা অমন দক্ষতার সঙ্গে অন্যের পায়ে জুতা পরাবার কৌশল জীবনে কখনোই আয়ত্ত করতে পারব না।

খদ্দেরের কাছে বড়ো সাকরেদকে একা রেখে মনিব প্রায়ই পিছনের ঘরে

চলে যেত, সাশাকেও ডেকে নিয়ে যেত সঙ্গে। মনে আছে, একবার এক লালচুলো মহিলার পায়ের উপরে হাত বুলতে বুলতে হঠাৎ হাতের আঙুলের ডগাগুলো জড়ো করে চুমো খেয়েছিল বড়ো সাকরেদ।

'আপনি কী দুষ্টু!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহিলা।

'আ—ঃ!' গাল ফুলিয়ে চাপা আওয়াজ করল বড়ো সাকরেদ।

জোরে হেসে উঠে আমি তো পড়েই যাই আর কি। দোরের হাতলটা ধরে ফেলতেই দোরটা খুলে যেতে তার কাঁচে মাথাটা গেল ঠুকে, ফলে কাঁচটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। বড়ো সাকরেদ লাথি উঁচিয়ে তেড়ে এল আমাকে, মনিব তার হাতের মোটা সোনার আংটিটা দিয়ে গাঁট্টা মেরে আমার সমস্ত মাথাটা ফুলিয়ে দিল, আর সাশা চেষ্টা করল আমার কান মলতে। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে সাশা আমায় দারুণ ধমকাল:

'এমনি করলে তোর জবাব হয়ে যাবে, অত হাসির কী হয়েছিল শুনি?'

তারপর বুঝিয়ে বলল যে বড়ো সাকরেদকে দেখে মেয়েরা যত বেশি আকৃষ্ট হবে ব্যবসায়ের দিক থেকে তো ততই ভালো।

'কোনো মহিলার জুতোর দরকার না-ও থাকলেও মেয়েরা স্রেফ ঐ সুন্দর চেহারা আর একবার দেখার জন্যে বাড়তি জুতো কিনতে আসবে, তা বুঝিস না! তোকে কিছু শেখানোই বৃথা।'

শুনে রাগ হয়ে গেল আমার: দোকানের কেউই কোনো দিন আমায় কিছু শেখাবার চেষ্টা করে নি, সাশা তো দূরের কথা।

রুগ্ণ ঝগড়াটে এক মেয়েছেলে রাঁধুনীর কাজ করে, রোজ ভোরে সে আমার মামাতো ভাইয়ের এক ঘণ্টা আগেই আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলত। আমি সামোভার গরম করতাম, কাঠ বয়ে আনতাম সবকটা উনুনের জন্যে, থালা বাসন মাজতাম; মনিব, বড়ো সাকরেদ আর সাশার জামা কাপড় বুরুশ করতাম, তাদের জুতা সাফ করতাম। দোকানের ঝাঁটপাট, ধুলো ঝাড়া, চা তৈরী করা, খদ্দেরদের বাড়িতে প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া—আমাকেই করতে হত। তারপর বাড়ি আসতাম দুপুরের খাবার নিয়ে যেতে। আমি যখন এ সব কাজ করতাম, তখন সাশাকে গিয়ে দাঁড়াতে হত আমার জায়গায়, দোরের সামনে। কিন্তু এটা ওর সম্মানে লাগত, তাই চিৎকার করে গাল পাড়ত আমাকে:

'এই উজবুক! আমি তোর কাজ করে দেব না!'

ঘোলা-জল ওকা নদীর তীরে মাঠে মাঠে বনে বনে আর কুনাভিনোর

কাঁকরভরা পথে পথে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো ছিল আমার অভ্যাস, বর্তমান জীবনটা তাই একঘেয়ে আর বিরক্তিকর লাগত। দিদিমা নেই, বন্ধুরা নেই, কথা বলার মতো একটি লোকও নেই। এই কৃত্রিম মাপাজোখা জীবন যেন পিষে ক্ষয় করে দিত আমাকে।

অনেক সময়ে ভদ্রমহিলারা কিছু না কিনেই চলে যেতেন, তখন মনিব আর দুই কর্মচারী চটে যেত দারুণ।

'জুতোগুলো তুলে রাখ কাশিরিন!' হুকুম করত মনিব, মিহি হাসির মুখোশ পড়ত খসে।

'দোকানে এসেছে ছোঁক ছোঁক করতে, হারামজাদী! বাড়িতে বসে থেকে থেকে গতরে ঘুণ ধরে গেছে তাই বেকুফ বুড়ি ভাবল, যাই দোকান ঘুরে আসি। ওঃ! ও আমার মাগ হত আচ্ছা করে দেখিয়ে দিতাম!'

মনিবের বৌয়ের রোগা চেহারা, কালো চোখ, নাকটা লম্বা, এমন তম্বি করত, তেড়ে আসত মনিবের উপর যে মনে হত ও যেন তার চাকর।

প্রায়ই কোনো ভদ্রমহিলাকে বিনীত নমস্কার আর মিষ্টি কথার আপ্যায়নে বিদায় দেবার পর মনিব আর তার কর্মচারীরা মিলে তাঁর সম্পর্কে এমন সব নোংরা বেহায়া কথা বলত যে, মনে হত ছুটে গিয়ে মহিলাকে বলে দিয়ে আসি কী বলছে ওরা তাঁর সম্পর্কে।

জানতাম পিছনে কুৎসা করা মানুষের স্বভাব, কিন্তু এরা তিনজনে মিলে প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন সব কথা বলত যে শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যেত। যেন দুনিয়ায় ওরাই হচ্ছে একমাত্র সৎলোক, অপরের সম্পর্কে রায় দেবার অধিকার শুধু ওদেরই। সবাইকে ওরা হিংসে করত, কারুর প্রশংসা করত না, প্রত্যেকের সম্পর্কে কিছু না কিছু নোংরা গল্প ওদের জানা ছিল।

একদিন এক তরুণী এলেন দোকানে। উজ্জ্বল দুটি চোখ, গোলাপী গাল, গায়ে ভেলভেটের ওভারকোট, গলা ঘিরে কালো নরম ফারের কলার, — কালো ফারের উপরে মুখখানা ফুটে রয়েছে সুন্দর ফুলের মতো। ওভারকোটটা খুলে যখন সাশার হাতে দিলেন, তখন যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে: দু-কানে হীরের দুটো ফোঁটা ঝিকমিকিয়ে উঠল, আঁটো-সাঁটো ধূসর-নীল পোশাকে তাঁর দৃপ্ত সুকুমার দেহভঙ্গিমা আরো ফুটে উঠেছিল। ওঁকে দেখে আমার মনে পড়ল সুন্দরী ভাসিলিসার কথা। আমার দৃঢ় ধারণা হল মহিলা নিদেনপক্ষে প্রদেশপালের স্ত্রী হবেনই। ওরা একটু বিশেষ ভাবেই অভ্যর্থনা করল তাঁকে। অগ্নি-উপাসকদের মতো নুয়ে পড়ে অভিবাদন করল, মুখে

মিষ্টি মধুর বুলি। তিনজনেই পাগলের মতো দোকানের ভিতরে ছোটাছুটি জুড়ে দিল, শো-কেসের কাঁচে চমকে উঠতে লাগল তাদের ছায়া। মনে হল সবকিছু বুঝিবা জ্বলে পুড়ে এক্ষুণি নতুন রূপ, নতুন রেখায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

খুব তাড়াতাড়ি এক জোড়া দামী জুতো পছন্দ করে মহিলা যখন চলে গেলেন, জিভে চুমকুড়ি কেটে হিসিয়ে উঠল মনিব:

'খানকী!'

'খাঁটি এক্‌ট্রেস,' অবজ্ঞার সুরে বিড় বিড় করে বলল বড়ো সাকরেদ।

তারপর মহিলাটির কজন মনের মানুষ, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনটা কেমন, এসব নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

দুপুরে খাওয়ার পরে মনিব একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে দোকানের পিছনের ছোট ঘরটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি তার সোনার ঘড়িটার পিছনের ডালা খুলে কলকব্জার ভিতরে খানিকটা ভিনিগার ঢেলে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে ঘড়িটা হাতে নিয়ে বিড় বিড় করতে করতে মনিব যখন দোকানে এসে ঢুকল তখন কী মজাই না লাগল:

'কী ব্যাপার বল দেখি! হঠাৎ আমার ঘড়িটা ঘামতে শুরু করেছে! এমন তো কখনো হয় নি। ঘামছে, দেখ কাণ্ডটা! বোধ হয় কোন অমঙ্গলের চিহ্ন, তাই না?'

দোকানের হৈহল্লা, আর বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম সত্ত্বেও এত একঘেয়ে লাগত যে প্রায়ই ভাবতাম: কী করলে ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

সর্বাঙ্গ তুষার-ছাওয়া পথচারীরা দ্রুত হেঁটে যেত দোকানের সামনে দিয়ে। মনে হত যেন দেরি করে ফেলেছে শবানুগমনে, তাই কফিনের সঙ্গ ধরতে তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে কবরস্থানের দিকে। মাল-টানা গাড়ির ঘোড়াগুলো পরিশ্রমে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তুষার-স্তূপের ভেতর দিয়ে। রোজ দোকানের পিছনের গির্জার ঘণ্টায় বাজত করুণ সুরে, কারণ এখন লেণ্ট পরবের সময়। ঐ অবিশ্রাম ঘণ্টা-ধ্বনির ফলে মনে হত যেন মাথার উপরে বালিশ পিটে চলেছে: ব্যথা নেই, কিন্তু চেতনা অষাড় করে আনে।

একদিন উঠোনে বসে নতুন-আসা একটা মালের প্যাকিং খুলছিলাম। গির্জার চৌকিদার এল: বুড়ো, কুঁজো হয়ে পড়েছে, ন্যাকড়ার পুতুলের মতো নড়বড়ে, পরনে জীর্ণ পোষাক, এমন ছেঁড়াখোঁড়া, মনে হয় যেন কুকুরে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। আমায় সে বলে:

'একজোড়া গালোশ আমায় চুরি করে এনে আমাকে দিবি বাছা?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। একটা খালি প্যাকিং বাক্সের উপরে ও এসে বসল, হাই তুলল, ঠোঁটের উপরে ক্রুশ করল, তারপর আবার অনুরোধ করে বলল:

'দিবি না?'

বললাম, 'চুরি করা অন্যায়!'

'কিন্তু তবুও তো চুরি হয়। শোন বাপধন, বুড়ো মানুষের কথাটা মান্যি কর্!'

যাদের ভিতরে বাস করছি তাদের থেকে লোকটা অন্যরকম বলে বেশ লাগল।

আমি যে চুরি করতে রাজী হয়ে যাব এ সম্পর্কে সে এত স্থির নিশ্চিত যে জানালা গলিয়ে একজোড়া গালোশ ওকে বের করে দিতে রাজী হয়ে গেলাম।

'বেশ, বেশ,' ধীর গম্ভীর গলায় বলল, মনে হল না তেমন খুশি হয়েছে। 'শেষ পর্যন্ত ঠকাবি না তো? বেশ, বেশ। না, ঠকাবার মতো মানুষ তুই নস্...'

খানিকক্ষণ বসে বসে জুতোর ডগা দিয়ে ভেজা নোংরা বরফের উপরে আঁচড় কাটল। মাটির পাইপটা ধরাল, তারপর আচমকা আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিল:

'আর আমি যদি তোকে ঠকাই, তাহলে? যদি সেই গালোশজোড়া তোর মনিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলি যে আধ রুব্লে আমার কাছে বেচেছিস, তখন? ওটার দাম দুরুব্লের উপরে আর তুই বেচেছিস আধ রুব্লে। দুটো হাতখরচের পয়সার জন্যে, কী?'

বোবার মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যেন শাসানিটাকে ইতিমধ্যেই সে কার্যে পরিণত করেছে। ও কিন্তু তেমনি ধীর ভাবে নাকী সুরে পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলেছে, মাথার চারপাশ ঘিরে উড়ছে নীল ধোঁয়া।

'যদি তোর মনিবই আমাকে পাঠিয়ে থাকে, 'ছোঁড়াটাকে গিয়ে একটু বাজিয়ে দেখ দেখি চোর ছ্যাঁচোড় কিনা,' তাহলে?'

'আমি দেব না তোমাকে গালোশ,' রেগে বললাম।

'একবার কথা যখন দিয়েছিস তখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই!'

আমার হাতখানা ধরে সে আমাকে কাছে টেনে নিল, তারপর আমার কপালের উপরে বরফের মতো ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে খোঁচা দিতে দিতে একটু টেনে বলল:

'অমন করে রাজী হয়ে গেলি কি করে একেবারে, গালোশ হাতে হাতে দিবি বলে ফেললি, এ্যাঁ!'

'তুমি নিজেই তো চেয়েছিলে, চাও নি?'

'আমি তো কতো কিছুই চাইতে পারি! যদি বলি গির্জা থেকে চুরি করে আন্, তবে কি তুই তাই করবি? মানুষকে অতটা বিশ্বাস করিস কোন আক্কেলে? বোকা ছেলে...'

আমাকে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

'চোরা গালোশে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যে করেই হোক গালোশ পরতে হবে এমন দুরন্ত বাবু আমি নই। একটু ঠাট্টা করছিলাম মাত্র... কিন্তু তুই যখন এতো সাদামাটা, তাই বলি, আসছে ইস্টারের সময়ে আমি তোকে ঘণ্টিঘরে চড়তে দেব। ঘণ্টাও বাজাতে পারবি আর শহরটাও ভালো করে দেখতে পাবি...'

'শহর আমার দেখা।'

'ঘণ্টিঘর থেকে আরো সুন্দর দেখায়...'

জুতোর ডগা দিয়ে বরফ ঠেলতে ঠেলতে ধীরে ধীরে সে চলতে শুরু করল, তারপর গির্জা ঘুরে একটা কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর চলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বেদনাভরা অস্বস্তিতে মন ভারী হয়ে উঠল। সত্যই কি বুড়ো আমার সঙ্গে শুধু রসিকতা করল? নাকি মনিবই ওকে পাঠিয়েছিল আমায় পরীক্ষা করতে? দোকানে ফিরে যেতে সাহস হচ্ছিল না।

'কী করছিস এখানে এতক্ষণ ধরে?' উঠানে দৌড়ে এসে চিৎকার করে উঠল সাশা।

হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে প্যাকিংবাক্স-ভাঙ্গা হাতুড়িটা নিয়ে তেড়ে উঠলাম।

জানতাম ও আর বড়ো সাকরেদ মনিবের মাল চুরি করে। একেক জোড়া বুট বা জুতো চুরি করে লুকিয়ে রাখে উনুনের চিমনিতে, তারপর দোকান বন্ধ করে যাবার সময়ে কোটের হাতার ভিতরে পুরে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দারুণ বিশ্রী লাগত আমার, ভয় হত। কারণ মনিবের সে দিনের সেই শাসানোর কথা আমি ভুলি নি।

সাশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুই চুরি করিস?'

'আমি না, বড়ো সাকরেদ করে,' একটু চটে গিয়েই জবাব দেয় সাশা, 'আমি তাকে সাহায্য করি মাত্র। বড়ো সাকরেদ বলে: 'তোকে যা বলব তা করবি।' যদি না করি তবে সে আমার পিছনে লাগবে, ক্ষতি করবে। আর মনিব — সে নিজেও এক সময়ে দোকান কর্মচারী ছিল, এ সব ব্যাপার সেও জানে। তুই কিন্তু মুখ বুজে চুপ করে থাকিস!'

কথা বলতে বলতে বার বার সাশা তাকাচ্ছিল আয়নার দিকে, বড়ো সাকরেদের অনুকরণে আঙ্গুলগুলো অস্বাভাবিক টান টান করে টাই ঠিক করছিল। বরাবর সে এমন সব ভাবভঙ্গি করত যেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইত সে আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, আমার উপরে মাতব্বরী করার অধিকার তার আছে। গম্ভীর ভারী গলায় গাল পাড়ত আমাকে, কর্তৃত্বভরা ভারিক্কি চালে হুকুম করত। যদিও ওর চাইতে আমি লম্বা, গায়েও জোর বেশি, তবুও আমাকে কেমন যেন বিশ্রী বেঢপ দেখাত। আর ওর চেহারা ছিল নধর, পুরুষ্টু, মসৃণ। ফ্রক কোটে ওকে বেশ কেউকেটা গোছেরই মনে হত, কিন্তু তবুও কেমন যেন একটু হাস্যকর। রাঁধুনীকে আদৌ দেখতে পারত না সাশা — অবশ্য সে মেয়েলোকটিও ছিল একটু অদ্ভুত গোছের, ভালো কি মন্দ তা জানি না।

'আমার সব চাইতে ভালো লাগে লড়াই দেখতে,' জ্বলন্ত কালো চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলত সে, 'তা সে যার লড়াই হোক না কেন — মোরগ হোক, কুকুর হোক, বা চাষাদের — আমার কাছে সব সমান!'

উঠোনে কখনো যদি মোরগ কিংবা পায়রার লড়াই শুরু হত, তাহলে হাতের সব কাজ ফেলে রেখে সে তক্ষুণি ছুটে এসে দাঁড়াত জানালায়। আর যতক্ষণ না লড়াই শেষ হয় ততক্ষণ কোনো কিছুই আর তার কানে ঢুকত না। সন্ধ্যা বেলায় সাশাকে আর আমাকে ডেকে বলত:

'এই ছোঁড়ারা, এখানে বসে আছিস কেন? বাইরে গিয়ে বেশ করে এক হাত লড় গে না!'

সাশা ফুঁসে উঠত:

'ছোঁড়া নই আমি, বোকা বুড়ী — আমি দোকানের ছোটো সাকরেদ!'

'থাক, তাতে কিছু এসে যায় না। বিয়ের দিনটি পর্যন্ত আমার কাছে তুই ছোঁড়াই থাকবি।'

"বোকা বুড়ী, মাথা হাঁড়ি...'

'শয়তান খুব চালাক, কিন্তু ভগবান তাকে পছন্দ করেন না।'

ওর কথা বলার ধরণেই বিশেষ করে খেপে যেত সাশা। সাশা ওর পিছনে লাগতে গেলে এমন এক চাউনীতে সাশাকে ঠাণ্ডা করে সে বলত:

'ফুঃ, খুদে আরশুলা! ভগবানের অপকম্ম কোথাকার!'

অনেক দিন সাশা আমাকে বলেছে ওর বালিশে আলপিন ফুটিয়ে রাখতে, ঘুমন্ত অবস্থায় ওর মুখে ঝুলকালি লেপে দিতে, নয়ত ঐ ধরণেরই কিছু একটা তামাসা করতে। কিন্তু রাঁধুনীকে আমি ভীষণ ভয় পেতাম, নিশ্চয় জানতাম ধরা পড়ে যাব ওর হাতে, কারণ ওর ঘুম খুব পাতলা। প্রায়ই রাত্রে জেগে উঠে আলো জ্বালত, তারপর এক কোণে চেয়ে চুপ করে বসে থাকত। কখনো বা উঠে এসে উনুনের পিছনে আমার বিছানায় বসত আর আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুলত, ভাঙ্গা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলত:

'কী জানি কেন ঘুম আসছে না, আলিয়শা। অস্থির লাগছে, একটা গল্প বল।'

আধঘুম আধজাগা অবস্থায় কোনো একটা গল্প বলে যেতাম, ও চুপ করে বসে বসে দুলত। মনে হত যেন ওর গরম গা থেকে গলানো মোম আর ধুনোর গন্ধ বেরিয়ে আসছে, ও যেন শীগ্গিরই মরবে। হয়ত এক্ষুণি, এই মুহূর্তে। ভয়ে গলার আওয়াজ চড়িয়ে দিতাম, কিন্তু তক্ষুণি ও আমাকে থামিয়ে দিত:

'শ্! তুই দেখছি ঐ বেজন্মাগুলোকে জাগিয়ে দিবি! ওরা ভাববে তুই আমার পিরিতের নাগর...'

প্রত্যেক দিন এক-ই ভঙ্গিতে ও বসে থাকত: কুঁজো হয়ে ঝুঁকে, হাঁটুর ভিতরে হাত দুটো ঢুকিয়ে, হাড্ডিসার পা দুটো শক্ত করে চেপে। হাতে-বোনা মোটা রাত্রিবাসের ভিতর থেকেও ওর পাঁজরার আর চ্যাপ্টা বুকের হাড়গুলো চোপসানো পিপের গায়ের খাঁজের মতো ঠেলে বেরিয়ে থাকত। বহুক্ষণ তেমনি ভাবে চুপ করে বসে থেকে এক সময়ে হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠত:

'ইচ্ছে হয় মরে জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োই!'

অথবা হয়ত অদৃশ্য কারুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলত:

'জীবনটা তো কাটিয়েই দিলাম কিন্তু কী হল?'

মাঝে মাঝে পরম নির্বিকার ভাবে আমার গল্প থামিয়ে দিয়ে বলে উঠত:

'নে, এখন ঘুমো!' বলে নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরের অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে যেত।

সাশা ওকে আড়ালে বলত, 'ডাইনী বুড়ী!'

একদিন সাশাকে বললাম ওর সামনে বলতে।

'ভয় পাই ভেবেছিস?' সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল সাশা। কিন্তু পরক্ষণেই কপাল কুঁচকে বলল:

'না, ওর সামনে বলব না! ও যদি সত্যিসত্যিই ডাইনী হয়...'

রাঁধুনীটির সবসময়েই অসন্তুষ্টি, সবসময়েই খিট্‌খিটে মেজাজ। আমাকেও অন্যের চাইতে এতটুকুও বেশি দয়া-মায়া দেখাত না। ভোর ছ-টায় এসে আমার ঠ্যাং ধরে টান মেরে চিৎকার করত:

'ঢের হয়েছে নাক ডাকান! উঠে কাঠ নিয়ে আয়! সামোভার গরম কর্‌! আলুর খোসা ছাড়া!..'

এতে সাশারও ঘুম ভেঙ্গে যেত।

'চ্যাঁচাচ্ছ কেন?' গজ্‌ গজ্‌ করে উঠত সাশা। 'মনিবকে বলে দেব তুমি আমাকে ঘুমোতে দাও না...'

রাত-জাগা ফোলা ফোলা দুটো চোখে চকিতে একবার সাশার দিকে চেয়ে মেয়েটা তার কঙ্কালসার দেহটা নিয়ে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে যেত।

'ফুঃ! ভগবানের অপকম্ম কোথাকার! তুই যদি আমার সতীনের ব্যাটা হতিস তবে ঠেঙ্গিয়ে ঢিট্‌ করে দিতাম না!'

সাশা গর্জাত, 'জাহান্নামে যা!'

তারপর দোকানে যাবার পথে বলত:

'দাঁড়া, ওকে তাড়ানর ব্যবস্থা করছি। ওর অজান্তে তরকারীতে নুন মিশিয়ে রেখে দেব। সব তরকারীই যদি দারুণ নুন কাটা লাগে তবে দেবে ওকে দূর করে। নয়ত কেরোসিন তেল। তুই পারবি করতে?'

'তুই নিজেই কেন কর না?'

'ভীতু কোথাকার!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠত সাশা।

আমাদের চোখের সামনেই রাঁধুনীটা মরল। একদিন নিচু হয়ে সামোভার তুলতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। কাত হয়ে পড়ে রইল, হাত দুটো

পড়ল ছড়িয়ে, কস বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল রক্তের ধারা; মনে হল যেন কেউ ওর বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

আমরা দুজনে বুঝতে পারলাম যে ও মারা গেছে, কিন্তু দারুণ ভয়ে ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কথা বলার শক্তিটুকুও ছিল না। অবশেষে সাশা এক ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমি কি করব বুঝতে না পেরে রাস্তার আলোর দিকের জানালাটার কাঁচের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনিব এল, চিন্তিত মুখে ওর পাশে উবু হয়ে বসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল। তারপর বলল:

'মরেই গেছে, না?'

আইকনের কোণের দিকে রাখা অদ্ভুতকর্মা নিকোলাইয়ের ছোট্ট মূর্তির দিকে ফিরে সে ক্রুশ করতে লাগল। প্রার্থনা শেষে দোরের দিকে মুখ বাড়িয়ে আদেশ দিল:

'কাশিরিন! ছুটে গিয়ে পুলিসে খবর দিয়ে আয়!'

পুলিস এল একটা। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে বেড়াল, তারপর একটি মুদ্রা পকেটস্থ করে চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এল একটা মাল-টানা গাড়ির কোচম্যানকে নিয়ে; দুজনে মিলে রাঁধুনীর মাথা আর পা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল মনিব গিন্নী।

আমাকে ডেকে বলল, 'মেঝেটা ভালো করে ঘসে ঘসে ধুয়ে ফেল!'

মনিব বলল, 'ভালোই হল সন্ধ্যাসন্ধি মারা গেছে...'

কিন্তু কেন ভালো হল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

'বাতি নেভাস নে!' শুতে গিয়ে অস্বাভাবিক নরম গলায় বলল সাশা। 'ভয় করছে?'

মাথা মুখ ঢেকে কম্বল মুড়ি দিয়ে বহুক্ষণ চুপ করে রইল সাশা। নিথর নিস্তব্ধ রাত, যেন কী শুনছে কান পেতে, প্রতীক্ষা করছে কোনো কিছুর। আমার মনে হল একটু পরেই বুঝিবা ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠবে, আর গোটা শহরের সমস্ত মানুষ ভয়ে চিৎকার করে উঠে পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দেবে।

'আয় দুজনে একসঙ্গে শুই উনুনের উপরে,' কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বের করে নরম সুরে বলল সাশা।

'উনুনের উপরটা গরম।'

আবার চুপ করে পড়ে রইল সাশা। অবশেষে বলল:

'খুবই আচমকা মারা গেল, তাই না? আর আমি কিনা ভাবতাম ও ডাইনী... না, ঘুম আসছে না আমার...'

'আমারও না।'

সাশা বলতে লাগল, কেমন করে মরা মানুষ কবরের ভিতর থেকে উঠে আসে, তারপর রাত দুপুর পর্যন্ত শহরময় ঘুরে বেড়ায় তাদের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনদের খোঁজে।

'মরা মানুষদের শুধু শহরটার কথাই মনে থাকে, কিন্তু রাস্তাঘাট বা বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না...' ফিস্ ফিস্ করে বলল সাশা।

আরো নিশ্চুতি হয়ে উঠল রাত, মনে হল যেন অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠেছে। সাশা মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল:

'দেখবি আমার বাক্সে কী আছে?'

বহুদিন অবাক হয়ে ভেবেছি, কী এমন বস্তু ও বাক্সে লুকিয়ে রাখে? বাক্সটা সবসময়েই তালাবন্ধ, খুলত একান্তই সন্তর্পণে। কখনো বা যদি উঁকি মেরে দেখতে গেছি ভিতরে কী আছে, অমনি খেঁকিয়ে উঠেছে।

'খবর্দার! কী দেখছিস?'

কী আছে দেখতে চাইতাম, সেকথা এবার জানাতে সাশা বিছানার উপরে উঠে বসল, তারপর ওর স্বভাবসুলভ কর্তৃত্বভরা সুরে হুকুম করল বাক্সটা ওর পায়ের কাছে এনে রাখতে। একটা সরু চেনে গলায় ঝোলানো ক্রুশের সঙ্গে রাখত চাবিটা। প্রথমে রান্নাঘরের অন্ধকারের ভিতরে তাকিয়ে ভারিক্কি চালে ভ্রূ কোঁচকাল, তারপর তালাটা খুলে ফেলল। বার কয়েক ফুঁ দিল বাক্সের ডালাটার উপরে, যেন ওটা খুব গরম, অবশেষে ডালাটা খুলে ফেলল। অনেকগুলো আন্ডারওয়্যার টেনে বের করল ভিতর থেকে।

ওষুধের বড়ির খালি বাক্স, চায়ের প্যাকেটের উপরের রঙ বেরঙের কাগজ, মাছের খালি টিন ইত্যাদিতে আধখানা বাক্স ঠাসা।

'কী ওগুলো?'

'দেখবি, দাঁড়া...'

বাক্সটা দু পায়ের ভিতরে চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল সাশা, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করল:

'হে স্বর্গের পিতা...'

আশা করেছিলাম দেখব নানান রকমের খেলনা: আমি কোনোদিনই

খেলনার মুখ দেখি নি। প্রকাশ্যে খেলনাপাতিদের সম্বন্ধে আমি তাচ্ছিল্য দেখাতাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যাদের খেলনা ছিল তাদের উপর হিংসেও হত খুব। আমার ভালো লাগত যে সাশা গুরুগম্ভীর লোক হলেও খেলনা খেলে; সেগুলো ও লজ্জায় লুকিয়ে রেখেছে। ওর এ সঙ্কোচ আমি বুঝতাম।

প্রথম বাক্সটা খুলে এক জোড়া চশমার ফ্রেম বের করল সাশা। ফ্রেমটা নাকে এঁটে গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকাল, বলল:

'কাঁচ নেই তাতে কী, এগুলোতে কাঁচ থাকে না।'

'দেখি, আমি একবার পরে দেখি!'

'তোর চোখে মানাবে না। যাদের চোখ গাঢ়, এগুলো তাদের জন্যে। তোর চোখ কটা কিনা!' নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সুরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল সাশা। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ভাবে গলাটা চড়ে গেল যে পর মুহূর্তেই ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল সে।

জুতোর কালির একটা খালি টিনের ভিতরে রয়েছে কতগুলো বোতাম।

'সবগুলোই রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি!' সগর্বে বলল সাশা। 'সব কটা নিজে জোগাড় করেছি সাঁইত্রিশটা।'

তৃতীয় বাক্সটায় কতগুলো বড়ো পেতলের কাঁটা, সেগুলোও রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। কিছু জুতার পেরেক, বকলস — কিছু পুরনো, কিছু ভাঙ্গা, কয়েকটা আস্ত। একটা পেতলের দোরের হাতল, হাতির দাঁতের গোল হাতল একটা, মেয়েদের মাথার চিরুনি একখানা, একখানা বই 'স্বপ্ন ও ভাগ্য গণনা', তাছাড়া ঐ ধরনের টুকিটাকি আরো অনেক কিছু।

আমিও এক সময় ছেঁড়া ন্যাকড়া আর হাড় কুড়িয়ে বেড়াতাম। তখন ইচ্ছে করলে ঐ সব বাজে জিনিস একমাসে ওর দশগুণ জমাতে পারতাম। সাশার সম্পদ দেখে মনটা দমে গেল, বিরক্তি লাগল, করুণাও হল ওর উপরে। একান্ত নিবিষ্ট ভাবে প্রত্যেকটি জিনিস দেখছে সাশা, পরম আদরে প্রত্যেকটির গায়ে হাত বুলচ্ছে; গর্বে ওর পুরু পুরু ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠেছে, দুটো ড্যাবা চোখের চাউনি বেয়ে যেন মমতা আর ঔৎসুক্য ঝরে পড়ছে। কিন্তু চশমার জন্যে ওর কচি মুখখানার চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

'কী করবি এগুলো দিয়ে?'

চশমার ফ্রেমের ভিতর দিয়ে চকিতে একবার আমার দিকে তাকাল সে, তারপর বয়ঃসন্ধির ভাঙ্গা গলায় বলল:

'তোকে দেব কিছু, নিবি?'

'না, ধন্যবাদ...'

ওর সম্পদে আমার আগ্রহের অভাব আর প্রত্যাখ্যানে ক্ষুন্ন হয়েই বোধ হয় খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ও, তারপর বলল:

'একটা তোয়ালে নে, আয় আমরা এগুলোকে ঘসে মেজে চকচকে করে তুলি, ধুলো পড়ে সব ময়লা হয়ে গেছে...'

সম্পদগুলো ঝেড়ে মুছে চকচকে করে গুছিয়ে রাখার পর সাশা দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল। ওদিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, বাতাসের ঝাপ্টা জানালার গায়ে।

'দাঁড়া, বাগানের মাটি শুকোক, তোকে এমন একটা জিনিস দেখাব যে হাঁ হয়ে যাবি!' মুখ না ফিরিয়েই বলল সাশা।

ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমি বিছানার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সাশা লাফিয়ে উঠল, নখ দিয়ে দেয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল:

'আমার ভয় করছে... হায় ভগবান, ভীষণ ভয় করছে! হে প্রভু, দয়া কর!'

ওর গলার স্বরে ওর আতঙ্ক সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে। আমি নিজেও তখন ভয়ে হিম: মনে হল যেন রাঁধুনী আমার দিকে পিছন ফিরে জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোরগের লড়াই দেখার সময়ে যেমন করে দাঁড়াত।

সাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ল, নখ দিয়ে দেয়াল আঁচড়াল, ওর পা দুটো কাঁপতে লাগল ঠক ঠক করে। যেন জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এমনি করে কোনো রকমে রান্নাঘরের মেঝে পেরিয়ে আমি ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তারপর কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে দুজনেই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কয়েক দিন পর এক ছুটির দিন, কেবল দুপুর পর্যন্ত কাজ করে ফিরে এলাম খেতে। মনিব আর তার গিন্নী ঘুমোতে গেলে পর রহস্যভরা কণ্ঠে বলল সাশা:

'চল যাই!'

অনুমানে বুঝলাম, ও আমাকে সেই তাজ্জব করা জিনিসটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

দুজনে বাগানের ভিতরে গেলাম। দুটো বাড়ির মাঝখানে এক ফালি

জমি, তাতে গোটা দশ-পনেরো লাইম গাছ। বিরাট মোটা সেকেলে গুঁড়িগুলো শেওলা পড়া, কালো কালো রিক্ত ডালপালাগুলো মড়ার মতো আকাশে উঁচু হয়ে উঠেছে। একটা দাঁড়কাকের বাসা পর্যন্ত নেই। অতিকায় সমাধি-স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছগুলো। ক-টা লাইম গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে, না কোনো ঝোপঝাড়, না একটু ঘাস। হাঁটা পথের মাটিটুকুও পায়ে-পায়ে লোহার মতো কালো আর শক্ত হয়ে গেছে। গত বছরের ঝরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে ফালি ফালি জমি চোখে পড়ে সেখানে তা ভুরভুরে মাটিতে এমন হয়ে আছে যেন ছাতলা পড়া বদ্ধজলের ডোবা।

বাড়িটার কোণের দিকে মোড় ফিরে রাস্তার বেড়ার সামনে সাশা এগিয়ে গেল। তারপর একটা লাইম গাছের তলায় দাঁড়াল। সামনের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উবু হয়ে বসে দুহাত দিয়ে পাতা সরাতে লাগল। বেরিয়ে এল একটা গিঁট শিকড়, আর তারই পাশে মাটির ভিতরে গভীর করে পোঁতা দুখানা ইট। ইট দুখানা তুলে ফেলল সাশা। ইটের তলায় চালা বানানোর একটুকরো টিন, টিনের নিচে চৌকো একটা তক্তা। অবশেষে দেখতে পেলাম একটা বড়ো গর্ত, শিকড়ের তলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

একটা দেশলাই জেবলে আধপোড়া একটুকরো মোমবাতি ধরাল সাশা। তারপর বাতিটা গর্তের ভিতরে নামিয়ে দিয়ে বলল:

'তাকিয়ে দেখ! কিন্তু ভয় পাস নে যেন...'

আদতে ও নিজেই ভয় পেয়েছিল: হাতের বাতিটা কাঁপছে থর থর করে, মুখখানা পাংশু, বিশ্রী ভাবে ঝুলে পড়েছে দুটো ঠোঁট, চোখ ছল ছল করছে, খালি হাতটা পিছনে লুকনো। ওর ভয় আমাতেও সংক্রামিত হল। একান্ত সন্তর্পণে ক্ষুদে গুহাটার খিলানের মতো ঐ শিকড়টার তলা দিয়ে তাকাই। তিনটা মোমবাতির টুকরো জেবলে দিয়েছে সাশা, নীল আলোয় ভরে উঠেছে গর্তটা। একটা সাধারণ বাল্‌তির মতো গভীর গর্তটা কিন্তু অনেকখানি চওড়া, দেয়ালে রঙ্গিন কাঁচ আর চিনে মাটির ভাঙ্গা টুকরো বসানো। মাঝখানের উঁচু জায়গায় ছোট্ট একটা কফিন, টিনের টুকরো জুড়ে তৈরি। কিংখাপের মতো কী একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে কফিনটার আধখানা ঢাকা। ঐ ঢাকনার ভিতর থেকে চড়ুই পাখির একটা ধূসর পা আর ঠোঁট বেরিয়ে রয়েছে। মাথার দিকে ছোট্ট একটা ডেস্কের উপরে ছোট একটা পিতলের ক্রুশ। বাকি

তিন দিকে সোনালী আর রুপোলী প্যাকেটের কাগজে মোড়া দীপদানির ভিতরে জ্বলছে মোমবাতির টুকরো।

সরু দীপশিখাগুলো গর্তের খোলা হাঁয়ের দিকে মুখ করে কাঁপছে; ভিতরটা নানা বর্ণের আলোর ছটায় স্বল্প উজ্জ্বল। মাটি, মোম আর গরম পচা আবর্জনার গন্ধ থেকে থেকে আমার নাকে মুখে ঝাপ্টা মারছে। আর যেন ভাঙ্গাচোরা রামধনুর রঙ্গগুলো লাফিয়ে উঠে আমার চোখের ভিতরে কাঁপতে শুরু করেছে। সবকিছু মিলে একটা দম আটকে-আসা চাপা বিস্ময়ে আমার ভয় দূর হয়ে গেল।

'চমৎকার না?' সাশা জিজ্ঞেস করল।

'এ কি, কি হবে এটায়?'

'মন্দির,' বলল সাশা, 'ঠিক সেরকম দেখতে না?'

'কি জানি।'

'আর ঐ চড়ুইটা হল শব। হয়ত একদিন ওর দেহটা অলৌকিক ভাবে একটা পুণ্য স্মারক হয়ে উঠবে, কেননা ওর মৃত্যু হল নিষ্পাপ আত্মদান কিনা।'

'মরা অবস্থায় পেয়েছিলি ওটাকে?'

'না, গোয়ালের মধ্যে উড়ে এসে পড়েছিল। আমি টুপি দিয়ে ধরে চেপে মেরেছি।'

'কেন?'

'এমনি...'

সাশা আমার চোখের দিকে তাকাল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল:

'চমৎকার না?'

'না।'

গর্তটার উপরে ঝুঁকে পড়ল সাশা, তাড়াতাড়ি তক্তাটা টেনে দিল, তার উপরে ঢাকা দিল টিন। তারপর ইট দুটো চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রুক্ষ স্বরে বলল:

'কেন তোর ভালো লাগল না শুনি?'

'কারণ, চড়ুইটার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

শূন্য দৃষ্টি মেলে সাশা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন সে হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আমার বুকের উপরে একটা ধাক্কা মেরে চিৎকার করে বলে উঠল:

'বেকুফ! তোর হিংসে হচ্ছে কিনা, তাই বলছিস ভালো লাগে না! ভাবছিস বুঝি কানাত্‌নায়া স্ট্রীটের তোর বাগানে যেটা বানিয়েছিলি সেটা আরো সুন্দর, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, সেটা ঢের সুন্দর!'

আমি নিজেই একটা মণ্ডপ তৈরী করেছিলাম। সেটার কথা মনে পড়তেই এতটুকু ইতস্ততঃ না করেই জবাব দিলাম।

সাশা তার ফ্রক কোটটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আস্তিন গুটল। তারপর হাতের চেটোয় থুথু ছিটিয়ে বলল:

'বেশ, তবে আয়, লড়ে ফয়সলা করি!'

লড়বার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। সব মিলে কেমন যেন একটা ক্লান্তি লাগছিল, সাশার ক্রুদ্ধ মুখটাও যেন অসহ্য ঠেকছিল।

সাশা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে। বুকে ধাক্কা মেরে সে চিৎ করে ফেলে দিল আমাকে, তারপর দুদিকে দু-পা দিয়ে আমার ওপর চেপে বসে চিৎকার করে বলল:

'বাঁচতে চাস, না মরতে চাস?'

ওর চাইতে আমার গায়ে জোর বেশি, রাগও হয়েছিল খুব। পরমুহূর্তেই মাথার উপরে দুহাত তুলে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়তে হল সাশাকে। গোঁ গোঁ করতে শুরু করল সাশা। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম ওকে, কিন্তু হাত পা ছুঁড়ে ও আমাকে দূরে সরিয়ে দিল। ফলে আরো ঘাবড়ে গেলাম। কী করব বুঝে উঠতে না পেরে একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম। সাশা মাথা তুলে বলল:

'এবার তোকে বাগে পেয়েছি। যতক্ষণ না মনিব এসে দেখে, ততক্ষণ একটুও নড়ব না। তারপর তোর নামে নালিশ করব, তোকে তাড়িয়ে ছাড়বে।'

গালমন্দ করতে লাগল সাশা, শাসাতে লাগল। ফলে খেপে গেলাম আমি। ছুটে গর্তটার কাছে গিয়ে ইট দুটো টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, চড়ুই সমেত কফিনটা তুলে এনে বেড়ার ওপাশে আছড়ে ফেললাম, আর ভিতরের সবকিছু টেনে তুলে দুপা দিয়ে দলে পিষে দিলাম গুঁড়িয়ে।

'বটে! বটে! তবে দ্যাখ্‌!'

আমার রাগের এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল সাশার উপরে। উঠে বসল ও,

মুখটা আধখোলা, ভ্রূ কোঁচকানো, চুপ করে সে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি থামতে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল, গায়ের ধুলো ঝাড়ল, ফ্রক কোটটা ফেলল কাঁধের ওপর। তারপর চাপা আক্রোশে বলল:

'এবার দেখে নিস কী হয়! দাঁড়া না কয়েক দিন যাক! তোর জন্যেই তৈরী করেছিলাম, ওটা একটা ডাইনীর তুকতাক! এইবার দেখবি!'

আমি থপ করে বসে পড়লাম। ওর কথাগুলোই যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আমাকে, গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেই চলে গেল সাশা। ওর এই শান্তভাব যেন আমাকে একেবারে শেষ করে দিল।

ঠিক করলাম, পরের দিনই শহর ছেড়ে, মনিব ছেড়ে, সাশা, সাশার তুকতাক— এই অর্থহীন বিষণ্ণ জীবন ছেড়ে যাব পালিয়ে।

পরদিন ভোরে নতুন রাঁধুনী আমাকে ঘুম থেকে তুলতে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় ভগবান, তোর মুখে কি হয়েছে?'

ভয়ে ভয়ে মনে হল, 'তুকতাকের ফল ফলছে।'

কিন্তু রাঁধুনীটা এত জোরে হেসে উঠল যে তার আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আমিও না হেসে থাকতে পারলাম না: কে যেন আমার মুখময় পুরু করে ঝুলকালি লেপে রেখেছে।

'সাশা করেছে, না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হয়ত আমিই করেছি!' হাসতে হাসতে বলল রাঁধুনী।

জুতা পালিশ করতে আরম্ভ করলাম। একটার ভিতরে হাত ঢোকাতেই হাতে একটা পিনের খোঁচা লাগল।

'বটে, এই তবে তুকতাক!' মনে মনে ভাবলাম।

সবগুলো জুতার মধ্যে পিন আর পেরেক এমন চালাকী করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে যাতে হাত দিলেই আমার হাতে ফুটে। এক ঘটি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে আমি ঘুমন্ত, অথবা ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকা যাদুকরের মাথায় মহা আনন্দে ঢেলে দিলাম।

কিন্তু তবুও মনে শান্তি এল না, কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না কফিনটার কথা। কফিনের ভিতরের সেই চড়ুইটার কথা, কুঁকড়ে যাওয়া ধূসর দুটো পা, করুণ মোমের মতো ঠোঁট আর ওকে ঘিরে বহুবর্ণের সেই মৃদু আলো, যা নাকি রামধনুতে পরিণত হয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টায় মিট মিট করছিল। মনের মধ্যে কফিনটা যেন ক্রমেই বড়ো

হয়ে উঠত, থাবাগুলো বড়ো হতে হতে ক্রমেই উপর দিকে ছড়িয়ে পড়ত, কাঁপত জীবন্তের মতো।

ঠিক করেছিলাম সে দিন সন্ধ্যাবেলায়ই পালিয়ে যাব, কিন্তু দুপুরে খাওয়ার আগে তেলের স্টোভে ঝোল গরম করতে করতে কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে যাই। ঝোল উথলে পড়তে আরম্ভ করল, তাড়াতাড়ি স্টোভ নেভাতে গিয়ে কড়াশুদ্ধ ঝোল উল্টে পড়ল আমার হাতে। ফলে আমাকে পাঠিয়ে দিতে হল হাসপাতালে।

হাসপাতালের সেই বিভীষিকার কথা আজও ভুলি নি: ধূসর আর শাদা পোশাক-পরা মূর্তির ভিড়, কাঁপা কাঁপা হলুদ শূন্যতার ভিতরে কোঁকাচ্ছে, বিড় বিড় করছে। ক্রাচে ভর করা একটা লম্বা লোক, ভ্রূ দুটো গোঁফের মতো মোটা, লম্বা কালো দাড়ি নাড়তে নাড়তে চিৎকার করছে:

'মহামান্য বিশপের কাছে আমি নালিশ করব তোমার নামে!'

হাসপাতালের খাটগুলো যেন কতকগুলো কফিন, সিলিংয়ের দিকে নাক উঁচু করে শুয়ে থাকা রোগীরা যেন মরা চড়ুই। হলদে দেয়ালগুলো দোলে, জাহাজের পালের মতো ফুলে ফুলে ওঠে সিলিংটা, খাটগুলোকে দোল দিতে দিতে ঢেউয়ের মতো দোলে মেঝেটা। সবকিছু কেমন অবাস্তর, আশাহীন। আর বাইরে, জানালার ওপাশে গাছের পাতাঝরা শূন্য ডালপালাগুলো যেন এক অদৃশ্য হাতের চাবুকের মতো উঁচিয়ে থাকে।

দোরের পথে একটা লাল চুল কঙ্কালসার শবদেহ যেন বেঁটে বেঁটে দুটো কঙ্কালময় হাত দিয়ে গায়ে শবাচ্ছাদন জড়াতে জড়াতে নাচছে আর চিৎকার করছে:

'পাগলদের মধ্যে আমি থাকব না!'

'মহামান্য বি-ই-শপের কাছে...' চিৎকার করে উঠছে ক্রাচওয়ালা লোকটি।

দিদিমা, দাদামশাই আর অন্যান্য আরো অনেকের মুখে শুনেছি হাসপাতালে লোককে মেরে ফেলে, তাই আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। চশমা-পরা এক মহিলা—তাঁর গায়েও যেন অমনি মৃতের পোশাক—কাছে এসে আমার শিয়রে ঝোলানো স্লেটে চক দিয়ে কী যেন লিখলেন, চকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছিল আমার চুলের ভিতরে।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

'আমার নাম নেই।'

'নাম নেই?'

'না।'

'বাজে কথা বলো না, তাহলে বেত খাবে।'

আমার কেমন যেন নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ওরা বেত মারবে আমাকে, তাই ইচ্ছে করেই জবাব দিই নি। বেড়ালের মতো ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কথা বলছিলেন মহিলা আর বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়েই চলে গেলেন।

দুটো আলো জ্বলল। তাদের হলদে গোলক দুটো যেন কার হারানো দুটো চোখ, সিলিংয়ের উপর থেকে ঝুলে মিটমিটিয়ে দুলতে লাগল, যেন পরস্পর মিলে যেতে চাইছে।

'এস একটু তাস খেলা যাক!' কে যেন বলে উঠল কোণের দিক থেকে।

'এক হাতে কেমন করে খেলব?'

'ওহো, ওরা তবে তোমার একটা হাত কেটে ফেলেছে?'

শুনে আমার মনে হল তাস খেলার জন্যেই ওর একটা হাত কেটে ফেলেছে ওরা। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম মেরে ফেলার আগে আর কি কি করবে আমাকে?

আমার হাত দুটো জ্বলছিল, টন টন করছিল, যেন কেউ আমার হাতের হাড়গুলো টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে। ভয়ে, ব্যথায় চোখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। চোখ বন্ধ করে রইলাম কেউ যাতে আমার চোখের জল দেখতে না পায়, তবু চোখ ছাপিয়ে দু'রগ বেয়ে আমার কানের ভিতরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাত এল। রোগীরা যে যার খাটে উঠে ধূসর কম্বলের তলায় গা ঢাকা দিল। প্রতি মুহূর্তে নিস্তব্ধতা গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেবল কোণের দিক থেকে ভেসে আসছিল কণ্ঠস্বর, বিড় বিড় করে কে বলে চলেছে:

'কিছুই ফল হবে না এতে—ও একটা জানোয়ার, মেয়েটাও জানোয়ার...'

ইচ্ছে হচ্ছিল দিদিমাকে চিঠি লিখে বলি সময় থাকতে থাকতে এখনো এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাক এখান থেকে। কিন্তু হাতের জন্যে লিখতে পারলাম না, তাছাড়া কাগজও ছিল না। ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।

মনে হল এ রাত বুঝিবা শেষহীন। নিঃশব্দে খাটের কিনারা দিয়ে পা গলিয়ে দিলাম, এগিয়ে গেলাম দোরের সামনে। একটা পাট খোলা আর সেখানে, বারান্দায় বেঞ্চের উপরে বসে রয়েছে এক বুড়ো। এলোমেলো

পাকা চুলে ভরা মাথাটা ঘিরে ধোঁয়া উড়ছে, কোটরে ঢোকা কালো দুটো চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। লুকবার মতো সময় আমার ছিল না।

'কে ওখানে ঘুর ঘুর করছে? এখানে এসো!'

ওর গলার স্বর নরম, আদৌ ভীতিজনক নয়। কাছে এগিয়ে গেলাম। দাড়ি গোঁফে ঢাকা গোল মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা চুল রুপোলি জ্যোতির্মণ্ডলের মতো চারদিক থেকে ঝুলে পড়েছে, কোমরবন্ধে ঝুলছে এক থোকা চাবি। চুলদাড়িগুলো যদি আর একটু বড়ো হত তবে ঠিক সেণ্ট পিটারের মতো দেখাত।

'তোমারই হাত পুড়ে গেছে বুঝি? এত রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? ঘোরাঘুরি করার নিয়ম নেই।'

আমার মুখের উপরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল।

'ভয় করছে?'

'হুঁ।'

'এখানে এসে প্রথমটা সবাই ভয় পায়, কিন্তু ভয় পাবার মতো কিছুই এখানে নেই। বিশেষ করে আমার কাছে—আমি কারুর এতটুকু অনিষ্ট হতে দিই না। সিগারেট খাবে? বেশ, বেশ, সিগারেট খাও না তুমি। এখনো বড্ডো ছোট আছো কিনা, আরো বছর দুই যাক। তোমার মা-বাপ কোথায়? মা-বাপ নেই? ঠিক আছে--নাই বা থাকল। তাদের ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারবে, শুধু ঘাবড়াবে না, বুঝেছ?'

বহু দিন পরে একজন লোকের দেখা পেলাম, যে সহজ সরল আন্তরিকতার সঙ্গে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলে। সে কথা শুনতে খুবই ভালোই লাগছিল।

লোকটি আমাকে বিছানায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

'আমর কাছে একটু বসো না!' অনুনয় করে বললাম।

'তা বসছি,' বলল সে।

'তুমি কে?'

'সৈনিক, খাঁটি সৈনিক। ককেশাসে লড়াই করেছি। সত্যিকারের লড়াই। তাতো হবেই, সৈনিকের জীবন যুদ্ধ করার জন্যেই। যুদ্ধ করেছি হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে, চেরকেশীয়দের সঙ্গে, পোলদের সঙ্গে। যুদ্ধ—বুঝলে ভাই, একটা মস্ত শয়তানী!'

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজেছিলাম। যখন খুললাম, দেখি সৈনিকটির জায়গায় বসে আছেন দিদিমা আর সৈনিকটি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলছে:

'তাহলে ওরা সবাই মারা গেছে, আহা!'

সূর্যের আলো দুষ্টু শিশুর মতো লুকোচুরি খেলছে. সোনালী আলোয় সবকিছু উজ্জ্বল করে তুলে পরক্ষণেই লুকিয়ে পড়ছে, নতুন করে আবার ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

দিদিমা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন:

'কী হয়েছে, সোনা! ওরা মেরেছে তোকে? ঐ লাল চুল হায়নাটাকে বলে দিয়েছি...'

'একটু সবুর করুন, কানুন মাফিক সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি,' চলে যেতে যেতে বলল সৈনিক।

'সৈনিকটির দেশ বালাখ্নায়, সে আমাদের গ্রামবাসী,' গাল বেয়ে নেমে আসা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন দিদিমা।

তখনো আমার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি, তাই কথা না বলে চুপ করে রইলাম। ডাক্তার এসে আমার হাত দুটো ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তারপর দিদিমা আর আমি একটা গাড়ি চড়ে চললাম শহরের ভিতর দিয়ে। দিদিমা বলে চললেন:

'তোর দাদুর মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে রে. দারুণ কিপ্টে হয়ে উঠেছে, হাড় কিপ্টে! এইতো সেদিন ওর নতুন বন্ধু ফারকারবারী খ্লীস্ত ওর প্রার্থনার বইয়ের ভিতর থেকে একশ টাকার একটা নোট চুরি করে নিয়েছিল। ওঃ, তা নিয়ে কী হাঙ্গামাই না হল! বাবা!'

ঝলমলে রোদ উঠেছে, সাদা পাখির মতো ডানা মেলে মেঘগুলো ভেসে চলেছে আকাশ পাড়ি দিয়ে। বরফ-জমা ভলগার বুকের উপর তক্তা-পাতা পথ বেয়ে নদী পেরলাম। বরফ ভাঙ্গার মুচুড় মুচুড় শব্দ, তক্তার নিচে অল্প জমে-ওঠা জল চল্‌কে চল্‌কে উঠছে শপ্ শপ্ করে, ঝকমক করছে বাজারের গির্জার চুড়োর লাল গম্বুজগুলোর উপরের সোনালী ক্রুশগুলো। পথে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা: চওড়া মুখ, এক বোঝা রেশমী কোমল উইলো নিয়ে চলেছে পথ বেয়ে—বসন্ত আসছে, শীগ্‌গিরই ইস্টার উৎসব!

আমার ভেতরটা গান গেয়ে উঠছিল লার্ক পাখির মতো।

'দিদিমা, তোমায় খুব ভালোবাসি আমি!'

আমার কথায় একটুকুও আশ্চর্য হন না দিদিমা।

'তা তো স্বাভাবিকই—তুই যে আমার আপনার,' শান্ত গলায় বললেন দিদিমা। 'অহঙ্কার না করেও বলতে পারি নিতান্ত পর যারা তারাও আমাকে ভালোবাসে, মেরীমাকে ধন্যবাদ!'

একটু হেসে আবার বললেন, 'মেরীমার আর কি—ওঁর ছেলে তো শীগ্গিরই বেঁচে উঠবেন, কত আনন্দ করবেন! কিন্তু আমার মেয়ে ভারুশা...'

তারপর চুপ করে গেলেন...

২

উঠোনে দাদুর সঙ্গে দেখা। হাঁটু গেড়ে বসে কুড়ুল দিয়ে একটা বাখারি চাঁছছিলেন। দেখেই হাতের কুড়ুলখানা এমন ভাবে তুলে ধরলেন, মনে হল যেন এক্ষুণি ওটা ছুঁড়ে মারবেন আমার মাথায়। তারপর টুপিটা খুলে ঘৃণাভরা বিদ্রুপের সুরে বললেন:

'আসুন, আসুন লাটসায়েব, আসতে আজ্ঞা হোক! নোকরিটা তাহলে খতম হল? ভালো, নিজের পেটের যোগাড়টা এবার থেকে নিজেই করবেন! তা সে যেমন করেই পারুন! ছ্যা!'

'জানি গো জানি, সে সব জানা আছে আমাদের,' হাত নাড়া দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন দিদিমা। ঘরের ভিতরে এসে সামোভার গরম করতে করতে দিদিমা বললেন:

'তোর দাদু এবার পথে বসল; যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, রসিদপত্তর ছাড়াই সব তুলে দিয়েছিলেন ওঁর ধর্ম-পুত্তুর নিকোলাইয়ের হাতে ওঁর হয়ে খাটাবার জন্যে। কি ব্যাপার হয়েছিল ঠিক জানি না, কিন্তু সব সাফ হয়ে গেছে—যা কিছু টাকাকড়ি ছিল সব। কোনো দিনও গরিবদের এতটুকু সাহায্যও করি নি কিনা তাই, এতটুকুও দয়া দেখাই নি দুর্ভাগাদের উপরে। তাই উপরওয়ালা ভগবান ভাবলেন: 'আমিই বা কেন কাশিরিনদের উপরে এত সদয় হব?' এই ভেবে তিনি যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিলেন...'

তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন:

'প্রভুর হৃদয় অন্তত একটুখানি যাতে নরম হয় তার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি, বুড়োটার উপরে যাতে তিনি একেবারে নির্দয় না হন। রাত্রে বেরিয়ে গিয়ে নিজের রোজগার থেকে গোপনে কিছুটা দান-ধ্যান করি। চাস তো আজ রাত্রেই বেরুব'খন আমরা দুজনে, কিছু পয়সা আছে আমার হাতে...'

চোখমুখ কুঁচকে দাদু এসে ঘরে ঢুকলেন:

'তোরা কী গিলছিস দেখি?'

'তোমার খুদ-কুঁড়োও আমরা গিলছি না,' প্রত্যুত্তরে বললেন দিদিমা, 'ইচ্ছে হলে বসে যেতে পারো আমাদের সঙ্গে, ঢের আছে, কুলিয়ে যাবে'খন।'

দাদু বসে পড়লেন টেবিলে।

'দাও দেখি আমাকে এক কাপ ঢেলে,' নরম সুরে বিড় বিড় করে বললেন দাদু।

ঘরের যেখানে যে জিনিস ছিল ঠিক তেমনিই আছে, শুধু মায়ের কোণটা ফাঁকা—খাঁ খাঁ করছে। আর দাদুর বিছানার উপরে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে একখন্ড কাগজ, তাতে বড়ো বড়ো করে ছাপার হরফে লেখা:

'যীশু, আমার আত্মাকে রক্ষা করো, তোমার করুণা যেন আমরণ আমার জীবনকে ঘিরে রাখে।'

'কে লিখেছে ওটা?'

দাদু কোনো জবাব দিলেন না। একটু পরে মুচকি হেসে বললেন দিদিমা:

'ঐ কাগজটার দাম একশ রুবল!'

'তোমার ওতে নাক গলাবার দরকার কী?' খেঁকিয়ে উঠলেন দাদু, 'আমার যা কিছু আছে রাস্তার লোক ডেকে সব বিলিয়ে দেব!'

'দেয়ার মতো বাকি আর কিছু নেই যে। যখন ছিল তখন কিছু দিতে তো বুক ফেটে যেত,' শান্ত গলায় দিদিমা বললেন।

'চোপ রও!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন দাদু।

আগে যেমন ছিল, যেমন থাকা উচিত—তেমনিই চলেছে সব।

কোণের দিকে তোরঙ্গের উপরে কাঁথা কাপড় বিছনো ঝুড়ির ভিতরে জেগে উঠল কোলিয়া; ভারি চোখের পাতার তলায় ওর চকচকে নীলাভ চোখ দুটো প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। ও যেন আগের চাইতে আরো বেশি ধূসর, আরো বেশি ক্লান্ত, আরো বেশি ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছে; আমাকে চিনতে না পেরে নীরবে পাশ ফিরে চোখ বুজল।

রাস্তায় বেরিয়ে কতগুলো দুঃসংবাদ পেলাম: ভিয়াখির মারা গেছে, বসন্ত হয়ে, খুন্টের মৃত্যু সপ্তাহে; খাবি চলে গেছে শহরে, ইয়াজের দুটো পাই পড়ে গেছে, ঘরের বার হতে পারে না। এ সব খবর দিতে দিতে কালো-চোখ কস্ত্রোমা রেগে উঠে বলল: .

'ছেলেগুলো সব ঝট ঝট করে মরে যাচ্ছে!'

'মরেছে তো শুধু ভিয়াখির?'

'একই কথা: পাড়া থেকে চলে যাওয়াটাও মরারই সামিল। একজনার সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হল, চেনা জানা হল, আর অমনি হয় তাকে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হল কাজ করার জন্যে, নয়তো মরেই গেল। তোদের হাতায় চেম্নকোভদের বাড়িতে নতুন লোক এসেছে, ইয়েভ্‌সেয়েঙ্কোরা; ওদের একটা ছেলে আছে, নাম ন্যুশ্‌কা, ভালোই, বেশ চালাক চতুর! দুটো মেয়েও আছে, একটা একদম বাচ্চা আর একটা খোঁড়া, ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, দেখতে কিন্তু ভালো।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে আবার বলল:

'চুরকা আর আমি ওর প্রেমে পড়েছি, দিনরাত ঝগড়া করি।'

'মেয়েটার সঙ্গে?'

'আরে না, না, নিজেদের মধ্যে। মেয়েটার সঙ্গে প্রায় কখনোই না।'

বড়ো বড়ো ছেলেরা, এমন কি বয়স্ক লোকেরাও যে প্রেমে পড়ে তা অবশ্যই জানতাম। প্রেমে পড়ার স্থূল তাৎপর্যটাও আমার অজানা ছিল না। এখন কিন্তু শুনে মনটা অস্থির হয়ে উঠল, দুঃখও হল কস্ত্রোমার জন্যে। ওর বেঢপ চেহারা আর জ্বলন্ত কালো চোখের দিকে তাকালে আমার নিজেরই যেন কেমন লজ্জা হয়।

সে দিনই সন্ধ্যেয় খোঁড়া মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নামতে নামতে হঠাৎ ওর হাত ফসকে ক্রাচটা পড়ে গিয়েছিল। মোমের মতো আঙুলগুলো দিয়ে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে ও দাঁড়িয়ে, কেমন অসহায়, শীর্ণ, দুর্বল ভাবে দাঁড়িয়েছিল। ক্রাচটা তুলে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাতের ব্যাণ্ডেজের জন্যে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম, মেয়েটি তখন উপরে দাঁড়িয়ে হাসছিল মুখ টিপে টিপে।

'কী হয়েছে তোমার হাতে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'পুড়ে গেছে।'

'আমারও পা খোঁড়া। তুমি কি এ বাড়িতেই থাকো? অনেক দিন ছিলে হাসপাতালে? আমি ছিলাম অ-নে-ক দিন!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মেয়েটা।

ওর পরনের সাদা পোশাকটা পুরনো, তবে টাটকা ইস্ত্রি-করা, উপরে নীল রঙের ঘোড়ার নালের ছাপ। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, খাটো মোটা বেণী বুকের উপরে ঝোলানো। বড়ো বড়ো দুটো চোখ, গভীর। সেই গভীর শান্ত অতলতা থেকে আগুনের নীল শিখা বেরিয়ে এসে ফ্যাকাসে

শীর্ণ মুখখানাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। হাসিটিও মিষ্টি, তবু কেন যেন ওকে আমার ভালো লাগল না। ওর ক্ষীণ রোগা দেহখানা যেন বলছে:

'ছুঁও না আমাকে!'

কেমন করে যে আমার বন্ধুরা এই মেয়েটার প্রেমে পড়ল?

'অনেক দিন ধরে অসুখে ভুগেছি,' মেয়েটা চট পট জানিয়ে দিল, ওর গলায় বুঝিবা বেজে উঠল একটু গর্বের সুর। 'আমাদের পড়শী তুক করেছিল আমাকে। মাগীর ঝগড়া হয়েছিল মায়ের সঙ্গে। মায়ের ওপর হিংসেয় আমার উপরে তুকতাক করল... হাসপাতালে খুব খারাপ লাগত?'

'হ্যাঁ...'

ওর সামনে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল, ঘরের ভিতরে চলে গেলাম।

প্রায় রাত দুপুরে দিদিমা চুপি চুপি আমাকে জাগালেন।

'চল যাই, পরের উপকার করলে তোর হাতের ঘা শীগ্গির শীগ্গির ভালো হয়ে যাবে...'

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে চললেন যেন আমি অন্ধ। কালো স্যাঁৎসেঁতে রাত। খরা নদীর মতো দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে বাতাস, ঠান্ডা বালিতে পা কন কন করছে। দিদিমা অতি সন্তর্পণে শহরবাসীদের ঘরের অন্ধকার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তিনবার করে ক্রুশ করেন, তারপর পাঁচটা পয়সা আর তিনখানা করে বিস্কুট জানালার পৈঠায় রেখে নক্ষত্রহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে আর একবার ক্রুশ করে বিড় বিড় করে বলেন:

'স্বর্গের পবিত্র রাণী! সমস্ত মানুষের সহায় হও! জগজ্জননী মা তোমার চোখে সবাই যে আমরা পাপী!'

বাড়ি ছেড়ে যত দূরে এগই অন্ধকার যেন তত বেশি গভীর হয়ে ওঠে, তত বেশি নিঝুম হয়ে ওঠে চারদিক। রাত্রির আকাশের ঐ সীমাহীন অতলস্পর্শী অন্ধকার বুঝিবা চিরদিনের মতো চাঁদ আর তারাগুলোকে গিলে ফেলেছে। একটা কুকুর ছুটে গিয়ে গজরাতে শুরু করল, অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছিল; ভয়ে আঁৎকে উঠে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম।

'ভয় নেই,' বললেন দিদিমা, 'ওটা কুকুর। ভূতপ্রেত বেরবার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, মোরগ ডাকতে শুরু করেছে!'

কুকুরটাকে ডাকলেন দিদিমা, মাথার উপরে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে একটু আদর করলেন।

'দেখ বাপু, আমার নাতিটাকে কিন্তু ভয় দেখাস নে।'

কুকুরটা আমার পায়ের সঙ্গে গা ঘসল, তারপর আমরা তিনজনে মিলে চলতে শুরু করলাম। দিদিমা একে একে বারোটা জানালার কাছে গিয়ে পৈঠার উপরে তাঁর 'গোপন দান' রেখে এলেন। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে, অন্ধকারের ভিতর থেকে বাড়িঘরগুলো ধূসর হয়ে ফুটে উঠেছে; চিনির মতো ধবধবে হয়ে উঠছে নাপোলনায়া গির্জার ঘণ্টিঘর; কবরস্থানের ইটের দেয়ালটা যেন কণ্ঠির বেড়ার মতো স্বচ্ছ।

'তোর বুড়ি দিদিমা এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,' বললেন দিদিমা, 'ঘরে ফেরার সময় হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে গিন্নীরা দেখবে মেরীমা তাদের ছেলেপুলেদের জন্যে দুটো খুদ-কুঁড়ো রেখে গেছেন! ভাঁড়ারে কিছু না থাকলে লোকে খুদ-কুঁড়োও আদর করে তুলে নেয়। হায় রে কপাল আলিয়শা, কি কষ্টেই যে লোকেরা দিন কাটায়, অথচ কেউ তাদের দেখার নেই!

> ধনীরা কখনো ভাবে না প্রভুর কথা,
> পুণ্যকাহিনী 'শেষ বিচারের' ব্যথা,
> দীনজন প্রতি কৃপা নেই এক কণা।
> নুয়ে পড়ে শুধু দুহাতে কুড়োয় সোনা —
> নরকে যখন যাবে
> সোনা দানা পুড়ে কালো অঙ্গার হবে।

'আপশোস তো সেইখানে! ঈশ্বর আমাদের সবাইকে দেখেন, আমাদেরও উচিত সবাইয়ের দেখাশুনো করা! তুই আবার আমার কোলে ফিরে এসেছিস, তাতেই আমার আনন্দ...'

আমার অন্তরও এক শান্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। আবছা-আবছা ভাবে অনুভব করলাম, এমন একটা কিছুর সংস্পর্শে এসেছি যার কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। বাদামী রঙের কুকুরটা কাঁপতে কাঁপতে চলেছে আমার পাশে; খেঁকশিয়ালের মতো মুখ, মায়া ভরা ক্ষমাপ্রার্থী চোখ।

'কুকুরটা আমাদের বাড়ি থাকবে?'

'যদি থাকতে চায় তো থাকবে। একটা বিস্কুট দিই ওকে, দুখানা আছে এখনো। চল, ঐ বেঞ্চটার উপরে গিয়ে একটু বসি, কেন জানি বড্ডো ক্লান্ত লাগছে...'

একটা গেটের সামনের বেঞ্চের উপরে দুজনে বসলাম। কুকুরটা পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে শুকনো বিস্কুট চিবোতে লাগল আর দিদিমা বলে চললেন:

'এক ইহুদি মেয়ে থাকে এখানে। গেঁড়িগেঁড়ি ন-টা তার ছেলেপুলে। একদিন জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'কেমন করে চলে তোমার, মইসেয়েভনা?' 'ভগবান সহায়, নইলে আর চালাব কী করে?' জবাবে বলল মেয়েটি।'

কিছু পরেই দিদিমার গরম গায়ের সঙ্গে লেপটে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার দ্রুতবেগে কূল ছাপিয়ে বয়ে চলে জীবনস্রোত। প্রতিটি নতুন নতুন দিনের চওড়া স্রোত আমার মনের মধ্যে নানা ছাপ ফেলে যায়, তার কোনোটা মুগ্ধ করে, কোনোটা ভয় জাগায়, ব্যথা দেয়, কোনোটা আবার ভাবায়।

দুদিন যেতে না যেতেই ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে ঘন ঘন দেখার, ওর সঙ্গে দুটো কথা বলার, নিদেনপক্ষে গেটের সামনের বেঞ্চটার উপরে শুধু ওর পাশটিতে চুপ করে বসে থাকার জন্যে আমার মনটাও উৎসুক হয়ে উঠল। ওর পাশে চুপ করে বসে থাকাটাও যেন সুখ। মেয়েটা পাখির মতো ঝকঝকে তকতকে। দন্-এর পারের কসাকদের জীবন সম্পর্কে গল্প বলে চমৎকার। ও অঞ্চলে সে অনেক দিন ছিল তার কাকার কাছে। কাকা ছিল মাখন কারখানায় একজন যন্ত্রী, ফিটার মিস্ত্রি বাবা পরে নিজনি-নভগরোদে চলে আসে।

'আমার আরো এক কাকা আছে, সে চাকরি করে খোদ জারের ওখানে।'

ছুটির দিনে পাড়ার সবাই বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। তরুণ তরুণীরা যায় গির্জার কবরস্থানে নাচ ও গানের আসরে, বড়োরা সরাইখানায়। শুধু গিন্নীরা আর বাচ্চাছেলেরা থাকে মহল্লায়। হয় বেঞ্চের উপরে নয়তো গেটের পাশে শুধু বালির উপরে বসে থাকে গিন্নীরা। তাদের ঝগড়া, কোঁদল আর গালগপ্প মিলে জেগে ওঠে বিরাট কোলাহল। ছোটরা খেলে বল, স্কিট্ল্, খেলে 'শারমাজ্‌লো'। মায়েরা কখনো বা ছেলেদের তারিফ করে ভালো খেলার জন্যে, আবার কখনো বা খারাপ খেলার জন্যে গাল পাড়ে। কানে তালা-লাগানো হৈ-হট্টগোল, ফুর্তিও অঢেল। বড়োদের উপস্থিতি আর তাদের মনোযোগে আমরা ছোট ছেলেরা এমন উল্লসিত হয়ে উঠি যে দারুণ উৎসাহে, তীব্র প্রতিযোগিতায় খেলতে শুরু করি। খেলায় যতই মেতে উঠি, ফাঁক পেলেই কস্ত্রোমা, চুরকা আর আমি খোঁড়া মেয়েটার কাছে ছুটে গিয়ে নিজের নিজের বিক্রম জাহির করে আসি।

'এক ঘায়েই কেমন ন-টা কাটি ফেলে দিলাম, দেখলে ল্যুদ্‌মিলা?'

মেয়েটা মিষ্টি হাসি হাসে আর মাথা দোলায়।

আগে আমরা তিনজনেই এক দলে খেলতে চাইতাম, কিন্তু এখন লক্ষ্য করছি চুরকা আর কস্ত্রোমা বিপরীত দলে খেলতে চায়। ওরা ওদের শক্তি নৈপুণ্য সবকিছু দিয়ে দুজনে দুজনকে আক্রমণ করে, এমন কি প্রায়ই মারপিট কান্নাকাটি পর্যন্তও গড়ায়। একদিন দুজনে এমন ভীষণ মারপিট শুরু করে দিল যে বড়োদের এসে গায়ে জল ঢেলে ওদের ছাড়াতে হল — যেন কুকুরের লড়াই।

ল্যুদমিলা বেঞ্চের উপরে বসে ভালো পা-টা ঠুকে চলেছিল মাটির উপরে। জাপ্টাজাপ্টি করতে করতে যখনই মল্লবীরেরা ওর কাছে গিয়ে পড়ছিল, ক্রাচ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে ভয়ে চিৎকার করে উঠছিল:

'থাম্!'

ওর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন, বিস্ফারিত, যেন এক্ষুণি মূর্ছা যাবে।

আর একদিন স্কিট্ল্ খেলায় চুরকার কাছে দারুণ হেরে লজ্জায় ক্ষোভে কস্ত্রোমা মুদীর আড়তের ওটের মরাইয়ের পিছনে গুটিসুটি হয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। সে কী ভীষণ দৃশ্য! এত জোরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে যে চোয়ালের মাংসপেশী ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, শীর্ণ মুখখানা পাথরের মতো শক্ত, কালো গভীর চোখ দুটো বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল গড়াচ্ছে। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেই ও কান্না গিলে দম চেপে বলল:

'দাঁড়া, ইট মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে দেব — দেখে নিস!'

চুরকার চালচলনে ফুটে উঠল একটা উদ্ধত ভাব। বিয়ের যুগ্যি ছেলেদের মতো টুপিটা মাথার একপাশে তেরছা করে পরে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাড়ার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়।

'শীগ্গিরই সিগারেট ধরছি,' দাঁতের ফাঁকে পিচ কেটে থুথু ফেলার কায়দা দেখিয়ে চুরকা বলল। এটা ওর নতুন শেখা। 'এর মধ্যেই বার দুই চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখনো গা ঘুলিয়ে ওঠে।'

সবকিছু মিলে মনটা কেমন খিঁচড়ে যেতে লাগল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বন্ধুদের হারাতে বসেছি, মনে হল ল্যুদমিলাই এর মূল কারণ।

একদিন সন্ধ্যেবেলা উঠোনে বসে কুড়োনো হাড়, ছেঁড়া নেকড়া ইত্যাদি জঞ্জাল বেছে আলাদা করছি। ল্যুদমিলা এল ক্রাচের উপর ভর দিয়ে, ডান হাতটা নাড়তে নাড়তে, হেলতে দুলতে।

'শুনছ,' তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'কস্ত্রোমা গিয়েছিল তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'আর চুরকা?'

'চুরকা আর আমাদের সঙ্গে খেলে না। এসব তোমারই দোষে। ওরা তোমার প্রেমে পড়েছে আর তাই ওরা মারপিট করে...'

ল্যুদমিলার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, তবু পরিহাসের সুরেই বলল:

'ইস্! আমার দোষ হতে যাবে কেন?'

'কেন তুমি ওদের প্রেমে পড়তে দিলে?'

'আমি তো আর আমার প্রেমে পড়ার জন্যে ওদের সাধতে যাই নি!' রেগে উঠে জবাব দিল ল্যুদমিলা। তারপর চলে যেতে যেতে বলল, 'যত সব বাজে কথা! আমি বয়সে ওদের চাইতে বড়ো। আমার বয়স চোদ্দ বছর। বয়সে বড়ো মেয়েদের সঙ্গে কেউ প্রেম করে না।'

'বড়ো বললে!' ওকে আঘাত করার জন্যেই চেঁচিয়ে বললাম। 'ওই দেখো না দোকানদারণী, খ্লীস্তের বোন, বেশ বয়েস হয়ে গেছে, কিন্তু দেখো না ছেলেরা কেমন ওর পিছন পিছন ঘুর ঘুর করে!'

ঘুরে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে ল্যুদমিলার ক্রাচটা বালির ভিতরে অনেকখানি ডেবে গেল।

'তুমি কিচ্ছু জানো না!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ল্যুদমিলা। ওর চোখ দুটো চকচক করছে। 'দোকানদারণীটা তো নষ্ট মেয়েমানুষ, কিন্তু আমি — আমাকেও কি তাই ভেবেছ? আমার এখনো বয়স হয় নি। আমার গায়ে হাত দেবে, ফষ্টিনষ্টি করবে তেমন পাও নি আমাকে... 'কামচাদাল্কা' বইটার দ্বিতীয় অংশটা যদি তোমার পড়া থাকত তবে এ ধরণের কথা তুমি বলতে না।'

গজ গজ করতে করতে চলে গেল ল্যুদমিলা। দুঃখ হল আমার ওর জন্যে, মনে হল যেন ওর কথায় এমন কিছু সত্য আছে যা আমার কাছে এখনো অজানা। আমার বন্ধুরা কেন ওর সঙ্গে খুনসুটি করে? অথচ বলে কিনা ভালোবাসে!

আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে পরের দিন দু'কোপেকের লাড্ডু কিনে নিয়ে এলাম। জানতাম জিনিসটা ল্যুদমিলার প্রিয়।

'নেবে?'

'চলে যাও! তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই না!' জোর করে আনা রাগে বলল ল্যুদমিলা।

তারপর খানিক পরেই লাড্ডুগুলো নিতে নিতে বলল:

'একটু কাগজে মুড়ে আনলেও তো পারতে, দেখো তো তোমার হাত দুটো কী নোংরা!'

'হাত ধুয়েছিলাম, কিন্তু এগুলো যে ওঠে না।'

ওর শুকনো নরম হাতে আমার হাতটা তুলে নিয়ে পরখ করে দেখল লুদমিলা।

'হাত দুটোকে তো একেবারে শেষ করে ফেলেছ...'

'তোমার আঙুলেও তো খোঁচা খোঁচা দাগ...'

'ওগুলো হয়েছে সূঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে, অনেক সেলাই করি কিনা...'

কিছুক্ষণ পরে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লুদমিলা বলল:

'চল কোথাও গিয়ে লুকিয়ে দুজনে মিলে 'কামচাদাল্‌কা' বইটা পড়ি, পড়বে?'

উপযুক্ত জায়গা বার করতে বেশ সময় লাগল। অবশেষে স্নানের ঘরে ঢোকার পথটাই সাব্যস্ত হল: জায়গাটা অন্ধকার, কিন্তু জানালার কাছে বসা যায়। জানালার সামনে গোয়ালের চালা আর কসাইখানার মাঝখানে আস্তাকুঁড়ের মতো একটু জায়গা, ওদিকটায় কেউ বড়ো একটা আসে না। লুদমিলা গিয়ে বসল জানালার কাছে। খোঁড়া পা-টা বেঞ্চের উপরে মেলে দিয়েছে, ভালো পা-টা রেখেছে মেঝের উপরে। মুখের সামনে খোলা বই, পাতাগুলোর কোণ ভাঙা। আউড়ে চলেছে অজস্র প্রাণহীন দুর্বোধ্য কথার স্রোত, কিন্তু তবুও আমি অভিভূত। মেঝের উপরে যেখানটায় বসে রয়েছি সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওর গম্ভীর দুটো চোখের দুটি নীল শিখা বইটার পাতার উপরে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে যায়, আর সেই অজানা শব্দগুলোর দুর্বোধ্য বিন্যাস উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঐ শব্দগুলোকে মনে মনে নানান ভাবে ভেঙেচুরে কবিতায় রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মনটা এদিকে নিবদ্ধ থাকার ফলে বইটার বিষয়বস্তু যে কী তা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল।

কুকুরটা আমার কোলের উপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর নাম রেখেছি 'বাতাসী', কারণ ওর ঠ্যাংগুলো লম্বা, লোমশ, ছোটে বাতাসের বেগে। আর গর্জন করে যেন শরৎকালের ঝড়ো হাওয়া চিমনির মুখে ঝাপটা মারছে।

'শুনছ তো?' জিজ্ঞেস করে লুদমিলা।

আমি মাথা নাড়ি। শব্দের ধাঁধায় আমার উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠেছে। তাদের নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে গানের কথার মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টায় আমি আরো অধীর। সে গানের প্রতিটি কথা এক একটি তারার মতো উজ্জ্বল, দীপ্তিময়।

অন্ধকার হয়ে এল। বইসমেত ফ্যাকাশে হাতটা নামিয়ে নিল ল্যুদমিলা।

'চমৎকার, না?' বলল ল্যুদমিলা, 'বললাম বইটা খুব সুন্দর...'

সে দিনের পর থেকে প্রায়ই আমরা স্নানের ঘরে ঢোকার পথে গিয়ে বসতাম। দুদিন পরেই ল্যুদমিলা 'কামচাদাল্‌কা' পড়া বন্ধ করতে আমি আরো খুশি হয়ে উঠলাম। বইটার ঐ অফুরন্ত গল্প সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে একটি বর্ণও আমি বলতে পারতাম না। অফুরন্ত বলছি এইজন্যেই যে দ্বিতীয় খণ্ডের পর আছে তৃতীয় খণ্ড। আমরা শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় খণ্ড থেকে, ল্যুদমিলা বলছিল চতুর্থ খণ্ডও নাকি আবার আছে।

বৃষ্টির দিনে আমরা খুশি হয়ে উঠতাম আরো বেশি, অবশ্য দিনটা যদি শনিবার না হত—স্নানের ঘরে জল গরম করার দিন।

বৃষ্টি নামত মুষলধারে। ঘরের বার হতে পারত না কেউ, তাই আমাদের অন্ধকার কোণের ওদিকে কারুরই আসার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। ল্যুদমিলার আবার পাছে কেউ আমাদের দেখে ফেলে তাই দারুণ ভয় ছিল।

'জানো, তাহলে কী ভাববে ওরা?' মৃদুকণ্ঠে বলেছিল ল্যুদমিলা।

জানতাম, আমারও ধরা পড়ার ভয় ছিল। এক এক সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে বসে আমরা গল্প করে কাটাতাম। কখনো আমি শোনাতাম দিদিমার বলা গল্প, কখনো ল্যুদমিলা শোনাত মেদ্‌ভেদিৎসা নদীর তীরের কসাকদের কথা।

'ভারি চমৎকার ও দেশটা!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলত ল্যুদমিলা। 'এখানকার মতো একটুও না, দেশটা তো ভিখারীদের উপযুক্ত...'

আমি স্থির করে ফেলেছিলাম বড়ো হলে মেদ্‌ভেদিৎসা নদী দেখতে যাব।

ক-দিন পরে আমাদের আর স্নানের ঘরে ঢোকার পথে গিয়ে বসার প্রয়োজন রইল না। ল্যুদমিলার মা ফারকারবারীর ওখানে কাজ পেলে, ছোট বোন যায় ইস্কুলে, ভাই কাজ করে টালির কারখানায়। বৃষ্টি বাদলার দিনে আমি ল্যুদমিলার রান্না-বান্না ঘরকন্নায় সাহায্য করি।

'বেশ স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করছি আমরা,' হেসে বলে ল্যুদমিলা। 'শুধু একসঙ্গে শুই না, এই যা। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর চাইতেও ভালো ভাবে ঘরকন্না করছি আমরা — মানে, স্বামীরা তো আর বৌদের সাহায্য করে না...'

আমার হাতে কিছু পয়সা হলে মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি, দুজনে মিলে চা খাই। তারপর সামোভারটা আবার জল ঢেলে ঠাণ্ডা করে রাখি, ল্যুদমিলার মা যাতে টের না পায় আমরা সামোভার গরম করেছিলাম। কখনো কখনো দিদিমা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। লেস বুনতে বুনতে বা সেলাই করতে করতে অদ্ভুত সুন্দর সব গল্প বলেন। আর যে দিন দাদু চলে যায় শহরে, ল্যুদমিলা আসে আমাদের ঘরে। সে দিন আমরা বেপরোয়া হয়ে ভোজ লাগাই।

দিদিমা বলতেন:

'বেশ সুন্দর কেটে যাচ্ছে আমাদের না রে? নিজের পয়সায় খাওয়া দাওয়া করব, তাতে কার কি বলবার আছে?'

আমাদের দুজনার বন্ধুত্বে উৎসাহ দিতেন দিদিমা।

'একটা ছেলে আর মেয়ের ভিতরে ভাব হওয়াটা খুব ভালো! শুধু খেয়াল রাখতে হবে যেন কিছু বোকামো করে না বসে...'

তারপর খুব সহজসরল ভাবে 'বোকামোটা' যে কী, তা বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর কথাগুলো ছিল সুন্দর, প্রেরণাময়। আমি অল্প পরেই বেশ বুঝে নিলাম যে ফুল যতক্ষণ না পুরো ফুটে উঠছে ততক্ষণ তাকে ছুঁতে নেই। তা না হলে সে ফুল না দেবে গন্ধ না ফল।

না, কোন রকমের 'বোকামো' করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু তা বলে ল্যুদমিলা আর আমার ভিতরে সেই সব না-বলা নিষিদ্ধ কথার আলোচনা যে হত না তা নয়। অবশ্য, কেবল প্রয়োজন পড়লেই হত, কারণ স্থূল যৌন-সম্পর্কের ঘটনা এত ঘন ঘন, এতো বেশি বেশি আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ত যে আমরা দারুণ মর্মাহত হতাম।

ল্যুদমিলার বাবা ইয়েভসেয়েঙ্কো সুপুরুষ, বয়েস প্রায় চল্লিশ। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর গালপাট্টা, মোটা ভুরু। ভুরু তুলে তাকাত একটা অদ্ভুত বিজয় গর্বের ভঙ্গিতে। আশ্চর্য রকমের স্বল্পভাষী লোক: তার মুখে কোনোদিন একটি কথাও শুনেছি বলে মনে পড়ে না, ছেলেপুলেদের যখন আদর করার সময় কেবল কালাবোবা মানুষের মতো শব্দ করত মুখ দিয়ে, এমন কি বৌকে পিটনোর সময়ও মুখ খুলত না।

ছুটির দিনে সন্ধ্যায় গায়ে চড়াত একটা নীল জামা, পরনে মখমলের চওড়া ট্রাউজার্স, পালিশ-করা চকচকে বুট। কাঁধে চামড়ার ফিতের সঙ্গে বড়ো একটা একর্ডিয়ন ঝুলিয়ে গেটের সামনে গিয়ে হাতিয়ারবন্ধ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। একটু পরেই হাওয়া খেতে বেরুনো লোকজনের ভিড় আমাদের গেটের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা শুরু করত। রাজহাঁসের মতো মন্থরগমন মেয়েরা আর গিন্নীরা চোখের কোণে লাজুক লুব্ধ দৃষ্টি হেনে ইয়েভসেয়েঙ্কোর দিকে তাকাতে তাকাতে দল বেঁধে চলে যেত। কেউ বা তাকাত খোলাখুলি, ক্ষুধার্ত চোখে। নিচের ঠোঁটটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কালো কালো দুটো চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত ইয়েভসেয়েঙ্কো। মেয়েদের সেই নীরব দৃষ্টি-বিনিময়, নিয়তির টানের মতো মন্থর গমনে ঐ পুরুষটির সামনে দিয়ে এই নারী-শোভাযাত্রার মধ্যে কেমন যেন একটা ন্যক্কারজনক সারমেয়বৃত্তি ফুটে উঠত। মনে হত ইয়েভসেয়েঙ্কোর তরফ থেকে একটু ইঙ্গিতের আদেশমাত্রেই যে কেউ পথের নোংরা ধুলোর উপরে লুটিয়ে পড়বে।

'চোখ মারছে ওদের দিকে, দেখো না! ছাগল! বেহায়া শুয়োর কোথাকার!' দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করে বলে উঠত ল্যুদমিলার মা। ওকে দেখাত ঠিক মুড়ো ঝাঁটার মতো: রোগা ঢ্যাঙা, চিমসে লম্বা মুখ, টাইফাসে ভোগার দরুন মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

তার পাশে বসে থাকত ল্যুদমিলা। নানান রকমের প্রশ্ন করে চেষ্টা করত মায়ের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে, কিন্তু পারত না।

'দূর হয়ে যা এখান থেকে, ল্যাংড়ী!' বিড় বিড় করে ধমকে উঠত ওর মা। নিদারুণ অস্বস্তিতে চোখ পিট পিট করত। তার চেরা চেরা মঙ্গোলীয় চোখ দুটো অদ্ভুত নিষ্প্রভ আর নিথর, যেন একটা কিছুর সঙ্গে আটকে গেছে, কিছু একটা টেনে ধরে রেখেছে।

'রাগ করো না মা, কোনো লাভ নেই,' বলত ল্যুদমিলা। 'দেখো দেখো, বেত-বুনিয়ের বিধবা বৌয়ের সাজগোজের ঘটাখানা দেখো!'

'তোদের তিন-তিনটেকে যদি এই হাতে মানুষ করতে না হত তো ওর চাইতে ঢের বেশি সাজগোজ করতে পারতাম আমি। তোরাই তো আমার হাড়মাস খেয়ে শেষ করেছিস — গিলে খেয়েছিস,' বেত-বুনিয়ের বিধবা বৌয়ের বিশাল দেহটার দিকে তাকিয়ে কান্নাভরা নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠত ওর মা।

বেত-বুনিয়ের বিধবাটাকে দেখায় যেন একটা ছোটখাটো বাড়ির মতো: বারান্দার মতো উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে বুকখানা, আঁট করে বাঁধা সবুজ রঙের রুমালের ফাঁকে ওর লাল মুখখানা দেখে আমার মনে পড়ে যায় সূর্যাস্তের লাল আলোয় ঝক্ মক্ করে ওঠা ঢালু ছাতের ঘুলঘুলির কথা।

একর্ডিয়নটা বুকের উপরে এনে দোলাতে দোলাতে বাজাতে আরম্ভ করে ইয়েভসেয়েঙ্কো। অজানা দূরকে প্রলুব্ধ করে যন্ত্রের ভিতর থেকে জেগে ওঠে অপূর্ব সুর! সমস্ত মহল্লার শিশুরা ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাদকের পায়ের কাছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে চুপ করে শোনে।

'একটু দাঁড়াও, কেউ একদিন আচ্ছা করে ধোলাই দেবে তবে ঠিক হবে,' শাসাত ইয়েভসেয়েঙ্কোর স্ত্রী।

শুধু আড়চোখে একটু তাকাত ইয়েভসেয়েঙ্কো, কোন জবাব দিত না।

খ্‌লীস্তের দোকানের সামনের বেঞ্চেটায় গিয়ে বসে থাকত বিধবা বৌটা যেন আটকে গেছে। বসে বসে শুনত বাজনা: মাথাটা হেলে পড়ত এক পাশে, দ্রুত নিশ্বাসে বুকখানা ওঠা নামা করত।

অস্তগামী সূর্যের গোলাপী আলো গির্জার ওধারে দূরের মাঠখানাকে ধুয়ে দিয়ে যায়। পথের ওপর চমকদার পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত সচল দেহস্রোত, তাদের পায়ে পায়ে চলেছে শিশুরা। মদির বাতাস। রোদে তপ্ত বালি থেকে ওঠে একটা মিশ্র গন্ধ। কসাইখানা থেকে ভেসে-আসা চর্বির মিষ্টি গন্ধটাই প্রবল, তার সঙ্গে আছে রক্তের গন্ধ আর ফারকারবারীর উঠোন থেকে আসে চামড়ার নোনা ঝাঁঝ। মেয়েদের বকবক, পুরুষদের মাতাল হল্লা, শিশুকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার, একর্ডিয়নের মৃদু গুঞ্জন, সব মিলে যেত এক উত্তাল ছন্দে, যেন উর্বরা ধরিত্রীর বিপুল দীর্ঘশ্বাস। সব কিছুই স্থূল, নগ্ন—এমন নির্লজ্জের মতো যা পাশবিক, আপন সগর্ব শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্যে যা এতখানি উন্মত্ত অধীর সেই অন্ধকার জীবনস্রোতের ওপর কেমন যেন একটা অপরিসীম প্রবল বিশ্বাস জেগে ওঠে।

একাকার কোলাহলের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটি কথা এসে অন্তরে আঘাত করে যায়, স্মৃতিতে বাসা বাঁধে।

'সবাই মিলে একসঙ্গে তো আর ওকে ছিঁড়ে খাওয়া যাবে না — পালা করে পেতে হবে...'

'নিজেরা যদি নিজেদের না দেখি তবে কে আর আমাদের দেখবে?'

'মেয়েমানুষকে ভগবান গড়েছেন শুধু একটু তামাসা করার জন্যে?'

রাত ঘনিয়ে আসে। বাতাস আরো তাজা হয়ে ওঠে। কোলাহল থেমে যায়। ছায়ার পোশাক জড়িয়ে কাঠের বাড়িঘরগুলো যেন ফেঁপে ফুলে ওঠে। ঘুমোবার সময় হয়েছে বলে শিশুদের কাউকে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘরে। কেউ কেউ ওখানেই বেড়ার ছায়ায়, মায়েদের পায়ের কাছে বা কোলের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু বড়ো ছেলেরা এখন শান্ত, অনুগত। ইয়েভসেয়েঙ্কো উধাও — সবার অলক্ষ্যে সরে পড়েছে যেন উবে গেছে। বেত-বুনিয়ের বিধবা বৌও উধাও। গির্জা ছাড়িয়ে বহু দূরের কোন এক জায়গা থেকে যেন ভেসে আসছে একর্ডিয়নের গম্ভীর সুর। ওখানেই বেঞ্চের উপরে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে ল্যুদমিলার মা, বেড়ালের মতো পিঠটা তার বাঁকা। দিদিমা চা খেতে যান দাইয়ের সঙ্গে। সে একাধারে দাই আর ঘটকী দুই। আমাদেরই পড়শী। লম্বা চওড়া পেশল চেহারা, হাঁসের ঠোঁটের মতো নাক। চ্যাপ্টা পুরুষালি বুকের উপরে একটা সোনার মেডেল — 'মৃত্যু থেকে উদ্ধার করার' পুরস্কার। পাড়ার সবাই ওকে ভয় করে, বলে ডাইনী। শোনা যায় এক সময়ে এক কর্নেলের তিনটি বাচ্চা আর রুগ্ণ স্ত্রীকে একটা জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বের করে এনেছিল।

দিদিমা আর ও দুই সই: পথে দেখা হলে অনেক দূর থেকেও খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই পরস্পরকে হেসে অভ্যর্থনা জানায়।

আমাদের গেটের সামনে বেঞ্চের উপরে ল্যুদমিলার পাশে বসে আমি আর কস্ত্রোমা। ল্যুদমিলার ভাইকে কুস্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে চুরকা: দুজন দুজনকে জাপটে ধরে বালির ভিতরে দাপাদাপি করছে।

'থাম!' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে ল্যুদমিলা।

ল্যুদমিলার দিকে কালো চোখের তেরছা দৃষ্টি হেনে শিকারী কালিনিনের গপ্প বলে চলেছে কস্ত্রোমা। নোংরা বুড়ো কালিনিন, দুটো চোখ শয়তানীভরা, গাঁয়ের সবাই জানত ওর কুখ্যাতির কথা। ক-দিন হল মারা গেছে কালিনিন, কিন্তু — কস্ত্রোমা বলল, — কবরস্থানের ভুঁয়ে কবর না দিয়ে ওর কফিনটা রেখে দিয়েছে উপরে, অন্যান্য কবর থেকে আলাদা করে। একটা লোহার ফ্রেমের উপরে বসানো কালো কফিনটা, ঢাকনার উপরে শাদা রঙে আঁকা একটা ক্রুশ, একটা বর্শা, একটা ছড়ি আর দুটো হাড়ের ছবি।

লোকে বলে রোজ রাত্রে নাকি বুড়ো কফিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে

মোরগ ডেকে ওঠার আগ পর্যন্ত কবরস্থানের ভিতরে কী খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

'ওসব ভয়ঙ্কর কথা বলিস না!' মিনতি করে বলল ল্যুদমিলা।

'ছেড়ে দে আমাকে!' ল্যুদমিলার ভাইয়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে চেঁচিয়ে উঠল চুরকা। তারপর কস্ত্রোমার দিকে ফিরে বিদ্রূপ করে বলল:

'মিথ্যে কথা বলছিস কেন? আমি নিজের চোখে মাটি খুঁড়ে কফিনটাকে কবর দিতে দেখেছি। আর উপরটা তো খালি রেখেছে স্মৃতিফলক বসাবার জন্যে... তাছাড়া ওর প্রেতাত্মা রাতের বেলা কবরস্থানের ভিতরে ঘুরে বেড়ায়— এ গপ্প রটিয়েছে ঐ মাতাল কামারটা!..'

'বেশ, অতই যদি জানিস তো যা না, কবরস্থানে গিয়ে রাত কাটিয়ে আয় না!' জবাব দিল কস্ত্রোমা। কিন্তু ওর দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত।

দুজনে শুরু করল কথা কাটাকাটি। একটু বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে ল্যুদমিলা মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁ মা, প্রেতাত্মারা কী রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ, বেড়ায়,' বলল ওর মা। প্রশ্নটা যেন বহু দূর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাকে।

দোকানীর ছেলে — ভালিওক: নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা, গাল দুটো লাল, বছর কুড়ি বয়েস। বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমাদের আলোচনা শুনে বলল:

'তোরা কেউ যদি কবরস্থানে গিয়ে ভোর পর্যন্ত কফিনটার উপরে শুয়ে থাকতে পারিস তো বিশ কোপেক আর দশটা সিগারেট দেব। কিন্তু যদি ভয়ে পালিয়ে আসিস তবে প্রাণভরে যতো খুশি কান মলে দেব। কেমন, রাজী?'

অস্বস্তিকর নীরবতা দেখা দিল। সেই নীরবতা ভেঙ্গে ল্যুদমিলার মা বলল:

'কি যা-তা বকছিস! বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের অমন কাজ করতে বলা ঠিক নয় তোর...'

'এক রুবল ফ্যাল, আমি যাব!' আস্তে আস্তে বলল চুরকা।

'কেন বিশ কোপেক হলে ভয় করবে বুঝি?' বিদ্রূপ করে বলে উঠল কস্ত্রোমা। 'বল, ভালিওক, বল এক রুবলই দেব, কিছুতেই ও যাবে না দেখিস, শুধু শুধু বড়াই করছে...'

'ঠিক আছে, এক রুবলই সই!'

মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল চুরকা, তারপর বেড়াটা ধরে ধরে গুটি গুটি খসে পড়ল। মুখের ভিতর আঙুল পুরে পিছন থেকে তীক্ষ্ম সুরে শিস দিয়ে উঠল কস্ত্রোমা। ল্যুদমিলা উদ্বেগভরা কণ্ঠে বলে উঠল:

'কেন যে অমন বড়াই করা?'

'ভীতু কাপুরুষের দল!' খোঁচা দিয়ে বলল ভালিওক, 'ওরা আবার সব মহল্লার সেরা লড়ুইয়ে! ছো! তোরা হলি কুত্তার ছানা!'

ওর ঐ অপমান অসহ্য। দুচক্ষে দেখতে পারি না আমরা ঐ মোটকা ছোঁড়াটাকে। সব সময়েই ও বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের উসকে দেয় কুকাজ করার জন্যে। মেয়ে আর গিন্নীদের নিয়ে যত নোংরা গপ্প শোনায়, তাদের সঙ্গে অশ্লীল রসিকতা করতে শেখায়। ছেলেরা ওর কথামতো কাজ করে আর উত্তম-মধ্যম খায়। কেন যেন ও আমার কুকুরটাকে দেখতে পারে না, দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে, মারে; একদিন রুটির ভিতরে ছুঁচ পুরে খেতে দিয়েছিল।

কিন্তু চুরকাকে অমন লেজ গুটিয়ে লজ্জাকর ভাবে পালিয়ে যেতে দেখে আমার আরো বেশি অসহ্য লাগছিল।

ভালিওককে বললাম:

'দাও রুবল, আমি যাব।'

হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করে ল্যুদমিলার মায়ের হাতে রুবল দিতে গেল সে।

'আমি নেব না!' বলে রেগে উঠে চলে গেল ল্যুদমিলার মা। ল্যুদমিলাও চাইল না টাকা রাখতে। তাতে আমাদের আরো বেশি করে খেপিয়ে তোলার সুযোগ পেল ভালিওক। আর বেশি পেড়াপীড়ি না করে আমি রুবল না নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে দিদিমা এসে পড়লেন, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিনি রুবল নিয়ে শান্ত গলায় বললেন:

'কোটটা গায়ে পরে নে, আর একটা কম্বল নিয়ে নে সঙ্গে। ভোরের দিকে শীত পড়বে...'

দিদিমার কথায় মনে ভরসা এল ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে না।

ভালিওক কড়ার করিয়ে নিল যে যাই ঘটুক না কেন, ভোর পর্যন্ত কফিনটার উপরে শুয়ে বা বসে কাটিয়ে দিতে হবে। এমন কি বুড়ো কালিনিন যখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে আর তখন কফিনটা নড়ে উঠলেও। যদি তখন লাফিয়ে নেমে আসি তবে রুবল হারাব।

মায়ের কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম... সিগারেট খেয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম বলে মা একদিন আমাকে মেরেছিলেন। আমি বলেছিলাম:

'মেরো না, সিগারেট খেয়ে এমনিতেই আমার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। গা ঘোলাচ্ছে...'

মার খাওয়ার পরে উনুনের পিছনে ঢুকে বসেছিলাম। শুনলাম মা বলছেন দিদিমার কাছে:

'এমন নিষ্ঠুর ছেলে! কারুর জন্যে একটু দয়ামায়া নেই!'

শুনে দারুণ দুঃখ হল মনে। মা যখনই মারতেন, মায়ের জন্যে কষ্ট হত মনে মনে, লজ্জা হত: মার খাওয়ার মতো কিছু না করেও মার খাচ্ছি বলে।

কিন্তু বাস্তবিকই জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যা কষ্টের। যেমন ধরা যাক, বাইরের ঐ লোকগুলো — ভালো করেই ওরা জানে যে এই কবরস্থানে একা থাকা আমার পক্ষে কী ভীষণ ভয়াবহ, তবুও ওরা চেষ্টা করছে আমাকে আরো বেশি করে ভয় পাইয়ে দিতে। কেন?

ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলি:

'জাহান্নামে যা তোরা!'

কিন্তু সেটা আরো বিপজ্জনক — কে জানে শয়তান কথাটা কী ভাবে নেবে? শয়তান যে আমার কাছেপিঠেই কোথাও আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বালির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে মিশে আছে অভ্রের গুঁড়ো, চাঁদের আলোয় চক চক করছে। তা দেখে মনে পড়ে গেল, একদিন ওকা নদীতে একটা ভেলার উপরে শুয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা মাছ। মাছটা কাত হয়ে ঘুরল, মনে হল যেন মানুষের গাল। গোল গোল পাখির মতো চোখ দিয়ে তাকাল আমার দিকে, তারপর ডুব দিয়ে ঝরা পাতার মতো ভাসতে ভাসতে তলিয়ে গেল গভীর জলে।

স্মৃতি আমার দারুণ সক্রিয় হয়ে উঠল। দুর্বার কল্পনা গড়ে তুলল যতো বিভীষিকার ছবি। তাকে বাধা দেবার জন্যে জীবনের বহু ঘটনার স্মৃতি মনের মধ্যে জড়ো করতে লাগলাম।

যেমন মনে পড়ল একবার একটা শজারু তার খুদে খুদে শক্ত পায়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে আসছিল। দেখে মনে হয়েছিল ঘরো-ভূতের কথা, তেমনি ছোট্ট, তেমনি জীর্ণশীর্ণ।

মনে পড়ল দিদিমা কেমন করে উনুনের সামনে বসে মন্ত্র পড়তেন:

'হে খুদে ঘরো-ভূত, তুমি খুব ভালো, ঘরের সমস্ত আরসুলাগুলোকে খেয়ে নাও...'

শহর ছাড়িয়ে দূরে, বহু দূরে দৃষ্টির বাইরে আকাশ লাল হয়ে উঠছে, ভোরের শীতে আমার গাল দুটো কন কন করছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। যা হবার হয় হোক!

দিদিমা আমাকে জাগালেন। পাশে দাঁড়িয়ে আমার গায়ের কম্বল ধরে টানতে টানতে বলছিলেন:

'ওরে ওঠ! ঠাণ্ডায় জমে গেছিস? খুব ভয় পেয়েছিলি নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাউকে যেন বলো না। ওরা যেন না জানতে পারে।'

'কেন, জানলে কি হয়েছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন দিদিমা। 'ভয় পাবার মতো যদি কিছু না দেখে থাকিস তবে তোর বড়াই করার মতোই বা কি থাকবে...'

বাড়িতে এলাম। আসার পথে কোমল স্নেহমাখা সুরে বললেন দিদিমা:

'জীবনে সবকিছুই তোকে এমনি করে যাচাই করে দেখতে হবে, বাছা! সবকিছুই শিখতে হবে নিজেকে... নিজে নিজে না খুঁজে পেতে শিখলে, অন্য কেউ তোকে কিছু শেখাবে না।'

সন্ধ্যার ভিতরেই পাড়ার 'বীরপুরুষ' বনে গেলাম। সবাই জিজ্ঞেস করল:

'খুব ভয়ের নাকি রে?'

যখন বললাম, 'ভয়েরই তো!' তখন মাথা নেড়ে ওরা বলল, 'দ্যাখ, বলেছিলাম না?'

দোকানদারণী জোর গলায় ঘোষণা করল:

'তার মানে লোকে যে বলে কালিনিন কবর থেকে উঠে আসে সেটা একদম বানানো কথা। তাই যদি হত, যদি সে কবর থেকে উঠেই আসত, তবে কি সে ওই ছেলেটাকে দেখে ভয় পেত ভাবছ? এমন এক চড় কষাত যে ছোঁড়াটা কবরস্থান থেকে কোথায় পগার পার হত কে জানে।'

বিস্ময়ভরা অনুরাগের দৃষ্টি মেলে ল্যুদমিলা আমার দিকে তাকাতে লাগল। মনে হল যেন দাদুও খুব খুশি হয়েছেন, বার বার আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছিলেন। শুধু চুরকা মুখ ভার করে বলল:

'ওর পক্ষে খুবই সোজা — ওর দিদিমা যে ডাইনী!'

৩

ভোরের তারার মতোই অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেল আমার ভাই কোলিয়া। একটা চালাঘরে কাঠের স্তূপের উপরে ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো কাঁথাকম্বল বিছিয়ে ঘুমতাম আমরা তিন জনে — কোলিয়া, দিদিমা আর আমি। ঠুনকো দেয়ালের ওপাশে বাড়িওয়ালার মুরগীর ঘর। রোজ সন্ধ্যায় শুনতে পেতাম মোটা সোটা মুরগীগুলোর কক্ কক্ শব্দ, ডানা ঝটপটানি। রোজ সকালে ঘুম ভাঙত একটা সোনালী মোরগের গলাভরা ডাকে।

'তোর মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দেয়া উচিত!' একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে গজ গজ করতে লাগলেন দিদিমা।

অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম দেয়ালের সরু সরু লম্বা ফাটলের ভিতর দিয়ে আসা সূর্যের আলোর ক্ষীণ স্রোত। রূপকথার কথার মতো ধুলোকণাগুলো নেচে নেচে চলেছে সেই আলোর ভিতর দিয়ে। কাঠের গাদার উপরে ইঁদুরগুলো লাফালাফি করছে, কালো ছিট ছিট ডানা মেলে লাল লাল গুবরে পোকাগুলো ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক।

কোনো কোনো দিন মুরগীর ঘরের ঐ দম আটকে-আসা দুর্গন্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি বিছানা ছেড়ে গুটি সুটি বেরিয়ে এসে ছাদের উপরে শুয়ে থাকতাম। সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম পড়শীরা ঘুম ভেঙে উঠছে — ঘুমে ফুলো মুখগুলো হয়ে উঠেছে বড়ো বড়ো, চোখগুলো ঢাকা।

একটা জানালার ভিতর থেকে মুখ বার করত নৌকোর মাঝি ফেরমানভ। মাথায় জট, রুক্ষ, নোংরা; বদরাগী মাতাল। ফোলা ফোলা চোখের পাতা দুটো একটু মেলে রোদের দিকে তাকিয়ে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠত। দুহাতে মাথার পাতলা চুলগুলি পাট করতে করতে ছুটে উঠোনে নেমে আসতেন দাদু। ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধোবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে যেতেন স্নানের ঘরের দিকে। টিকল নাক আর মুখময় ছিট্ ছিট্ দাগের জন্যে বাড়িওয়ালার ঝগড়াটে রাঁধুনীটাকে ঠিক কোকিলের মতো দেখাত। বাড়িওয়ালাকে দেখাত মোটা সোটা পায়রার মতো। মানুষ দেখলেই কেমন যেন আমার মনে পড়ে যায় কোনো না কোনো পাখি বা পশুর কথা।

মেঘমুক্ত সুন্দর সকাল, কিন্তু আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যেত।

ইচ্ছে হত ছুটে মাঠের ভিতরে চলে যাই, যেখানে গিয়ে একটু নিরালায় থাকতে পারব। জানতাম, এমন উজ্জ্বল দিনটা লোক নষ্ট করে দেবে।

এমনি একদিন ছাদের উপরে শুয়ে আছি, দিদিমা ডাকলেন। তারপর মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কোলিয়ার বিছানাটা দেখিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন:

'কোলিয়া মরা গেছে।'

লাল শালুর বালিশের উপর থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়ে গেছে ফেল্টের তোষকের উপরে। সর্বাঙ্গ নীল, নগ্ন। গায়ের জামাটা গলার কাছে উঠে এসেছে। বেরিয়ে পড়েছে ডিগডিগে পেটটা আর খোস-পাঁচড়াভরা দুটো পা। হাত দুটো পিঠের নিচে দোমড়ানো, মনে হয় যেন উঠতে চেষ্টা করেছিল। মাথাটা একদিকে ঢলে কাত হয়ে রয়েছে।

'মরেছে না বেঁচেছে,' চুলের ভিতরে চিরুনী চালাতে চালাতে দিদিমা বললেন, 'এরকম পিনপিনে পুঁচকে কি আর বাঁচে!'

দাদু ঘরের ভিতরে এলেন। মৃতদেহটার চারপাশে বার কয়েক পায়চারি করে খুব সন্তর্পণে বাচ্চাটার বোজা চোখের পাতা দুটো একটু ছুঁলেন।

'আধোয়া হাতে ছুঁও না ওকে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন দিদিমা।

'দুনিয়ায় এল · · নিঃশ্বাস টানল · খেল দেল · কিন্তু সবকিছু ভস্মে গেল...' বিড় বিড় করে উঠলেন দাদু।

'কী বলছ খেয়াল আছে কিছু!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠে থামিয়ে দিলেন দিদিমা।

শূন্য দৃষ্টি মেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠোনে নেমে গেলেন দাদু:

'করো গে যা খুশি, কবর দেবার পয়সা নেই আমার হাতে...'

'হা রে পোড়ারমুখো!'

আমি বেরিয়ে চলে গেলাম, ফিরে এলাম সেই সন্ধ্যেয়।

পরদিন সকালে কোলিয়াকে কবর দেয়া হল। আমি গির্জায় যাই নি। সৎকারের গোটা সময়টা মায়ের কবরের কাছে বসে রইলাম। মায়ের কবরটা খোঁড়া হয়েছে ছোট্ট ভাইটিকে তাঁর পাশে রাখার জন্যে। আমার কুকুরটা আর ইয়াজের বাপ বসে রয়েছে আমার পাশে। কবর খুঁড়তে এতটুকু মেহনত করতে হয় নি ওকে তবুও বার বার বড়াই করল সে আমার কাছে:

'নেহাৎ তোমার সঙ্গে আমার খাতির আছে বলে, নইলে একটা গোটা রুবল নিতাম...'

হলদে গর্তটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ, ভিতরের দিকে তাকাতেই কতগুলো ছ্যাতলা-পড়া কালো তক্তা নজরে পড়ল। আমি একটু নড়াচড়া করতেই ঝর ঝর করে বালি ঝরে পড়ছিল গর্তটার তলায়। আমি ইচ্ছে করেই নড়াচড়া করতে লাগলাম, যাতে বালি পড়ে তক্তাগুলো ঢাকা পড়ে যায়।

'ওসব চালাকি করবি নি ছোঁড়া,' পাইপ টানতে টানতে বলল ইয়াজের বাপ।

ছোট্ট একটা সাদা কফিন বয়ে নিয়ে এলেন দিদিমা। গর্তটার ভিতরে লাফিয়ে নেমে পড়ল 'হাবা চাষী'। দিদিমার হাত থেকে কফিনটা নিয়ে সেই ছ্যাতলা-ধরা তক্তাগুলোর পাশে নামিয়ে দিয়ে আবার লাফিয়ে উপরে উঠে এল, তারপর পা আর কোদাল দিয়ে ঠেলে ঠেলে বালি চাপা দিতে লাগল। দাদু আর দিদিমা ওকে সাহায্য করলেন নিঃশব্দে। পুরুত নেই, কোনো ভিখারী নেই, অজস্র ক্রুশের ভিড়ের মধ্যে শুধু আমরা চারটি প্রাণী।

পাহারাদারের হাতে পয়সা দেবার সময় ধমকের সুরে দিদিমা বললেন:

'তুমি কিন্তু বাপু আমার ভারিয়ার বাসা নড়ানড়ি করেছ। করো নি বলতে চাও?'

'উপায় ছিল না। তাও তো পাশের কবরের খানিকটা জমি নিতে হয়েছে। ঠিক আছে, ওতে ক্ষতি হয় নি কিছু!'

কবরের সামনে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন দিদিমা, নাক টানলেন, খানিকটা কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, তারপর চলতে শুরু করলেন। জীর্ণ ফ্রক কোটটা গায়ে চড়িয়ে, টুপিটাকে টেনে চোখের সামনে নামিয়ে দিয়ে পিছন পিছন চললেন দাদু।

'পোড়ো জমিতে বীজ বুনেছিলাম আমরা,' হঠাৎ বলে উঠলেন দাদু। তারপর চষা খেতের উপরে কাকের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের আগে আগে চলতে লাগলেন।

'কী বললেন উনি?' দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ভগবান জানেন, ওনার ভাবনা উনিই বোঝেন,' বললেন দিদিমা।

দারুণ গরম, ধীরে ধীরে দিদিমা এগিয়ে চলেছেন, গরম বালির ভিতরে তাঁর পা দুটো ডুবে ডুবে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছেন।

অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করলাম:

'কবরের ভিতরে ঐ যে কালো মতো — ওটাই কি আমার মায়ের কফিন?'

'হ্যাঁ,' রুক্ষ স্বরে বললেন দিদিমা। 'লক্ষ্মীছাড়া!.. এক বছরও এখনো পুরো হয় নি, এর মধ্যেই ভারিয়ার পচন শুরু হয়েছে! এটা হয়েছে শুধু ঐ বালির জন্যে — জল চোয়ায়। মাটি ঢের ভালো।'

'সবাই কি পচে যায়?'

'সবাই। শুধু যারা সাধু তারা বাদে...'

'তুমি কিন্তু কোনোদিন পচবে না!'

দাঁড়িয়ে পড়লেন দিদিমা। আমার টুপিটা মাথার উপরে ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন:

'ওসব কথা ভাবতে নেই। এখন ওসব কথা ভাবতে নেই, বুঝেছিস?'

মনে মনে কিন্তু ভাবতেই লাগলাম আমি:

'মৃত্যু কী কুৎসিত, কী বিশ্রী! কী জঘন্য!'

দারুণ খারাপ লাগছিল আমার।

বাড়িতে এসে দেখি দাদু ইতিমধ্যেই সামোভার ঠিক করে টেবিল গুছিয়ে নিয়েছেন।

'একটু চা খাওয়া যাক, বড্ডো গরম পড়েছে। আমি নিজেই তৈরি করছি — সবার জন্যে।'

তারপর দিদিমার কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধের উপরে একটু চাপড়ে বললেন:

'কি গো গিন্নী, তুমি কী বলো?'

হাত নাড়া দিয়ে দিদিমা বললেন:

'বলার আবার কী আছে!'

'তাই বটে! প্রভুর অভিশাপ লেগেছে আমাদের উপরে, একটি একটি করে কেড়ে নিচ্ছেন... হাতের আঙুলগুলোর মতো গোটা পরিবারটা যদি শক্ত হয়ে মুঠো বেঁধে থাকত...'

বহুকাল এমন শান্ত গলায়, এমন নরম আপোষের সুরে কথা বলেন নি দাদু। কান খাড়া করে ওঁর কথা শুনতে লাগলাম। আশা করছিলাম আমার মনের ব্যথা বুঝিবা খানিকটা হালকা হয়ে যাবে, ভুলে যেতে পারব ঐ বিবর্ণ হলদে গর্তটার কথা — গর্তটার ভিতরের কালো চাপড়া চাপড়া সেই দাগ-গুলোর কথা।

কিন্তু বাধা দিয়ে তীক্ষ্ম সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন দিদিমা:

'থাম বাপু! চিরটা কালই তো বলে আসছ ঐ কথা, তাতে কারুর কোনো

লাভ হয়েছে? লোহার গায়ের মরচের মতো সারাটা জীবনই তো মানুষকে কুরে কুরে খেয়ে আসছ...'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দাদু দিদিমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর চুপ করে গেলেন।

সকালবেলা যা দেখেছিলাম সেদিন সন্ধ্যেয় গেটের সামনে বসে ল্যুদমিলাকে বলছিলাম সে সব কথা। কিন্তু মনে হল, সেকথা ওর মনে একটুকুও রেখাপাত করল না।

'বাপ-মা না থাকা ঢের ভালো। আমার মা-বাপ দুজনেই যদি মরে যেত তবে বোনটাকে ভাইয়ের জিম্মায় রেখে বাকি জীবনটা মঠে গিয়ে সন্ন্যেসিনী হয়ে কাটাতাম। তাছাড়া আর কীইবা করতে পারি বল? খোঁড়া, অকর্মণ্য বলে বিয়ে হবে না কোনো দিন। আর হলেও একগাদা খোঁড়া ছেলেপুলে এনেই তো দুনিয়া ভরাব।'

বিবেচকের মতোই কথা বলছিল ল্যুদমিলা, পাড়ার গিন্নী বান্নীরা যেমন করে বলে। কিন্তু বোধ হয় সেই দিনের পর থেকে ওর উপরে আমার আর একটুকুও আকর্ষণ ছিল না; অবশ্য তারপর থেকে আমার জীবনযাত্রার ধারাও এমন হয়ে উঠল যে দেখাশুনোও হত কালেভদ্রে।

ভাইয়ের মৃত্যুর ক'দিন পরে একদিন দাদু ডেকে বললেন:

'আজ রাত্তিরে একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘুমোতে যাস, ভোর থাকতে আমি তোকে জাগাবো'খন। তারপর দুজনে মিলে বন থেকে কাঠ আনতে যাব।'

'আমিও গাছগাছড়া তুলব,' বললেন দিদিমা।

ফার আর বার্চের বন। বনটা আমাদের বাড়ি থেকে ভার্স্ট তিনেক দূরে একটা জলা জায়গার উপরে। শুকনো ঝোপঝাড় আর ডালপালায় ভর্তি। একদিকটা ওকা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, অন্যদিক এসে মিশেছে মস্কো সড়কে। নরম বনের উপরে উঁচু উঁচু কালো তাঁবুর মতো গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করা অজস্র পাইন গাছের সার। লোকে ওগুলোকে বলে 'সাভেলের কেশর'।

এই বন-সম্পদ কাউণ্ট শুভালভের সম্পত্তি, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তাঁর তেমন নজর নেই। কুনাভিনোর লোকেরা বনটা তাদের বলেই মনে করত: শুকনো ঝোপঝাড় কেটে নিত, মরা গাছ চালা করত, এমন কি জ্যান্ত গাছ পর্যন্ত বাদ দিত না। শরৎকালে দলে দলে লোক হাতে কুড়ুল আর কোমরে

দাঁড় জড়িয়ে শীতের দিনের জন্যে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আসত সেই বনে।

ভোর হতে না হতে শিশির-ভেজা রুপোলি-সবুজ মাঠ পাড়ি দিয়ে তিনজনে চলতে শুরু করলাম। দিয়াতলভ পাহাড়ের রক্তিম পাশ ঘেঁষে ওকা নদীর বুকের উপরে ধীরে জেগে উঠছে রাশিয়ার মদির-মন্থর সূর্য—উঠে আসছে শাদা নির্জনি নভগরোদের সবুজ ফলের বাগান আর গির্জার সোনালী গম্বুজের মাথার উপর দিয়ে। শান্ত ওকার ঘোলাটে বুক থেকে বয়ে আসছে ঝিরঝিরে ঘুমপাড়ানী বাতাস; শিশিরের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে সোনালী অতসী, নিঃশব্দে মাটির বুকে ঝরে পড়ছে অপরাজিতা, ঘাসের গুচ্ছের মধ্যে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙ-বেরঙের কাশ ফুল, লাল তারার মতো ফুটে রয়েছে অজস্র 'সন্ধ্যামণি'...

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ নিবিড় বন এগিয়ে এল আমাদের কাছে। ফার গাছগুলো যেন ডানা মেলে-দেয়া অতিকায় পাখি, আর বার্চগুলো কুমারী মেয়ে। মাঠের বুকের উপর দিয়ে ভেসে আসছে জলাভূমির সোঁদা গন্ধ। লকলকে লাল জিভ বের করে আমার কুকুরটা চলেছে আমার পাশে পাশে, থেকে থেকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, মাটি শুঁকছে, তারপর খেঁকশিয়ালের মতো মাথাটা নাড়ছে অনিশ্চিত ভাবে।

দিদিমার গরম জ্যাকেটটা গায়ে পরেছেন দাদু, মাথায় ছেঁড়া একটা পুরোনো টুপি; সরু সরু পা ফেলে যতই বনের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছেন ততই আপন মনে মুখ টিপে হাসছেন, যেন এক্ষুণি চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কারুর উপরে। দিদিমার পরনে কালো স্কার্ট, গায়ে নীল রঙের ব্লাউজ, মাথায় বেঁধেছেন একটা সাদা রুমাল। এত তাড়াতাড়ি গড় গড় করে চলেছেন যে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকর।

যতই বনের কাছাকাছি এগচ্ছি দাদুর উৎসাহ যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে; আপন মনে বিড় বিড় করছেন, লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকছেন, তারপর কথা কইতে শুরু করলেন। প্রথমে কুঁথে কুঁথে, অস্পষ্ট ভাবে, পরে সুন্দর সাবলীল ভাবে, যেন ক্রমেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি:

'বন হচ্ছে প্রভুর বাগান। কেউ লাগায় নি, লাগিয়েছে বাতাস—তাঁর মুখের স্বর্গীয় নিশ্বাস... বয়েসকালে সেই ঝিগুলি পাহাড়ের কাছে যখন গুণ-টানিয়ের কাজ করতাম... আঃ! আলেক্সেই, সে আমি যা দেখেছি, তুই তা কোনো দিন দেখতে পাবি না! ওকার পাড় ধরে—কাসিমভ থেকে মুরম

পর্যন্ত বন আর বন। হয়ত ভলগা ছাড়িয়ে উরাল পর্যন্ত সোজা চলে গেছে সে বন, সে এক সীমাহীন অপূর্ব জিনিস...'

ভ্রূর তলা দিয়ে আড়চোখে দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। আর ঢিবির উপর দিয়ে হোঁচট খেয়ে দাদু মুঠো মুঠো শুকনো কথার বীজ ছড়িয়ে চলতে লাগলেন। সে বীজগুলো যেন আমার স্মৃতির ভিতরে গেঁথে গিয়ে শেকড় নামাতে লাগল।

'একবার সূর্যমুখীর বীজের তেল বোঝাই একটা বড়ো নৌকো টেনে টেনে যাচ্ছিলাম সারাতভ থেকে 'মাকার দিন'এর মেলায়। আমাদের ফোরম্যান ছিল কিরিল্লো, পুরেখ্-এর লোক, আর কাসিমভের এক তাতার ছিল চালানদার, যতদূর মনে পড়ছে ওর নাম ছিল আসাফ... তারপর ঝিগুলি এসে পেঁছাতেই উজান বাতাসের কবলে পড়লাম—আমাদের গায়ের জোর সবটুকু নিংড়ে বের করে নিল। বাধ্য হয়ে পাড়ে নৌকো ভিড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। তারপর দুটি খাবার ফুটিয়ে নেবার যোগাড় দেখতে উঠলাম পাড়ে। মে মাস, ভলগা তখন সমুদ্দুর, হাঁসের ঝাঁকের মতো ঢেউ জেগেছে ওর বুকে—হাজার হাজার ঢেউ ছুটে চলেছে কাস্পীয় সাগরের দিকে। বসন্তে সবুজ ঝিগুলির পাহাড়গুলো আকাশ ছুঁয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তার উপরে চরছে শাদা মেঘ। সূর্য সোনা ঢালছে মাটির বুকে। জিরোতে জিরোতে এ সমস্ত কিছু যেন আমরা প্রাণভরে গিললাম আর মন ভরে যাচ্ছিল। নিচে নদীর বুকে তখনো উত্তুরে হিম, কিন্তু এখানে পাড়ের ওপর গরম, সুন্দর গন্ধভরা। সন্ধের দিকে আমাদের সেই কিরিল্লো—বেশ ভার-ভারিক্কে গোছের চাষী, বয়েসও হয়েছে ঢের—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে বলল, 'শোনো হে তোমরা, আমি আর তোমাদের কর্তাও নই, গোলামও নই। তোমরা নিজেরা নিজেরা চলে যাও, আমি চললাম বনে!' শুনে তো সবাই হাঁ করে বসে রইলাম, কে কবে শুনেছে এমন কথা? মনিবের কাছে আমাদের হয়ে জবাবদিহি করার কেউ থাকবে না তো যাব কেমন করে? মাথাটা ফেলে রেখে মানুষ তো আর হেঁটে চলে বেড়াতে পারে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এটা ভলগা, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। তাছাড়া মানুষ হচ্ছে পশুর চাইতেও হিংস্র, কোনো কিছুতেই পিছপা নয়। তাই আমরা ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিরিল্লো অনড়, 'তোমাদের রাখালি করে এমনি ভাবে আমি আর দিন কাটাতে চাই না হে, চললাম বনে!' আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছিল ওকে মারধর করে বেঁধে রাখা যাক,

কিন্তু কেউ কেউ ছিল আবার ওরই মতের। তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'থাম!' আর চালানদার তাতার বলে উঠল, 'আমিও চললাম ওর সঙ্গে!' বাস্তবিকই ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে উঠল। মনিবের কাছে ইতিমধ্যেই তাতারের দু-খেপের দাম পাওনা, আর তেসরা খেপেরও এই অর্ধেকটা পথ চলে এসেছে— সে দিনের হিসেবে অনেকগুলো টাকা। সন্ধে পর্যন্ত আমরা হল্লা করে চললাম। কিন্তু রাত হলে দেখা গেল আমাদের জন পনেরো ষোলোকে ফেলে রেখে সাতজনে উধাও হয়ে গেছে। বন মানুষকে এমনিই করে ফেলে!'

'ওরা কি ডাকাত হওয়ার জন্যে চলে গেল?'

'হয় ডাকাত, নয় সাধু—তখনকার দিনে লোকে অতশত পার্থক্য দেখত না...'

দিদিমা ক্রুশ করলেন।

'হায় দেবমাতা! মানুষের কথা ভাবতে আরম্ভ করলে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।'

'কোন দিকে গেলে শয়তানের পাল্লায় পড়ব সেটুকু বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের আছে...'

একদিকে শীর্ণ ফারের ঝোপ আর একদিকে কাদাভরা জলা: মাঝখানের সরু ভিজে পথ বেয়ে আমরা বনের ভিতরে ঢুকলাম। ভাবছিলাম পুরেখের ঐ কিরিল্লোর মতো চিরদিনের জন্যে বনে চলে যাওয়া কী চমৎকার। সেখানে মারামারি নেই, মাতলামো নেই, হল্লা নেই, ভুলতে পারা যায় দাদুর লোভের কথা, বালির তলায় মায়ের কবরের কথা—যা কিছু অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে, বোঝার মতো ভারি হয়ে বুকে চেপে বসেছে সে সবকিছুই সেখানে ভোলা যায়।

একটা শুকনো জায়গায় পেঁছতেই দিদিমা বললেন...

'কিছু মুখে দেবার সময় হয়েছে এবার, বসে পড়!'

ঝুড়ির ভিতর থেকে বের করলেন খানিকটা রুটি, কাঁচা রসুন, একটু শসা, নুন আর নেকড়ায় জড়ানো কিছুটা ঘরে-তৈরী পনীর। আনচান করে উঠে চোখ পিট পিট করে দাদু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সবকিছু।

'তাই তো — আমি তো কিচ্ছু সঙ্গে আনি নি...'

'ঢের আছে, সবারই কুলিয়ে যাবে'খন...'

তামাটে রঙের একটা উঁচু পাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সবাই বসে পড়লাম; বাতাসে ধুনোর গন্ধ, মাঠের বুকের উপর থেকে একটা হালকা

বাতাস ঘাসের ডগাগুলোকে নুইয়ে দিয়ে ভেসে আসছে। গাঢ় রঙের হাত দিয়ে দিদিমা নানান রকমের গাছগাছড়া তুলে চলেছেন আর আমাকে কলা আর সেণ্ট জন লতার ওষধি গুণের কথা শোনাচ্ছেন, ফার্ণ আর এ°টেল গোলাপজামের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের কথা।

ঝোপঝাড় কাটতে আরম্ভ করলেন দাদু, সেগুলোকে বয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করার কথা আমার। আমি কিন্তু পালিয়ে দিদিমার পিছু পিছু গভীর বনের ভিতরে ঢুকলাম। দিদিমা যেন মোটা সোটা গাছের গু°ড়ির ফাঁক দিয়ে ভেসে চলেছেন, থেকে থেকে নুয়ে নুয়ে পড়ছেন নরম মাটির উপরে, যেন ডুব দিচ্ছেন জলে। চলতে চলতে আপন মনে বকছেন:

'এবার ব্যাঙের ছাতা আগেই দেখা দিয়েছে - তার মানে, ফলন হবে খুব কম! গরিবদের উপরে ভালো করে দৃষ্টি দিচ্ছ না প্রভু,—যাদের কিচ্ছু সম্বল নেই ব্যাঙের ছাতাও তাদের খাদ্য!'

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে চলেছি তাঁর পিছে পিছে যাতে না দেখে ফেলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে, ব্যাঙ আর ঘাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনায় বাধা দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

কিন্তু তবুও দিদিমার চোখে পড়ে গেলাম।

'কী রে, দাদুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?'

নানান রকমের গাছগাছড়ার কিংখাপে মোড়া কালো মাটির দিকে নুয়ে দিদিমা বলতে লাগলেন, কেমন করে একবার ঈশ্বর মানুষের উপরে দারুণ রেগে গিয়ে সমস্ত প্রাণীশুদ্ধু পৃথিবীটাকে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

'কিন্তু সময় থাকতেই তাঁর মা ভগবতী সমস্ত কিছুর বীজ কুড়িয়ে ঝুড়িতে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বন্যার পরে তিনি গেলেন সূর্যের কাছে। 'পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত শুকিয়ে দাও, লোকেরা চিরদিন তোমার গুণগান করবে! তারপরে সূর্য পৃথিবীকে শুকিয়ে দিল, আর তিনি লুকানো বীজ সব ছড়িয়ে দিলেন। প্রভু তাকিয়ে দেখলেন: পৃথিবী আবার ঘাসলতা, পশুপাখি, মানুষজনে ভরে উঠেছে... 'কার এমন দুঃসাহস আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়?' বললেন তিনি। ভগবতী স্বীকার করলেন। কিন্তু পৃথিবীকে অমন শূন্য দেখে মনে মনে ঈশ্বরের নিজেরও দুঃখ হচ্ছিল খুব, তাই তিনি বললেন, 'তুমি খুব ভালো কাজ করেছ মা।''

গল্পটা খুব ভালো লাগল আমার, অবাকও লাগছিল। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'সত্যি তাই হয়েছিল? মেরীমা তো প্লাবনের ঢের পরে জন্মেছিলেন।'

এবার দিদিমার অবাক হবার পালা।

'কে বলেছে তোকে এমন কথা?'

'ইস্কুলে—বইতে লেখা আছে...'

শুনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন:

'ওদের কথায় কান দিস নে, বইতে যা লেখা আছে সে সব ভুলে যা; যত সব আজগুবি কথা লেখা থাকে বইতে!' তারপর একটু মৃদু খুশির হাসি হেসে বললেন:

'কি সব বানিয়েছে, ভাব দেখি একবার! যত সব মূর্খের দল! যেন মা ছাড়াই ঈশ্বর জন্মাতে পারতেন! কে তবে তাঁকে পেটে ধরেছেন শুনি?'

'আমি জানি না।'

'তবে দ্যাখ! তোদের ঐ শিক্ষা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে 'আমি জানি না'তে!'

'পুরুত বলছিলেন, মেরীমা জোয়াকিম আর আন্নার সন্তান।'

'তার মানে, তিনি হলেন মারিয়া জোয়াকিমোভনা?'

আগুনে ঘি পড়ল। তীব্র দৃষ্টিতে দিদিমা আমার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন:

'তোর পিঠের চামড়া ছুলে নেব ফের যদি অমন কথা মনেও ভাবিস!'

একটু পরে আবার বললেন:

'মেরীমা চিরদিন আছেন—সকলের জন্মের বহু আগ থেকে। ঈশ্বর জন্মেছেন তাঁর পেটে, তারপর...'

'তবে যীশু খ্রীষ্ট এলেন কোত্থেকে?'

কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে চোখ বুজলেন দিদিমা।

'যীশু খ্রীষ্ট? অ্যাঁ, হ্যাঁ... খ্রীষ্ট?..'

বুঝতে পারলাম আমি জিতে গেছি। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যজালে জড়িয়ে ফেলেছি দিদিমাকে, তাতে মনটা দমে গেল।

সূর্যের সোনালী আলোর তীর-বেঁধা নীল কুয়াশার ভিতর দিয়ে আমরা আরো গভীর বনের ভিতরে এগিয়ে চলতে লাগলাম। নিবিড় বনের একটা নিজস্ব ধ্বনি আছে, স্বপ্নালু ধ্বনি। মানুষকে স্বপ্নালু করে তোলে। কিচির-মিচির শব্দে ডাকছে ছাতারে, চটক পাখি কিচ্ কিচ্ করছে, কোকিল হাসছে, ডাকছে বৌ-কথা-কও, অবিশ্রাম গান গেয়ে চলেছে সোনার-পাখা

হলুদ পাখি, আর ঐ অদ্ভুত শূর-পাখি গম্ভীর সুরে গলা কাঁপিয়ে গেয়ে চলেছে। সবজে রঙের ব্যাঙগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে পায়ের তলায়; শিকড়ের তলার লুকানো ফোকরের ভিতর থেকে সোনালী মাথা তুলে উঁকি মারছে হেলে সাপ। খুদে খুদে দাঁতে কট কট করতে করতে পাইন গাছের ডালের ভিতরে পালকের মতো লেজ নাড়ছে কাঠবেড়ালী। দেখার জিনিস অজস্র, অসংখ্য, কিন্তু তবুও চোখের তৃষ্ণা মেটে না — আরো চাই, আরো দূরে এগিয়ে যেতে চাই।

পাইন গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে ভূতের মতো বিরাট বিরাট মূর্তি দেখা দিয়ে পরক্ষণেই ঘন সবুজের ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ঝিলি মিলি দেখা যাচ্ছে নীল আর রুপোলি আকাশ। মাটিতে বিছনো কালো জামের বুটিতোলা, শিয়াকুলের ঝালর দেয়া শেওলার সৌখিন গালিচা। ঘাসের ভিতরে রক্তের ফোঁটার মতো চিক চিক করছে কুঁচ ফল, আর নাকে এসে লাগছে ব্যাঙের ছাতার লোভনীয় গন্ধ।

'জগতের আলো মেরীমা,' একটা নিশ্বাস ফেলে প্রার্থনা করলেন দিদিমা।

মনে হল যেন বনটা দিদিমার, আর দিদিমা বনের। একটা বিরাট ভালুকমায়ের মতো হেঁটে চলেছেন সবকিছু দেখতে দেখতে, সবকিছু তারিফ করতে করতে আর আপন মনে বিড় বিড় করে আউড়ে চলেছেন কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের ভিতর থেকে উত্তাপ এসে বনময় ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ভারি মজা লাগছিল যখন দেখছিলাম তাঁর পায়ের চাপে পিষে যাওয়া শেওলাগুলো আবার তাঁর পিছু পিছু মাথা তুলে উঠছে।

চলতে চলতে ভাবছিলাম ডাকাত হয়ে ধনীর কাছ থেকে লুটে এনে গরিবদের ভিতরে বিলিয়ে দিলে কী চমৎকারই না হয়। সবাই যদি হাসিখুশি হত, ভরপেট খেতে পেত, জানত না হিংসা দ্বেষ, হিংস্র কুকুরের মতো একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া না করত, তাহলে কি সুন্দরই না হত। দিদিমার ঈশ্বর আর তাঁর মেরীমার কাছে যদি একবার যাওয়া যেত তবে কী ভালোই না হত। মানুষ কী ভীষণ দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়েই না জীবন কাটায়,—সে সমস্ত সত্য কথা তবে খুলে বলতাম তাঁদের কাছে। বলতাম কী বিশ্রী ভাবে, কী নিদারুণ আঘাত করেই না তারা পরস্পরকে ঐ ভয়ানক বালির ভিতরে কবর দেয়। আর কতই না অনাবশ্যক দুঃখ-আঘাত পৃথিবীতে। তারপর যদি মেরীমার বিশ্বাস হয় তবে তিনি যেন আমাকে এমন জ্ঞান দান

করেন যাতে আমি সবকিছু বদলে দিয়ে তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। মানুষ আমার কথা শুনুক, আমাকে বিশ্বাস করুক, আমি নিশ্চয়ই তাদের সুন্দর জীবনের পথ দেখাতে পারব। আমি এখনো ছেলেমানুষ তো কি হয়েছে? মন্দিরে যখন খ্রীষ্টের কাছে জ্ঞানীগুণীরা উপদেশ শুনতে এসেছিলেন, তখন খ্রীষ্টও তো ছিলেন আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়ো...

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে হঠাৎ একটা গভীর গর্তে পড়ে গেলাম। মরা ডালের খোঁচা লেগে পাশটা ছড়ে গেল, মাথার পিছনের খানিকটা চামড়া গেল কেটে। গর্তের তলার ঠাণ্ডা চট্‌চটে কাদার ভিতরে বসে বসে একান্ত লজ্জার সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে নিজে উঠে আসার শক্তি আমার নেই। চেঁচিয়ে উঠে দিদিমাকে ঘাবড়ে দিতে মন সরছিল না, কিন্তু তাছাড়া উপায়ও ছিল না।

হ্যাঁচকা মেরে আমাকে টেনে তুললেন দিদিমা, তারপর ক্রুশ করতে করতে বললেন:

'ভগবানকে ধন্যবাদ! গর্তটা খালি ছিল তাই রক্ষে! কিন্তু যদি ভল্লুক থাকত, তবে কী হত?'

দুচোখ বেয়ে ঝরে-পড়া জলের ভিতর দিয়ে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর একটা ঝরণার দিকে গিয়ে আমাকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিলেন, ব্যথা সারিয়ে দেওয়ার জন্যে কাটা-ছড়া জায়গাগুলোতে কতগুলো পাতা লাগিয়ে দিয়ে তাঁর গায়ের ব্লাউজ দিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে এলেন রেলের পাহারাদারের ঘরে, কারণ হেঁটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না।

প্রায় প্রত্যেক দিনই বলতাম দিদিমাকে:

'চলো, বনের ভিতরে যাই!'

খুব খুশি হয়েই রাজী হতেন দিদিমা। শরৎকালের শেষাশেষি পর্যন্ত এমনি করে আমরা গাছগাছড়া, ফলপাকুড়, ব্যাঙের ছাতা, বাদাম ইত্যাদি কুড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম।

দিদিমা এসব বিক্রি করে যা পয়সা পেতেন তাই দিয়েই আমাদের চলত।

'পরগাছার দল!' খেঁকিয়ে উঠতেন দাদু। যদিও তাঁর খাবার আমরা ছুঁতাম না।

বন আমার মনে জাগিয়ে তুলল এক শান্ত সমাহিত ভাব। সে অনুভূতি

আমার অন্তরের সব ব্যথা, সব বেদনা দূর করে দিল, ভুলিয়ে দিল সব ক্ষোভ। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরে বিকশিত হয়ে উঠল অনুভব শক্তির এক অপূর্ব তীক্ষ্ণতা: চোখ কান সজাগ হয়ে উঠল, আরো প্রখর হয়ে উঠল স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতার ভান্ডার আরো প্রসারিত হল।

দিদিমাকে যতই দেখছি ততই যেন আরো বেশি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে তাঁর স্থান চিরদিনই সবার উপরে, সংসারে সবার চাইতে বেশি করুণাময়ী, সবার চাইতে বেশি বুদ্ধিমতী। আমার এ ধারণা ক্রমেই যেন তিনি আরো বদ্ধমূল করে দিতে লাগলেন। একদিন ব্যাঙের ছাতা তুলে ঘরে ফেরার পথে বনের কিনারায় একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে দিদিমা বসলেন। আরো ব্যাঙের ছাতা পাবার আশায় খুঁজতে খুঁজতে আমি একটু দূরে গিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দিদিমার গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাতেই দেখি স্থির হয়ে পথের উপরে বসে তুলে-আনা ব্যাঙের ছাতার শেকড় ছাড়াচ্ছেন। পাশে একটা ছাই রঙের লিকলিকে কুকুর লকলকে জিভ বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'সরে যা, পালা এখান থেকে!' বলে চলেছেন তিনি, 'ভগবানের নাম নিয়ে সরে যা!'

এর কয়েক দিন আগেই ভালিওক বিষ খাইয়ে আমার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছিল। তাই ঐ নতুন কুকুরটাকে লোভ দেখিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছুটে গিয়ে পথের উপরে দাঁড়ালাম। মুখ না ফিরিয়েই কুকুরটা অদ্ভুত ভাবে পিঠ বাঁকাল, তারপর সবুজ চোখ দুটোর তীব্র, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে লেজ গুটিয়ে বনের ভিতরে ঢুকল। জানোয়ারটার চলার ভঙ্গি আদৌ কুকুরের মতো নয়। আমি শিস্ দিয়ে ডেকে উঠতেই গভীর ঝোপঝাড়ের ভিতর মিলিয়ে গেল।

'দেখলি তো?' একটু হেসে বললেন দিদিমা, 'প্রথমটায় আমিও ভেবেছিলাম ওটা কুকুর। তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম — দাঁতগুলো ছুঁচের মতো ধারাল, নেকড়ের মতো, ঘাড়টাও। আমি তো ভয়ে মরি। তারপরে ভাবলাম, ওটা যদি নেকড়ে হয় তবে তোর পালিয়ে যাওয়াই ভালো। ভাগ্যিস গরমের দিনে নেকড়েরা একটু শান্ত থাকে।'

দিদিমা কখনো বনের ভিতরে পথ হারিয়ে ফেলতেন না, চিনে চিনে ঠিক বাড়ি চলে আসতেন। গাছগাছড়ার গন্ধ থেকে বুঝতে পারতেন কোথায় কোন জাতের ব্যাঙের ছাতা জন্মে। প্রায়ই আমার জ্ঞানের পরখ করতেন:

'বল দেখি কোন গাছের তলায় লাল ব্যাঙের ছাতা হয়? কি করে বুঝবি

কোন সিরয়েজ্‌ কাগ্‌লো ভালো আর কোনগ্‌লো বিষাক্ত? কোন জাতের ব্যাঙের ছাতা ফার্ণের ঝোপে ল্‌কিয়ে থাকে?'

গাছের বাকলের উপরে ছোট্ট একটু নখের আঁচড় দেখেই ব্‌ঝতে পারতেন কাঠবেড়ালীর গর্ত কোনখানে। তক্ষ্‌ণি আমি গাছে চড়ে ওদের বাসা খালি করে শীতের সঞ্চয় বাদামগ্‌লো পেড়ে নিয়ে আসতাম। এক একটা বাসা থেকে এক এক সময়ে পাঁচ সের পর্যন্ত বাদাম পাওয়া গেছে।

একবার এমনি করে যখন কাঠবেড়ালীর বাসা থেকে বাদাম পাড়ছি এক শিকারীর গ্‌লির সাতাশটা ছররা এসে বিঁধল আমার ডান পাঁজরে। ছ্‌ঁচ দিয়ে এগারোটা বের করে দিয়েছিলেন দিদিমা, বাকিগ্‌লো বহ্‌ বছর পর্যন্ত আমার চামড়ার ভিতরে গেঁথে ছিল, পরে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

আমাকে ধৈর্য ধরে ব্যথা সহ্য করতে দেখে দিদিমা দার্‌ণ খ্‌শি হতেন। বলতেন:

'লক্ষ্মী ছেলে! ব্যথা সহ্য করা হল লড়াই জেতা!'

ব্যাঙের ছাতা, বাদাম ইত্যাদি বেচে যখনই হাতে কিছ্‌ বাড়তি পয়সা হত, তখনই জানালার পৈঠায় পৈঠায় দিদিমা তাঁর 'গোপন দান' রেখে আসতেন, অথচ নিজে তালি-মারা ছেঁড়া জামাকাপড় পরতেন। এমন কি পরবের দিনেও বের্‌তেন ঐ একই পোশাকে।

'ভিখারীরও অধম — মান-সম্মান সব ডোবাল আমার,' দাদ্‌ গজ গজ করতেন।

'তাতে কি, আমি তো আর তোমার মেয়ে নই, বিয়ের য্‌গ্যি কন্যেটি নই যে বর খ্‌ঁজে ফিরতে হবে।'

ক্রমেই ঘন ঘন ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগল দ্‌জনার মধ্যে।

'অন্য লোকের চাইতে এমন কিছ্‌ আর বেশি পাপ করি নি,' ক্ষ্‌ব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠতেন দাদ্‌, 'তব্‌ও সবার চাইতে বেশি শাস্তি ভোগ করছি আমি!'

দাদ্‌কে খোঁচা দিয়ে দিদিমা বলতেন, 'কে কেমন লোক তা শয়তান ভালোই জানে।' তারপর যখন দিদিমা আর আমি, দ্‌জনে একা থাকতাম তখন আমার কাছে ভেঙে বলতেন ব্যাপারটা: 'ব্‌ড়োটার দার্‌ণ ভয় শয়তানকে! দেখ না, ভয়ে ভয়ে কেমন ব্‌ড়িয়ে যাচ্ছে... হায় রে কপাল, হা রে পোড়ারম্‌খো!'

সে বছর গোটা গরমকালটা বনে বনে ঘ্‌রে আমার শরীরটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। কিন্তু ফলে একেবারে ব্‌নো হয়ে পড়লাম, খেলার সঙ্গীসাথী,

ল্যুদমিলার সম্পর্কে সমস্ত আকর্ষণ দূর হয়ে গেল। ল্যুদমিলার বুদ্ধিমত্তা কেমন যেন জলো বিরক্তিকর মনে হত।

একদিন বৃষ্টিতে ভিজে জ্যাবজ্যাবে হয়ে শহর থেকে ফিরে এলেন দাদু। শরৎকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। দরজার চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চড়ুইয়ের মতো গা ঝাড়া দিতে দিতে বিজয় গর্বে বলে উঠলেন:

'শোন রে ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা, কাল থেকে তোকে কাজে যেতে হবে।'

'কোথায়?' বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন দিদিমা।

'তোর বোন মাত্রিওনার বাড়ি — কাজ করবে তার ছেলের কাছে...'

'কাজটা ভালো করলে না গো!'

'চুপ, বেকুফ বুড়ি! ওরা ওকে নক্সানবীশও বানিয়ে দিতে পারে।'

আর একটি কথাও না বলে দিদিমা মাথা নিচু করলেন।

সেদিন সন্ধ্যেয় ল্যুদমিলাকে জানালাম আমি শহরে চলে যাচ্ছি।

'আমাকেও শীগ্‌গিরই নিয়ে যাবে শহরে,' চিন্তিত মুখে বলল ল্যুদমিলা। 'বাবার ইচ্ছে আমার পা-টা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন তাতে নাকি আমি ভালো হয়ে যাব।'

গরমের কালটায় ও যেন আরো রোগা হয়ে গেছে, মুখের উপরে ফুটে উঠেছে একটা নীল আভা, আরো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে চোখ দুটো।

'ভয় লাগছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হুঁ,' বলল ল্যুদমিলা, তারপর নীরবে কাঁদতে লাগল।

সান্ত্বনা দেবার একটি কথাও খুঁজে পেলাম না: শহরের জীবন সম্পর্কে আমি নিজেই ভীত। এক অসহায় ব্যথাভরা নীরবতায় দুজনে ঘন হয়ে পাশাপাশি বসে রইলাম বহুক্ষণ।

গ্রীষ্মকাল হলে দিদিমাকে গিয়ে বলতাম, চলো ভিক্ষে করি গে, যেমন করতেন তিনি ছেলেবেলায়। ল্যুদমিলাকেও নিতে পারতাম সঙ্গে, —একটা ছোট্ট গাড়িতে বসিয়ে আমি ওকে টেনে নিয়ে চলতাম।

কিন্তু শরৎকাল। ভিজে বাতাসের ঝাপটায় পথঘাট উড়িয়ে নিচ্ছে, সীমাহীন মেঘের ঘোমটায় আকাশের মুখ ঢাকা, আর ধরিত্রী বিবর্ণ, পঙ্কিল, বিষাদময়...

আবার শহরে। একটা সাদা দোতলা বাড়ি কফিনের মতো দেখতে, যেন অনেকগুলো লোককে একসঙ্গে ধরাবার জন্যে তৈরী করা। বাড়িটা নতুন,

তবুও মনে হয় যেন ধুঁকছে — কাঙ্গালের হাতে হঠাৎ কিছু পয়সা এসে গেলে যেমন হাবাতের মতো দুহাত মেলে গিলে গিলে ফেঁপে ফুলে ওঠে ঠিক তেমনি অবস্থা। বাড়িটার পাশের দিকটা রাস্তামুখো, রাস্তার সামনের তলায় আটটা জানালা। যে দিকটা সামনের দিক হওয়া উচিত ছিল, সে দিকে জানালা চারটে। নিচের তলার জানালাগুলো পিছনের উঠোনে যাবার সরু গলি-পথের উপরে, দোতলার জানালাগুলো খুললেই ঘেরা-বেড়ার মাথার উপর দিয়ে সামনের একটা নোংরা খাদ আর ধোবানীর কুঁড়ে।

রাস্তা গোছের কিছুই সেখানে নেই; বাড়ির সামনের ঐ নোংরা খাদটার দু-জায়গায় দুটো বাঁধ পাতা আছে। বাঁ দিকটা কয়েদী বসতি পর্যন্ত বিস্তৃত। তারই কাছে খাদের পারে গেরস্তেরা নোংরা জঞ্জাল ফেলার আস্তাকুঁড় করে নিয়েছে, ফলে খাদের তলায় জমে উঠেছে সবুজ রঙের পুরু কাদা। ডান দিকে খাদটা গিয়ে শেষ হয়েছে পচা জ্‌ভেজ্‌দিন পুকুরের কাছে, মাঝখানটা আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে; বিছুটি, আমরুল, চোরকাঁটা আর ময়লা আবর্জনায় খাদের অর্ধেকটা ভর্তি, বাকি অর্ধেকটায় বাগান করেছেন পুরুত দরিমেদন্ত পক্রোভ্‌স্কি; বাগানের ভিতরে রয়েছে একটা গ্রীষ্মাবাস, সবুজ রঙের পাতলা কাঠের চটা দিয়ে তৈরী। এমন পাতলা যে ঢিল ছুঁড়লে ভেঙে যায়।

জায়গাটা যেমন অসম্ভব গুমোট তেমনি ভীষণ নোংরা; শরতের আবহাওয়া আগাছাভরা কাদা-মাটিকে এমন চটচটে লাল আলকাতরার মতো করে তুলেছে যে নির্মম ভাবে পায়ে আটকে থাকে। এতটুকুন একটু জায়গার ভিতরে এমন ভীষণ নোংরা আবর্জনা জীবনে কখনো আর দেখি নি। খোলা মাঠ আর তাজা বনে ঘুরে বেড়ানো অভ্যেস হবার পর শহরের এই নিদারুণ বিষণ্ণ কোণে মনটা এমন দমে গেল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

খাদের ওপারে সারি সারি ভাঙাচোরা জীর্ণ বেড়া, তারই ভিতর থেকে আবিষ্কার করলাম বাদামী রঙের সেই বাড়িটাকে -- জুতার দোকানে বয়'এর কাজ করার সময়ে যেটায় থাকতাম। বাড়িটা কাছাকাছি হওয়ার ফলে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কেন যে আবার আসতে হল সেই একই মহল্লায়?

নতুন মনিবের সঙ্গে পরিচয় হল, সে আর তার ভাই আগে আমার মায়ের কাছে যেত। ওর ভাই এমন অদ্ভুত সুরে চিঁ চিঁ করত ভারি মজা লাগত শুনে:

'আন্দ্রেই পাপা, আন্দ্রেই পাপা।'

ওরা কেউ-ই বদলায় নি এতটুকুও: বড়ো ভাইয়ের ঈগলের ঠোঁটের মতো

নাক, লম্বা চুল, মুখখানা হাসিখুশি, মোটামুটি সহৃদয় মানুষ; আর ছোট জন — ভিক্তরের তেমনি আবার ছিটছিট দাগে ভরা ঘোড়ার মতো লম্বাটে মুখ। ওদের মা দিদিমার বোন, কিন্তু যেমন দজ্জাল তেমনি খিটখিটে। বড়ো ছেলের বিয়ে হয়েছে, বৌয়ের চোখ দুটো কালো, গায়ের রঙ খুবই সাদা, এমন মোটা সোটা যেন ময়দার রুটি।

প্রথম যাওয়ার পরে দিনকয়েকের ভিতরেই সে দুবার শুনিয়েছে আমাকে:

'তোর মাকে একবার আমি চুমকির কাজ-করা একটা সিল্কের ব্লাউজ দিয়েছিলাম...'

কেন জানি ও যে মাকে কিছু উপহার দিয়েছিল, আর মা তা হাত পেতে নিয়েছিলেন সে কথা আদৌ বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পরে আবার একদিন ঐ ব্লাউজ দেবার কথা শোনাতে এলে আমিও বললাম:

'দিয়েই যদি থাকো তবে অত ঢাকঢোল পেটাবার দরকার কি?'

চমকে উঠে অবাক হয়ে তাকাল:

'কী ব-ল-লি? কার সঙ্গে মুখ নাড়ছিস খেয়াল আছে?'

মুখের উপরে ফুটে উঠল চাপ্ড়া চাপ্ড়া লাল দাগ, চোখ পাকাল খানিকক্ষণ, তারপর স্বামীকে ডাকল।

হাতে কম্পাস, কানে পেনসিল গোঁজা তার স্বামী ঢুকল ঘরে। বৌয়ের সমস্ত কথা শোনার পরে বলল আমাকে:

'ওকে আর অন্য সবাইকে তোর আপনি বলা উচিত, বেয়াড়াপনা করা উচিত নয়!'

তারপর অধৈর্য ভাবে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'এ সব বাজে ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করো না বলে দিচ্ছি!'

'বাজে ব্যাপার মানে? তোমার নিজের আত্মীয় যখন!'

'চুলোয় যাক আমার আত্মীয়!' চিৎকার করে বলে সে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এরা যে দিদিমার আত্মীয় তা আমিও যেন তেমন বরদাস্ত করতে পারতাম না। দেখেশুনে আমার এটা ধারণা হয়েছিল পরের চাইতে আপনার লোকেরাই পরস্পরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বেশি: পরস্পরের দুর্বলতা, খারাপ দিক, অন্যের চাইতে তারাই ভালো করে জানে বলে বেশি করে বদনাম রটায়, ঝগড়া করে, আর কথায় কথায় লাঠালাঠি।

মনিবকে আমার ভালো লাগত। ওর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে

চুলগুলোকে পিছনের দিকে কানের ওপাশে ঠেলে দেওয়া — তা দেখে কেন জানি আমার মনে হয় 'বাঃ বেশ' লোকটার কথা। লোকটা মাঝে মাঝে প্রাণখোলা হাসি হাসত, তখন তার ধূসর চোখ দুটো সরলতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাকের দুপাশে ফুটে উঠত হাস্যকর দুটো রেখা।

'ঢের লড়াই হয়েছে, কুঁদুলে মুরগীর ছানারা, থামো এবার!' ছোট ছোট ঘন দাঁতের পাটি বের করে হেসে বলত ওর মা আর বৌকে।

রোজ ঝগড়া করত দুজনে; দেখে অবাক হয়ে যেতাম কতো অল্পেই না ওরা আগুন হয়ে ওঠে! ভোর না হতেই দুটো মেয়েছেলে আলুথালু বেশে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিত যেন আগুন লেগেছে বাড়িতে। সারাটা দিন তেমনি দাপাদাপি করে ফিরত, শুধু দুবেলা খাওয়ার সময়ে আর চায়ের সময়ে যা একটু ক্ষান্ত দিত। খাবার সময়ে এমন ঠেসে খেত যে তার আর দিশে থাকত না। দুপুরে খাবার সময়ে শুরু হত রান্নার সমালোচনা। বড়ো রকমের একটা ঝগড়া বাঁধাবার জন্যে ধীরেসুস্থে কথা শানানো হত। শাশুড়ী যাই কিছু রাঁধুক না কেন, বৌ বলত:

'আমার মা কখনো এটা এমন ভাবে রাঁধতেন না।'

'তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আরো খারাপ হত!'

'না, হত না — ঢের বেশি ভালো হত এর চেয়ে!'

'তবে বাপের বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে থাকলেই পারো!'

'এ বাড়ির গিন্নী আমি!'

'তবে আমি কে, কী মনে হয় আমাকে?'

'ঢের হয়েছে, থামো এবার, কুঁদুলে মুরগীর ছানারা!' চেঁচিয়ে উঠত মনিব। 'ব্যাপারটা কী? দুজনে পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

এ বাড়ির সবকিছুই যে কী অদ্ভুত আর হাস্যকর তা আর বলবার নয়। রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে আসতে হলে ছোট্ট অপরিসর একটা পায়খানাওয়ালা স্নানের ঘরের ভিতর দিয়ে আসতে হয়। বাড়ির মধ্যে ওটাই একমাত্র স্নানের ঘর। খাবার, সামোভার ইত্যাদি যা কিছু সব বয়ে আনতে হয় ঐ ঘরের ভিতর দিয়েই, ফলে অনেক সময়ে অনেক হাসি ঠাট্টার, এমন কি অনেক মজার মজার ঘটনাও ঘটে। অনেক কাজের মধ্যে স্নানের টবে জল ভরা আছে কিনা সেটা তদারক করাও আমার কাজ। স্নানের ঘরের দরজার ওপাশে রান্নাঘরে আমার জায়গা। দরজাটার পাশেই ছাদওয়ালা বড়ো অলিন্দ, ফলে এক দিকে

যেমন উনুনের তাতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে, অন্য দিকে তেমনি অলিন্দের ফাঁক দিয়ে বাতাসের ঝাপটা এসে পা দুটো ঠান্ডায় জমিয়ে দেয়। শোবার সময়ে মেঝের সবগুলো গালিচা তুলে এনে পায়ের উপরে স্তূপ করে চাপাতাম।

বসবার ঘরটাও কেমন যেন গুমোট, ফাঁকা ফাঁকা। ঘরটায় দুটো বড়ো আয়না, দুটো টেবিল, সোজা পিঠওয়ালা বারোখানা চেয়ার আর গিল্টি করা ফ্রেমে খানকয়েক ছবি — 'নিভা' মাসিক পত্রের গ্রাহক হিসেবে মাগনা পাওয়া উপহার। ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরটাও কিছু চটকদার গদি আঁটা, চেয়ার টেবিলে ঠাসা; কয়েকটা সেল্ফ-এ রুপোর বাসন, টি সেট ইত্যাদি সাজানো — বৌয়ের বিয়ের সময়ের যৌতুক; আর আছে কয়েকটা বাতি, আকারে আকৃতিতে একটা আর একটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে যেন। জানালাহীন শোবার ঘরটার ভিতরে আছে বড়ো একটা খাট, একটা তোরঙ্গ আর আলনা, ওগুলো থেকে ভেসে আসে তামাকপাতা আর ঘৃতকুমারী লতার গন্ধ। এ তিনটে ঘর সব সময়েই খালি থাকে আর গোটা পরিবারটা ঐ ছোট্ট খাবার ঘরটার ভিতরে গিয়ে গাদাগাদি করে—চলতে ফিরতে গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি। আটটায় চায়ের পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুভাই টেবিল বিছিয়ে বসে, তার উপরে পাতে সাদা কাগজ, নিয়ে আসে আঁকার সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি — পেনসিল, ইন্ডিয়া ইঙ্কে ভরা প্লেট। তারপর দুভাই দুদিকে মুখোমুখী হয়ে বসে কাজে লেগে যায়। টেবিলটা নড়বড়ে, প্রায় ঘরজোড়া। ছোট গিন্নী বা দাই বাচ্চাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেই প্রত্যেকবার টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

'এখান দিয়ে না এসে পারিস না?' খেঁকিয়ে উঠল ভিক্তর।

মুখখানা হাঁড়ির মতো করে গিন্নী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল:

'ভাসিয়া, ওকে বারণ করে দাও, আমার সঙ্গে যেন লাগতে না আসে!'

'ভালো কথা, তুমিও তাহলে টেবিল নাড়িও না,' শান্ত হয়ে বলল ওর স্বামী।

'কিন্তু আমার পেটে বাচ্চা, আর এ ঘরটায় এমন গাদাগাদি...'

'বেশ, আমাদের কাজকর্ম নিয়ে আমরা বসবার ঘরে চলে যাচ্ছি।'

'কি বলছ, কে কবে শুনেছে যে মানুষ বসবার ঘরে গিয়ে কাজ করে?'

স্নানের ঘরের দোরের পথে বুড়ো গিন্নী মাত্রিওনা ইভানভ্না মুখ বাড়াল, রান্নাঘরের উনুনের আঁচে মুখখানা বিটের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

'শোন্ কথা, ভাসিয়া,' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো গিন্নী, 'এখানে বসে বসে তোরা আঙুল ক্ষইয়ে খেটে খেটে সারা হবি, আর উনি বলছেন কিনা চার

চারটে ঘরেও ওর বাচ্চা বিয়োনো চলবে না। খুব এক রাজকন্যে বে' করে এনেছিস — তবু যদি মাথায় এতটুকুও ঘিলু থাকত!'

একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল ভিক্তর :

'ঢের হয়েছে, থামো!' ধমকে উঠল ছোট গিন্নীর স্বামী।

শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে একগাদা গালাগাল ঝেড়ে বৌ চেয়ারের উপরে আছড়ে পড়ে নাকী কান্না জুড়ে দিল:

'আমি চলে যাব! মরব আমি!'

'আমার কাজে বাগড়া দিচ্ছ, জাহান্নামে যাও সব!' চিৎকার করে উঠল মনিব। নিদারুণ রাগে মুখখানা সাদা হয়ে উঠেছে। 'পাগলা গারদ বানিয়ে ছেড়েছে একেবারে! এখানে যে আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মরছি — সে তো তোমাদেরই খাওয়ানো পরানোর জন্যে! যতো সব কুঁদুলে মুরগীর ছানা!'

প্রথম প্রথম এই ধরনের ঝগড়াঝাঁটি দেখলে ভয় পেতাম। বিশেষ করে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে দিন ছোট গিন্নী রুটি কাটা ছুরি নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্যে সব থম মেরে রইল, তারপর স্বামী ছুটে গিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে পিঠ নিচু করে দাঁড়াল।

'উপরে উঠে যা! জানলা ভেঙে ফেলে দোরের খিলটা খুলে দে!' চেঁচিয়ে উঠে হুকুম করল আমাকে।

নিমেষে ওর পিঠের উপরে লাফিয়ে উঠে দরজার উপরের কাঁচটা ভেঙে ফেললাম, কিন্তু খিলটা খোলার জন্যে ঝুঁকে পড়তেই বৌটা ছুরির বাঁট দিয়ে আমার মাথার উপরে মারতে আরম্ভ করল। তবুও কোনো রকমে খিলটা খুলে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গেই মনিব ঝাঁপিয়ে পড়ল বৌটার উপরে। টেনে হিঁচড়ে ওকে বসবার ঘরে নিয়ে এসে হাত মুচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিল। পরে রান্নাঘরে বসে ফুলে-ওঠা মাথাটার পরিচর্যা করতে করতে বুঝতে পারলাম যে আমার সমস্ত কষ্টটাই বৃথা গেছে। ছুরিটা এমন ভোঁতা যে হাতের চামড়া তো দূরের কথা, রুটিও কাটা কঠিন। অমন করে মনিবের পিঠের উপরে চড়ারও কোনো প্রয়োজন ছিল না, একটা চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়েই ভাঙতে পারতাম জানালাটা। তাছাড়া বড়ো কারুর পক্ষে ছিটকিনিটা খোলা আরো সহজ ছিল — হাতটা একটু লম্বা হলেই হত। এর পর থেকে এমন ধরনের ব্যাপারে আদৌ আর ঘাবড়াতাম না।

ভাই দুজনেই গির্জার গানের দলের লোক; কাজ করতে করতে কখনো কখনো ওরা গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠত। দাদা মোটা গলায় খাদে ধরত:

কোন্ কন্যের আংটি ফেলে
দিলেম ফেনিল জলে...

সরু গলায় ছোট ভাই চড়া সুরে ধরত:

সেই সাথে সুখ শান্তি আমার
গেল অতল তলে।

বাচ্চাদের ঘর থেকে ছোট গিন্নীর চাপা তর্জন ভেসে আসত:

'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি, ভাসিয়া! জানো না বাচ্চা ঘুমোচ্ছে?'

অথবা:

'বিয়ে থাওয়া হয়ে গেছে ভাসিয়া, কুমারী মেয়েদের নিয়ে গান গাওয়া এখন আর তোমার সাজে না! তাছাড়া একটু পরেই সন্ধ্যা উপাসনার ঘণ্টা বেজে উঠবে ...'

'বেশ, তাহলে আমরা গির্জের গানই গাই ...'

কিন্তু আমার কর্ত্রীঠাকরুন জিদ করতে লাগল গির্জের গান যেখানে সেখানে গাওয়া উচিত নয়, আর বিশেষ করে—স্নানের ঘরের দোরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এখানে তো নয়-ই।'

'অসহ্য!' গজ্ গজ্ করে উঠল মনিব, 'না, আমাদের অন্য ঘরেই যেতে হবে দেখছি!'

একটা নতুন টেবিল কেনার কথাটাও মনিব ঠিক এমনি ভাবেই, গত তিন বছর ধরে পুনরাবৃত্তি করে আসছে।

যখনই ওদের পাড়া-পড়শীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনতাম, আমার মনে পড়ত জুতার দোকানের সেই সব গাল-গপ্পের কথা। স্পষ্টই বুঝতে পারতাম আমার মনিবরাও মনে করে যে শহরের মধ্যে তারাই হচ্ছে সবচাইতে সজ্জন লোক; সঠিক চালচলন, আচার-ব্যবহারের সবকিছু রীতি-নীতি, আইনকানুন তাদের নখদর্পণে। ঐ কানুনের কষ্টিপাথরেই তারা প্রত্যেক লোকের বিচার করে। পরকে বিচার করার এই অভ্যেস তাদের আর তাদের ঐ আইনকানুন সম্বন্ধে আমার মনে এমন এক দারুণ বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল যে, সেগুলো ভেঙেই যেন তখন চরম আনন্দ পেতাম।

আমায় ভীষণ খাটতে হত: একটা ঝিয়ের যাবতীয় কাজ করার পরেও

প্রতি বুধবার আমাকে রান্নাঘরের মেঝে ধুয়ে মুছে সাফ করতে হত, ঘসে মেজে চকচকে করে রাখতে হত সামোভার আর পিতলের অন্য সব জিনিসপত্র, রবিবার রবিবার সবগুলো ঘরের মেঝে আর সিঁড়ি দুটো ঘসামাজা করতে হত। তাছাড়া কাঠ ফেড়ে উনুনের কাঠ বয়ে আনতাম, বাসন মাজতাম, কুটনো কুটতাম, সওদার ঝুড়ি বয়ে আনতে গিন্নীর সঙ্গে বাজারে যেতাম, ছুটতাম মুদীর দোকানে আর ডাক্তারখানায়—সবকিছু কাজই আমাকে করতে হত।

দিদিমার বোন দজ্জাল খিটখিটে আমার বড়ো কর্ত্রী রোজ উঠত ভোর ছটায়। কোনো রকমে চোখেমুখে একটু জল ছুঁইয়েই আইকনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বহুক্ষণ ধরে প্রভুর কাছে তার নিজের জীবন সম্পর্কে, ছেলে আর ছেলের বৌ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করত।

'হে প্রভু!' হাতের সমস্ত আঙুলগুলো জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলত, 'কিছুই চাই না আমি তোমার কাছে, কিচ্ছুটি চাই না। যদি দয়া করো তবে চাই শুধু একটু বিশ্রাম— একটু শান্তি!'

তার কান্নার চোটে আমার ঘুম ভেঙে যেত; কম্বলের তলা থেকে দেখতাম তাকিয়ে তাকিয়ে, ভয়ে ভয়ে শুনতাম তার আবেগভরা প্রার্থনা। বৃষ্টি ধোয়া রান্নাঘরের জানলার পথে উঁকি মারত শরতের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ প্রভাত; সেই কন্‌কনে শীতের সকালে ভীষণ ভাবে ক্রুশ করার সঙ্গে সঙ্গে ওর ধূসর দেহখানা নুয়ে নুয়ে পড়ত; ছোট্ট মাথা থেকে রুমালটা খসে পড়ে পাতলা সাদা চুলগুলো লটপট করত ঘাড়ের কাছে; বাঁ হাতে স্থূল ভাবে মাথার রুমাল ঠিক করতে করতে বলত:

'হতচ্ছাড়া তেনাটুকু নিয়ে আর পারি না!'

ক্রুশের ভঙ্গিতে ভীষণ ভাবে কপাল, কাঁধ আর পেট চাপড়ে ফিস ফিস করে প্রার্থনা জুড়ে দিত:

'যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, হে প্রভু, তাহলে আমার ঐ ব্যাটার বৌটাকে সাজা দাও; আমাকে যেমন করে অপমান করে ও যেন তার উপযুক্ত শাস্তি পায়! আর আমার ছেলের যেন চোখ ফোটে—সে যেন দেখতে পায় সত্যি সত্যি ও কী ধরনের মেয়েমানুষ আর ভিক্তরই বা কেমন ছেলে! হে প্রভু, ভিক্তরকে সাহায্য করো, তাকে তোমার করুণা ভিক্ষা দাও...'

ভিক্তরও শুত রান্নাঘরে একটা উঁচু মাচার উপরে। মায়ের অভিযোগে তারও ঘুম ভেঙে যেত; ঘুম-জড়ানো চোখে খেঁকিয়ে উঠত:

'মা, ফের বক বক শুরু করেছেন এই ভোরে, অসহ্য!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঘুমো গে যা,' নরম সুরে ফিস ফিস করে বলত ওর মা। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলত, তারপর আবার বিদ্বেষভরা তীব্র কণ্ঠে বলতে শুরু করত, 'ওদের অস্থিমজ্জা জমে যাক! রক্ত শুকিয়ে যাক!'

এমন কি দাদু যে দাদু, তিনিও প্রার্থনায় এতোখানি বিষ ঢেলে দিতেন না।

প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে পর আমাকে ডেকে তুলত:

'ওঠ! শুয়ে শুয়ে আর কুঁড়েমি করতে হবে না—এর জন্যে তোকে পয়সা দিয়ে রাখা হয় নি! সামোভার ধরা, ধরিয়ে বাইরে থেকে কাঠ নিয়ে আয়! অ্যাঁ! সন্ধ্যেবেলা কাঠ গুছিয়ে রাখার কথা আবার অগ্রাহ্যি করেছিস!'

খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার চেষ্টা করতাম যাতে ঐ বুড়িটার হিসহিসে গলার গজগজানি না শুনতে হয়, কিন্তু ওকে খুশি করা অসম্ভব। তুষার ঝড়ের মতো হিস হিস করে গজরাতে গজরাতে ঘরময় দাপাদাপি জুড়ে দিত:

'আস্তে, খুদে শয়তান! ভিক্তরের ঘুম ভাঙিয়ে দিবি দেখছি! মজাটা তাহলে দেখিয়ে দেব তোকে! ছুটে যা দোকানে!'

হপ্তা দিনে প্রাতরাশের জন্যে আসত দু'পাউণ্ড করে ময়দার রুটি। আর ছোট গিন্নীর জন্যে দু'কোপেকের একটা বন-রুটি। বাড়িতে নিয়ে আসতেই দুই গিন্নী সন্দিগ্ধ ভাবে হাতের চেটোয় ওজন করে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করত:

'মেপে দেয়ার সময়ে সঙ্গে ছোট আর এক টুকরো দেয় নি — না? এদিকে আয়! হাঁ কর্ তো দেখি!'

পরক্ষণেই ওরা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠত:

'খেয়ে নিয়েছে টুকরোটা! খেয়ে নিয়েছে! দাঁতে গুঁড়ো লেগে আছে!'

...স্বেচ্ছায় অনেক কাজ করতাম। ঘরদোরের জঞ্জাল সাফ করা, পেতলের জিনিসপত্তর, দোরের হাতল ঘসে ঘসে চকচকে করে তোলা, উনুনের প্লেট ইত্যাদি মেজে ঘসে পরিষ্কার করা — এসব করে আনন্দই পেতাম। মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে অনেক দিনই মেয়েদের বলতে শুনেছি:

'ছেলেটা খাটে কিন্তু খুব।'

'বেশ পরিপাটী।'

'কিন্তু বড্ডো বেয়াড়া।'

'কার কাছে মানুষ সেটা তো মনে রাখতে হবে!'

দুজনেই চায়, আমি ওদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান দেখাই, কিন্তু আমার চোখে ওরা আধপাগল। কোনো দরকার নেই আমার ওদেরকে দিয়ে, কোনো কথাই শুনতে চাইতাম না ওদের, মুখে মুখে জবাব দিতাম। ছোট গিন্নীর কথা শুনে আমার যে প্রতিক্রিয়া হত তা নিশ্চয়ই তার নজর এড়ায় নি। তাই বার বার করে শোনাত আমাকে:

'ভুলিস নে কখনো যে তোকে আমরা ভিখারীর ঘর থেকে এনে ঠাঁই দিয়েছি! তোর মাকে একবার আমি একটা চুমকির কাজ-করা সিল্কের ব্লাউজ দিয়েছিলাম!'

একদিন আমিও বললাম:

'সেই ব্লাউজটার বদলে আপনি কি আমার গায়ের চামড়া খুলে নিতে চান নাকি?'

'মা গো! এ ছেলে তো দেখছি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে!' ভয়ে আঁৎকে উঠে চিৎকার জুড়ে দিল।

হতভম্ব হয়ে গেলাম, ঘরে আগুন দিতে যাব কেন?

দুজনেই অনবরত মনিবের কাছে নালিশ করত আমার নামে, আর সেও রুক্ষ গলায় বলত:

'সামলে চল্ হে ছোকরা!'

কিন্তু শেষটায় তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন মা আর বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল:

'আচ্ছা মানুষ বটে তোমরা! রাতদিন ছেলেটাকে ঘোড়া দাবড়ানে দাবড়াও-- অন্য কেউ হলে অনেক দিন আগেই ভেগে পড়ত, নয়ত স্রেফ খাটুনির চোটে মরে যেত!'

এতে দুজনেই এতো চটে গেল যে, রাগের চোটে কে'দে ফেলে আর কি।

'কোন সাহসে তুমি ওর সামনে এমন কথা বলছ শুনি? লম্বাচুলো মুখ্যু কোথাকার!' রাগে জ্বলে উঠে পা আছড়ে চিৎকার করে উঠল ওর বৌ, 'একথা শোনার পরে আর ও আমাকে মানবে ভাবো? ভুলে যেও না আমি পোয়াতী মানুষ।'

মা জুড়ে দিল নাকী সুরে বিলাপ:

'ভগবান তোকে ক্ষমা করুন, ভাসিলি! ছেলেটাকে তুই-ই নষ্ট করবি, মনে রাখিস আমার কথাটা!'

দপ দপ করে পা ফেলে চলে গেল দুজনে।

'দেখলি তো, কী কাণ্ডটাই না বাধিয়েছিস, খুদে শয়তান — তোকে ফের তোর দাদুর কাছে পাঠিয়ে দেব, দেখে নিস। আবার সেই ন্যাকড়া কুড়োনোর কাজে লাগতে হবে!' রুক্ষ গলায় ধমকে উঠল মনিব।

'আপনাদের সঙ্গে থাকার চাইতে ন্যাকড়া কুড়োনো ঢের ভালো!' অপমান সহ্য করতে না পেরে আমিও জবাব দিলাম, 'আমাকে এনেছিলেন শিক্ষানবীশ হিসেবে, কিন্তু কি শিক্ষেই দিচ্ছেন আমাকে! কেমন করে জঞ্জাল সাফ করতে হয়, তাই না?'

মনিব আস্তে আমার চুলের মুঠো চেপে ধরল, তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'একেবারে বর্বর বনে গেছিস! ওসব চলবে না ভায়া, মোটেই না...'

আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে মনিব আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু দুদিন পরে সে একটা পেনসিল, টি-স্কোয়ার, রুল আর খানিকটা গোটানো কাগজ হাতে করে রান্নাঘরে ঢুকল।

'ছুরি-টুরিগুলো মাজার পরে এটা নকল করে রাখিস!' বলল মনিব।

নক্সাটা হচ্ছে একটা দোতালা বাড়ির সামনের দিক, অসংখ্য জানালা আর প্লাস্টারের কাজ করা।

'এই রইল একজোড়া কম্পাস। সবগুলো লাইন মেপে কাগজের উপরে ফুটকি দিয়ে তারপর রুল ফেলে জুড়ে দিবি — প্রথমে লম্বালম্বি — সেটা হবে সমান্তরাল, তারপরে উপর নিচে — লম্বা। লেগে যা!'

পরিচ্ছন্ন কাজ পেয়ে আর পড়াশুনো শুরু করতে পারব জেনে মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল। কাগজ আর যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

যাই হোক, তক্ষুণি হাত ধুয়ে কাজে বসে গেলাম। সমস্ত সমান্তরাল রেখাগুলো চিহ্ন দিয়ে দিয়ে একে একে জুড়ে দিলাম, বেশ চমৎকার হল। শুধু কেমন করে যেন তিনটে রেখা বেশি হয়ে গিয়েছিল। তারপর লম্বালম্বি দাগগুলো কাটলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম গোটা বাড়িটার চেহারাই অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে: জানালাগুলো দেয়ালের মাথার উপরে চড়ে বসেছে, একটা জানালা বাড়ির বাইরে গিয়ে ঝুলেছে, সদর দরজাটা হামাগুড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে পড়েছে, ছাদের চাইতে উঁচুতে গেছে কার্নিশ, ঘুলঘুলিটা চিমনির মাথার উপরে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বহুক্ষণ ধরে কিম্ভূতকিমাকার নক্সাটার দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম কেমন করে এটা সম্ভব হল। অবশেষে ঠিক করলাম, কল্পনার সাহায্যে শুধরে নেব: সমস্ত কার্নিশে কার্নিশে, ছাদের কিনারায় কিনারায় আঁকলাম কাক, চড়ুই আর কবুতরের ছবি। মাটিতে জানালার সামনে আঁকলাম পা ফাঁক করে দাঁড়ানো মানুষ, তাদের হাতে দিলাম ছাতা — তাতেও মানুষগুলোর বিকলাঙ্গভাব ঘুচল না। তারপর গোটা ছবিটা ভরে তেরছা দাগ টেনে টেনে মনিবের কাছে নিয়ে গেলাম।

মনিব চোখ তুলে তাকাল। একগোছা চুল নিয়ে পাকাতে পাকাতে গম্ভীর মুখে বলল:

'এটা কি হল?'

'বৃষ্টি পড়ছে,' বুঝিয়ে বললাম, 'বৃষ্টি যখন হয় তখন বাড়িগুলোকে এমনি বাঁকা দেখায়, কারণ বৃষ্টি পড়ে তেরছা হয়ে। পাখি — এগুলো হচ্ছে সব পাখি — কার্নিশে কার্নিশে লুকিয়ে বসে রয়েছে, বৃষ্টির সময়ে ওরা অমনি করেই বসে থাকে। আর ঐ লোকগুলো বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে, একটা মেয়ে পড়ে গেছে এখানটায়, আর এ হচ্ছে একটা নেবুওয়ালা...'

'সত্যিই এর জন্যে তোর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ,' বলল মনিব। হাসির ধমকে এমন ভাবে মাথাটা নুয়ে পড়েছে যে চুলগুলো কাগজের উপরে লটপট করছে।

'মরণও হয় না! সত্যি। ঝগড়াটে খুদে চড়ুই কোথাকার!'

ছোট গিন্নী ঘরে এসে ঢুকল। পেটটা জালার মতো ফুলে উঠেছে। আমার আঁকা নক্সাটা খানিকক্ষণ দেখল, স্বামীকে বলল:

'দাও না আচ্ছা করে দুঘা লাগিয়ে!'

'আরে না, না, আমি যখন প্রথম শুরু করেছিলাম, এর চাইতে ভালো কিছু করি নি...' এতটুকুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিল মনিব।

একটা লাল পেনসিল দিয়ে আমার ভুলগুলো দাগ দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিল। তারপর আর এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলল:

'আবার চেষ্টা কর্! যতক্ষণ না ঠিক হয় এঁকে যাবি...'

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় অনেকটা ভালো হল, শুধু একটা জানালা নেমে এসেছিল অলিন্দের উপরে। কিন্তু জনমানবহীন বাড়িটা দেখে আমার তেমন পছন্দ হল না, তাই নানান রকমের লোকজনে ভরে দিলাম: জানালায় বসে তরুণী মেয়েরা পাখার হাওয়া খাচ্ছে, যুবকেরা টানছে সিগারেট, একজনের

সিগারেট নেই কিন্তু নাকটা লম্বা। সদর দরজার সামনে একটা গাড়ি, একটা কুকুর শুয়ে আছে।

'আবার ঐ সব আজেবাজে জিনিস এ'কে নষ্ট করেছিস কেন?' রেগে উঠল মনিব।

বুঝিয়ে বললাম যে মানুষজন ছাড়া বাড়িটাকে কেমন নিঝুম-নিঝুম লাগছিল তাই। কিন্তু সে গাল পাড়তে আরম্ভ করল:

'চুলোয় যাক! যদি শিখতে চাস তবে ঠিক ঠিক কাজ করতে হবে! যাচ্ছেতাই হয়েছে ওগুলো...'

শেষ পর্যন্ত ঠিক আসলটার মতো করে একটা নকল আঁকতে মনিব ভারি খুশি হল।

'চেষ্টা করলে কি করতে পারিস দেখলি তো? এমনি করে যদি কাজ করে যাস, অল্প দিনের ভিতরেই অনেকখানি উন্নতি করতে পারবি...'

তারপর আর একটা নতুন কাজ দিল:

'আমাদের ফ্ল্যাটের একটা নক্সা আঁক: দেখবি ঘরগুলো কোথায় কী ভাবে আছে, কোনখানে দরজা, কোনখানে জানালা আর কী কী সব কোথায় কোথায় আছে। আমি কিচ্ছু দেখিয়ে দেব না, সব নিজে থেকে করতে হবে!'

রান্নাঘরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম: কোথা থেকে, কেমন করে শুরু করব?

কিন্তু এখানেই আমার নক্সা-আঁকা শেখার পাঠ শেষ।

বুড়ো গিন্নী আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর বিদ্বেষভরা হিংসুটে গলায় বলল:

'বটে, নক্সাদার হতে চাস?'

আমার চুলের মুঠো ধরে মাথাটা এত জোরে টেবিলের উপরে ঠুকে দিল যে ঠোঁট আর নাক থে'তলে গেল, তারপর লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিল। আমার আঁকা কাগজটা ছি'ড়ে, যন্ত্রপাতি মেঝের উপরে ফেলে ছড়িয়ে বিজয়-গর্বে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, তারপর চিৎকার জুড়ে দিল:

'করে দেখ্ আবার! কি করি দেখিস! বাইরের লোক দিয়ে কাজ করাতে চায় — সেটাই ওর মতলব — নিজের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজের মায়ের পেটের ভাইকে!'

ছুটে এল মনিব, পায়ে পায়ে এল তার বৌ, তারপর শুরু হয়ে গেল এক খণ্ড প্রলয়: তিনজনা তিনজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, চিৎকার চেঁচামেচি,

তর্জন গর্জন। অবশেষে সমাপ্তি ঘটল যখন মেয়েরা চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে আর মনিব আমাকে ডেকে বলল:

'এখনকার মতো বরং ছেড়েই দে। আঁকা জোঁকা বন্ধ রাখ্, দেখলি তো অবস্থা!'

লোকটার জন্যে দুঃখ হল আমার, এমন মুষড়ে পড়া অসহায় ভাব। চিরদিনই এই মেয়েছেলেরা চেঁচিয়ে গলাবাজী করে ওকে দাবিয়ে রাখছে।

এর আগেই আমি টের পেয়েছিলাম যে বুড়ি চায় না আমি শিখি, আর যতদূর পারত চেষ্টা করত আমার কাজে বাগড়া দিতে। আঁকতে বসার আগে সব সময়েই জিজ্ঞেস করে নিতাম তাকে:

'আর কি কিছু করবার আছে আমার?'

'থাকলে বলব,' খেঁকিয়ে উঠে জবাব দিত, 'যা গিয়ে টেবিলের সামনে বসে বসে বগল বাজা।'

কিন্তু মিনিট দুই পরেই হয় আমাকে কোনো কাজে পাঠাত, নয়ত বলত:

'আহা, কি ঝাঁটই দিয়েছিস সিঁড়িতে? কোণে কোণে ধুলো বালি জমা হয়ে রয়েছে! যা আবার গিয়ে ঝাঁট দিয়ে আয়...'

গিয়ে দেখতাম কোথাও ধুলোর চিহ্নটুকুও নেই।

'বটে, মুখে মুখে তর্ক?'

চিৎকার জুড়ে দিত বুড়ি।

একদিন আমার আঁকা সমস্ত নক্সার উপরে লেই ঢেলে দিল, আর একদিন ঢেলে দিল এক বোতল প্রদীপের তেল। ছোট ছেলেদের মতো শয়তানী করত: তেমনি শিশুসুলভ ধূর্ততা আর তা লুকবার ব্যর্থ চেষ্টা। আর কাউকে ওর মতো এত সহজে এত তাড়াতাড়ি চটে উঠতে কখনো দেখি নি, সবার বিরুদ্ধে সবকিছু নিয়েই নালিশ করার এমন উদ্দাম প্রবৃত্তিও দেখি নি আর কারুর মধ্যে। সাধারণত মানুষ অভিযোগ করতে ভালোবাসে, কিন্তু গাইয়েরা যেমন গানে আনন্দ পায় নালিশ করে ও তেমনি আনন্দ পেত।

ওর পুত্রস্নেহটাও পাগলামীরই নামান্তর; তার তোড় দেখে আমার মজাও লাগত, আবার ভয়ও হত — বদ্ধ পাগলামী ছাড়া আর কোনো ভাবেই তা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রায়ই ভোরের প্রার্থনার পরে উনুনের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে ভিক্তরের মাচার কিনারে কনুইয়ে ভর দিয়ে দারুণ আবেগে ফিস ফিস করে বলত:

'আদরের খোকা আমার, আমার প্রাণের প্রাণ! হীরের টুকরোর মতো

খাঁটি, নির্মল! দেবদূতের পাখার মতো হালকা! ঘুমোচ্ছে ছেলেটা, — ঘুমো বাছা, ঘুমো! মন তোর সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাক, পরমাসুন্দরীর চাইতেও সুন্দরী কনের স্বপ্ন দেখ — ধনী রাজ-কন্যে কি, সওদাগর-কন্যে! তোমার শত্তুর জন্মাবার আগেই যেন মরে যায়, তোমার বন্ধুদের শত বছর পরমায়ু হোক! হাঁসের পেছনে হাঁসীদলের মতো মেয়েরা পাগল হয়ে তোমার পিছনে দলে দলে ঘুরে বেড়াক!'

এক নিদারুণ বেদনাময় কৌতুক অনুভব করতাম আমি: স্থূলরুচি, কুঁড়ের বাদশা ভিক্তরকে লম্বা নাক আর ছুলিভরা মুখে দেখাত ঠিক যেন একটা কাঠঠোকরা, যেমন গোঁয়ার, তেমনি মূর্খ।

মায়ের বিড়বিড়ানিতে কোনো কোনো দিন তার ঘুম ভেঙে যেত, ঘুম জড়ানো চোখে খেঁকিয়ে উঠত:

'জাহান্নামে যান! কেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সারা গায়ে থুথু ছিটচ্ছেন? নাঃ, আপনার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল দেখছি!'

তখন সাধারণত শান্ত বাধ্যের মতো নেমে আসত বুড়ি, তারপর একটু হেসে বলত:

'ঘুমো, ঘুমো জংলিটা, ঘুমো!'

কিন্তু কোনো কোনো দিন ওর পা দুটো অবশ হয়ে ধপ করে উনুনের ধারে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকত, যেন ওর জিভটা পুড়ে গেছে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতেই জ্বালা ভরা ভাষায় বলত:

'কী? তোর নিজের মাকেই তুই নরকে পাঠাস, বেজন্মা কোথাকার? আমার আত্মার কলঙ্ক, শয়তান নিজের হাতে তোর মতো একটা অভিশপ্ত শেল আমার বুকে বিঁধে দিয়েছে, জন্মাবার আগেই কেন পচে মরে গেলি না?'

রাস্তার মাতালের মতো নোংরা ভাষার তুবড়ী ছুটত তার মুখে, শুনে ভয় করত।

বুড়ি ঘুমোত খুবই অল্প আর ঘুমের মধ্যে ছটফট করত। কোনো কোনো দিন রাত্রের মধ্যে অনেক বার নেমে আসত উনুনের উপর থেকে আর যে সোফাটার উপরে আমি ঘুমোতাম সেটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিত।

'কী ব্যাপার?'

'চুপ্!' ক্রুশ করে অন্ধকারের ভিতরে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠত:

'হে প্রভু... হে পয়গম্বর ইলিয়া... হে শহিদ ভারভারা... অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাও...'

কাঁপা কাঁপা হাতে একটা মোমবাতি জ্বালাত। বিরাট লম্বা নাকশুদ্ধু রুক্ষ ফোলা গোল মুখ আর ধূসর চোখ দুটো পিট পিট করে আবছা আলোয় বিকৃত হয়ে-ওঠা জিনিসগুলোর দিকে অস্থির ভাবে তাকিয়ে থাকত। রান্নাঘরটা বড়ো, কিন্তু সিন্দুক ইত্যাদি জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি হয়ে ঘরটাকে অপরিসর করে তুলেছে। নিরালায় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, আইকনের সামনে মিট মিট করে জ্বলছে প্রদীপ, দেয়ালের গায়ে ছুরিগুলো তুষার কণার মতো ঝক ঝক করছে, তাকের উপরে কালো কালো রান্নার হাঁড়িকুঁড়িগুলো কেমন যেন কানামতো বিদঘুটে।

উনুনের উপর থেকে নিচে নামার সময়ে বুড়ি নামত খুব সন্তর্পণে, যেন নদী তীর থেকে জলে নামছে। তারপর খালি পা দুটো টেনে টেনে কোণের দিকে যেখানে ময়লা জলের বালতিটার উপরে চওড়া-মুখ কলসীটা কাটা মাথার মতো বসানো রয়েছে সেখানে চলে যেত; সেখানে থাকত পরিষ্কার জলের একটা পিপে। চোঁ চোঁ শব্দ করে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে জানালার কাঁচের ওপর জমা তুষারের ঝালরের মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত।

'হে প্রভু, দয়া করো! আমার আত্মার প্রতি করুণা করো!' নিঃশ্বাস চেপে বলে উঠত।

কোনো কোনো দিন বাতি নিভিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তিক্তকণ্ঠে বিড় বিড় করে বলত:

'কেউ আমাকে ভালোবাসে না, হে ঈশ্বর, কেউ চায় না আমাকে!'

এক এক দিন উনুনের উপরে ফের উঠে যাবার সময়ে চিমনির সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করত, তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখত ড্যাম্পারটা ঠিক আছে কিনা; কালিতে মাখামাখি হয়ে যেত হাতটা, প্রাণভরে খানিকটা বাপান্ত করে শুতে না শুতেই সম্মোহিতের মতো ঢলে পড়ত গভীর ঘুমে। বুড়ির উপরে যখনই রাগ হত তখনই ভাবতাম দাদু কেন ওকে বিয়ে করলেন না, — বুড়িটা তাহলে আচ্ছা শায়েস্তা করতে পারত তাঁকে আর বুড়িটাও তার যোগ্য জুটি পেত। ওর জ্বালায় প্রতিমুহূর্তে আমার জীবন বিষাক্ত, কিন্তু এক এক দিন ওর তুলোর মতো ফুলো মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠত, জলে ভরে যেত দুটো চোখ। বলত:

'ভাবছিস আমি খুব সুখে-শান্তিতে আছি? ছেলে পেটে ধরলাম, বড়ো করলাম, মানুষ করে তুললাম। কিন্তু কী পাচ্ছি আমি তার বদলে? রাঁধুনীর মতো হেঁশেল ঠেলে মরছি, এ সহ্য করা কি সোজা কথা? ঐ মাগীকে আমার ছেলে নিয়ে এসেছে আমার জায়গায় বসাতে — তার নিজের রক্তমাংসের আপন জনের জায়গায়। এটা কি ন্যায্য হয়েছে?'

'না, তা ঠিক হয় নি,' সরল ভাবেই বলি আমি।

'আঃ, দেখছিস তো তাহলে?..'

তারপর ছেলের বৌয়ের সম্পর্কে যত নোংরা নির্লজ্জ উক্তি শুরু করে দিত:

'স্নানের ঘরে মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে যা দেখার সব কিছুই দেখে নিয়েছি। কী দেখে যে ছেলেটা অমন করে মজল? ওই মাল দেখে কোনো পুরুষ আবার মজে?'

স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে অসম্ভব কদর্য ভাষায় কথা বলত বুড়ি; প্রথম প্রথম ভীষণ বিচ্ছিরি লাগত, কিন্তু পরে বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনতাম। মনে হত যেন ঐসব কথার ভিতরে কিছু কিছু কঠোর সত্য রয়েছে।

'মেয়েমানুষের অসীম শক্তি, খোদ ঈশ্বরকে পর্যন্ত ঠকিয়ে ছেড়েছে!' টেবিল চাপড়ে জোর গলায় বলে উঠত বুড়ি। 'ইভের জন্যেই গোটা মানুষজাতটাকে নরকে যেতে হল, সেকথা ভুলে যাস নে!'

অফুরন্ত বক্তৃতা দিতে পারত মেয়েমানুষের শক্তি সম্পর্কে, আর আমার সব সময়েই মনে হত একথা বলে ও যেন কাউকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। ওর সমস্ত কথার ভিতরে বিশেষ করে ঐ কথাটাই আমার মনে থেকে গেল যে ইভ 'ঈশ্বরকে পর্যন্ত ঠকিয়ে ছেড়েছে'।

একই উঠোনে আমাদের বাড়িটার মতো আর একটা বড়ো বাড়ি; বাড়িটার আটটা ঘরের চারটেতে থাকত অফিসাররা, একটায় থাকত সেনাবাহিনীর পুরুত। উঠোনে সবসময়েই ভিড় করত সহিস, চাকর আর তাদের বান্ধবী — রাঁধুনী, ধোপানী আর ঝি চাকরাণীর দল; রান্নাঘরে নাটক আর রোমান্স লেগে থাকত দিনরাত, তার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল। ঝগড়া, মারামারি লেগেই থাকত অষ্টপ্রহর। সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যেই শাবল নিয়ে মারামারি করত, কখনো বা মারামারি করত বাড়িওয়ালার মজুরদের সঙ্গে; প্রায়ই মেয়েদের ধরে ধরে পেটাত। উঠোনটা টগ বগ করত লাম্পট্য আর ব্যভিচারে—স্বাস্থ্যবান জোয়ানদের উদ্দাম পাশবিক লালসায়। সকালে চায়ের টেবিলে, দুপুরে আর

রাত্রে খাওয়ার সময়ে শুনতাম জীবনের এই স্থূল যৌন দিক, অর্থহীন পাশবিকতা আর কুৎসিত জয়ের জাঁকজারি সম্পর্কে বেহায়া আলোচনা। উঠোনে যা কিছু ঘটত সব বুড়ির নখদর্পণে সে সোৎসাহে সব বলে যেত।

পুরুষ্টু ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে শুনত বৌ, ভিক্তর হো হো করে হেসে উঠত, কিন্তু মনিবের চোখে মুখে ফুটে উঠত একটা বিরক্তির ছায়া। বলত:

'ঢের হয়েছে, এখন থামুন, মা...'

'হা ভগবান, আমি দুটো কথা বলি তাও তোর সহ্য হয় না!'

'ঠিক আছে মা, এখানে বললে কি হয়েছে! বলছেন তো পরিবারের মধ্যে!' মাকে উৎসাহ দিত ভিক্তর।

মায়ের জন্যে বড়ো ছেলের মনে ছিল একটা ঘৃণাভরা অনুকম্পা, মায়ের সঙ্গে একা থাকাটা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত। কখনো সখনো যদি দৈবাৎ একা পড়ে যেত, ওমনি ওর মা বৌয়ের বিরুদ্ধে নালিশের ঝড় তুলত, তারপর নির্ঘাত পয়সা চাইত। তাড়াতাড়ি দু-তিনটে রুবল আর কিছু খুচরা গুঁজে দিত মায়ের হাতে।

'টাকাকড়ি নেয়াটা আপনার বোকামো হচ্ছে মা! অবশ্য আমি যে দিতে কুণ্ঠিত বা রাগ করছি তা নয়, তবু আপনার নেয়াটা উচিত নয়!'

'শুধু ভিখারীদের জন্যে... আর উপাসনার টেবিলের জন্যে খানকতক মোমবাতি কিনব...'

'ভিখারীদের জন্যে! ভিক্তরের সর্বনাশ করে ছাড়বেন আপনি, মা।'

'নিজের ভাইকে দেখতে পারিস নে তুই, তোর মনে পাপ আছে!'

ধৈর্যহীন বিরক্তিতে হাত নাড়া দিয়ে চলে যেত বড়ো ছেলে।

মায়ের সঙ্গে ভিক্তরের ব্যবহার ছিল রুক্ষ, অবজ্ঞাপূর্ণ। খেত রাক্ষসের মতো। রবিবার রবিবার বুড়ি প্যানকেক পিঠে বানাত, ভিক্তরের জন্যে কতকগুলি আলাদা করে একটা বয়ামে ভরে লুকিয়ে রেখে দিত আমার ঘুমোবার সোফাটার নিচে। উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বয়ামটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত ভিক্তর আর গজ গজ করত:

'আর দুটো বেশি করে রাখতে পারেন নি, জটাবুড়ি?'

'জলদি করে গেল্, নইলে কেউ দেখবে...'

'আরে বুড়ি, কেউ যদি দেখেই ফেলে তো বলব আপনি চুরি করে এনেছেন আমার জন্যে!'

একদিন বয়ামটা বের করে গোটা দুই পিঠে খেয়ে ফেলেছিলাম, তার

জন্যে ধরে পিটল আমাকে ভিক্তর। আমি ওকে দেখতে পারতাম না, ও আমাকে দেখতে পারত না, পিছনে লাগত। দিনে তিনবার করে আমাকে দিয়ে ওর জুতা পালিশ করিয়ে নিত, মাচার উপরে শুয়ে তক্তাটা সরিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে থুথু ফেলত।

ওর দাদা যেমন সব সময়েই সবাইকে বলে 'কুঁদুলে মুরগির ছানা', বোধ হয় তারই অনুকরণে ভিক্তরও কতগুলো লব্জ তৈরি করে নিয়েছিল, সেগুলো শুনে মজা লাগত না, মাত্র অপ্রীতিকর। যেমন অদ্ভুত তেমনি বোকা বোকা, অর্থহীন।

'মা, গোলচক্কর-ডাইনেঘোর, আমার মোজা কোথায়?'

কতগুলো নির্বোধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমাকে উত্যক্ত করে মারত, যেমন:

'বল দেখি আলেক্সেই, কেন লেখা থাকে নীল আর লোকে বলে মিল? কেন লোকে সাতখানা না বলে বলে রাতকানা?..'

ওদের কথাবার্তার ধরণধারণে ঘেন্না ধরে যেত। দিদিমা দাদুর মুখের সুন্দর ভাষা শুনে আমি মানুষ হয়ে উঠেছি। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না ওদের বিপরীত শব্দ জুড়ে কথা বলার মানে, যেমন 'ভয়ঙ্কর মজার', 'খাবার জন্যে মরছি', 'নিদারুণ আনন্দ'। আমার মনে হত মজা কখনো ভয়ঙ্কর হতে পারে না, আনন্দ নিদারুণ, খাওয়ার সঙ্গে মরার বোধগম্য কোনো সামঞ্জস্য নেই।

'এভাবে বলাটা কি ঠিক?' জিজ্ঞেস করতাম ওদের।

'দেখ, দেখ, উনি এসেছেন আমাদের উপরে মাস্টারী করতে!' রেগে উঠে বলত ওরা। 'ছোঁড়ার কান দুটো তুলে নেয়া দরকার...'

'কান দুটো তুলে নেয়া' দেখতাম এ কথাটাও ভুল। শাক তুলতে পারো, ফুল তুলতে পারো, ফলও তুলতে পারো, কিন্তু কান তুলতে পারো না।

কান যে তোলা যায়, সেটা প্রমাণ করার জন্যে ওরা আমার কান মলে দিত, কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হত না। পরক্ষণেই পরমোল্লাসে বলে উঠতাম:

'কিন্তু কৈ, আমার কান তো তোলা গেল না?'

আমার চারপাশেই দেখতাম হৃদয়হীন শয়তানী আর কুৎসিত নির্লজ্জতা। কুনাভিনোর পথে পথে গণিকালয় আর রূপ-পসারিনীদের ভিড়ের কমতি ছিল না, তবু তা এতখানি নয়। সে নোংরামি, সে নষ্টামীর অবশ্যম্ভাবিতার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়: তার মূলে অসহনীয় কঠোর শ্রম-ক্লান্তি, দৈন্য দুর্দশা, অর্ধাহার। কিন্তু এখানে মানুষ আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন

কাটায়, শ্রমের স্থান অধিকার করেছে অর্থহীন হৈ-হল্লা আর সবকিছু ঘিরে বিরাজ করছে এক নিদারুণ শঠতা আর বিরক্তিকর ক্লান্তির কালো ছায়া।

দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটত আমার। দিদিমা আমাকে দেখতে এলে পর আরো বেশি আঘাত পেতাম। তিনি যখনই আসতেন, ঢুকতেন রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে। তারপর আইকনের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করে প্রায় মাটির উপরে নুয়ে পড়ে ছোট বোনকে নমস্কার করতেন। তাঁর এই নমস্কার যেন জগদ্দল বোঝা হয়ে আমাকে পিষে মারত।

'ও, তুই এসেছিস, আকুলিনা?' শুকনো গলায় নেহাৎ মামুলী ভাবেই বলত বুড়ো গিন্নী।

সে সময়ে যেন দিদিমাকে চিনতে পারতাম না: এমন বিনীত ভঙ্গিতে ঠোঁট চাপতেন যে তাঁর সমস্ত চেহারাটাই যেত বদলে। দরজার পাশে নোংরা জলের বালতিটার কাছে একটা টুলের উপরে নিঃশব্দে গিয়ে বসতেন। এমন ভাবে চুপচাপ বসে থাকতেন যেন কী একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছেন। শান্ত বিনীত সুরে জবাব দিতেন বোনের কথায়।

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত, রেগে উঠে বলতাম:

'ওখানে গিয়ে বসেছ কেন?'

'চুপ করে থাক্, তুই এ বাড়ির কর্তা নস!' সস্নেহে চোখ মটকে একটু ধমক দিয়ে বলতেন দিদিমা।

'ঐ তো, যেখানে দরকার নেই সেখানে গিয়েও ও নাক গলাবে। তা সে যতোই বকো আর যতোই মারো,' নালিশ শুরু করত গিন্নীঠাকরুন।

কোনো কোনো দিন বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলত তার দিদিকে:

'তাহলে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করতে শুরু করে দিলি, অ্যাঁ আকুলিনা?'

'তেমন খারাপ তো আর কিছু নয়...'

'যেটা লজ্জার কথা সেইটাই তো খারাপ।'

'লোকে বলে যীশু নিজেও ভিক্ষে করতেন...'

'মূর্খ নাস্তিকেরা বলে ও কথা, আর তুই কিনা কান দিস ওদের কথায়, নেহাৎ একটা বেকুফ বুড়ি তুই। যীশু ভিক্ষুক ছিলেন না, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আর লেখা আছে, তাঁর আবির্ভাব হবে জ্যান্ত আর মরা উভয়েরই বিচার করার জন্যে — এমন কি যারা মরে গেছে তাদেরও, মনে রাখিস! তাঁর হাত থেকে কোথাও পালিয়ে নিষ্কৃতি নেই, এমন কি যদি নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করেও ফেলিস, তবুও না... তোদের — তোর আর ভাসিলির অহঙ্কারের

সাজা তিনি দিচ্ছেন। তোদের কাছে যখন সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম তখন যে তাড়িয়ে দিয়েছিলি, সেইজন্যে, কী চমৎকার বড়োলোক আত্মীয় আমার!'

'আমার সামর্থ্যে যখন যেমন কুলিয়েছে, সবসময়েই তো কিছু না কিছু করেছি তোমাদের জন্যে,' এতটুকুও বিচলিত না হয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় জবাব দিতেন দিদিমা, 'কিন্তু ভগবান আমাদের শাস্তি দেবার কথা ভেবেছেন...'

'এতেও হয় নি তোদের, এতেও হয় নি...'

দিদিমার বোন তার ক্লান্তিহীন জিভ দিয়ে দিদিমাকে চাবকে চলত। তার সেই ঘেউ ঘেউ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে ভাবতাম, কী করে সহ্য করেন দিদিমা। এ সময়ে দিদিমাকেও ভালোবাসতে পারতাম না আমি।

ছোট গিন্নী এসে ঘরে ঢোকে, মাথা দোলায় যেন গরবিনী কৃপা করছে।

'আসুন খাবার ঘরে! ঠিক আছে, চলে আসুন!'

দিদিমা যেতে গেলে পিছন থেকে খেঁকিয়ে ওঠে তাঁর বোন, 'পা দুটো মুছে যা, হাড়গিলে শুঁটকী!'

মনিব দিদিমাকে খুব খুশি হয়েই অভ্যর্থনা করে।

'আরে, প্রজ্ঞাবতী আকুলিনা যে? কেমন আছো? কাশিরিন বুড়ো বেঁচে আছে এখনো?'

পরম আন্তরিকতার সঙ্গে হাসেন দিদিমা।

'বড্ডো ঘামছ যে? কাজ করছ নাকি এখনো?'

'খেটেই যাচ্ছি! জেলখানার কয়েদীর মতো।'

মনিবের সঙ্গে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন দিদিমা, কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠর মতোই। মনিব কখনো কখনো আমার মায়ের কথা বলত।

'হুঁ, ভারভারা ভাসিলিয়েভনা... কী চমৎকার মেয়ে! বীরাঙ্গনা!'

'মনে আছে, আমি তাকে একটা ব্লাউজ দিয়েছিলাম? কালো সিল্কের উপরে বুটি তোলা?' দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ওর বৌ।

'হাঁ, আছে...'

'ব্লাউজটা ছিল ঠিক নতুনের মতো...'

'হুঁ, ব্লাউজ — ব্লাউজ না ফ্লাউজ — জীবনটাই একটা পরিহাস!' বিড় বিড় করে বলে ওঠে মনিব।

'কী বললে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ওর বৌ।

'ও কিছু না, কিছু না!.. সুখের দিন যা ছিল সব চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে ভালো লোকেরা...'

উদ্বিগ্ন স্বরে বৌ বলে, 'এ সব কথা বলার মানে কী!'

তারপর দিদিমাকে ওরা নিয়ে যায় নতুন খোকা দেখাতে। আমি একলা থাকি চায়ের পেয়ালা পিরিচ ইত্যাদি এ'টো বাসন তুলতে।

'চমৎকার মানুষ তোর ঐ বুড়ি দিদিমা,' কোমল স্বপ্নালু কণ্ঠে বলত মনিব।

এই কটি কথার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞ আমি ওর কাছে। দিদিমাকে যখন একা পেয়ে ক্ষুব্ধ অন্তরে বলতাম:

'কেন তুমি আসো এখানে? দেখতে পাও না কী ধরনের মানুষ ওরা...'

'ওরে আলিয়শা, সবকিছুই দেখতে পাই,' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিদিমা বলতেন। তাঁর অদ্ভুত অপূর্ব মুখখানার উপরে এমন একটা স্নেহভরা মধুর হাসি ফুটে উঠত যে সঙ্গে সঙ্গেই আমি লজ্জিত হয়ে পড়তাম: নিশ্চয়ই তিনি দেখতে পান, বুঝতে পারেন সবকিছু, এমন কি এই মুহূর্তে আমার বুকের ভিতরে কী চলেছে তাও।

সন্তর্পণে চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে আমাকে বুকে টেনে দরদ ঢেলে বলতেন:

'সত্যি, আসতাম না আমি এখানে, আসি শুধু তোরই জন্যে,—নইলে ওদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? তোর দাদুর খুব অসুখ, চব্বিশ ঘণ্টাই থাকতে হয় তার কাছে। তাই আর কাজ করতে পারি না। ফলে টাকাকড়িও হাতে নেই... তার উপরে আবার মিখাইলো তার ছেলে সাশাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে, তাই তাকেও খেতে পরতে দিতে হচ্ছে। ওদের সঙ্গে কথা ছিল তোর দরুন বছরে ছটা করে রুবল দেবে। তাই ভাবলাম এখন যদি অন্তত একটা রুবলও দেয় ওরা। প্রায় ছ মাস কাজ হল তোর এখানে, তাই না?' তারপর একটু ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'ওরা বলে দিল, আমি যেন তোকে একটু বকে যাই। বলল, তুই নাকি খুব অবাধ্য। আর কয়েকটা দিন যদি কষ্ট করে থাকতে পারিস, লক্ষ্মী সোনাটি আমার। চেষ্টা করে দেখ্ দু'একটা বছর—যতদিন না তোর পা দুটো একটু শক্ত হয়ে ওঠে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারিস... দেখবি একটু চেষ্টা করে!'

আমি কথা দিলাম। কিন্তু বড্ডো শক্ত রাখা। দুর্বিসহ বিরক্তিকর জীবনের বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছি। সকাল থেকে সন্ধ্যে শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্যে খেটে খেটে মরছি, বেঁচে আছি যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে।

মাঝে মাঝে দারুণ ইচ্ছে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু অভিশপ্ত শীতকাল চলেছে পূর্ণোদ্যমে: রাত্রে তুষার-ঝড়, বাড়ির মাথায় গোঁ গোঁ করে উঠত বাতাসের কান্না, ঠাণ্ডায় কড়ি-বর্গাগুলো মড় মড় করে উঠত, — কি করে পালাই?

বাড়ির বাইরে খেলতে যাওয়া আমার বারণ ছিল, অবশ্য সময়ও পেতাম না: নানান ধরনের বিশ্রী নোংরা কাজের আবর্তেই শীতের বেলা ডুবে যেত।

কিন্তু গির্জায় যেতেই হত—শনিবারের সান্ধ্য উপাসনায় আর রবিবারের শেষ উপাসনায়।

গির্জায় যেতে খুবই ভাল লাগত। একটা অন্ধকার খালি কোণ বেছে সেখানে দাঁড়িয়ে আইকনের মঞ্চের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তারিফ করতাম: দূর থেকে মনে হত যেন মোমের আলোয় গলে গিয়ে সোনালী স্রোতের মতো পাথরের মেঝের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে; আইকনের কালো মূর্তিগুলো মৃদু মৃদু দুলছে আর তার উপরে রাজার দুয়ারের সোনার ঝালর থেকে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে; নীল বাতাসে সারি সারি ঝোলানো মোমের আলো সোনালী রঙের মৌমাছির ঝাঁকের মতো দুলছে, মেয়েদের মুখগুলো যেন ফোটা ফুল।

উপাসনার সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সর্বকিছুই যেন একাকার হয়ে ডুবে গেছে, সর্বকিছুই যেন জেগে উঠেছে এক অদ্ভুত রূপকথার রাজ্যে, পিচের মতো ঘন কালো অন্ধকারের ভিতরে সমগ্র গির্জেটাই যেন দোলনার মতো দুলছে ধীরে ধীরে।

মাঝে মাঝে আমার মনে হত, গির্জেটা যেন একটা হ্রদের তলায় ঢাকা পড়ে আছে; দুনিয়া থেকে এমন ভাবে আড়াল পড়েছে যাতে অন্য সমস্ত জীবন থেকে আলাদা এক ভিন্ন রকমের জীবনযাত্রা এখানে চলতে পারে। বোধ হয় এ ধারণাটা এসেছে দিদিমার কাছে শোনা সেই গল্পের নগরী কিতেজ থেকে। উপাসনার গান, চাপা গলায় প্রার্থনার ফিস ফিস সুর—এই পরিবেশে যখন তন্দ্রায় দুলুনি আসে, তখন প্রায়ই মনে মনে আউড়ে যেতাম সেই সুরেলা করুণ গাথা:

তারপর এল সেই বর্বর তাতার দল,
এল অশ্বপৃষ্ঠে, সর্বাঙ্গ অস্ত্রে সজ্জিত;
সুন্দরী কিতেজগ্রাদ অবরুদ্ধ
ভোরের প্রার্থনার সেই শুভ মুহূর্তে...

হে বিশ্বের প্রভু,
হে পবিত্র মেরীমা!
ঈশ্বরের দাসানুদাসদের রক্ষা করো,
তাদের প্রার্থনা যেন শান্তিতে সমাপ্ত হয়,
তোমার বাক্য-সুধা যেন তারা পান করে তদ্গত বিনম্রতায়!
কলুষ হতে রক্ষা করো তোমার এই মন্দির,
রক্ষা করো কুমারীদের কৌমার্য,
নিষ্পাপ শিশুদের রক্ষা করো ঘাতকের কবল হতে,
আঘাত থেকে রক্ষা করো বৃদ্ধ আর অশক্তদের!
এই আকুল আর্তনাদে ঈশ্বরের আসন টলল,
উদ্দীপ্ত হলেন তিনি এই করুণ প্রার্থনায়,
পুণ্যাত্মা দেবদূত মিখাইলকে
ডেকে বললেন ভগবান জিহোবা:
মিখাইল, মর্তে অবতীর্ণ হও,
প্রবল ভূকম্পনে কম্পিত করো ঐ কিতেজগ্রাদ,
প্রবল জলরাশি এসে ঢেকে দিক তাকে,
আর ঈশ্বরের দাসানুদাসেরা যেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে
মগ্ন থাকে প্রাণভরা প্রার্থনায়,
সকাল থেকে সন্ধ্যায় — নিঃশঙ্ক চিত্তে
বছরের পর বছর — অনন্ত কাল ধরে!

মৌচাকে যেমন মধু ভরা থাকে এই সময়টা আমার অন্তরও তেমনি কানায় কানায় ভরপুর ছিল দিদিমার মুখের ছড়া ও কবিতায়; মনে হত আমার চিন্তাধারাও যেন তাঁর এই সব কবিতার ধাঁচেই রূপ নিত।

গির্জেয় গিয়ে কখনো আমি প্রার্থনা করি নি — দিদিমার ঈশ্বরের কাছে দাদুর সেই সব হিংসুক প্রার্থনা আর ঘেনর ঘেনর স্তোত্র আওড়াতে কেমন যেন সংকোচ হত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দিদিমার ঈশ্বরও ওগুলো ঠিক আমার মতোই অপছন্দ করেন, তাছাড়া ওগুলো বইতে ছাপা, তার মানে যে কোনো লেখাপড়া জানা লোকের মতোই ঈশ্বরেরও ওগুলো ভালো মুখস্থ আছে।

তাই যখনই আমার অন্তর কোনো সুমধুর বেদনায় আকুল হয়ে উঠত, কিংবা দিনান্তের ছোটখাটো ব্যথায় হত আহত, আমি নিজের প্রার্থনা নিজেই মনে মনে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করতাম। নিজের অদৃষ্টের কথা একটু ভাবতেই অনায়াসে আপনা থেকেই কথা তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসত।

কী অসুখী, হায় ভগবান, কী অসুখী হায়!
জোয়ান মরদ হতেম যদি হঠাৎ তোমার কৃপায়!
আত্মঘাতী হবার কথা মনে ভাবি আমি,
ক্ষমা করো, অনেক যে গো সয়েছি দিন-যামী।
শিক্ষাদীক্ষা কেউ দেবে না, কেউ দেবে না মোরে,
ঠাক্‌মার বোন ডাইনী বুড়ি ধমক দেবে জোরে,
কান দুটোকে আঁকড়ে ধরে টান লাগাবে আর
পথের কুকুর-সম যেন জীবনটা আমার।

সে দিনের নিজের তৈরী অনেক স্তোত্র আজও আমার মনে আছে। শিশুমনের প্রতিক্রিয়া এমন গভীর দাগ কেটে রেখে যায় যে জীবনের শেষ মুহূর্তটিতেও তা স্পষ্ট হয়ে থাকে।

ভারি আনন্দ লাগত আমার গির্জেয় যেতে। আগে মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে স্বস্তি পেতাম, এখন তেমনি গির্জেয় এসে নিঃশ্বাস ছাড়ার জায়গা পাই। আমার শিশুমন ইতিমধ্যেই ঘা খেয়েছে, জীবনের স্থূল রূঢ়তায় পোড় খেয়েছে, এখানকার অস্পষ্ট নিবিড় স্বপ্নে তা খানিকটা শান্তি পেত।

যে দিন দারুণ শীত পড়ত, বা প্রবল তুষার-ঝড় আকাশটাকে পর্যন্ত তুষার মেঘের ঘোমটার তলায় জমিয়ে দিয়ে শহরের বুকে দাপাদাপি করে ফিরত, ঝরা তুষারের স্তূপের নিচে মাটি উঠত জমে, মনে হত কোনো দিনও বুঝি আর মাটি দেখা যাবে না, ফুটে উঠবে না জীবনের চিহ্ন, সেই সব দিনই আমি গির্জেয় যেতাম।

আর রাত যেদিন শান্ত থাকত সেদিন শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করত। এপথ ওপথ করে খুঁজে বেড়াতাম নির্জন কোণাকান্‌চি। হাঁটতাম খুব জোরে, যেন পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলেছি; আকাশের চাঁদের মতোই সঙ্গিহীন, একাকী; বরফের বুকের আলোর ঝিলিমিলি মুছে দিয়ে আগে আগে ছুটে চলত আমার ছায়া। সে ছায়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে থাম আর বেড়ার গায়ের উপর দিয়ে পিছলে পিছলে এগিয়ে চলত। গায়ে ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে পথের মাঝখান দিয়ে কখনো কখনো আসত পাহারাওয়ালা, হাতে তার ঝুমঝুমি আর পাশে কুকুর।

তার বিরাট লম্বা-চওড়া শরীরটা দেখে মনে হত যেন একটা কুকুরের বাসা উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে সামনের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেছে অজানার দিকে আর বেচারী কুকুরটা তাকে অনুসরণ করছে বিব্রতের মতো।

কোনো কোনো দিন দেখা হত হাসিখুসি অল্প-বয়সী তরুণী মেয়েদের সঙ্গে, সঙ্গে তাদের প্রণয়ীরা। আর অমনিই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত করে বসতাম ওরাও সান্ধ্য উপাসনা থেকে পালিয়েছে।

মাঝে মাঝে আলোকোজ্জ্বল খোলা জানালার পথে ভেসে আসত হালকা অজানা গন্ধ, যেন এক অপরিচিত অচেনা জগতের আভাস আনত বয়ে। সেই জানালার নিচে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ নিতাম আর ভাবতে চেষ্টা করতাম, বুঝতে চেষ্টা করতাম কী ধরনের মানুষজন থাকে সেখানে, কেমনই বা তাদের জীবন? যে সময়টায় সমস্ত গণ্যমান্য লোকদের সান্ধ্য উপাসনায় থাকার কথা, তখন ওরা এখানে হাসছে, গল্প করছে, এক অদ্ভুত ধরনের গিটার বাজাচ্ছে, জানালার পথে ভেসে আসছে তার সুমধুর সুর।

আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল বিশেষ করে দুটো নির্জন রাস্তা তিখনভ্স্কায়া আর মার্তিনভ্স্কায়া যেখানে মিশেছে সেই মোড়ের নিচু একটা একতলা বাড়ি। শ্রোভটাইডের আগে যখন বরফ একটু ঘেমে ওঠে সেই সময়ে এক জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ এসে পড়ি বাড়িটার সামনে। খোলা জানালার পথে গরম বাষ্পের সঙ্গে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত সুর, যেন খুব শক্তিশালী আর ভালো মানুষ গোছের এক লোক মুখ বুজে সুর ভেঁজে চলেছে। কথাগুলো অস্পষ্ট, কিন্তু গানটা যেন খুবই পরিচিত, বোধগম্য, যদিও কী যেন একটা তারের যন্ত্র বিরক্তিকর ভাবে বাধা দিচ্ছিল গানটার সাবলীল গতিপ্রবাহে আর তাই ভালো করে শুনতে পারছিলাম না। একটা খোঁটার উপরে বসে পড়লাম, ভাবলাম সুরটা নিশ্চয়ই কোনো অদ্ভুত আর অসহ্য জোরাল বেহালার — শুনতেও বুঝি কষ্ট হয়। এক এক সময়ে এত জোরে বেজে ওঠে মনে হয় যেন সমস্ত বাড়িটা কাঁপছে, জানালার কাঁচগুলো বেজে উঠছে ঝন ঝন করে। বরফ গলে ঝরে ঝরে পড়ছে ছাদ বেয়ে, আর আমার দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে চোখের জল।

ধাক্কা মেরে আমাকে খোঁটাটার উপর থেকে ফেলে দেয়ার আগে পর্যন্ত টের পাই নি পাহারাওয়ালা এসেছে।

'এখানে ঘুর ঘুর করছিস কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ঐ বাজনা,' বললাম বুঝিয়ে।

'কী হয়েছে তাতে? দূর হ এখান থেকে...'

তাড়াতাড়ি করে পাড়াটা ঘুরে আবার বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু ততক্ষণে বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, হালকা খুশির ঝলক ভেসে ভেসে

আসছে জানালার পথে। কিন্তু আগের সেই ব্যথাভরা করুণ সুরের সঙ্গে মিল এতো কম যে মনে হল সে সুর বুঝি শুনেছিলাম স্বপ্নে।

প্রায় প্রত্যেক শনিবারই ঐ বাড়িটার সামনে আসতাম, কিন্তু আর একটি দিন শুধু শুনতে পেয়েছিলাম সেই চেলো'র বাজনা। তখন বসন্তকাল, সে দিন দুপুর রাত পর্যন্ত একটানা চলেছিল সেই বাজনা; বাড়িতে ফিরে মার খেয়েছিলাম।

শীতের তারাভরা আকাশের তলায় শহরের নির্জন পথে ঘুরে ঘুরে প্রচুর সম্পদ আহরণ করলাম। ইচ্ছে করেই বেছে নিতাম শহরতলীর পথ: বড়ো রাস্তায় অনেক আলো, হঠাৎ মনিবদের কোনো বন্ধুবান্ধব দেখে ফেললে তারা জানতে পারবে আমি সান্ধ্য উপাসনায় যাই নি। তাছাড়া সদর রাস্তায় মাতাল, বেশ্যা, পুলিস আমার বেড়ানোটাই মাটি করে দেবে। কিন্তু দূরের রাস্তায় একতালার জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় অনেক কিছু, অবশ্য যদি পর্দা ফেলা না থাকে বা পলা পড়ে ঢেকে না যায়।

এই সব জানালার পথে বহু দৃশ্যই দেখেছি: দেখেছি প্রার্থনা করতে, চুমু খেতে, মারপিট করতে, তাস খেলতে, শব্দহীন গভীর আলোচনা চালিয়ে যেতে। চোখের সামনে দিয়ে মাছের ঝাঁকের মতো চলে যেত বিচিত্র নির্বাক দৃশ্যাবলী -- যেমন বায়স্কোপে দেখা যায়।

একদিন এমনি একটা একতালার জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম দুটি মহিলাকে -- একটির বয়েস খুবই কম, আর একটি ওর চাইতে একটু বড়ো। ওরা বসে রয়েছে একটা টেবিলের সামনে। ওদের মুখোমুখি বসে একটি লম্বা চুল ছাত্র। নানান ভঙ্গি করে কী একখানা বই থেকে ওদের পড়ে শোনাচ্ছে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে কম বয়সের মেয়েটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে, কঠিন রেখায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠছে। বড়ো মেয়েটি খুবই রোগা, চুলগুলো ফাঁপানো; হঠাৎ মেয়েটি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল। ছাত্রটি বইটা রেখে দিল হাত থেকে; ছোট মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ছাত্রটি ফাঁপানো চুল মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর দুটো হাত চুমোয় চুমোয় ভরে দিতে লাগল।

আর একদিন একটা জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম বিরাট দেহ লম্বা চওড়া দাড়িওয়ালা একজন লোক লাল-ব্লাউজ পরা একটি মেয়েমানুষকে কোলে বসিয়ে ছোট ছেলের মতো দোল দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি গান করছে, কারণ ওর মুখটা থেকে থেকে হাঁ হচ্ছিল, চোখ দুটো ঘুরছিল।

খিল খিল করে হেসে মেয়েটি পা দুটো শূন্যে ঝট পট করতে করতে ওর হাতের উপরে লুটিয়ে পড়ছিল। মেয়েটিকে আবার টেনে তুলে গান গাইছিল লোকটি আর মেয়েটিও তেমনি হাসছিল। বহুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওদের, তারপর চলে গেলাম; বুঝলাম ওদের এ ফুর্তি চলবে রাতভোর।

এমনি কতো না দৃশ্য আজীবনের জন্যে ছাপ রেখে গেছে আমার স্মৃতিতে। প্রায়ই এই সব দৃশ্য খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত, ফলে মনিবদের মনে সন্দেহ জাগত। তারা জিজ্ঞেস করত:

'কোন গির্জেয় গিয়েছিলি? কোন পুরুত স্তোত্র পড়াল?'

শহরের সমস্ত পুরুত ওদের চেনা আর বাইবেলের কোন অধ্যায় পড়া হচ্ছে তা-ও জানা; আমার মিথ্যে কথা ধরে ফেলতে ওদের দেরি হত না।

মহিলারা দুজনেই পুজো করে দাদুর ভগবানকে — ভয় দেখিয়ে, দুঃখ দিয়ে সে ঈশ্বর পুজো দাবি করেন। তাঁর নাম সবসময়েই লেগে আছে ওদের ঠোঁটের ডগায় এমন কি ঝগড়ার সময়ও।

'দাঁড়া না, ভগবান তোকে কি শাস্তি দেন দেখিস, তোর গায়ের মাংস কুঁচকে যাবে, খানকী!' দুজন দুজনকে শাসাত।

লেণ্ট পর্বের প্রথম রবিবার বুড়ো গিন্নী পিঠে ভাজছিল, কিন্তু তা কড়া থেকে উঠছিল না, লেগে লেগে যাচ্ছিল।

'জাহান্নামে যা!' রেগে মেগে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি; আগুনের আঁচে তার মুখটা ফুলে উঠেছে।

তারপর হঠাৎ কড়াটা শুঁকেই ওর মুখটা কালো হয়ে উঠল। মেঝের উপরে কড়াটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল:

'হায় রে কপাল, কড়ায় যে চর্বি লেগে রয়েছে! পবিত্র সোমবারে নোংরা পুড়িয়ে ফেলতে ভুলে গেছি!'

হাঁটু গেড়ে বসে সজল চোখে মিনতি করতে লাগল:

'হে প্রভু, পাপ করে ফেলেছি, ক্ষমা করো! তুমি করুণাময়, আমার মতো নির্বোধ বুড়িকে শাস্তি দিও না! হে ভগবান!'

নষ্ট পিঠেগুলো দেয়া হল কুকুরকে, কড়াটা পুড়িয়ে নেয়া হল, কিন্তু এর পর থেকে ছোট গিন্নী যখন-তখনই বুড়িকে খোঁটা দিত।

'লেণ্ট পর্বের সময়ে আপনি তো অমাজা কড়াতে পিঠে ভেজেছেন!' ঝগড়া হলেই শুনিয়ে দিত বৌ।

প্রতিটি সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও ওরা ঈশ্বরকে টেনে আনত, টেনে আনত ওদের অপরিসর জীবনের অন্ধকার কোণে। হয়ত মনে করত এতে ওদের দুর্ভাগা জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, যেন প্রত্যেকটি মুহূর্তে ওরা ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনায় ব্যয় করছে। তুচ্ছতম ব্যাপারেও ভগবানকে টেনে আনার এ অভ্যেসটা আমাকেও চেপে ধরল, নিজের অজ্ঞাতেই চোখ পড়ত কোণের দিকে, মনে হত কোনো এক অদৃশ্য চোখের দৃষ্টি যেন আমার উপরে নিবদ্ধ। রাত্রে ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসত; রান্নাঘরের কোণে যেখানে আইকনের সামনে জ্বলছে অনির্বাণ দীপ, ভয়টা যেন সেখান থেকেই আসত।

আইকনের আসনের পরেই একটা বড়ো জানালা, মাঝখানে লম্বালম্বি কাঠ দিয়ে ফ্রেমটা আলাদা করা। জানালার বাইরে বিরাট নীল শূন্য, মনে হত যেন এই বাড়ি, এই রান্নাঘর সমস্ত কিছু মায় আমি সেই শূন্যের কিনারে ঝুলে রয়েছি। বুঝিবা একটু নড়লে চড়লেই আমরা দ্রুতবেগে নক্ষত্রমণ্ডল ছাড়িয়ে সেই তুহিন শীতল অতল নীল মহাশূন্যের মৃত্যু নিথর স্তব্ধতার ভিতরে তলিয়ে যাব, যেমন করে জলের ভিতরে ঢিল ছুঁড়লে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে নিথর হয়ে পড়ে থাকতাম বিছানায়, নড়তে চড়তে ভয় করত, অপেক্ষা করে থাকতাম পৃথিবীর ভয়ংকর শেষ দিনটির জন্যে।

কি করে যে সে ভয় কাটিয়ে উঠেছিলাম তা আজ আর মনে নেই, কাটিয়ে যে উঠেছিলাম তা ঠিক, আর অল্প দিনের ভিতরেই। স্বভাবতই দিদিমার করুণাময় ঈশ্বর সাহায্য করেছিলেন আমাকে। তাছাড়া মনে হয় তখনো একটি সহজ সত্য সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম: কোনো অপরাধ আমি করি নি, আর যদি নির্দোষই হই তবে কোনো আইনেই আমি শাস্তি পেতে পারি না, অন্যের পাপের জন্যে আমাকে কেউ দায়ী করতে পারে না।

সকালের উপাসনা সভা থেকে পালিয়ে যেতাম বিশেষ করে বসন্তকালে। পুনরুজ্জীবিত প্রকৃতির এক দুর্নিবার শক্তি আমাকে গির্জা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত। তার উপরে যদি সাত কোপেক পেতাম বেদীর উপরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবার জন্যে, তবে তো কথাই ছিল না। ঐ সাত কোপেকে হাড়ের ঘুঁটি কিনে উপাসনার গোটা সময়টা খেলে কাটিয়ে দিতাম। ফলে অনিবার্য ভাবেই বাড়ি ফিরতে দেরি হত। একদিন তর্পণের জন্যে রুটি আর দশটা কোপেক আমি বেমালুম উড়িয়ে দিলাম, ফলে ছোট ধর্মযাজক

যখন বেদীর উপর থেকে প্রসাদী রুটির থালা নিয়ে এল, থালার উপর থেকে অন্যের একখানা রুটি তুলে নিয়ে চলে এলাম।

খেলার দিকে দারুণ ঝোঁক ছিল আমার আর খেলতেও পারতাম অক্লান্ত। গায়ে ছিল যেমন জোর আর তেমনি উদ্দীপনা; ফলে অল্প দিনের ভিতরেই বল, হাড়ের ঘুঁটি আর স্কিট্‌ল্‌ খেলায় গোটা পাড়ায় আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

লেণ্ট পর্বের সময়ে দীক্ষার জন্যে তৈরী হতে হল আমাকে; আমাদের প্রতিবেশী দরিমেদন্ত পক্রোভস্কি নামে এক পুরুতের কাছে গেলাম পাপ স্বীকারের জন্যে। আমার ধারণা ছিল লোকটা খুব কড়া মেজাজের। তাছাড়া তাঁর উপরে আমি যে সব অন্যায় কাজ করেছি তা সবই তিনি জানেন: ওঁর গ্রীষ্মাবাসের ক্ষতি করেছি ঢিল ছুঁড়ে, মারামারি করেছি ওঁর ছেলেদের সঙ্গে, এমন আরো অনেক কিছু করেছি যার জন্যে ওঁর কুনজরে পড়াটাই সম্ভব। যখন ওঁর ছোট জীর্ণ গির্জেয় দাঁড়িয়ে পাপ স্বীকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন সব কথাই আমার মনে পড়তে লাগল, দারুণ অস্বস্তিতে ধড় ফড় করছিল বুকটা।

পুরুত দরিমেদন্ত খুব সহৃদয় অনুযোগ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

'আরে, আমাদের পড়শী যে!' খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বেশ হাঁটু গেড়ে বসো! বলো কী পাপ করেছ?'

এক টুকরো মোটা মখমলের কাপড় দিয়ে তিনি আমার মাথাটা ঢেকে দিলেন, মোম আর ধুনোর গন্ধে দম আটকে আসছে। যে কথা বলতে চাই তা বলা যেন আরো কঠিন হয়ে উঠল।

'তুমি গুরুজনের আদেশ পালন করো?'

'না।'

'বলো, আমার হৃদয়ে পাপ!'

কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেলাম যখন আপনা থেকেই বলে উঠলাম: 'তর্পণের রুটি চুরি করেছিলাম।'

'কী বলছ? কোথায়?' একটু ভেবে নিয়ে ধীরেসুস্থে জিজ্ঞেস করলেন পুরুত।

'তিন সাধুর গির্জায়, পক্রোভ ক্যাথিড্রালে, নিকোলা...'

'বটে, বটে, সবগুলি গির্জেতেই করেছ বলছ — খুবই অন্যায় কাজ করেছ, বাছা। পাপ, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বলো, আমার আত্মায় পাপ, বোকা ছেলে! খাবার জন্যে চুরি করেছিলে বুঝি?'

'কোনো দিন খাবার জন্যে, কোনো দিন বা হাড়ের ঘুঁটি খেলায় পয়সা নষ্ট করে। কিন্তু বাড়িতে তো প্রসাদী রুটি আনতে হবে, তাই চুরি করে আনতাম...'

পুরুত দরিমেদন্ত অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর আরো কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন:

'গোপন ছাপাখানায় ছাপা কোনো বই পড়েছ?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম:

'কি?'

'নিষিদ্ধ বই পড়েছ কখনো?'

'না, পড়ি নি...'

'ঠিক আছে, তোমার সব পাপ মাপ হয়ে গেল... উঠে দাঁড়াও!'

অবাক হয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, মুখখানা তাঁর চিন্তামাখা কেমন সহৃদয়। মনে মনে লজ্জা হচ্ছিল আমার: পাপ স্বীকারে পাঠাবার সময়ে আমার মনিবগিন্নীরা আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে অনেক কিছু বলেছিল যাতে সবকিছু স্বীকার করি।

'আপনার গ্রীষ্মাবাসে ঢিল ছুঁড়েছিলাম আমি,' বললাম।

পুরুত মুখ তুলে বললেন:

'সেটাও অন্যায়! যাও, এখন চলে যাও...'

'আর কুকুরটাকেও...'

আমার দিকে আর ফিরে না তাকিয়েই ডাকলেন:

'পরের জন!'

ক্ষুব্ধ হলাম মনে মনে: মনে হল ঠকিয়েছে আমাকে। স্বীকারোক্তির চিন্তা আমার সমস্ত শিরায় শিরায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিছুই হল না, এতটুকুও আগ্রহের ব্যাপার নয়! একমাত্র আগ্রহের ব্যাপার হল ঐ প্রশ্নটা — ঐ রহস্যজনক বইগুলোর কথা; মনে পড়ল সেই একতলার ঘরে মেয়েদুটির সামনে ছাত্রটির বই পড়ার কথা, মনে পড়ল সেই 'বাঃ বেশ' লোকটির কথা — তারও অমনি অনেক দুর্বোধ্য ছবিওয়ালা মোটা মোটা কালো মলাটের বই ছিল।

পরের দিন পনেরোটা কোপেক দিয়ে আমাকে গির্জার অনুষ্ঠানে পাঠানো হল। সেবার ইস্টার এসেছিল দেরিতে, আগেই বরফ গলে গিয়েছিল, শুকনো পথের বুকে অল্প অল্প ধুলো জমে উঠেছে; রোদভরা খড়খড়ে দিন।

গির্জার দেয়ালের কাছে কয়েকজন মজুর মিলে মহা উৎসাহে হাড়ের ঘুঁটি খেলছিল। ভাবলাম, না হয় একটু দেরি করেই যাব উপাসনা সভায়।

'খেলতে নেবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'খেলতে হলে এক এক কোপেক দান,' মুখে বসন্তের দাগ, লালচুল একটা লোক বলল জাঁক দেখিয়ে।

জবাবে আমিও তেমনি জাঁক দেখিয়েই বললাম:

'বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় জোড়া ঘুঁটিতে দান রাখছি তিন কোপেক!'

'দেখি পয়সা!'

খেলা শুরু হল!

ভাঙিয়ে এনে তিনটে কোপেক রাখলাম দুটি ঘুঁটির নিচে। যে ফেলতে পারবে এই ঘুঁটিজোড়া, সেই পাবে পয়সা। বরাত ভালো আমার: লক্ষ্য করে দুজনে ঘুঁটি ছুঁড়ল, দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল — মানে, আমি ছ'কোপেক জিতে গেলাম. আর জিতলাম কিনা আমার চাইতে অনেক বড়োদের কাছ থেকে। ফলে আমার বুকটা দশহাত হয়ে উঠল।

'ওর দিকে নজর রাখিস, নইলে জিতের পয়সা নিয়ে ভেগে যাবে...' কে একজন খেড়ু বলে উঠল।

এতে রাগ হল আমার।

'বাঁ দিকের ঘুঁটির শেষ জোড়ায় ন'কোপেক!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম।

আমার গোঁয়ার্তুমী খেড়ুদের উপরে তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করল না, শুধু আমার বয়সী একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'ওর দিকে লক্ষ্য রাখিস! তার কপাল ভালো! আমি ওকে চিনি।'

'কী বললি? হুম, বেশ দেখা যাক...' রোগা দোহারা চেহারার একটি মজুর বলল। গায়ের গন্ধে মনে হয় লোকটা ফারকারবারী।

খুব সতর্কতার সঙ্গে আমার ঘুঁটি তাক করে ফেলে দিল।

'এবার কেমন?' আমার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'ডান দিকের শেষ ঘুঁটিতে তিন কোপেক!' জবাবে বললাম।

'তাও জিতে নেব,' বুক ফুলিয়ে জবাব দিল ফারকারবারী, কিন্তু পারল না, ওর তাক ফসকে গেল।

পরপর তিনবারের বেশি ঘুঁটির নিচে দান ধরার নিয়ম নেই। অন্যের ধরা দানের উপরে খেলতে লাগলাম: চার কোপেক জিতলাম আর অনেক ঘুঁটি। কিন্তু পরে যখন আবার আমার দান ধরার পালা এল যা কিছু পয়সা ছিল সব হারলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই উপাসনা সভা ভাঙল। ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে, বেরিয়ে আসছে লোকজন গির্জা থেকে।

'কি হে, মজা টের পেয়েছ তো!' বলতে বলতে আমার চুলের মুঠি ধরার জন্যে এগিয়ে এল ফারকারবারী। কিন্তু আমি ঝট্‌কা মেরে ছুটে পালিয়ে গেলাম। রবিবারের পোশাক-পরা একটি ছেলেকে ধরলাম রাস্তায়; খুব নম্র ভাবে জিজ্ঞেস করলাম:

'উপাসনা সভা থেকে আসছেন তো?'

'যদি এসেই থাকি তো হয়েছে কি?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

জিজ্ঞেস করলাম কেমন হল উপাসনা, কি বললেন পুরুত, কোন পুরুত উপাসনা করালেন।

মাথা নিচু করে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা:

'বটে! তার মানে তুই উপাসনা সভা থেকে পালিয়েছিস, তাই না রে ব্যাটা নাস্তিক? কিচ্ছু বলব না আমি তোকে! বাপ ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দিন, ঠিক হবে!'

ছুটে বাড়ি চলে গেলাম; নিশ্চয়ই জানতাম গেলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ধরে ফেলবে আমি যাই নি গির্জায়।

কিন্তু আমাকে অভিনন্দিত করার পরে বুড়ি শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করল:

'ছোট পুরুতকে কতো দিলি?'

'পাঁচ কোপেক,' মুখের ডগায় যা এল বলে দিলাম।

'তিন কোপেক দিলেই ঢের হত! দু কোপেক তাহলে থাকত তোর, হাঁদারাম!'

...বসন্তকাল। প্রতিটি নতুন দিন আসে আগের দিনের চাইতে নতুন নতুন পোশাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে, আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি উজ্জ্বল। কচি ঘাস আর বার্চের সবুজ পাতা থেকে ভেসে আসে মাতাল করা গন্ধ, অসহ্য ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যাই, মাঠের ভিতরে উষ্ণ মাটির বুকে চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি ভরত-পাখির গান। কিন্তু তার বদলে এখানে বসে বসে

শীতের জামা-কাপড়, গরম পোশাক ঝাড়তে হচ্ছে আর সেগুলো ভাঁজ করে বাক্সে তুলে রাখার কাজে যোগান দিচ্ছি; গুঁড়ো করছি তামাক পাতা, ঝাড়ছি ঘরদোরের ধুলো — অনাবশ্যক নোংরা কাজে খেটে মরছি সকাল সন্ধ্যা।

বিশ্রামের সময়ে যে কিছু করব তারও উপায় নেই। আমাদের নিরানন্দ নোংরা রাস্তায় নেই কোনো আকর্ষণ, তার বাইরেও পা বাড়াতে দেয় না আমাকে; উঠোন-ভর্তি ক্লান্ত, খিটখিটে মেজাজের গর্ত-খোঁড়ার দল, রুক্ষ চেহারার রাঁধুনী আর ধোপানীদের জটলা; রোজ সন্ধ্যায় চলে লুচ্চামি। আমার কাছে সব এত কুৎসিত, এত জঘন্য মনে হত যে ইচ্ছে করত অন্ধ হয়ে যাই।

খানিকটা রঙিন কাগজ আর একটা কাঁচি নিয়ে চলে যেতাম চিলেকোঠায়। ঝালর কেটে কেটে সাজাতাম কড়ি-বর্গা। তাতে অন্তত সেই একঘেয়ে নিদারুণ বিরক্তি খানিকটা হালকা হয়ে আসত। এক অদম্য ইচ্ছে পেয়ে বসত আমাকে, ছুটে এমন কোথাও পালিয়ে যাই যেখানে মানুষ অনেক বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয় না, ঝগড়া করে কম, প্রতিমুহূর্তে নালিশ অভিযোগের স্রোত ঢেলে দেয় না ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, কিংবা তীক্ষ্ন মন্তব্যে খোঁচা দেয় না লোককে:

...ইস্টারের আগের শনিবার ওরানস্কি মঠ থেকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভ্লাদিমিরস্কায়া পবিত্র মাতার আইকন নিয়ে আসা হল আমাদের শহরে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পবিত্র মাতার আইকন থাকবে এ শহরের অতিথি হয়ে, আর এই সময়ের ভিতরে গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেকের বাড়ি যাবে।

হপ্তা-দিনে এক সকালে আমার মনিব-বাড়িতে আনা হল সেই আইকন। আমি তখন পিতলের জিনিসপত্র ঘসামাজা করছিলাম। শুনলাম, পাশের ঘর থেকে মনিব-গিন্নী সভয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'ছুটে যা, সদর দরজা খুলে দে! ওরান্স্কায়ার পবিত্র মাতার আইকন নিয়ে এসেছে!'

চর্বি আর ইটের গুঁড়ো মাখানো নোংরা হাতেই ছুটে নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

দরজার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণ এক সন্ন্যাসী, এক হাতে একটা লণ্ঠন আর এক হাতে ধুনচি।

'বড্ডো দেরি দোর খুলতে,' সন্ন্যাসী গজ গজ করে উঠল, 'এসো হাত লাগাও...'

শহরবাসী দুজন লোক ভারি আইকনকে সরু সিঁড়ি দিয়ে বয়ে উপরে

নিয়ে এল। কোণের দিকে কাঁধ লাগিয়ে নোংরা হাতে ধরেই সাহায্য করলাম ওদের। পিছনে পিছনে মোটা সোটা কয়েকজন সন্ন্যাসী বিরক্তিভরা হেঁড়ে গলায় স্তোত্র পড়তে পড়তে থপ্ থপ্ করে উপরে উঠল:

'হে পবিত্র মাতা, আমরা প্রার্থনা করি তোমার মধ্যস্থতা...'

'হয়ত নোংরা হাতে ধরেছি বলে পবিত্র মাতা আমার হাত দুটো নুলো করে দেবেন...' আমি ভাবছিলাম ভয়ে ভয়ে।

ঘরের কোণের দিকে দুটো চেয়ার পেতে পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে তার উপরে রাখা হল আইকন। দুপাশ থেকে দুটি তরুণ সন্ন্যাসী আইকনটি ধরে রয়েছে, সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল চোখ, চুলগুলো ফাঁপানো, হাসি হাসি মুখ, যেন দুটি দেব-দূত।

শুরু হল উপাসনা।

'হে সৌভাগ্যবতী ঈশ্বর জননী...' চুলের ঝোপের ভিতরে শুকনো ফোলা ফোলা কানে লালচে আঙুল দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে সিরসিরে গলায় গেয়ে চলল মোটা পুরুত!

'হে পবিত্র মাতা! তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ করো আমাদের উপরে,' ক্লান্ত গলায় গেয়ে চলল সন্ন্যাসীরা।

পবিত্র মাতাকে আমি ভালোবাসতাম। দিদিমার মুখে শুনেছি তিনিই পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলেছেন ফুলে পুষ্পে, আনন্দে; ভরিয়ে তুলেছেন যা কিছু সুন্দর সব কিছু দিয়ে গরিবদের সান্ত্বনা দিতে। তারপর যখন চুম্বন করার সময় এল, বড়োরা কেমন করে চুম্বন করল তা না দেখেই আমি কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে পবিত্র মাতার আইকনের মুখে ঠোঁট চেপে ধরলাম।

কার যেন একটা বলিষ্ঠ হাত আমাকে ধাক্কা দিয়ে দরজার ওপাশে কোণের দিকে ঠেলে ফেলে দিল। আইকন নিয়ে সন্ন্যাসীরা কখন চলে গিয়েছিল জানি না, শুধু মনে আছে মেঝের উপরে যেখানে আমি বসেছিলাম, সেখানে আমাকে ঘিরে মনিব, মনিব-গিন্নী দুশ্চিন্তায় আলোচনা করছিল আমার কপালে কী আছে তাই নিয়ে।

'পুরুতকে গিয়ে বলতে হবে, এ সব ব্যাপার আমাদের চাইতে তিনিই ভালো বোঝেন। ওরে মূর্খ!' মৃদু ভর্ৎসনাভরা সুরে বলল মনিব, 'এটুকুও জানিস না যে পবিত্র মাতার ঠোঁটে চুমো খেতে নেই? ইস্কুলে পড়ে খুব শিক্ষা পেয়েছিস যা হোক!'

বহুদিন পর্যন্ত চোরের মতো ভয়ে ভয়ে কাটল। প্রথমত আমি নোংরা

হাতে পবিত্র মাতার আইকন ধরেছি, তারপর অন্যায় ভাবে চুমো খেয়েছি। নিশ্চয়ই এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে, নিশ্চয়ই এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে!

কিন্তু বাহ্যত দেখা গেল পবিত্র মাতা আমার সেই ভালোবাসা বশতঃ অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষমা করেছেন। নয়ত তাঁর দেয়া শাস্তি এতই লঘু যে কখন যে আমার অজ্ঞাতেই এই সব ভালো মানুষদের হাতের ঘন ঘন প্রহারের ভিতর দিয়ে সেটা শেষ হয়ে গেছে তা জানতেও পারি নি।

মাঝে মাঝে বুড়িটাকে খেপাবার জন্যে নিরীহ ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলতাম:

'মনে হচ্ছে পবিত্র মাতা আমাকে শাস্তি দিতে ভুলে গেছেন...'

বুড়ি বলত:

'একটু রোস্, সময় যায় নি এখনো!'

...চায়ের প্যাকেটের লাল কাগজ, টিনের পাত, পাতা, আরো টুকিটাকি সব জিনিসের ঝালর কেটে কড়ি-বর্গা সাজাতে সাজাতে মাথায় যা আসত তাই দিয়ে পদ্যও বানাতাম আর কালমীকেরা যেমন ঘোড়ার পিঠে চড়ে পথ চলতে চলতে গান গায় সেইভাবে গাইতাম গির্জার সুরে:

আবার বসি এসে
চিলেঘরেই শেষে,
কাগজ কুচোই আর
মোমবাতিটা জ্বালাই বার বার।
হতাম যদি কুকুর
ছুট লাগাতাম দূর —
হেথায় অবিরাম
উঠতে বসতে সবাই বলে
চোপ রও হাঁদারাম।

বুড়ি আমার সেই ঘর সাজানো দেখে মাথা নেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল:

'রান্নাঘরটা অমন করে একটু সাজা না কেন?'

একদিন মনিব এল চিলেকোঠায়। আমার হাতের কাজ দেখল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল:

'ধুত্তোরি সব! তুই একটা অদ্ভুত ছেলে পেশকভ! কী যে হবি তুই, তাই ভাবি... যাদুকর কী বলিস, অ্যাঁ? বলা যায় না কিছুই...'

তারপর আমার হাতে প্রথম নিকোলাইয়ের আমলের একটা পাঁচ কোপেক গুঁজে দিল।

খুব সরু একটু তার দিয়ে সেটাকে সাজিয়ে মেডেলের মতো করে আমার সেই কারুশিল্পের মাঝখানে সবচেয়ে ভালো জায়গায় ঝুলিয়ে দিলাম।

কিন্তু পরের দিন দেখা গেল সাজ-শুদ্ধু পয়সাটা হাওয়া হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে বুড়িটাই চুরি করেছে।

৫

অবশেষে বসন্তকালে একদিন পালিয়েই গেলাম। সেদিন সকালে প্রাতরাশের জন্যে রুটি কিনতে গিয়ে দেখি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে রুটিওলা একটা ভারি বাটখারা ছুঁড়ে মেরেছে তার কপালে। বৌটা ছুটে গিয়ে রাস্তার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; ভিড় জমে উঠল। সবাই ধরাধরি করে ওকে একটা গাড়ির উপরে শুইয়ে নিয়ে চলল হাসপাতালে। আমিও চললাম গাড়ির পিছু পিছু। তারপর দেখি নিজের অজ্ঞাতেই কেমন করে যেন পৌঁছে গেছি ভলগার পারে। হাতের মুঠোয় বিশ কোপেক পয়সা।

বসন্তের দিন যেন কোমল হাসিতে ভরে উঠেছে। দূরপ্রসারী ভলগা বান ডেকে বয়ে চলেছে কূল ছাপিয়ে। বিশাল বিস্তীর্ণ মাটির বুকে জেগে উঠেছে সতেজ জীবন। এমন দিনে আজ সকাল পর্যন্তও আমি কিনা ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে ছিলাম। ঠিক করলাম মনিব বাড়ি আর ফিরব না। কুনাভিনোয় দিদিমার কাছেও ফেরা চলবে না, কথা দিয়ে কথা রাখি নি বলে তাঁর কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল। তাছাড়া ফিরে গেলে দাদু তাই নিয়ে মত্ত হয়ে উঠবেন।

নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ালাম দু-তিন দিন। জাহাজের দরদী খালাসীরা খেতে দিত। রাত্রে ওদেরই সঙ্গে ঘুমোতাম জেটির উপরে। একদিন একজন খালাসী বলল:

‘এমনি করে ঘুর ঘুর করে তো কোনো লাভ হবে না, খোকা! ‘দবরি’ জাহাজে যা না কেন? ওরা থালা বাসন ধোয়ার লোক খুঁজছে।’

গেলাম। লম্বা চেহারার দাড়িওয়ালা এক স্টুয়ার্ড চশমা-পরা ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে।

‘মাস মাইনে দু’রুবল,’ শান্ত গলায় সে জানাল, ‘পাসপোর্ট আছে?’

পাসপোর্ট ছিল না। একটু ভাবল স্টুয়ার্ড। তারপর বলল:

'যা, তোর মাকে নিয়ে আয় গে।'

ছুটে চলে গেলাম দিদিমার কাছে। আমার এ কাজে তিনি সায় দিলেন। দাদুকে ডেকে বললেন সরকারী শ্রম-অফিসে গিয়ে আমার জন্যে পাসপোর্ট যোগাড় করে আনতে। তিনি নিজেই জাহাজ পর্যন্ত এলেন আমার সঙ্গে।

'বেশ,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল স্টুয়ার্ড, 'আয় তাহলে।'

জাহাজের গলুইয়ের দিকে নিয়ে গেল আমাকে। সাদা কোট আর সাদা টুপি-পরা লম্বা-চওড়া একটি লোক টেবিলে বসে চা খেতে খেতে মোটা সিগারেট টানছিল। আমাকে তার সামনে একটু ঠেলে এগিয়ে দিল স্টুয়ার্ড:

'বাসন মাজার লোক।'

বলেই সে ফিরে চলে গেল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল বাবুর্চি। কালো গোঁফজোড়া তার কাঁটা দিয়ে উঠল পিছন থেকে স্টুয়ার্ডকে লক্ষ্য করে হাঁক দেবার সময়:

'সস্তায় পেলে শয়তানকেও তুই বহাল করবি, তা জানি!' ছোট ছোট করে ছাঁটা কালো চুলে ভরা মাথাটা রাগে ঝটকা মেরে পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে কালো চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর গাল ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'কে তুই?'

লোকটাকে আদৌ ভালো লাগল না আমার। সাদা ধবধবে পোশাক পরিচ্ছদ সত্ত্বেও কেমন যেন নোংরা দেখতে। আঙুলগুলো রোমশ। লম্বা লম্বা চুল গজিয়েছে বড়ো বড়ো দুটো কান ছেয়ে। বললাম:

'খিদে পেয়েছে আমার।'

চোখ পিট পিট করে তাকাল। দেখতে দেখতে ওর মুখের সেই রুক্ষ ভয়ংকর চেহারা বদলে গেল। লাল লাল দুটো গালে ঢেউ খেলিয়ে ফুটে উঠল দরাজ হাসি। ঘোড়ার মতো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। গোঁফজোড়া নুয়ে পড়ল নরম হয়ে। মোটা সোটা ভালোমানুষ গোছের গৃহিণীর মতোই দেখাচ্ছিল ওকে।

বাকি চা-টা নদীতে ছিটিয়ে নিজের গ্লাসে টাটকা চা ঢেলে একখানা রুটি বড়ো একটুকরো সসেজের সঙ্গে ঠেলে দিল আমার দিকে।

'নে, চালা। বাপ-মা আছে? চুরি করতে জানিস? চিন্তা নেই, এখানে সবাই চোর— দুদিনেই ঠিক তালিম দিয়ে নেবে'খন!'

যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠল। দাড়ি কামানোর জন্যে ফুলো ফুলো গাল দুটো নীল হয়ে উঠেছে। নাকের কাছের মাংসের উপরে ছেয়ে রয়েছে জালি জালি উপশিরা। গোঁফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা ফুলো ফুলো লালচে নাক আর নিচের পুরু ঠোঁটটা যেন ঘৃণায় ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে ধোঁয়াচ্ছে একটা সিগারেট। দেখে মনে হয় এক্ষুণি ফিরে এসেছে স্নানাগার থেকে। কারণ ওর গায়ে বার্চ পাতা আর মরিচের ব্রান্ডির গন্ধ, গলা আর কপালের উপরে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে পরে হাতের ভিতরে একটা রুবল গুঁজে দিয়ে বলল:

'তোর নিজের জন্যে দুটো এপ্রন কিনে নিয়ে আয় গে, যা! আচ্ছা দাঁড়া, আমিই কিনে আনছি?'

টুপিটা ঠিক করে মাথায় বসিয়ে দিয়ে ভল্লুকের মতো থপ্ থপ্ করতে করতে হেলেদুলে ডেক থেকে নামতে লাগল লোকটা।

... রাত। উজ্জ্বল চাঁদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে জাহাজ ছেড়ে বাঁয়ের মাঠের দিকে ছুটে চলেছে। সাদা চক্কর দেওয়া কালো চিমনিওয়ালা আমাদের সেকেলে ধরনের বাদামী রঙের জাহাজটা ধীর অলস গতিতে রুপোলী জলের মধ্যে চাকা চালিয়ে এগচ্ছে মন্থর গমনে। কুঁড়েঘরের জানালার আলোর চুমকি বসানো তীরের ছায়া ধীরে জেগে উঠে এগিয়ে আসছে জাহাজটার নাগাল ধরতে। গাঁয়ের ভিতর থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। মেয়েরা আনন্দে গান গাইছে। তাদের গানের ধুয়া 'আইলুলি' শোনায় হাল্লেলুইয়ার মতো।

জাহাজটা লম্বা তারের দড়িতে একটা বজরা বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। বজরার রঙও বাদামী। তার পাটাতনের উপরে বড়ো একটা লোহার খাঁচা। খাঁচার ভিতরে নির্বাসন দণ্ডের ও কঠোর শ্রমের কয়েদী। গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে সান্ত্রী। মোমের আলোর মতো ঝিকমিক করছে তার হাতের বেয়নেট। ঘন নীল আকাশের বুকে তারাগুলোকেও দেখাচ্ছে ছোট ছোট মোমবাতির মতো। বজরার উপরের সবকিছুই নীরব, নিস্তব্ধ, চাঁদের আলোয় ভরা। লোহার খাঁচার গারদের ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল গোল ধূসর ছায়া। ওরা কয়েদী, ভলগার দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে রয়েছে। কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে জল। হয়ত বা কাঁদছে, হয়ত বা হাসছে ভীরু হাসি। সবকিছু ঘিরে জেগে উঠেছে কেমন যেন গির্জার আবহাওয়া। এমন কি তেলের গন্ধটাও যেন ধুনোর গন্ধের মতো।

বজরাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে গেল খুবই ছেলেবেলার কথা। সেই আস্ত্রাখান থেকে নিজনি নভগরোদ যাওয়া। মায়ের মুখোসের মতো ভাবলেশহীন মুখ। মনে পড়ল দিদিমাকে, এই কঠোর অথচ কৌতূহলভরা জীবনের পথে যিনি আমাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। দিদিমার কথা মনে পড়লেই ভুলে যাই জীবনের ঘৃণ্য কুশ্রীতার কথা। সবকিছুই যেন তখন বদলে যায়—সবকিছুই যেন মনে হয় আরো বেশি চিত্তাকর্ষক, আরো বেশি আনন্দময়। লোকজনকে যেন আরো ভালো লাগে, আরো ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়।

রাত্রের সৌন্দর্যে আমার চোখে জল ভরে আসে। ঐ বজরাটার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি। কফিনের মতো দেখতে স্রোতস্বতী নদীর এই বিশাল বিস্তীর্ণ বুকের উপরে, এই ধ্যানমগ্ন নিরালা উষ্ণ রাতে দারুণ বেমানান লাগে ওটাকে। নদী তীরের অসমান পাড় কখনো উঠছে, কখনো পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডের গতিও দ্রুততর হয়ে উঠছে। অন্তরে জাগিয়ে তুলছে সুন্দর সুষ্ঠু জীবনের কামনা, জাগিয়ে তুলছে মানুষকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষা।

যাত্রীদের রকম সকমের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওরা, তরুণ প্রবীণ, স্ত্রী পুরুষ — সবাই যেন একই রকম। আমাদের জাহাজটা চলেছিল ধীর গতিতে। কাজের তাড়া যাদের বেশি তারা যায় ডাক-জাহাজে। আর যাদের তাড়া নেই, নির্ঝঞ্ঝাট, তারাই আসে আমাদের জাহাজে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা খায় দায় আর একগাদা থালা বাসন, কাঁটা চামচ ছুরি এঁটো করে। আমার কাজ হচ্ছে সেই এঁটো থালা বাসন ধোঁয়া, ছুরি কাঁটা মেজে ঘসে চকচকে করে তোলা। ভোর ছটা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত আমাকে এই নিয়েই থাকতে হয়। বিকেলে দুটো থেকে ছটা আর রাত্রে দশটা থেকে বারোটা কাজ একটু কম থাকে। কারণ যাত্রীরা তখন খাওয়ার পরে কেউ চা খায় কেউ বা বিয়ার ভদকা টানে। এ সময়ে ওয়েটারদেরও কাজ থাকে না। সাধারণত ওদের একটা দল নালার সামনের টেবিলে বসে চা খায়। ওদের সঙ্গে থাকে বাবুর্চি স্মুরি আর তার সহকারী ইয়াকভ ইভানভিচ। থাকে মাক্সিম। মাক্সিম রান্নাঘরের বাসন মাজে। আর থাকে সের্গেই,—ও ডেকের যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করে। লোকটা কুঁজো, বসন্তের দাগে ভরা চওড়া মুখ, তেলতেলে চোখ। নোংরা দাঁত বের করে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে হাসতে হাসতে ইয়াকভ ইভানভিচ ওদের অশ্লীল

গল্প শোনায়। ব্যাঙের মতো মুখটাকে হাসিতে আকর্ণ বিস্তৃত করে তা শোনে সের্গেই। আর গোমড়া মুখ মাক্সিম তার কঠিন চোখে অন্যদের লক্ষ্য করতে করতে শুনে যায় নিঃশব্দে। ওর চোখের রঙটা কেমন তা বোঝা যায় না।

'মানুষখেকো! মর্দোভীয়!' থেকে থেকে গমগমে গলায় হেঁকে ওঠে বড়ো বাবুর্চি।

আদৌ দেখতে পারি না এই লোকগুলোকে। মোটা টেকো ইয়াকভ ইভার্নাভচের মুখে সব সময়েই লেগে আছে মেয়েদের সম্বন্ধে যত অশ্লীল কথা। ওর অভিব্যক্তিহীন মুখটা নীল নীল গুটিতে ভরা। চওড়া গালের উপরে একটা আঁচিল। লাল চুল গজিয়েছে আঁচিলটার উপরে। সব সময়েই ওটা খোঁটে। কোনো আলাপী মহিলা জাহাজে এলেই ভিখারীর মতো ও তার পিছন পিছন ঘুর ঘুর করে ফেরে। কথা বলে মিহি মিষ্টি সুরে, ঠোঁট দুটো ভরে যায় থুতুতে আর বেহায়া জিভটা বের করে চটপট তা চাটতে থাকে। ওকে দেখে কেন যেন আমার মনে হত সরকারী জল্লাদের চেহারা ঠিক অমনি মোটা সোটা তেলতেলেই হবে নিশ্চয়।

'আরে, কেমন করে মেয়েমানুষকে গরম করতে হয় সেটা জানতে হয়,' একদিন ও সের্গেই আর মাক্সিমকে বলছিল। মনোযোগ দিয়ে ওরা শুনছিল আর ফুলে উঠেছিল লাল হয়ে।

'মানুষখেকো!' ঘৃণায় গর্জে উঠল স্মুরি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

'উঠে আয় পেশকভ!'

ওর ঘরে গিয়ে পেঁছে চামড়ায় বাঁধানো একটা ছোট্ট বই আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ঠান্ডা গুদাম ঘরের দেয়ালের দিকে বাঁধা বাঙ্কের উপরে উঠে শুয়ে পড়ে বলল:

'পড়ে শোনা!'

একটা কেক'এর ঝুড়ির উপরে বসে একান্ত বাধ্য ছেলের মতো পড়তে আরম্ভ করলাম:

'নক্ষত্র খচিত প্রচ্ছায়া হইল স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশস্ত ক্ষেত্র। মূর্খতা ও কদভ্যাস হইতে উহা মুক্ত...'

একগাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল স্মুরি:

'যতো সব উট! কি লিখেছে দ্যাখ।'

'বাঁ দিকের খোলা বুকের অর্থ নিষ্পাপ হৃদয়।'

'কার বাঁ দিকের বুক খোলা?'

'কার সে কথা লেখা নেই।'

'তাহলে তার মানে মেয়েমানুষের বুক... ইঃ শালা লম্পট!'

দুটো হাত জড়ো করে মাথার তলায় দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজল স্মরি। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের কোণ থেকে সরিয়ে এনে এমন জোরে টান দিল যে ওর বুকের ভিতর থেকে কী যেন শিস দিয়ে বেজে উঠল আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল মুখটা। এক এক সময়ে মনে হত ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পড়া বন্ধ করে ঐ অভিশপ্ত বইটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম।

'পড়!' খেঁকিয়ে উঠত স্মরি।

'তখন সেই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি জবাব দিলেন: চাহিয়া দ্যাখো হে আমার সাধু স্যাভারিয়ান...'

'সেভেরিয়ান...'

'লেখা আছে স্যাভারিয়ান...'

'জাহান্নামে যাক! তলার দিকে কিছু কবিতা আছে, সেখান থেকে শুরু কর।'

সুতরাং আমিও শুরু করতাম:

> হে অবোধ প্রাণী,
> তোমরা বুঝতে চাও আমাদের কাণ্ডকারখানা,
> কোনো কালেই তোমাদের ক্ষুদ্র মন
> তার কাছে পর্যন্ত পেঁছতে পারবে না।
> সাধুদের যত গুন্ গুন্ মন্ত্রের গুঞ্জন
> সেও কখনো তোমাদের অধিগম্য হবে না!

'থাম!' চিৎকার করে উঠত স্মরি, 'এ কি কবিতা হল! দে বইটা আমার হাতে, দে!'

দারুণ চটে গিয়ে বার কয়েক ঐ মোটা নীল মলাটের বইটার পাতা ওল্টাত। তারপর বাঙ্কের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিত।

'অন্য একটা বই পড়...'

দুর্ভাগ্যবশত ওর লোহায় বাঁধানো ট্রাঙ্কটার ভিতরে বই ছিল

অনেকগুলি। তার ভিতরে ছিল, 'ওমিরের কথামৃত', 'গোলন্দাজ বাহিনীর স্মৃতিকথা', 'লর্ড সিদেনগেলির পত্রাবলী', 'অনিষ্টকারী কীট ছারপোকা — উহাকে উচ্ছেদ করা ও উহার অনিষ্ট রোধ করার উপায়'। অনেক বই ছিল যেগুলোর শুরুও নেই শেষও নেই। মাঝে মাঝে বাবুর্চি ওগুলো আমাকে দিত, শিরোনামা পড়তে বলত। পড়লে পরে রেগে উঠে বিড় বিড় করে বলত:

'কী সব লেখে ওরা, হতভাগা ব্যাটারা। যেন অযথা গালের উপরে চড় মারছে। গেরভাসি! গেরভাসি দিয়ে কী হবে আমার? প্রচ্ছায়া...'

অদ্ভুত শব্দ আর অজানা নামগুলো আমার মাথায় বাসা বাঁধত। উত্ত্যক্ত করতে শুরু করত। বার বার করে সেগুলোকে আওড়াবার জন্যে জিভ সুড় সুড় করে উঠত। যেন বার বার আওড়ালেই ওগুলোর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। জানালার বাইরে অবিশ্রাম জল ছিটিয়ে আর গান গেয়ে চলে নদী। ডেকের উপরে জাহাজী আর ফায়ারম্যানরা জড়ো হয়ে বসত একটা প্যাকিং বাক্স ঘিরে, গান গাইত কিংবা গল্প ফাঁদত, অথবা তাস খেলে যাত্রীদের পয়সাকড়ি জিতে নিত, আমার মনটা সেখানে যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠত। ওদের সঙ্গে বসে ওদের সহজবোধ্য কথাবার্তা শুনতে কী ভালোই না লাগত — সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে থাকতাম কামা'র পাড়ের দিকে—যেখানে পাইনের গুঁড়িগুলো তামার তারের মতো টান টান হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে। মাঠের বুকে নেমে যাওয়া জোয়ারের জল স্থানে স্থানে আটকে গিয়ে সৃষ্টি করেছে অজস্র ছোট ছোট হ্রদ। টুকরো টুকরো ভাঙা আয়নার মতো সেই হ্রদের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে নীল আকাশ। আমাদের জাহাজটা তীর থেকে দূরে, বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তবুও সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় তীর থেকে ভেসে আসত কোনো অদৃশ্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। মনে পড়িয়ে দিত শহরের আর লোকজনের কথা। আধখানা গোল রুটির মতো ছোট একটা জেলে ডিঙ্গি দুলছে জলের বুকে। ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা গাঁ। ছোট ছোট কতগুলি ছেলে জলে নেমে জল ছিটচ্ছে। লাল জামা গায়ে একটি চাষী হলদে ফিতের মতো বালির ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসছে। দূর থেকে সবকিছুই সুন্দর। সবকিছুই যেন খেলনার মতো — অদ্ভুত, ছোট ছোট, রঙীন। স্নেহমাখা আদরভরা সুরে কিছু একটা চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করত—নদী তীরের উদ্দেশে, ঐ বজরাটার উদ্দেশে।

বাদামী রঙের বজরাটা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। ওর থ্যাবড়া নাক দিয়ে ঘোলা জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে দেখতে পারতাম। দড়ি বাঁধা শুয়োরের মতো বজরাটাকে টেনে নিয়ে চলেছে স্টিমারটা। তারের দড়িটা কখনো ঢিলে হয়ে ছপাত্ করে জলের বুকে পড়ে, আবার পরক্ষণেই জল কেটে কেটে নাকে ধরে টেনে নিয়ে চলে। লোহার খাঁচার ভিতরে পশুর মতো বসে থাকা লোকগুলোর মুখ দেখার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠত। পের্মে পৌঁছে যখন ওদের পাড়ে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছিল তখন সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পাশ দিয়ে ধূসর আকৃতির কয়েকজন লোক গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে শিকল বাজিয়ে চলে গেল। পিঠের বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। তাদের ভিতরে রয়েছে পুরুষ নারী, বৃদ্ধ তরুণ, রয়েছে সুন্দর, কুৎসিত — ঠিক অন্যান্য মানুষেরই মতো। পার্থক্যের ভিতরে শুধু ওদের পোশাকগুলো আলাদা, আর মাথার চুল কামিয়ে দিয়ে করে দেয়া হয়েছে শ্রীহীন। ওরা ডাকাত, কিন্তু দিদিমার মুখে কতো না সুন্দর সুন্দর গল্পই না শুনেছি ওদের সম্বন্ধে।

ওদের যে কোনো লোকের তুলনায় বরং স্মুরিকেই বেশি ডাকাত বলে মনে হত।

'ভগবান, ওদের মতো অদৃষ্ট যেন আমার কখনো না হয়!' বজরাটার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠত স্মুরি।

একদিন কথায় কথায় ওকে বললাম:

'তুমি হলে রাঁধুনী আর ওরা কেউ চোর, কেউ খুনী — এটা কেমন করে হয়?'

'আমি রাঁধুনী নই, বাবুর্চি। শুধু রাঁধুনী হয় মেয়েমানুষরা,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল স্মুরি। তারপর খানিকক্ষণ ভেবে আবার বলল:

'মানুষে মানুষে যে তফাত সেটা নির্ভর করে মাথার উপরে। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। কেউ আবার একেবারে নিরেট। সাচ্চা বই পড়লে তবে মানুষ চালাক চতুর হয়। যেমন যাদুবিদ্যা আর ঐ ধরনের সব বই। সব রকমের বই পড়ে তবেই সাচ্চা বইয়ের সন্ধান পাবি।'

স্মুরি সব সময় আমাকে বলত:

'পড়, পড়! কোন বই যদি বুঝতে না পারিস তবে সাতবার করে পড়বি। সাত বারেও না হলে, বারো বার!'

জাহাজের সবার সঙ্গে স্মুরির ব্যবহার খুবই কাটখোট্টা। এমন কি

রাশভারী স্টুয়ার্ডের সঙ্গেও। যখনই কারুর সঙ্গে কথা বলত, তখন নিচেকার ঠোঁটটা অবজ্ঞায় বেঁকে যেত তার, আর গোঁফ মোচড়াত। কথাগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসত পাথরের টুকরোর মতো। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল ভদ্র, সমনোযোগী। কিন্তু ওর সেই মনোযোগের ভিতরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে আমি দারুণ ভয় পেতাম। দিদিমার বোনের মতোই খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ মনে হত বাবুর্চিকে।

'থাম, পড়িস নে আর,' বলে উঠত সে, তারপর বহুক্ষণ ধরে চোখ বুজে পড়ে থাকত। ভাঙা ভাঙা নিশ্বাস পড়ত নাক দিয়ে। বিরাট ভুঁড়িটা দুলে দুলে উঠত। হাত দুটো মরা মানুষের মতো আড়াআড়ি করে রাখত বুকের উপরে। কাটা দাগে ভরা রোমশ আঙুলগুলো নড়াচড়া করত, যেন কোনো অদৃশ্য কাঁটা দিয়ে মোজা বুনে চলেছে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিড় বিড় করে বলে উঠত:

'যেমন ধর, মগজ! খাটিয়ে দেখ, কী-ই না করতে পারিস মগজ খাটিয়ে! কিন্তু এই মগজ পরিমাণে দেয়া হয়েছে খুবই কম, আর দিয়েছেও অসমান ভাবে। সবার মাথায় যদি সমান মগজ থাকত — কিন্তু তা হয় না। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না, আবার আর কারো ইচ্ছেই হয় না বুঝতে!'

কথাগুলোর উপরে হোঁচট খেতে খেতে ওর সৈনিক জীবনের গল্প শোনাত আমাকে। ওর গল্পের কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পেতাম না। এতটুকুও মজা লাগত না। বিশেষ করে ও কখনো শুরু থেকে গল্প বলতে আরম্ভ করত না বলে। যেমন খুশি, যেখান থেকে খুশি শুরু করে দিত।

'তাই রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার সৈনিকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমায় কী বলেছিল লেফটেনেণ্ট?' যা যা বলেছিল সবই ঠিক ঠিক বলে গেল। কারণ সৈনিকেরা সত্যি কথা বলতে বাধ্য। লেফটেনেণ্ট এমন ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যেন একটা পাথরের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ নামাল। হুঁ!'

ভীষণ ভাবে নিঃশ্বাস টেনে বিড় বিড় করে বলে চলত বাবুর্চি:

'যেন কী বলব না বলব সে সব আমি জেনে বসে আছি! ওরা লেফটেনেণ্টকে ধরে জেলে পুরল। আর ওর মা... হায় রে কপাল! কেউ আমাকে কোনো দিন কিছু শেখাল না...'

গরম পড়ে গিয়েছিল। সবকিছু কাঁপছে থর থর করে। গুঞ্জন তুলছে। কেবিনের ধাতুময় দেয়ালের বাইরে চাকা ঘুরছে ঝপ্ ঝপ্ করে। ছিটকে

ছিটকে উঠছে জল। পোর্টহোলের গা বেয়ে বিস্তীর্ণ স্রোত বয়ে চলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একফালি মাঠ। গাছগুলো আবছা আবছা ভেসে উঠছে দৃষ্টিপথে। এসব শব্দ এমন কানসহা হয়ে গেছে যে আমার মনে হয় সবকিছুই যেন নীরব। যদিও জাহাজের গলুইয়ের উপরে একজন খালাসী একঘেয়ে সুরে বলে চলেছে:

'সা-তে সাত, সা-তে সাত...'

ইচ্ছে হত এ সবকিছু থেকে নিস্পৃহ হয়ে থাকি। কিছু শুনব না, কিছু করব না — শুধু রান্নাঘরের গরম চর্বির গন্ধ থেকে দূরে কোথাও একটু ছায়ায় বসে আধ-জাগ্রত অবস্থায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব কেমন করে নীরবে জলের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বয়ে চলেছে এই শান্ত ক্লান্ত জীবন।

'পড়!' রুক্ষ গলায় খেঁকিয়ে উঠত স্মুরি।

প্রথম শ্রেণীর পরিচারকেরাও ভয় করত ওকে। মনে হত নিরীহ স্বল্পভাষী স্টুয়ার্ড পর্যন্তও মনে মনে ওকে দারুণ ভয় করে।

'এই শুয়োর!' চিৎকার করে ধমকে উঠত স্মুরি মদের দোকানের লোকটাকে, 'এদিকে আয় ব্যাটা চোর, মানুষখেকো! প্রচ্ছায়া!'

খালাসী আর ফায়ারম্যান সবাই ওকে সমীহ করত। সবাই খোসামোদ করত ওর একটু কৃপা পাবার জন্যে। স্মুরি ওদের সুরুয়া থেকে মাংস তুলে দিত, পরিবার পরিজনের খবর নিত। শুনত তাদের গ্রাম্য জীবনের কথা। তেল-কালি মাখা বেলোরুশী ফায়ারম্যানদের অন্য সবাই হেয় চক্ষে দেখত। রুশরা ওদের চামরী গাই বলে খেপাত:

'চামরী গাই, চামরী গাই, থলেটা ওকে দাও না ভাই!'

এতে দারুণ খেপে যেত স্মুরি। রাগে ওর সর্বাঙ্গ ফুলে উঠত। টকটকে লাল হয়ে উঠত মুখখানা। চিৎকার করে ধমকে উঠত ফায়ারম্যানদের:

'তোদের সঙ্গে অমন করে লাগতে দিস কেন? মুখ ভেঙে দিতে পারিস না? নচ্ছার কাৎসাপ*-এর দল!'

একদিন সারেঙ্গ — খুবই সুন্দর চেহারার বদরাগী লোকটি — স্মুরিকে বলল:

'চামরী গাই-ও যা, খখল**-ও তাই, দুই-ই সমান!'

* রুশদের হেয় করে ডাকতে হলে কাৎসাপ বলা হয়। — সম্পাঃ

** ইউক্রেনীয়দের হেয় করে ডাকতে হলে বলে খখল। — সম্পাঃ

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চি খপ্ করে ওর কোমরের বেল্ট আর জামার কলার ধরে শূন্যে তুলে ফেলে ঝাঁকুনী দিতে দিতে গর্জে উঠল:

'এবার আছড়ে ছাতু করে ফেলি?'

প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হত। আর তার সমাপ্তি হত মারপিটে। কিন্তু স্মুরির গায়ে কেউ কখনো হাত তুলত না। কারণ একদিকে যেমন তার গায়ে ছিল অমানুষিক শক্তি, অন্যদিকে ক্যাপটেনের বৌ ওকে দেখত সুনজরে। মহিলাটি লম্বা, দীর্ঘাঙ্গী। মুখখানা খানিকটা পুরুষালী ধরনের। মাথার চুলগুলোও ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

প্রচুর ভদকা টানত স্মুরি। কিন্তু কখনই মাতাল হত না। সকাল বেলা থেকেই শুরু করত মদ খেতে। বার চারেক টেনেই একটা গোটা বোতল শেষ করে ফেলত। তারপর সারা দিন ধরে ঢুক ঢুক করে চালাত বিয়ার। ক্রমে ওর মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠত। লোকে অবাক হলে যেমন চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে তেমনি বিস্ফারিত হয়ে উঠত তার চোখ।

কখনো কখনো সন্ধ্যায় ডেকের উপরে চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিত। তখন মনে হত একটা প্রকাণ্ড শ্বেত মূর্তি গম্ভীর মুখে অপসৃয়মান সুদূরের দিকে চোখ মেলে বসে রয়েছে। এ সময়ে সবাই ওকে ভয় পেত। কিন্তু আমার কেমন যেন করুণা হত ওর উপরে।

ইয়াকভ ইভানভিচ কখনো কখনো বেরিয়ে আসত রান্নাঘর থেকে। আগুনের তাতে মুখটা রাঙ্গা। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। টাক-পড়া মাথায় হাত বুলিয়ে হতাশ হয়ে হাত দুটো ছুঁড়ে ফিরে চলে যেত। নয়ত দূর থেকে ডেকে বলত:

'মাছটা মরে গেল যে।'

'চচ্চড়ি বানিয়ে ফেল গে যা...'

'কেউ যদি টাটকা মাছের ঝোল বা সিদ্ধ চেয়ে বসে, তখন কি হবে?'

'বানা গে, ওরা যা পাবে তাই-ই গিলবে।'

সাহস করে কোনো কোনো দিন আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম।

'কী চাই?' চেষ্টা করে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করত।

'কিছু না।'

'বহুত আচ্ছা।'

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, লোকদের আপনি অত ভয় দেখান কেন? এমন ভালো মানুষ আপনি!'

ও একটুও চটে উঠল না দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

'ভালো মানুষ শুধু তোর কাছে,' প্রত্যুত্তরে বলল। তারপর একটু চিন্তিত সুরে সরল ভাবেই বলল:

'হয়ত সবার কাছেই ভালো, কিন্তু সেটা জানতে দিই না। কাউকে বুঝতে দিতে নেই যে তুই ভালো মানুষ। তাহলেই তারা তোকে একেবারে শেষ করে ফেলবে। জলার মধ্যে শুকনো জায়গা পেলে মানুষ যেমন সেখানে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তেমনি ভালো মানুষের সন্ধান পেলেই লোকে তার কাঁধে চড়ে দু-পায়ে দলতে থাকে। যা, খানিকটা বিয়ার নিয়ে আয় আমার জন্যে...'

গ্লাসের পর গ্লাস বিয়ার টেনে গোঁফটা চেটে নিয়ে আবার বলল:

'আর একটু যদি বড়ো হতিস, তবে অনেক কিছু শেখাতে পারতাম তোকে। শোনাবার মতো কথা দু-চারটে জানা আছে আমার। একেবারে মূর্খ আমি নই। তোকে বই পড়তে হবে। যা কিছু জানার দরকার বই পড়লেই সব জানতে পারবি। বই বাজে জিনিস নয়। একটু বিয়ার খাবি?'

'না, ও আমার ভালো লাগে না।'

'বেশ, বেশ, মদ ধরিস নে। মদ খাওয়াটা দারুণ দুঃখের। ভদকা হল গে শয়তানের তৈরী। আমার যদি পয়সা থাকত, তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতাম। লেখাপড়া না জানলে মানুষ ষাঁড়ের মতো হয়ে ওঠে। জোয়ালেই জুতে দাও, কি কেটে মাংসই বানাও ষাঁড় শুধু লেজ নাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

ক্যাপটেনের বৌ ওকে গোগলের একটা বই পড়তে দিয়েছিল। 'ভীষণ প্রতিহিংসা' বইখানা আমি ওকে পড়ে শোনালাম। খুব ভালো লাগল আমার। কিন্তু স্মুরি রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠল:

'একদম বাজে, আজগুবি গল্প। অন্য রকমের বই নিশ্চয়ই আছে...'

বইটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আর একখানা বদলে নিয়ে এল ক্যাপটেনের বৌয়ের কাছ থেকে।

'এই নে, এটা পড়, 'তারাস...' ওর আর একটা নাম যেন কী?' কী যেন ভাবতে ভাবতে গম্ভীর ভাবে পড়তে হুকুম করল আমাকে। 'গল্পটা কী দেখ তো। ক্যাপটেনের বৌ তো বলল খুব ভালো বই। কার কাছে? হয়ত ওর কাছে ভালো, আমার কাছে খারাপ। কেমন করে চুল ছাঁটে দেখেছিস? কান দুটো ছেঁটে ফেললেও পারত।'

তারাস অস্তাপকে লড়াইয়ের আহ্বান জানানর জায়গাটায় পে'ছিতেই বাবুর্চি হো হো করে হেসে উঠল।

'কেমন লাগল কথাটা?' জিজ্ঞেস করল, 'একজনার আছে বুদ্ধি আর একজনার বল! আচ্ছা সব লেখে যা হোক, যত উটের দল!'

গল্পটা একাগ্র মনে শুনল স্মুরি। থেকে থেকে খুঁত খুঁত করে উঠল:

'হুঁ, আজগুবি! এক কোপে একটা মানুষকে কি কেউ আর কখনো কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত দো-ফাঁক করে ফেলতে পারে! কিছুতেই পারে না! বর্শায় গে'থেও একটা মানুষকে তুলে ফেলা যায় না! ভেঙে যাবে না! আমি নিজে বুঝি আর সৈনিক ছিলাম না?'

আন্দ্রেইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল স্মুরি।

'জঘন্য ছেলে, তাই না? একটা মেয়েমানুষের জন্যে কিনা! থুঃ!'

কিন্তু তারাস যখন তার নিজের ছেলেকে গুলি করল, তখন বাঙ্কের কিনারা থেকে ওর পা দুটো ঝুলে পড়ল। দুহাতে বাঙ্কের দুবাজু আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিল ও। ধীরে ধীরে দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল মেঝের উপরে। নাক টানতে টানতে বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'হায় ভগবান! হায় ভগবান!'

হঠাৎ সে ধমকে উঠল আমাকে:

'পড়ে যা, শয়তানের ডিম!'

তারপর যখন মৃত্যুপথযাত্রী অস্তাপ চিৎকার করে ডেকে বলল তার বাবাকে, 'বাবা! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?' তখন আরো জোরে কে'দে উঠল স্মুরি।

'সব শেষ!' কান্নাভাঙা গলায় বলে উঠল স্মুরি, 'সব, সব! তাহলে এই কি পরিণতি? কী অভিশপ্ত ব্যাপার! খাঁটি মানুষ ছিল সেকালেই। ঐ তারাস, কী বলিস? মানুষের মতো মানুষ, ভগবানের দিব্যি!'

আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে একমনে দেখতে লাগল ও। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছিল মলাট।

'একটা ভালো বই পড়া ঠিক ছুটির দিনের মতোই উপভোগ্য!'

তারপর আমরা পড়লাম 'আইভান্‌হো'। স্মুরির খুব ভালো লাগল রিচার্ড প্লানটাজেনেটকে।

'রাজার মতো রাজা বটে!' একটু জোর দিয়েই বলে উঠল স্মুরি। কিন্তু

বইটা আমার তেমন ভালো লাগল না। কেমন যেন শুকনো, নীরস মনে হল।

সাধারণত আমাদের রুচি ছিল ভিন্ন। আমার ভালো লাগল 'টমাস জোন্সের গল্প' — টম জোন্সের ইতিহাসের পুরনো অনুবাদ, পরিত্যক্ত শিশু।

স্মুরি বলল, 'বাজে! কী হবে আমার টমাসকে দিয়ে? আরো বই আছে নিশ্চয়ই...'

একদিন ওকে বললাম অন্য এক জাতের বই আছে, আমি জানি — নিষিদ্ধ বই। শুধু রাত্রে গোপনে ঘরে বসে পড়তে হয় সে বই।

স্মুরির চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠল। গোঁফ জোড়া ফুলে উঠল কদম ফুলের মতো।

'সে আবার কি? কী যে মিথ্যে কথাই না বলতে পারিস?'

'মিথ্যে কথা নয়। পাপ-স্বীকারের সময়ে পুরুতও একবার বলেছিল আমাকে। তার আগেও আমি লোককে সেসব বই পড়ে কাঁদতে দেখেছি!'

বাবুর্চি বোকার মতো তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

'কে কেঁদেছিল?'

'একটি মহিলা। সে শুনছিল বসে বসে। আর একজন তো ছুটে পালিয়েই গেল ভয়ে।'

'স্বপ্ন দেখছিস তুই, উঠে গা ঝাড়া দে,' চোখ কুঁচকে বলল স্মুরি। তারপর একটু থেমে আবার বলল:

'ঠিকই, কোথাও না কোথাও গোপন কিছু আছেই। না থেকেই পারে না... কিন্তু বয়েসটা বড্ডো বেশি হয়ে গেছে আমার... তাছাড়া ওদের মতোও নই... তবুও এসব কথা যখন মনে হয়...'

এমনি ধারা নৈপুণ্যে এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও কথা বলে যেতে পারত।

নিজের সম্পূর্ণ অজান্তেই আমার ভিতরে গড়ে উঠল বই পড়ার অভ্যেস। খুবই আনন্দ পেতাম পড়তে। বইয়ে যা কিছুই পড়তাম তাই আনন্দময়; জীবনের মতো নয়। ফলে জীবনটা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

বই সম্পর্কে স্মুরির আগ্রহও বেড়ে গেল। প্রায়ই আমাকে কাজের মধ্যে থেকে ডেকে নিয়ে আসত:

'পেশকভ! আয় পড়বি চ'!

'একগাদা বাসন জমা হয়েছে, মাজতে হবে যে!'

'মাক্সিম মাজবে'খন।'

তারপর রক্ষ ভাবে জোর করেই বয়স্ক মাক্সিমকে পাঠিয়ে দিত আমার কাজ করতে। আর সেও গ্লাস ভেঙে তার শোধ তুলত। শান্ত গলায় স্টুয়ার্ড আমাকে শাসাত:

'জাহাজ থেকে দূর করে দেব তোকে।'

একদিন মাক্সিম ইচ্ছে করেই কয়েকটা গ্লাস ডুবিয়ে রেখে দিল ময়লা জলের তাগারীর ভিতরে। ফলে আমি যখন ময়লা জলটা ফেলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসগুলোও পড়ে গেল।

কিন্তু স্টুয়ার্ডকে স্মুরি জানাল:

'ওটা আমারই দোষ। দামটা আমার হিসেব থেকেই কেটে নিয়ে নিও।'

পরিচারকেরা আড়চোখে তাকাতে শুরু করল আমার দিকে।

'ওরে বইয়ের পোকা, কিসের জন্যে তোকে মাইনে দেয়া হয় শুনি?' ওরা বলত আমাকে।

ইচ্ছে করে ওরা থালা বাসন এঁটো করে কাজ বাড়িয়ে রাখত আমার। বুঝতে পেরেছিলাম এর জন্যে একদিন একটা অনাসৃষ্টি কান্ড ঘটবে। দেখলাম ভুলও হয় নি।

একদিন সন্ধ্যায় লালমুখো এক মহিলা হলদে রুমাল আর আনকোরা গোলাপী ব্লাউজ পরা একটি মেয়েকে নিয়ে উঠল এসে জাহাজে। দুজনেই বেশ একটু টেনে এসেছিল। মহিলাটি শুধু হাসছিল আর যাকে সামনে পাচ্ছিল তাকেই নমস্কার করে বলছিল:

'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ভাই, এই এক ফোঁটা একটুখানি ঠোঁটে ঠেকিয়েছি মাত্র। ওরা আমাকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। খালাস করে দিয়েছে। তাই খোশ-মানাবার জন্যে এক ফোঁটা একটু টেনেছি মাত্র।'

মেয়েটা হি হি করে হাসতে হাসতে ঘোলাটে চোখে সবার দিকে চেয়ে সঙ্গী মহিলাটির পাঁজরায় গুঁতো দিতে দিতে বলছিল:

'চালা, নচ্ছার মাগী! চালা!'

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোর কাছে কেবিনের উলটো দিকে যেখানে ইয়াকভ ইভানভিচ শোয় তারই পাশে ওরা জায়গা নিল। একটু পরেই মহিলাটি উধাও। আর সের্গেই এসে বসে পড়ল মেয়েটার পাশে। ওর ব্যাঙের মতো মুখটা হাঁ হয়ে গেছে কামুকতায়।

সেদিন রাত্রে কাজকর্ম সেরে আমার শোবার টেবিলটার উপরে উঠে বসেছি। সের্গেই এসে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল:

'চল, তোকে আজ আমরা ওর সঙ্গে শোয়াব...'

ও তখন মাতাল। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ওর মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু সের্গেই ঘুসি মারল আমাকে।

'আয় ব্যাটাচ্ছেলে!'

দৌড়ে এল মাক্সিম। সেও মাতাল। দুজনে মিলে ঘুমন্ত যাত্রীদের পাশ দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল তাদের কেবিনের দিকে। কিন্তু ঠিক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে স্মুরি। আর ঠিক দরজায় মেয়েটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়াকভ ইভানভিচ। মেয়েটা ওর পিঠের উপরে কিল-চড় মারছে।

'ছেড়ে দাও আমাকে!' চিৎকার করে জড়িত গলায় বলছে মেয়েটা।

সের্গেই আর মাক্সিমের হাত থেকে স্মুরি ছাড়িয়ে নিল আমাকে। তারপর দুজনার মাথায় মাথায় ঠুকে দিয়ে ছুঁড়ে উলটে ফেলে দিল ডেকের উপরে।

'মানুষখেকো!' ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের উপরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গর্জে উঠল স্মুরি। তারপর আমাকে এক ঠেলা দিয়ে বলল:

'ভাগ এখান থেকে!'

ছুটে পাছ-গলুইয়ের দিকে চলে গেলাম। মেঘলা রাত। নদীর জল কালো। দুটো ধূসর পথ-রেখা জেগে উঠেছে স্টিমারের গতিপথে। অদৃশ্য তীরের দিকে চলেছে ছুটে। ঐ দুটো পথ-রেখার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসছে বজরাটা। কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে ফুটে উঠছে লাল আলো। সে আলোয় কোনো কিছুই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না। আর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে নদীর বাঁকে। মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত যেন আরো নিকষ, আরো দুঃসহ হয়ে উঠছে।

বাবুর্চি এসে বসল আমার পাশে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'ওরা তোকে ঐ বেশ্যামাগীটার কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই না? শুয়োরের বাচ্ছারা! ওরা যখন তোর দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি শুনতে পেয়েছিলাম...'

'মেয়েটাকে উদ্ধার করেছেন তো ওদের হাত থেকে?'

'ঐ মাগীটাকে?' মেয়েটার উদ্দেশ্যে গাল পাড়ল স্মুরি। তারপর ব্যথাঝরা গলায় বলল:

'এখানে সবগুলোই হচ্ছে শুয়োরের বাচ্চা। এই জাহাজটা গাঁয়ের চাইতেও খারাপ। গাঁয়ে থেকেছিস কোনো দিন?'

'না।'

'গাঁ হচ্ছে ভীষণ খারাপ! বিশেষ করে শীতকালটাতে...'

নদীর জলের ভিতরে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল:

'এই সব শুয়োরের বাচ্চাগুলোর মধ্যে থেকে থেকে তুই নষ্ট হয়ে যাবি, তোর জন্যে আমার দুঃখ হয়—বুঝলি রে খুদে ইঁদুর! সবার জন্যেই দুঃখ হয়। কী যে করব কোনো কোনো সময়ে বুঝে উঠতে পারি না... হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলব ওদের: 'ওরে বেজন্মার দল, কী করছিস তোরা দেখ্? তোরা অন্ধ নাকি? যত উটের দল!' '

বেজে উঠল জাহাজের বাঁশী—দীর্ঘ, একটানা, তারের দড়িটা ছপ করে পড়ল জলের উপরে। অন্ধকারের ভিতরে দুলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো—জাহাজ ঘাটার নিশানা। আরো অজস্র ছোট আলোর বিন্দু ফুটে উঠল আবছা অন্ধকারের বুকে।

'মাতলা বন,' বিড় বিড় করে বলে উঠল বাবুর্চি। 'মাতাল নদী নামে একটা নদীও আছে। এক সময়ে মাতালভ নামে এক রেশান অফিসারও ছিল আর একজন কেরানী ছিল, তার নাম নেশাবুঁদ... আমি তীরে যাচ্ছি।'

কামা অঞ্চলের শক্ত-সমর্থ মেয়েরা লম্বা ঠেলা বোঝাই করে কাঠ বয়ে আনছে। বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে জোড়ায় জোড়ায় জেটির উপর দিয়ে নেচে নেচে এগিয়ে আসছে ফায়ারম্যানদের অন্ধকার ঘুলঘুলির সামনে। চারফুট লম্বা কাঠগুলো ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ঠেলে দিয়ে সুরেলা গলায় হেঁকে উঠছে:

'হেঁইয়ো!'

কাঠ বয়ে আনবার সময় জাহাজীরা মেয়েগুলোর পায়ে বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরছে। মেয়েরা তারস্বরে চেঁচিয়ে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে: ফিরে যাবার সময়ে জাহাজীদের চড় চিমটির বদলে হাতঠেলা দিয়ে আঘাত করে করছে আত্মরক্ষা। বহুবার দেখেছি এসব, যেখান থেকেই জ্বালানী কাঠ তোলা হয়েছে সেখানেই প্রত্যেক বার দেখেছি এই একই ব্যাপার।

মনে হত আমি যেন এক প্রাচীন প্রবীণ, বহুবছর ধরে রয়েছি এই জাহাজে, কি ঘটবে কাল বা আসছে সপ্তাহে, আসছে শরতকালে — তা সবই আমার নখদর্পণে।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে: জাহাজঘাটার উপরে একটা বালির ঢিবির ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাইন বন। পাহাড় বেয়ে মেয়েরা চলেছে বনের দিকে, হাসছে, গাইছে, হৈ-হুল্লোড় করছে; লম্বা হাতঠেলার হাতিয়ার হাতে দেখাচ্ছে ঠিক সৈনিকের মতো।

ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁদি, বুকের ভিতরে লুকনো চোখের জল উছলে উঠে হৃৎপিন্ডটাকে চাপ দিচ্ছিল, ব্যথা করছিল।

কিন্তু কাঁদতেও লজ্জা, তাই এগিয়ে গিয়ে জাহাজী ব্লাখিনকে ডেক মোছার কাজে সাহায্য করতে লাগলাম।

ব্লাখিন থাকে সবার অলক্ষ্যে। রোগা, ফ্যাকাশে চেহারা; আড়াল খুঁজে এককোণে চুপ করে বসে খুদে খুদে চোখ দুটো মিট মিট করত। ও একদিন আমাকে বলেছিল:

'সত্যি বলছি — আমার ডাক নাম ব্লাখিন নয়, খানকীন... কেন জানিস? আমার মা ছিল খানকী। বোনও আছে একটা, সেও বেশ্যা। এ যেন ওদের ললাটের লিখন, দুজনারই। অদৃষ্ট, বুঝলি ভাই, ওটা ঘাড়ের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। যতোই উঠতে চেষ্টা করিস কিছুতেই পারবি না...'

এখন ডেক মুছতে মুছতে শান্ত গলায় সে বলে চলল:

'দেখছিস তো, কেমন করে মানুষ মেয়েদের পিছনে লাগে? ভেবে দেখ্ একবার — প্রাণপণ চেষ্টা করলে ভিজে কাঠও জ্বালানো যায়! বুঝলি ভাই, ওসব আমার ভালো লাগে না, আদৌ বরদাস্ত করতে পারি না। আমি যদি মেয়ে হতাম তবে কোনো এক দেবতার নাম নিয়ে গভীর পুকুরে ডুবে মরতাম... লোকের তো আর স্বাধীনতা নেই, তার ওপরে এই রকম পিছে লাগা! বিশ্বাস কর্ আমার কথা, স্কোপেৎসরা বোকা নয়। স্কোপেৎসদের কথা শুনেছিস কোনো দিন? ওরা হল খোজা। ভারি চালাক, বেঁচে থাকার সঠিক পথটি ওরা ধরতে পেরেছে: জীবনের যা কিছু ছোটখাটো নোংরামী থেকে দূরে চলে গিয়ে কেবল পবিত্র ভাবে ভগবানের সেবা করে চলেছে...'

স্কার্টটা উঁচু করে তুলে ধরে জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল ক্যাপটেনের বৌ। খুব ভোরে ওঠে সে। রাণীর মতো

চেহারা, লম্বা; মুখখানা এমন অকপট, এমন সরলতা মাখা যে ইচ্ছে হয় তার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে বলি:

'কিছু বলুন আমাকে—কিছু বলুন!'

জেটি ছেড়ে ধীরে জাহাজটা দূরে সরে যেতে লাগল।

'জাহাজ ছেড়েছে...' ক্রুশ করে বলে উঠল স্নাখিন।

৬

সারাপুলে মাক্সিম চলে গেল, কারুকে বিদায়টুকু পর্যন্ত না জানিয়ে নীরবে শান্ত গম্ভীর মুখে। পিছনে পিছনে চলে গেল সেই ফুর্তিবাজ মহিলাটি, তখনো হাসছে সে। আর গেল সেই স্বৈরিণী মেয়েটা, ওর চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। বহুক্ষণ ধরে সের্গেই ক্যাপটেনের কেবিনের দোরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কখনো চুমু খেল দোরের কপাটের উপর, কখনো বা কপাল কুটল।

'মাপ করেন, আমার কোনো দোষ নেই!' কেঁদে কোঁকিয়ে সে বলছিল, 'সব দোষ ঐ মাক্সিমের...'

জাহাজীরা, পরিচারকরা, এমন কি যাত্রীদেরও কেউ কেউ জানত ও মিছে কথা বলছে, তবু উসকে দিচ্ছিল:

'চালা, চালিয়ে যা! নিশ্চয়ই তোকে মাপ করবেন দেখিস!'

ক্যাপটেন মাপ করল ওকে, কিন্তু এমন জোর একখানা লাথি কসাল যে ও ছিটকে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই দেখা গেল সের্গেই ডেকময় ছোটাছুটি করে ফিরছে ট্রে নিয়ে আর মারখাওয়া কুকুরছানার মতো সোহাগে জুলজুলে চোখে তাকাচ্ছে সবার দিকে।

ভিয়াৎকা থেকে এক ভূতপূর্ব সৈনিককে বহাল করা হল মাক্সিমের জায়গায়। লোকটা ক্ষীণজীবী, মাথাটা ছোট্ট, চোখ দুটো লালচে বাদামী রঙের। আসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'নম্বর বাবুর্চি ওকে কয়েকটা মুরগী মেরে আনতে বলল; দুটো মুরগী ও কাটল, কিন্তু বাকিগুলো হাত ছাড়িয়ে ডেকময় ছোটাছুটি করে ফিরতে লাগল। যাত্রীরাও চেষ্টা করতে লাগল ধরতে,—তিনটে উড়ে চলে গেল জাহাজের বাইরে। দারুণ হতাশায় সৈনিকটি রান্নাঘরের কাঠের স্তূপের উপরে বসে কান্না জুড়ে দিল।

'হল কি রে বেকুব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্মুরি, 'কে কবে শুনেছে সৈনিকে কাঁদে!'

'আমি ছিলাম বে-সামরিক দলে,' আস্তে আস্তে বলল লোকটা।

এতেই ওর কাল হল। আধঘণ্টার মধ্যে জাহাজ-শুদ্ধ লোক এসে ওর পিছনে লাগল; এক এক করে ওরা খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঐ নাকি?'

তারপর হো হো করে রূঢ় উপহাসের হাসিতে গড়িয়ে পড়ে।

সৈনিকটি প্রথমে ঐ লোকেদের কিংবা তাদের হাসি লক্ষ্য করে নি; বসে বসে আপন মনে তার জীর্ণ স্মৃতির শার্টের হাতায় চোখের জল মুছছিল, যেন চোখের জলের ফোঁটাগুলো জামার হাতার ভিতরে লুকিয়ে রাখতে চায় সে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর লালচে বাদামী চোখ দুটো জ্বলে উঠল রাগে। ওর দেশের ভিয়াৎকাই টানে কিচির মিচির করে বলে উঠল:

'আমার উপরে ঝাল ঝাড়তে আসা কেন? জাহান্নামে যা! সেখানে গিয়ে প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাক গে যা...'

এতে লোকগুলো আরো মজা পেয়ে গেল। কেউ ওর কোঁকে আঙুলের খোঁচা মারে, কেউ টানে জামা ধরে, কেউ বা এ্যাপ্রণ ধরে। দুপুরের খাওয়ার আগ পর্যন্ত নির্মম ভাবে এমনি করে সবাই মিলে খোঁচাল ওকে। খাওয়ার পরে কে যেন একটা নেবুর খোসা কাঠের চামচে আটকে ওর পিছনে এ্যাপ্রণের ফিতের সঙ্গে বেঁধে দিল; হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চামচটা দোলে আর সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওরা যত হাসে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো লোকটা ততোই জড়োসড়ো হয়ে পড়ে, ওদের অত হাসি মস্করার কারণটা সে বুঝতে পারে না।

গম্ভীর কঠিন মুখে স্মুরি তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, দেখতে দেখতে তার মুখখানা মেয়েদের মতো কোমল হয়ে উঠল। আমারও দুঃখ হল ওর জন্যে।

'বলে দেব ওকে চামচটার কথা?' জিজ্ঞেস করলাম স্মুরিকে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল স্মুরি।

সবার হাসাহাসির কারণটা সৈনিককে বলে দিতেই সে চামচটা টেনে খুলে মেঝের উপরে আছড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল। তারপর দুহাতে আমার চুলের মুঠো আঁকড়ে ধরল, মারামারি শুরু করে দিলাম দুজনে। মজা পেয়ে সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাদের।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে স্মুরি প্রথমে আমার পরে ওর কানটা মুচড়ে ধরে আমাদের দুজনকে টেনে ছাড়িয়ে দিল। কান ছাড়াবার জন্যে ক্ষুদে

লোকটাকে ছটফট করতে দেখে লোকগুলো হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল, কেউ শিস দিয়ে উঠল, কেউ হাসির ধমকে পা আছড়াতে শুরু করল।

'সাবাস সৈনিক! মার ঢুঁ বাবুর্চির পেটে!'

এক পাল মানুষের এই উচ্ছৃংখল খ্যাপা আনন্দ দেখে ইচ্ছে হল একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে ওদের মাথাগুলো গুঁড়িয়ে দিই।

সৈনিককে ছেড়ে দিয়ে বুনো শুয়োরের মতো স্মুরি ঘুরে দাঁড়াল লোকগুলোর দিকে: দুটো হাত পেছনে, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, গোঁফজোড়া ফুলে উঠেছে কাঁটা দিয়ে।

'যে যার নিজের জায়গায় চলে যাও! মার্চ! মানুষখেকোদের দল!'

সৈনিক আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে, কিন্তু এক হাতেই স্মুরি ওকে শূন্যে তুলে উঁচু করে জলের কলের কাছে নিয়ে এল। তারপর ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ওর শীর্ণ দেহটা দুমড়ে মুচড়ে মাথাটা জলের নিচে ঠেসে ধরল।

ছুটে এল জাহাজী, সারেঙ্গ আর বুড়ো মেট, আবার জমে উঠল ভিড়। আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠল স্টুয়ার্ডের মাথা, যথারীতি মুখচোরা এবং বাক্যহীন।

কাঠের স্তূপের ওপর বসে সৈনিকটি তার কাঁপা কাঁপা হাতে বুট খুলতে লাগল, পায়ে জড়ানো ন্যাকড়াগুলো মোচড়াতে লাগল, সেগুলো কিন্তু ভেজে নি। জল ঝরে পড়তে লাগল তার এলোমেলো চুল থেকে এবং তা দেখে লোকেরা আবার হাসতে শুরু করে দিল।

'একটু রোস,' সরু চড়া গলায় বলে উঠল সৈনিক, 'ছোঁড়াটাকে যদি না আমি খুন করি তো কী বলেছি!'

আমার কাঁধের উপরে হাত রেখে স্মুরি কী যেন বলল বুড়ো মেটকে, ভিড় সরিয়ে দিল জাহাজীরা।

'তোকে নিয়ে কী করা যায় বল্ দেখি?' সবাই চলে যেতে সৈনিককে বলল স্মুরি।

সৈনিক চুপ করে রইল। হিংস্র দৃষ্টি মেলে বারবার তাকাতে লাগল আমার মুখের দিকে, ওর সমস্ত দেহটা অদ্ভুত ভাবে বেঁকে বেঁকে উঠছিল।

'টেনশান্, ছিঁচকাঁদুনে কোথাকার!' স্মুরি বলল।

'ঘোড়ার ডিম! এটা সেনাবাহিনী নয়!' প্রত্যুত্তরে বলল সৈনিক।

তাতে বাবুর্চি কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল, ফুলো ফুলো গাল

দুটো চুপসে এল। পরক্ষণেই থুঃ করে খানিকটা থুথু ফেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল। আমি যেতে যেতে আহত মনে সৈনিকের দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু স্মুরি বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'ঝগড়াটে মানুষ, তাই না? চলে আয় এখন!'

সের্গেই ছুটে এসে ফিস ফিস করে বলল:

'লোকটা নিজের গলায় ছুরি বসাতে চাইছে!'

'কোথায়?' চিৎকার করে উঠল স্মুরি, তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল।

সৈনিক পরিচারকদের কেবিনের দোরের সামনে দাঁড়িয়েছিল, হাতে একটা বড়ো ছুরি। মুরগী আর জ্বালানী কাঠ কাটা হয় ছুরিটা দিয়ে; ফলাটা ভোঁতা, ভেঙ্গে ভেঙ্গে করাতের মতো হয়ে গেছে। এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল ঐ মজার লোকটাকে দেখার জন্যে আবার ভিড় জমে উঠেছে। ওর থ্যাবড়া নাক-শুদ্ধ গোটা মুখটা জেলি-মাছের মতো কাঁপছে থর থর করে, মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট কাঁপছে, বিড় বিড় করে সে বলে চলেছে:

'শয়তান... শ-য়-তা-ন!'

কিসের উপরে যেন লাফিয়ে উঠে ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম— কেউ হাসছে, কেউ ফোড়ন কাটছে, একজন বলছে আর একজনকে:

'দেখ্, দেখ্!'

লোকটা তার রোগা লিকলিকে বাচ্চা ছেলের মতো হাত দুটো দিয়ে জামাটা ট্রাউজারের ভিতরে ঢোকাতে সুরু করতে আমার পাশে দশাসই একটা লোক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল:

'আত্মহত্যাই যদি করবে তবে আর পাতলুন নিয়ে অত টানা হেঁচড়া করছে কেন?'

তাতে উচ্চতর হাসির ধমকে ফেটে পড়ল সবাই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ও যে আত্মহত্যা করতে পারে এটা কেউই বিশ্বাস করছে না, আমিও না। কিন্তু স্মুরি খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে ঠেলে লোক সরাতে সরাতে এগিয়ে যেতে যেতে বলল:

'চলে যা এখান থেকে বেকুফ!'

স্মুরি কথাটা ব্যবহার করত সমষ্টিগত বিশেষ্য হিসেবে। এক ভিড় লোকের সামনে গিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলত:

'দূর হ মূর্খ কোথাকার!'

কথাটা মজার, কিন্তু আজ সকাল থেকে সমস্ত লোকগুলো সত্যি করেই যেন একটা বিরাট মূর্খে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

ভিড় ঠেলে সৈনিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল স্মুরি।

'আমার হাতে দে ছুরিটা!'

'আচ্ছা, নিয়ে নাও,' বলতে বলতে সে ছুরিটা ওর হাতে তুলে দিল। বাবুর্চি ছুরিটা আমার হাতে দিয়ে ধাক্কা মেরে ওকে কেবিনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল:

'শুয়ে ঘুমো গে যা! কী হয়েছে তোর?'

আর টুঁ শব্দটিও না করে সৈনিক বাঙ্কের উপরে বসে পড়ল।

'খাবি কিছু? কিছু খাবার আর ভদকা ছেলেটা এনে দেবে। ভদকা খাস?'

'অল্প অল্প খাই...'

'দেখ্, ওর গায়ে খবরদার হাত তুলবি না। ও তোকে ঠাট্টা করে নি। শুনেছিস? আমি বলছি ও করে নি...'

'কেন ওরা আমাকে এমনি করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে?' নরম সুরে প্রশ্ন করল সৈনিক।

মিনিটখানেক চুপ করে রইল স্মুরি, তারপর বলল:

'সে কথা আমি জানি ভাবছিস?'

আমি আর স্মুরি রান্নাঘরে ফিরে এলাম।

'হুম! আচ্ছা, একটা অভাগা জীবের পেছনে লেগেছিল সবাই,' পথে যেতে যেতে বলল, 'দেখলি তো? মানুষ তোকে পাগল করে দিতে পারে, বুঝলি রে ভাই? তা পারে ওরা... ওরা ছারপোকার মতো তোর গায়ে কামড়ে ধরে থাকবে। তারপর ঠেলা বোঝো! কী বলছিলাম আমি—ছারপোকা? ওরা ছারপোকার চাইতেও হাজারগুণ খারাপ...'

খানিকটা রুটি মাংস আর ভদকা নিয়ে যখন সৈনিকটিকে দিতে গেলাম তখন দেখি বাঙ্কের উপরে বসে মেয়েছেলেদের মতো দুলে দুলে কাঁদতে শুরু করেছে। থালাগুলো রাখলাম টেবিলের উপরে।

'খাও,' বললাম ওকে।

'দোরটা ভেজিয়ে দে।'



'অন্ধকার হবে যে।'

'বন্ধ করে দে, নইলে আবার ওরা এসে পড়বে।'

বেরিয়ে এলাম। আদৌ ভালো লাগছিল না আমার সৈনিকটাকে, ওর জন্যে এতটুকু দয়া বা সহানুভূতি হচ্ছিল না আমার। তাতে আরো যেন বেশি অস্বস্তি লাগতে লাগল, দিদিমা সব সময়েই বলতেন আমাকে:

'মানুষকে করুণা করতে হয়—ওরা বড়ো গরীব, বড়ো হতভাগা। জীবনভোর লড়াই করেই চলেছে...'

'দিয়েছিস ওকে?' ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল স্মুরি, 'কেমন আছে এখন?'

'কাঁদছে।'

'আরে ছ্যা! ছেঁড়া ন্যাকড়া কোথাকার! ওকে আবার সৈনিক বলে?'

'ওর জন্যে একটুও দুঃখ হচ্ছে না আমার।'

'তার মানে?'

'মানুষের উচিত মানুষকে দয়া করা...'

স্মুরি হাত ধরে আমাকে তার কোলের কাছে টেনে নিল।

'জোর করে কি আর দুঃখ অনুভব করা যায়? মিছে কথা বলেও লাভ নেই কিছু, বুঝেছিস?' গভীরভাবে বলল স্মুরি, 'মনটাকে নরম করে তুলিস না, নিজের মনটাকে চিনতে শেখ...'

তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিমর্ষ মুখে বলল:

'এটা তোর জায়গা নয়। নে, একটা সিগারেট খা!'

যাত্রীদের ব্যবহারে মনটা দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ওরা যেভাবে সৈনিকটির পিছনে লেগেছিল, স্মুরি ওর কান ধরতে যেমন করে ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, তাতে কেমন যেন একটা অব্যক্ত অপমানবোধের অনুভূতি জেগে উঠছিল আমার মনে। কেমন করে ওরা উপভোগ করতে পারল! ওর মধ্যে অমন হৈচৈ মজার কী দেখল ওরা?

আবার ওরা ডেকের উপরে শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল: কেউ খাচ্ছে, কেউ পান করছে, কেউ বা তাস পিটছে, সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় শান্ত ভাবে করছে গল্পগুজব, কেউ বা নদীর দিকে তাকিয়ে। ঘণ্টাখানেক আগেই যারা হল্লা করেছে, শিস দিয়েছে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, এরা যেন সে মানুষই নয়, আবার ওরা ঠিক আগেরই মতো শান্ত, অলস। রোদের ঝিলিমিলির ভিতরে পোকা বা ধুলোকণার মতো ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্থর গমনে

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মাত্র ডজনখানেক লোক ভিড় করে এসে দাঁড়াল সিঁড়ির সামনে, জেটির উপরে নেমে যাওয়ার আগে ক্রুশ করল। আবার ঠিক ওদেরই মতো ডজনখানেক উঠে এল, পরনে ওদেরই মতো জামাকাপড়, ঠিক তেমনি থলে, পুলিন্দা ইত্যাদি বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে।

ক্রমাগত এই লোক বদলে স্টিমারের উপরের জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অন্যেরা যে সব কথা আলোচনা করে গেছে সেই একই কথার আলোচনা করে নতুন যাত্রীরা: সেই জমি, চাকুরী, ঈশ্বর আর মেয়েমানুষের কথা, এমন কি ভাষাও সেই একই।

'ভগবানের ইচ্ছেতেই আমরা দুঃখকষ্ট ভোগ করি, এমনি ভোগ করেই যাব! এর আর কী করবে বলো, সবই আমাদের অদৃষ্ট...'

বিশ্রী বিরক্তিকর এসব আলোচনা। নোংরামি আমি সহ্য করতে পারি না; অন্যায় ভাবে কেউ আমার উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে তাও সহ্য করার ইচ্ছে নেই আমার। আমি নিশ্চিত জানি এমন কোনো অন্যায় কাজ আমি করি নি যাতে ঐ ধরনের ব্যবহার পেতে পারি। ঐ সৈনিকটিও পেতে পারে না। সেও অমন করে হাস্যাস্পদ হতে চায় নি নিশ্চয়ই...

গম্ভীর প্রকৃতির সহৃদয় মাক্সিমকে ওরা তাড়িয়ে দিল, আর রেখে দিল কিনা ঐ ঘৃণ্য সের্গেইটাকে। যারা নিরীহ ভালো মানুষকে নির্যাতন করে পাগল করে দিতে পারে, তারাই আবার কেন জাহাজীদের রুক্ষ কণ্ঠের হুকুম তামিল করে মুখ বুজে? বিনা প্রতিবাদে বরদাস্ত করে তাদের অভদ্র গালাগালি?

'রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে যা!' শয়তানীভরা সুন্দর চোখ দুটো কুঁচকে খেঁকিয়ে ওঠে সারেঙ্গ, 'দেখতে পাচ্ছিস না স্টিমারটা একপাশে কাত হয়ে পড়েছে? সরে যা শয়তানের দল!'

শয়তানের দল একান্ত বশংবদের মতো ডেকের অন্য দিকে সরে যায়, সেখান থেকে আবার তাড়া খায় ভেড়ার পালের মতো।

'ভাগ, ছুঁচোর দল!'

গ্রীষ্মের রাতে ধাতুর ছাদের তলে অসহ্য গরম। সারাদিন রোদে পুড়ে আগুন হয়ে থাকে ছাদটা। যাত্রীরা আরশুলার মতো হামা দিয়ে বেরিয়ে এসে যে যেখানে পারে ডেকের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে: প্রত্যেক ওঠা-নামার ঘাটে জাহাজীরা ওদের লাথি, ঘুসি মেরে তুলে দেয়।

'এ-ই রাস্তা ছেড়ে ভাগ নিজের জায়গায়!'

ওরা উঠে ঘুমভরা চোখে যেদিকে সেদিকে চলে যায়।

যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজীদের পার্থক্য শুধু পোশাকে, তবুও পুলিসের মতোই তারা হুকুম চালায় ওদের উপরে।

যাত্রীদের সম্পর্কে সবচাইতে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হল তাদের লজ্জা, ভীরুতা আর বিষণ্ণ বৈরাগ্য। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য লাগে যখন ওদের ঐ বৈরাগ্যের পাতলা খোলস ফেটে গিয়ে পাশবিক ফুর্তি জেগে ওঠে, যদিও সে ফুর্তি আনন্দদায়ক নয়। আমার কেমন যেন মনে হত ওরা জানে না ওদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহাজটায়, ওদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে সে সম্পর্কে এতটুকুও ঔৎসুক্য নেই ওদের মনে। যখন নেমে যায়, সে শুধু যেন অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে তীরে অন্য কোনো একটা স্টিমারে ওঠার জন্যে, সে জাহাজ তাদের নিয়ে যাবে অন্য কোথাও। ওদের কারুর যেন ঘর নেই বাড়ি নেই, ভবঘুরের দল: সব দেশই ওদের কাছে প্রবাস আর সবাই ওরা ভীরুর অধম।

একদিন দুপুর রাতের পরে একটা মেশিন গেল ভেঙে। ঠিক কামানের মতো আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফাটল পথে ইঞ্জিনঘরের যতো বাষ্প ঘোর হয়ে এসে ছেয়ে ফেলল ডেক। কানে তালা লাগানো আওয়াজে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল:

'গাব্রিলো! এক টুকরো ফেল্ট আর লাল সীসে নিয়ে আয়!'

আমি ঘুমোতাম ইঞ্জিনঘরের পাশের ঘরে ডিশ-ধোয়া টেবিলের উপরে। বিস্ফোরণের শব্দে আর ধাক্কায় যখন আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখনো ডেকের উপরটা শান্ত। মেশিন থেকে বাষ্প বেরচ্ছে আর দ্রুত তালে চলছে হাতুড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই ডেকের যাত্রীরা এমন তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল যে সে এক ভীষণ ব্যাপার।

সেই দ্রুত অপসৃয়মান কুয়াশার ভিতরে আলুথালু চুল মেয়েরা আর ড্যাবা ড্যাবা চোখ উস্ক-খুস্ক পুরুষেরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। একজন আর একজনকে ফেলে দিচ্ছে ধাক্কা মেরে; সুটকেশ, বিছানা, লটবহর টানাটানি করছে সবাই; হুমড়ি খেয়ে পড়ছে একজন আরেকজনার গায়ে, মারামারি করছে, কেউ ভগবানের নাম জপছে, কেউ নাম করছে সেণ্ট নিকোলাইয়ের। সে এক মহামারি দৃশ্য, তবুও ভারি মজার। আমি ওদের পিছন পিছন ছুটে ছুটে দেখছি ওরা কী করে?

রাতের পাগলা-ঘণ্টির এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, তবুও কেন যেন আমার মনে হয়েছিল এ সব সত্যি নয়—মিথ্যে। ডান তীর ধরে স্টিমার চলেছে স্বাভাবিক গতিতে, চলেছে খুব কাছ ঘেঁসে—খড়-কাটাদের আগুনের পাশ দিয়ে। জ্যোৎস্না রাত, মাথার উপরে ভরা চাঁদ আলোয় ঝলমল করছে।

কিন্তু লোকগুলো আরো বেশি উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিল, বেরিয়ে এল কেবিনের যাত্রীরা। কে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, তার দেখাদেখি আরো অনেকে লাফিয়ে পড়ল; দুজন চাষী আর এক সন্ন্যাসী মিলে কয়েকটা ডাণ্ডা টেনে বের করে ডেকের পাটাতনের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো একটা বেঞ্চ উপড়ে ফেলে দিল; বড়ো এক খাঁচা মুরগী উল্টে ফেলে দিল পাছ-গলুইয়ের উপর থেকে; ডেকের মাঝখানে ক্যাপটেনের মঞ্চের সিঁড়ির সামনে এক চাষী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর ওর পাশ দিয়ে যেই ছুটে গেল, তাকেই নমস্কার করে নেকড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল:

'ওগো খৃষ্টানেরা, আমি পাপী!'

'একটা নৌকা নিয়ে আয় শয়তানের দল!' মোটা সোটা এক ভদ্রলোক দুহাতে বুক চাপড়ে চ্যাঁচাতে শুরু করেছে, তার পরনে শুধু একটা পায়জামা।

জাহাজীরা ছুটে এসে ওদের ঘাড় ধরে কিল ঘুঁসি মারতে মারতে একপাশে ঠেলে দিতে লাগল। রাত্রিবাসের উপরে একটা কোট চাপিয়ে ভারি পায়ে স্মুরি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল আর বজ্রকণ্ঠে প্রত্যেকটি লোককে বলল:

'লজ্জাও করে না! একেবারে পাগল হয়ে গেছিস সব? স্টিমার ঠিকই আছে, ডুবছে না। নদীর পাড় দুহাত দূরে। যে সব বেকুফ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ দেখ খড়-কাটারা তাদের তুলে এনেছে। ঐ দেখ্ তারা—দেখেছিস দুনৌকা বোঝাই।'

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মাথায় স্মুরি ঘুসো মারতে শুরু করল আর ওরা ডেকের উপরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল বস্তার মতো।

উত্তেজনা তখনো থামে নি। ব্লাউজ-পরা একটি মহিলা চামচ হাতে স্মুরির দিকে তেড়ে এসে চিৎকার করে উঠল:

'তোর এতো বড়ো সাহস!'

একটি ভদ্রলোক ধরে ফেলল তাকে। তার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে।

'ছেড়ে দাও, ও একটা মূর্খ...' গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে বলল ভদ্রলোক।

হকচকিয়ে গিয়ে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল স্মুরি, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

'কেমন লাগছে ব্যাপারটা? কী চায় মেয়েটা আমার কাছে? জীবনে কোনো দিন চোখেও দেখি নি ওকে!'

বেঁটেখাটো চেহারার একটি চাষী নাক দিয়ে ঝরে পড়া রক্ত টানতে টানতে চিৎকার করল:

'আচ্ছা লোক বটে সবাই! ডাকাত!'

গ্রীষ্মকালের ভিতরেই দু-দুবার দেখলাম স্টিমারের উপরে এমনি আতঙ্কের দৃশ্য। দুবারই সত্যিকার বিপদ কিছু ঘটে নি, শুধু ভয়। তৃতীয় বার যাত্রীরা ধরল দুটো চোর, একটার পরনে তীর্থযাত্রীর বেশ। জাহাজীদের চোখের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওরা ঘণ্টাখানেক ধরে পিটল দুটোকে। শেষ পর্যন্ত জাহাজীরা যখন যাত্রীদের হাত থেকে ওদের উদ্ধার করল, ওরা দল বেঁধে তেড়ে এল জাহাজীদের।

'চোরকে লুকিয়ে রাখছে যত চোর, তোদের চিনি আমরা!' যাত্রীরা চ্যাঁচাতে লাগল।

'তোরাও ওদের দলের তাই ওদের বাঁচাতে চাইছিস।'

মারের চোটে ওরা অজ্ঞান করে ফেলেছিল চোর দুটোকে। পরের জেটিতে যখন তাদের পুলিসের হাতে জিম্মা করে দেয়া হল, তখনো তারা হাঁটতে পারছিল না।

এমনি কতো কী যে ঘটত — খুবই মন খারাপ হয়ে যেত, অবাক হয়ে ভাবতাম মানুষ স্বভাবত ভালো না মন্দ, শান্ত না ভয়ঙ্কর? কেন মানুষ এমন নিষ্ঠুর, এমন হিংস্র আর সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্লজ্জ পদলেহী হয়?

বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ সম্পর্কে। প্রত্যুত্তরে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখটা ঢেকে একটু বিরক্তির সঙ্গে সে জবাব দিয়েছিল:

'তোর তাতে কী? মানুষ, মানুষ। কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। এ সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বই পড়্, বইয়ের ভিতরেই সবকিছুর জবাব পাবি অবশ্য যদি ঠিক বই পড়িস।'

ধর্মগ্রন্থ বা 'সাধুদের জীবনী' এসবের কোনো কদর ছিল না ওর কাছে।

'ওসবের দরকার পুরুত আর তাদের ছেলেপুলেদের।'

ওর জন্যে কিছু একটা করবার ইচ্ছেয় ঠিক করলাম একখানা বই ওকে উপহার দেব। কাজানের স্টিমার ঘাটায় পেঁছে 'এক সৈনিক কর্তৃক মহান পিটারের উদ্ধার কাহিনী' কিনে নিয়ে এলাম পাঁচ কোপেক দিয়ে। কিন্তু বাবুর্চি তখন নেশায় টঙ, ভয়ঙ্কর মূর্তি তার। তাই ঠিক করলাম ওকে

দেয়ার আগে নিজেই একবার পড়ে নিই। খুব ভালো লাগল আমার বইটা। সব ঘটনা এমন সহজ, প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত আর মজার যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, বইটা ওকে খুবই আনন্দ দেবে। কিন্তু বইটা ওর হাতে দিতেই কোনো কথা না বলে বইটাকে দুমড়ে মুচড়ে তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

'তোর বইয়ের স্থান হচ্ছে ওখানে, মূর্খ!' মুখ গোমড়া করে বলল, 'রাত দিন তোকে আমি পাখিপড়া করে শেখাচ্ছি যাতে শিকারী কুকুর হয়ে উঠতে পারিস, আর তোর নজর কিনা আরশুলা ধরার দিকে?'

পা আছড়ে চিৎকার করে উঠল স্মুরি:

'ওটা কোন জাতের বই শুনি? সব বাজে! ওর সব আমার পড়া আছে। ওসব সত্যি কথা বলতে চাস? আয় এদিকে, বল!'

'আমি জানি না।'

'বেশ শোন তবে, আমি জানি। প্রথম যে লোকটা উঠে এসেছিল, যদি ওরা তার মাথাটা কেটে ফেলে দিত, তাহলে নিশ্চয়ই সে পড়ে যেত মই থেকে। বাকি কেউ আর খড়ের গাদায় উঠে আসত না, সৈনিকেরা বোকা নয়। ওরা তখন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিত আর সেখানেই সব শেষ হয়ে যেত! বুঝেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তবেই বুঝে দেখ্! জার পিটার সম্পর্কে আমি সব জানি, ও ধরনের কোনো কিছুই ঘটে নি তাঁর জীবনে! যা দূর হ!'

বুঝলাম, বাবুর্চির কথাটা ঠিক, কিন্তু তবুও বইটা ভালো লেগেছে আমার। বইটা আবার কিনে এনে পড়লাম দ্বিতীয়বার। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম, দেখলাম বইটা সত্যি সত্যিই বাজে। নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম; সেই থেকে বাবুর্চির উপরে আমার আস্থা ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এর পর থেকে কেন জানি প্রায়ই সে বলত:

'তোকে পড়তে হবে! এটা তোর উপযুক্ত জায়গা নয়...'

আমারও মনে হত কথাটা ঠিক, এটা আমার উপযুক্ত স্থান নয়। সের্গেই আমার সঙ্গে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার শুরু করেছে: বহুবার আমার টেবিল থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে স্টুয়ার্ডের অলক্ষ্যে যাত্রীদের সার্ভ করেছে সেটা আমি দেখেছি। জানতাম একে চুরি বলে। বহুবার স্মুরি হুঁসিয়ারী করে দিয়েছিল আমাকে:

'সাবধান! দেখিস যেন ওয়েটাররা তোর টেবিল থেকে চায়ের সরঞ্জাম না মারে!'

আমার পক্ষে খারাপ এমনি আরো অনেক কিছুই ছিল, প্রায়ই ইচ্ছে হত পরের ঘাটায় নেমেই স্টিমার ছেড়ে পালিয়ে যাই বনে। কিন্তু বাধা দিত স্মুরি: মনে হত ক্রমেই আমার উপরে ওর আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। আর আমাকেও আকৃষ্ট করে রাখছিল স্টিমারের অবিশ্রাম গতি। ঘাটে ঘাটে থামাটা বিশ্রী লাগত আমার: নতুন কিছু ঘটনার জন্যে সব সময়েই মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। মনে হত কামা ছাড়িয়ে জাহাজটা চলে যাক বেলায়া, বেলায়া ছাড়িয়ে দূরে বহু দূরে ভিয়াৎকা বা ভলগায়, সেখানে দেখতে পাব কতো নতুন তীর, শহর, নতুন মানুষ।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। হঠাৎ একদিন আমার জাহাজী জীবনের উপরে নেমে এল আকস্মিক আর লজ্জাকর এক যবনিকা। কাজান থেকে নিজনি-নভগরোদ যাবার পথে স্টুয়ার্ড একদিন সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠাল। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে স্মুরি বসেছিল কার্পেট বিছনো একটা টুলের উপরে। স্টুয়ার্ডের সামনে হাজির হতেই দোরটা বন্ধ করে দিয়ে সে স্মুরিকে বলল:

'এই যে এসে গেছে।'

'চামচ আর অন্য সব জিনিস তুই দিয়েছিলি সের্গেইকে?' রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'আমার অসাক্ষাতে ও নিয়ে যায় টেবিল থেকে।'

'ওকে দেখিস নি নিতে, কিন্তু জানিস যে ও নেয়,' শান্ত গলায় বলল স্টুয়ার্ড।

স্মুরি উরুর উপরে একটা থাপ্পড় মেরে তারপর জায়গাটা চুলকতে লাগল।

'তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই,' বলল স্মুরি, তারপর কী যেন ভাবতে লাগল।

আমি তাকিয়ে রইলাম স্টুয়ার্ডের দিকে আর স্টুয়ার্ড আমার দিকে। মনে হল চশমার আড়ালে ওর চোখ দুটো যেন নেই।

খুব চুপচাপ থাকে স্টুয়ার্ড। নিঃশব্দে চলা ফেরা করে, কথা বলে আস্তে — খুবই নিচু গলায়। কখনো কখনো ওর ধূসর দাড়ি আর দুচোখের শূন্য দৃষ্টি কোনো একটা কোণে হঠাৎ দেখা দিয়ে পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। শুতে যাবার আগে বহুক্ষণ ধরে আইকন আর আইকনের কাছে অনির্বাণ প্রদীপের সামনে বসে থাকে হাঁটু গেড়ে। কিন্তু তার দরজার হরতন আকারের ফুটো

ভিতর দিয়ে অনেক তাকিয়েও কখনো তাকে প্রার্থনা করতে দেখতে পাই নি। শুধুমাত্র হাঁটু গেড়ে বসে আইকন আর প্রদীপের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে আর আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

'পয়সা দিয়েছে তোকে সের্গেই?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল স্মুরি।

'না।'

'কখনো দেয় নি?'

'কখনো না।'

'মিছে কথা বলবে না ও,' স্টুয়ার্ডের কাছে বলল স্মুরি। কিন্তু ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল স্টুয়ার্ড:

'কিছুই এসে যায় না তাতে, বুঝলে?'

'চলে আয়,' আমার টেবিলের কাছে এসে মাথার পিছন দিকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠল স্মুরি, 'বোকা কোথাকার! আর আমিও একটা আহাম্মক, আমার নজর রাখা উচিত ছিল তোর দিকে...'

নিজনি-নভগরোদে পেঁছে স্টুয়ার্ড আমার হিসেবপত্র চুকিয়ে দিল: প্রায় আট রুবলের মতো পেলাম। জীবনে এই প্রথম একটা মোটা টাকা পেলাম নিজের রোজগারের।

বিদায় নেবার সময়ে বিষণ্ণ ভাবে স্মুরি বলল:

'হুঁ, ভবিষ্যতে চোখ্ দুটো খোলা রেখে চলিস, বুঝেছিস? উড়ো মাছির পেছনে ছুটিস নে...'

আমার হাতের ভিতরে চকচকে একটা তামাকের বটুয়া গুঁজে দিল।

'নে ধর! চমৎকার কাজ করা, আমার ধর্ম মেয়ে নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিল আমাকে... আচ্ছা চলি তবে! বই পড়িস — করার যোগ্য ঐ একটি মাত্র ভালো কাজই আছে।'

দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে উঁচু করে তুলে চুমু খেল, তারপর শক্ত হাতে জেটির ওপর নামিয়ে দিল। দারুণ কষ্ট হচ্ছিল আমার ওর জন্যে, নিজের জন্যেও। ঐ বিরাট দেহ, নিঃসঙ্গ মানুষটা যখন জাহাজী খালাসীদের ভিতর দিয়ে পথ করে করে স্টিমারে ফিরে গেল তখন আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না...

পরবর্তীকালে এই ধরনের কতো সহৃদয়, নিঃসঙ্গ, নিঃসংসার লোকের সঙ্গে যে দেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

৭

দিদিমা আর দাদু আবার ফিরে এসেছিলেন শহরে। একটা ক্রুদ্ধ ঝগড়াটে মনোভাব নিয়ে ফিরে গেলাম তাঁদের কাছে। অন্তর ভারি হয়ে ছিল: কেন আমাকে চোর বদনাম দিল ওরা?

পরম স্নেহে দিদিমা আমাকে কোলে টেনে নিলেন, তারপরেই চলে গেলেন সামোভার গরম করতে। কিন্তু দাদু তাঁর স্বভাবসুলভ বিদ্রূপের সুরে বললেন:

'অনেক সোনা দানা জমিয়েছিস বুঝি?'

'যা কিছু জমিয়েছি তা আমার নিজের,' জানালার পাশে বসে পড়ে বললাম। পরক্ষণেই খুব চালের সঙ্গে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ধরালাম।

'ওহো!' আমার প্রত্যেকটি হাবভাব লক্ষ করতে করতে বলে উঠলেন দাদু, 'বটে! এরই মধ্যে ঐ শয়তানের চুরুট ধরেছিস, দেখি! বড্ডো শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধরা হল নাকি?'

'তামাকের বটুয়াও আছে আমার,' বললাম বুক ফুলিয়ে।

'তামাকের বটুয়া?' টেনে টেনে বলে উঠলেন দাদু, 'মতলবটা কী, আমার পেছনে লাগতে চাস?'

কাঠের মতো শীর্ণ শক্ত হাত দুটো বাড়িয়ে তেড়ে এলেন আমাকে, সবুজ রঙের চোখ দুটো চক চক করে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে তাঁর পেটের উপরে এক গুঁতো মারতেই বুড়ো মেঝের উপরে ধপ করে বসে পড়লেন। তেমনি করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগলেন, কালো মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে। তারপর শান্ত গলায় বললেন:

'বটে, শেষকালে আমার গায়ে হাত তুললি তুই — তোর নিজের দাদুর গায়ে? তোর নিজের মায়ের বাপের গায়ে?'

'আমিও ঢের মার খেয়েছি তোমার হাতে,' কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে বুঝতে পেরে বিড় বিড় করে বলে উঠলাম।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাদু আমার পাশে এসে বসলেন। হাত থেকে সিগারেটটা ফস করে কেড়ে নিয়ে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'ওরে মূর্খ! জানিস না, যতদিন বেঁচে থাকবি এর জন্যে কোনো দিন

ভগবান তোকে ক্ষমা করবেন না?' ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন। তারপর দিদিমার দিকে ফিরে আবার বললেন, 'ভাবো দেখি নি একবার ভারব্যশার মা! ও কিনা মারলে আমাকে! ও! মারলে। শুধোও ওকে, সত্যি না মিথ্যে।'

আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ধার না ধেরে কাছে এসে আমার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন দিদিমা:

'ফলটা কেমন বুঝুক একবার! কেমন! কেমন!' বললেন দিদিমা।

দিদিমার মারে আমার গায়ে কিছু ব্যথা লাগে নি, কিন্তু মনে মনে দারুণ আঘাত পেলাম। বিশেষ করে যখন দাদু বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলেন। চেয়ারের উপরে লাফালাফি জুড়ে দিলেন তিনি, উরুর উপরে চাপড় মারলেন আর খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলতে লাগলেন:

'ঠিক হয়েছে! উচিত শিক্ষে।'

দিদিমার মুঠো থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটে দোরের পথে গিয়ে হতাশায় আর দুঃখে এক কোণে শুয়ে পড়লাম আর শুনতে লাগলাম সামোভারের শোঁ শোঁ শব্দ।

বেরিয়ে এলেন দিদিমা। ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে অস্পষ্ট স্বরে ফিস্ ফিস্ করে বললেন:

'নে হয়েছে, ওঠ! সত্যি সত্যি তো আর মারি নি, মেরেছি? শুধু দেখাবার জন্যে করেছি ওটুকু, উপায় কী বল! যাই হোক না কেন তোর দাদু বুড়ো মানুষ, তাঁকে তোর মান্য করা উচিত। ওঁরও হাড্ডি চুর হয়ে গেছে— ভেঙে পড়েছে, দুঃখে কষ্টে বুক ভেঙে গেছে। ওঁকে তুই আর আঘাত দিস নি কখনো। এখন আর ছোটটি নোস, বুঝতে পারিস সব... তোকে বুঝতে হবে আলিয়শা! ও এখন একটি আস্ত বুড়ো খোকা।'

দিদিমার কথাগুলো যেন উষ্ণ জলের ধারার মতো আমার সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করে তুলল। তাঁর সৌহার্দভরা কথার মর্মর ধ্বনি আমার অন্তরের সব ব্যথা বেদনা মুছে দিয়ে গেল। পরিবর্তে জেগে উঠল নিদারুণ লজ্জা। দৃঢ় আলিঙ্গনে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে দুজনে দুজনকে চুমু খেলাম।

'যা, ভিতরে যা ওঁর কাছে। যা, দেখবি'খন সব ঠিক হয়ে গেছে! শুধু দেখিস হঠাৎ যেন আবার আগের মতো ওঁর সামনে সিগারেট ধরাস নে, সয়ে নেবার সময় দে একটু...'

ঘরে ঢুকে দাদুর দিকে তাকিয়ে আর হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না: কচি শিশুর মতো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠেছেন, মুখখানা জ্বলজ্বল

করছে, পা দাপড়াচ্ছেন, বড়ো বড়ো লাল চুলে ভরা দুটো হাত দিয়ে টেবিল চাপড়াচ্ছেন।

'কি, আবার গুঁতোতে এসেছিস নাকি রে, খুদে ছাগল, অ্যাঁ? ব্যাটা খুদে ডাকাত! ঠিক বাপেরই মতো! বাড়িতে ঢুকেই ক্রুশ পর্যন্ত না করে আগেই সিগারেট ধরানো হয়েছে কেমন! আরে ছ্যা, ব্যাটা এক কোপেকের খুদে বোনাপার্ট!'

কোনো জবাব দিলাম না তাঁর কথার। কথা ফুরিয়ে যেতে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলেন, কিন্তু চা খাবার সময় আবার আমাকে উপদেশ দিতে লাগলেন:

'ঘোড়ার যেমন লাগাম দরকার, মানুষেরও তেমনি দরকার ভগবানের ভয়। ভগবান ছাড়া আর কেউ আমাদের বন্ধু হতে পারে না! মানুষ হচ্ছে মানুষের সবচাইতে বড়ো শত্তুর!'

মানুষ মানুষের সবচাইতে বড়ো শত্রু — কথাটার সত্যতা আমার মনে লাগল, কিন্তু তাঁর অন্য কোনো কথায় কান দিলাম না।

'আবার তোকে তোর মাত্রিওনা দিদিমার কাছে কাজ করতে যেতে হবে। তারপর বসন্তকাল এলে পরে ফের জাহাজের কাজে ফিরে আসিস, শীতকালটা ওদের কাছে কাটিয়ে দিয়ে আয় গে। কিন্তু খবর্দার বলিস নে যেন যে বসন্তকালে ছেড়ে চলে আসবি...'

'কেন মানুষকে ধোঁকা দেওয়া?' বললেন দিদিমা। কিন্তু, এইমাত্র একটু আগেই দাদুকে বোকা বানিয়েছেন তিনি মিছিমিছি আমার চুল টেনে।

'মানুষকে ধোঁকা না দিয়ে বাঁচা যায় না,' জোর গলায় বললেন দাদু, 'কেউ পারে না।'

সেদিন সন্ধ্যেয় দাদু যখন প্রার্থনা বই পড়তে আরম্ভ করলেন, দিদিমা আর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতরে চলে গেলাম। ছোট্ট দুটি মাত্র জানালাওয়ালা যে কুঁড়েঘরটায় দাদু থাকেন আজকাল সেটা হচ্ছে শহরের কিনারায় কানাত্‌নায়া স্ট্রীটের শেষে। এককালে এখানে তাঁর নিজের একটা বাড়ি ছিল।

'দেখ একবার, কোথায় আমরা আবার উঠে এসেছি!' হাসতে লাগলেন দিদিমা। 'তোর দাদু কোথাও মনের শান্তিতে বাস করতে পারেন না, তাই অনবরতই আজ এখানে কাল ওখানে করে বেড়াচ্ছেন। এটাও অবশ্য ও'র পছন্দ নয়, আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে।'

সামনে ভার্স্ট দুই বিস্তৃত মাঠ, শীর্ণ ঘাসের চাপড়ায় ছাওয়া, মাঝে

মাঝে খাদ কাটা। শেষপ্রান্তে কাজান সড়কের সারবন্দী বার্চ গাছ। খাদের ভিতর থেকে ফুঁড়ে ওঠা কাঠির মতো ডগাগুলোর উপরে অস্তগামী সূর্যের উত্তাপহীন আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে রক্তমাখা চাবুকের মতো দেখাচ্ছে। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে ঘাসগুলো দুলছে আর তারই দোলায় দুলছে কাছের খাদের ওপারে শহর থেকে আসা তরুণ-তরুণীর চলমান যুগল ছায়ামূর্তি। দূরে ডানদিকে বিরোধী-মতাবলম্বীদের কবরস্থানের লাল দেয়াল, ওটা বুগ্রুভ্স্কি আশ্রম বলে পরিচিত। আর বাঁয়ের দিকে যেখানে কালো হয়ে গাছগুলো গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে সেখানে ইহুদিদের কবরখানা। সব কিছুই যেন জীর্ণ, দীনহীন, ভাঙাচোরা মাটি আঁকড়ে সব কিছুই যেন পড়ে আছে নিঝুম হয়ে। শহরের প্রান্তের এই কুঁড়েঘরের জানালাগুলো যেন ধুলোভরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ ঠারছে, কতগুলো খেতে না পাওয়া রোগা রোগা মুরগী চড়ে বেড়াচ্ছে রাস্তাটার উপরে। দেভিচি মঠের সামনে দিয়ে হাম্বা রবে ডাকতে ডাকতে চলেছে গরুর পাল; কাছের কোন এক ছাউনি থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধের বাজনা — জয় ঢাকের উচ্চশব্দ, শিঙার আওয়াজ।

এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে পথ বেয়ে চলেছে একটা মাতাল। একর্ডিয়নটা জোরে বাগিয়ে ধরে আপন মনে বিড় বিড় করছে:

'দাঁড়া, গিয়ে পেঁছিব নির্ঘাত...'

'কার কাছে যাচ্ছিস রে বেকুফ?' অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলোর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে বললেন দিদিমা, 'এক্ষুণি তো রাস্তায় পড়ে গিয়ে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে থাকবি। আর ঘুমের মধ্যে ওরা তোকে ন্যাংটো করে সবকিছু খুলে নিয়ে যাবে... তোর ঐ এতো সাধের একর্ডিয়নটা পর্যন্ত...'

দিদিমার কাছে জাহাজী জীবনের কথা বলতে বলতে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। যে সব দৃশ্য দেখে এসেছি তারপরে বর্তমানের এই পরিবেশ কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছিল, মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। একান্ত নিবিষ্ট মনে দিদিমা শুনছিলেন আমার কথা, আমি যেমন করে সব সময়েই তাঁর কথা শুনে থাকি। স্মুরির কথা বলতে দারুণ খুশি হয়ে উঠে দিদিমা ক্রুশ করে বললেন:

'আঃ চমৎকার, খুব ভালো মানুষ! মেরীমা ওকে আশীর্বাদ করুন! তুই যেন ওকে ভুলে যাস নে কখনো! ভালো যা কিছু সব সময়েই তা মনের ভিতরে গেঁথে রাখবি আর যা কিছু খারাপ দূর করে দিবি মন থেকে...'

কেন যে জাহাজের কাজ থেকে জবাব হয়েছে সে কথাটা বলতে পারছিলাম না কিছুতেই, শেষ পর্যন্ত দাঁত মুখ চেপে কোনো রকমে বলে ফেললাম কথাটা। শুনে এতটুকুও ভাবান্তর হল না দিদিমার।

'এখনো বড্ডো ছোট আছিস কিনা, তাই সংসারে কেমন করে চলতে হয় তা শিখিস নি এখনও,' একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে বললেন দিদিমা।

'সবাই সবাইকে বলে শুনি যে সংসারে কেমন করে চলতে হয় তা তারা শেখে নি। চাষীরা বলে, জাহাজীরা বলে, মাত্রিওনা দিদিমাও বলে তার ছেলেকে প্রায়ই। কিন্তু শেখবার কী আছে এর ভিতরে?'

ঠোঁট চেপে দিদিমা মাথা নাড়তে লাগলেন।

'তা আমি জানি না,' বললেন দিদিমা।

'কিন্তু তুমিও তো প্রায়ই বলে থাকো!'

'কেন বলব না বল?' শান্ত কণ্ঠে বললেন দিদিমা, 'কিন্তু তার জন্যে মনে দুঃখ করিস না, তুই এখনো নেহাৎ ছোট, কেমন করে সংসারে চলতে হয় এই বয়সেই তোর পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া জানেই বা কে? শুধু যারা চোর তারা। যেমন ধর তোর দাদু — চালাক চতুর মানুষ, পেটে কিছু বিদ্যাও আছে, কিন্তু তা কোনো উপকারেই তো এল না।'

'আচ্ছা, জীবনে তুমি কখনো সুখের মুখ দেখেছ?'

'আমি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সুখেরও, দুঃখেরও। পালা করে চলে...'

পিছনে লম্বা ছায়া টেনে দিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে লোকজন। ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছে পায়ে পায়ে, যেন ঐ ছায়াগুলোকে ঢেকে দিতে চাইছে। আরো ঘন হয়ে এসেছে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা। জানালার পথে ভেসে আসছে দাদুর অনুযোগভরা কণ্ঠস্বর:

'সব ক্রোধ আমার ওপর ঢেলে দিয়ো না, প্রভু। আমার যতটুকু শক্তি আছে সেই অনুপাতে শাস্তি দাও আমাকে...'

একটু হাসলেন দিদিমা।

'ভগবানের কান ঝালাপালা হয়ে গেল, তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন নিশ্চয়ই ওর উপরে!' বললেন দিদিমা, 'রোজ সন্ধ্যায় এমনি করে ঘ্যান ঘ্যান করে, কিন্তু কিসের জন্যে শুনি? ওর মতো বুড়ো মানুষের কিছুই তো চাইবার নেই, তবুও এমনি ধারা ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করেই চলেছে! রোজ সন্ধ্যেয় ওর গলার আওয়াজ পেয়ে ভগবান নিশ্চয় হেসে ওঠেন: ঐ আবার শুরু করেছে ভাসিলি কাশিরিন!.. হুঃ... বেশ, চল এখন শুয়ে পড়ি গে আমরা...'

ঠিক করলাম গাইয়ে পাখি ধরব; মনে হল জীবিকা অর্জনের ওটা একটা ভালো উপায়: আমি পাখি ধরে আনব আর দিদিমা বিক্রি করবেন। তাই ভেবে একটা জাল, আংটা আর ফাঁদ কিনে নিয়ে এলাম, তৈরী করলাম কয়েকটা খাঁচা। তারপর ভোর ভোর থাকতে একটা খাদের পাশে ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। একটা থলে আর ঝুড়ি নিয়ে দিদিমা আশেপাশে বনের ভিতরে শেষ ফলনের ব্যাঙের ছাতা, বেরি আর বাদাম খুঁজে ফিরতে লাগলেন।

সবেমাত্র উঠছে শরতের ক্লান্ত সূর্য। ম্লান আলোর রেখা কখনো মেঘের কোলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো বা রুপোলি পাখা মেলে দিচ্ছে আমার লুকিয়ে থাকা ঝোপের উপরে। খাদের তলায় এখনো গাঢ় অন্ধকার, জেগে উঠছে সাদা কুয়াশা; নালাটার একটা পাড় ভেজা, কাদায় পিছল, ঘাস-লতাহীন, শূন্য, অন্ধকার; অন্য পাড় অল্প ঢালু, ঘাস বহুল, উজ্জ্বল লাল হলুদ আর বাদামী পাতায় ভরা ঝোপে আচ্ছন্ন; সে পাতা বাতাসে খসে ছড়িয়ে পড়ছে খাদময়।

তলায় শেয়াকুলের ঝোপের ভিতরে কিচির-মিচির করছে মুনিয়া পাখি, শীর্ণ পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তাদের গর্বোন্নত ছোট ছোট মাথার উপরের লাল লাল ঝুঁটি। ছুটির দিনে কুনাভিনোর ছুঁড়িদের মতো শাদা শাদা গাল ফুলিয়ে সন্ধানী গলায় আমাকে ঘিরে সোরগোল তুলেছে ছোট ছোট চটক পাখি। ওরা চঞ্চল, চতুর, বাচাল — জানতে চায় সবকিছু, সবকিছুই চায় ছুঁয়ে ছেনে পরখ করতে, তাই একটার পর একটা এসে আমার পাতা ফাঁদে ধরা পড়তে লাগল। ওদের ছট্‌ফটানী দেখে দুঃখ লাগে, কিন্তু না, নির্বিকার হতে হবে আমাকে, ব্যবসায়ে নেমেছি আমি। ফাঁদ থেকে খুলে এনে পাখিগুলোকে একটা খাঁচার ভিতরে পুরে থলে চাপা দিয়ে ঢেকে রাখলাম যাতে শান্ত হয়ে চুপটি করে থাকে, এরই জন্যে এনেছিলাম খাঁচাটা।

রোদমাখা মেহেদির ঝোপের উপরে উড়ে এসে পড়ল এক ঝাঁক হরবোলা; সূর্যের আলোয় দারুণ খুশি হয়ে উঠে পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেদের মতো আনন্দে কিচির-মিচির করছে। কাঁটা গোলাপের দোলানো ডালের উপরে এসে বসেছে একটা হাঁড়িচাঁচা, দক্ষিণ অঞ্চলে উড়ে যেতে দেরি করে ফেলেছে; ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করতে করতে চকচকে দুটো কালো চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে শিকারের সন্ধানে। হঠাৎ ভরত-পাখির মতো তীর বেগে উড়ে গিয়ে বড়ো গোছের একটা মৌমাছি ধরে নিয়ে এল, তারপর

মৌমাছিটাকে কাঁটায় গেঁথে নিয়ে ধূসর রঙের মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চোরের মতো উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল। নিঃশব্দে উড়ে গেল একটা খঞ্জন, ওর একটা যদি ধরতে পারতাম! মনে মনে দারুণ আশা। লাল, সেনাপতির মতো গর্বিত ভঙ্গিতে দল ছেড়ে উড়ে এসে বার্চ ঝোপের উপরে বসল একটা সদা-সোহাগী, লেজ নাড়াতে নাড়াতে রেগে কিচির-মিচির শুরু করল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখির ঝাঁকও বেড়ে যেতে লাগল, আর ততই আনন্দমুখর হয়ে উঠতে লাগল তাদের গান। সমস্ত খাদটা সঙ্গীতে ভরপুর, আর তারই সঙ্গে সঙ্গত করে চলেছে হাওয়ায় কাঁপা বনের অবিশ্রাম মর্মর ধ্বনি। পাখিদের নিরবচ্ছিন্ন কূজনেও এই কোমল ব্যথা-মধুর বন-মর্মরকে ডুবিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এরই ভিতর দিয়ে যেন শুনতে পাচ্ছি গ্রীষ্ম-ঋতুর বিদায় সঙ্গীত, সে সঙ্গীত যেন ফিস্ ফিস্ করে মর্মবিদারী কথা কইছে, কথাগুলি যেন আপনা থেকেই কবিতার স্তবক হয়ে উঠছে ফুটে। আর জাগিয়ে তুলছে আমার মনে অতীতের যত কথা, যত স্মৃতি।

উপরের কোথা থেকে যেন ডেকে উঠলেন দিদিমা:

'কই রে, কোথায় গেলি?'

খাদের কিনারে সামনে রুমাল বিছিয়ে বসেছেন দিদিমা। রুমালের উপরে রুটি, শসা, শালগম, কয়েকটা আপেল; এই সব খাবার-দাবারের ভিতরে ঝক্ ঝক্ করছে নেপোলিয়নের মাথার মতো দেখতে একটা কাচের ছিপি-আঁটা ছোট পলা-কাটা কাচের কুঁজো, তার ভিতরে রয়েছে খানিকটা ভদকা — সেণ্ট জন লতার গন্ধ দেওয়া।

'হে প্রভু, সবকিছুই কী চমৎকার!' কৃতজ্ঞতার সুরে বলে উঠলেন দিদিমা।

'আমি একটা গান বেঁধেছি!'

'তুই নিজে? সত্যি?'

এই রকমের কয়েকটা লাইন আবৃত্তি করলাম:

হিম ঋতু এল ঐ
ফুলেরা বিদায় মাগে,
নিদাঘ মরিয়া যায়
স্তিমিত রবির রাগে!..

সবটা না শুনেই দিদিমা বলে উঠলেন:

'ঠিক অমনি আর একটা গান আছে, তবে সেটা আরো ভালো,' বলেই তিনি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন:

সাঁঝের সূর্য পাটে নামে ঐ
বুলবুলি গেছে উড়ে,
হেথা একাকিনী কুমারী হিয়ায়
ফাগুন রোদনে ভরে!

সকালের পথে ঘুরি একা একা
স্মরি সেই ফালগুনে
যেখানে আমায় ডেকেছিলে প্রিয়,
সে আকাশে শীত, আলো নিভে আসে
আজকে কপাল গুণে।

সন্ত কুমারী প্রিয় ভগিনীরা,
উত্তুর হাওয়া রোলে,
দাবদাহ জ্বালা এ হৃদয় রেখ
তুষার সমাধি তলে!..

আমার কবি অভিমান একটুকুও আহত হল না। অদ্ভুত সুন্দর লাগল আমার দিদিমার মুখের ঐ গানটা, মেয়েটির দুঃখে অন্তর ব্যথায় ভরে উঠল।

'দুঃখের গান এমনি করেই গাইতে হয়!' বললেন দিদিমা, 'গানটা গেয়েছিল ঐ মেয়েটি। গোটা বসন্তকাল ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে ফিরেছে মাঠে বাটে, কিন্তু যখন শীত এল, মেয়েটিকে একা ফেলে রেখে চলে গেল তার মানুষটি, হয়ত বা গেল অন্য কোনো প্রেমিকার কাছে। বুক ভাঙ্গা দুঃখে কাঁদতে লাগল মেয়েটি... নিজে না সইলে কি গান গাওয়া যায়। দেখ দেখি, কী চমৎকার গান বেঁধেছে মেয়েটি!'

প্রথমবারেই কয়েকটা পাখি বিক্রি করে চল্লিশ কোপেক পেয়ে দারুণ অবাক হয়ে গেলেন দিদিমা।

'কাণ্ডখানা দেখ! আমি তো ভেবেছিলাম কিচ্ছু হবে না এতে — নেহাৎ বাচ্চা ছেলের ঝোঁক। কিন্তু দেখ, কী রকম লাভ হল!'

'তবু তো তুমি শস্তায় বেচেছ...'

'তাই নাকি?'

হাটের দিনে দিদিমা এক রুবল বা তার চাইতেও বেশি রোজগার করে আরো বেশি অবাক হয়ে যেতেন। তুচ্ছ জিনিসেও কতো না টাকা আসে!

'মাত্র পঁচিশ কোপেকের জন্যে কেন এক একটা মেয়েছেলে দিনভর কাঁথা কাপড় কাচে, ঘর নিকোয়! এর আদৌ কোনো মানে হয় না! অন্যায়! আর পাখি ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখাও অন্যায়। এ কাজ ছেড়ে দে তুই, আলিয়শা!'

কিন্তু পাখি ধরায় মেতে উঠেছিলাম আমি, খুব মজা লাগত। তাতে শুধুমাত্র পাখিগুলোকে একটু অসুবিধায় ফেলা ছাড়া আর কারুর কোনো ক্ষতি না করে নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখে চলা যেত। আরো ভালো সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হলাম। পাখি ধরায় অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শিখে ফেললাম অনেক কিছু। একা একা তিরিশ ভার্স্ট পর্যন্ত চলে যেতাম, কখানো ক্স্তোভস্কি বনের দিকে, কখনো বা ভলগার পাড় ধরে। সেখানে উঁচু উঁচু পাইন বনের ভিতরে ধরতাম মুনিয়া, বা বিশেষ এক জাতের শুক পাখি — সাদা, লম্বা লেজ, অদ্ভুত সুন্দর। যারা পাখি ভালোবাসে তারা খুব চড়া দাম দেয়।

কোনো কোনো দিন বেরিয়ে পরতাম সন্ধ্যায়। তারপর ঘন ঘন নেমে আসা শরতের বৃষ্টি বাদল আর এক হাঁটু কাদা-জমা কাজানের রাস্তায় রাতভোর ঘুরে বেড়াতাম। পিঠে অয়েলক্লথের থলের ভিতরে থাকত পাখি ধরা ফাঁদ, খাঁচা আর কিছু টোপ। হাতে বাদাম গাছের মোটা লাঠি। শরতের অন্ধকার রাত — যেমন কনকনে শীত, তেমনি ভয়ংকর, খুবই ভয়াবহ!.. রাস্তার পাশে বাজে পোড়া বুড়ো বার্চ, ভিজে ডালগুলো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত আমার মাথায়; বাঁয়ে ভলগার দিকে পাহাড়ের তলা দিয়ে মাঝে মাঝে দেরিতে আসা স্টিমার বা গাধাবোটের মাস্তুলের আলো ভেসে যেত, মনে হত ওগুলো যেন এক সীমাহীন অন্ধ অতলতার দিকে এগিয়ে চলেছে! শুনতে পেতাম স্টিমারের বাঁশী, জল কেটে চলা চাকার ছপ্ ছপ্ শব্দ।

পথের পাশে লোহার মতো শক্ত মাটির উপরে গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলো পার হবার সময় হিংস্র ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ত পায়ের উপরে। রাত-চৌকিদারেরা ভয়ে ঝুমঝুমি বাজিয়ে চিৎকার করে উঠত: 'কে যায়? রাতবিরেতে যার নাম করতে নেই সেই শয়তান এত রাত্রে কাকে টেনে নিয়ে এসেছে রে বাবা?'

পাছে আমার ফাঁদ কেড়ে নেয়, তাই সব সময়েই পাঁচ কোপেক রাখতাম

চৌকিদারদের ঘুষ দেবার জন্যে। ফাঁকনো গাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কীর্তি দেখে সে তো অবাক।

'আবার এসেছিস তুই? ভয়-ডর-নেই কী এক চঞ্চল নিশাচর ছেলে রে তুই, অ্যাঁ?'

ওর নাম ছিল নিফন্ত। বেঁটেখাটো মানুষটি, বুড়ো সাধু-সন্ন্যেসীর মতো দেখতে। কখনো একটা শালগম, বা আপেল, কখনো বা এক মুঠো মটরশুঁটি পকেট থেকে বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলত:

'এই যে, স্যাঙাৎ, ধর, তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। খেয়ে খুশি হবি আশা করি।'

তারপর হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত আসত আমার সঙ্গে।

'আচ্ছা চললাম এবার, ভগবান তোর সঙ্গে থাকুন!'

ভোর ভোর পেঁছিতাম বনে। ফাঁদ পেতে টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে দিনের আলো ফুটে ওঠার অপেক্ষায় বনের কিনারে গিয়ে শুয়ে থাকতাম। নিঝুম, নিস্তব্ধ। আমাকে ঘিরে সবকিছুই যেন শরত রাতের গভীর ঘুমে অচেতন; অন্ধকার কালো পাহাড়ের নিচে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে বহু দূর ছড়ানো মাঠ; মাঝখান থেকে দুভাগ করে বয়ে চলেছে ভলগা নদী। মাঠের শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গেছে ঘন কুয়াশায়। বন ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরের মাঠের শেষে দিগন্তের কোল ঘেঁসে ধীরে সূর্য উঠছে বনের কালো কেশরে আগুন ধরিয়ে। পরক্ষণেই অন্তর মথিত করা এক আলোড়ন। সূর্যের আলোর রুপোলি দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠা ঘন কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে যতই দ্রুত উপরে উঠে যেত, তারই তলায় মাটির বুকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠত গাছপালা ঝোপঝাড় আর ঘাসের গাদা। মনে হত যেন সূর্যের তাপে মাঠগুলো গলে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সোনালী স্রোত। ইতিমধ্যে নদীর কুলের শান্ত জলের বুকে লেগেছে আলোর ছোঁয়া, মনে হত যেখানে পড়েছে ঐ সোনালী আঙুলের উষ্ণ ছোঁয়া সেখানেই বুঝি যা সমস্ত নদীর জল ধেয়ে এসে জুটেছে। সোনার থালাটা যতই উপরে উঠে যেত ততই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত আনন্দভরা আশীর্বাদ। হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা পৃথিবীকে কোমল উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলত আর গভীর কৃতজ্ঞতায় পৃথিবী শরতের সুমধুর গন্ধভরা নিঃশ্বাসে আমোদিত করে তুলত চারদিক। স্বচ্ছ বাতাসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে মনে হত পৃথিবীটা বিশাল, সীমাহীন। সবকিছুর ভিতরেই যেন জেগে উঠত সুদূরের পিপাসা — পৃথিবীর ঐ সীমাহীন নীল সীমান্তের

জন্যে প্রলুব্ধ করত মনকে। বহুবার এখান থেকে আমি সূর্যোদয় দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেক বারেই আমার চোখের সামনে জন্ম নিয়েছে এক এক নতুন পৃথিবী— অনন্যা অপূর্বা সুন্দরী পৃথিবী...

কেন জানি সূর্যের উপরে আমার অন্তরে রয়েছে এক অদ্ভুত ভালোবাসা; তার নামটা পর্যন্ত আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে তার সুমধুর অপূর্ব ঝঙ্কারময় উচ্চারণ। ভাঙা বেড়ার ফাটল দিয়ে কিংবা গাছের ঘন ডালপালার ফাঁক ফুঁড়ে তলোয়ারের মতো এসে পড়ে সূর্যের আলোর রেখা, চোখ বুজে সেই উষ্ণ রেখার দিকে মুখ তুলে ধরে বা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে মনপ্রাণ। 'প্রিন্স মিখাইল চেরনিগোভস্কি আর বয়ারিন ফিওদরের উপরে' দারুণ শ্রদ্ধা দাদুর। তাঁরা সূর্যকে প্রণাম করতে চান নি। কিন্তু আমার চোখে তাঁরা ছিলেন দুর্বৃত্ত, জিপসীদের মতো কালো, রুক্ষ স্বভাব তাঁদের, আর মর্দোভীয় চাষীদের মতো চোখভরা ঘা। মাঠের উপর দিয়ে যখন সূর্য উঠত, নিজের অজ্ঞাতেই আনন্দে আমি হেসে উঠতাম।

মাথার উপরে শোনা যেত চির সবুজ গাছগুলোর বন-মর্মর, ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ত ঝরে। গাছের ছায়ায় ফার্ণ পাতার ঝালরের উপরে তুষার কণার রুপোলি কিংখাপ ঝলমলিয়ে উঠত আমার চোখের সামনে। বৃষ্টির ঝাপটায় শুকনো ঘাসগুলো নিথর হয়ে লুটিয়ে পড়ে থাকত মাটির বুকে, তবুও যখন সূর্যের আলোর রেখা পড়ত ওদের গায়ে, মনে হত যেন একটা মৃদু কম্পন দেখা যাচ্ছে, যেন ওরা ওঠার শেষ চেষ্টা করে দেখছে।

পাখিরা জেগে উঠত। ধূসর রঙের ফুলো ফুলো বলের মতো গাছের ডালে ডালে লাফালাফি জুড়ে দিত দোয়েল। পাইন গাছের ছুঁচলো মগডালে এসে পড়েছে আগুন রাঙা মুনিয়া পাখির ঝাঁক। একটা গাছের ডালের ডগার দিকে বসে পালক খুঁটতে খুঁটতে আড়চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পাতা ফাঁদের দিকে তাকিয়ে দুলতে থাকে একটা সদা-সোহাগী। যে বনটা মুহূর্ত আগেও ছিল গভীর ধ্যানে মগ্ন, হঠাৎ টের পেতাম সেটা যেন শত শত পাখির ভাষায় ভরে উঠেছে। মুখর হয়ে উঠেছে তাদের কলকাকলীতে যারা পৃথিবীর সব প্রাণীর চেয়ে পবিত্রতর। তাই পার্থিব সৌন্দর্যের রূপস্রষ্টা মানুষ আপন আনন্দে এদেরই রূপে সৃষ্টি করেছে অপ্সরা, পরী আর কিন্নর-কিন্নরীদের, সৃষ্টি করেছে যত দেবদূতদের।

পাখি ধরতে কষ্ট হত। খাঁচায় পুরে বন্দী করে রাখা আরো লজ্জাকর। শুধুমাত্র ওদের চোখে দেখেই আনন্দে আমার মনপ্রাণ ভরে উঠত। কিন্তু

শিকারীর উৎসাহ আর পয়সা রোজগারের আশার তলে চাপা পড়ে যেত আমার করুণা।

পাখিগুলোর চালাকি দেখে ভারি মজা লাগত: নীল রঙের একটা দোয়েল একবার খুব মনোযোগ দিয়ে ফাঁদটাকে দেখল খানিকক্ষণ। বিপদ আছে বুঝতে পেরে সন্তর্পণে একপাশ দিয়ে এগিয়ে এসে খুব চতুরতার সঙ্গে কাঠি দুটোর ভিতর থেকে দানা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। ওরা খুব চালাক, কিন্তু কৌতূহল-প্রবণ আর তাতেই ওদের মরণ। কিন্তু ধীর প্রকৃতির মুনিয়া পাখিগুলো বোকা। গোটা ঝাঁকটাই এসে হয়ত ঢুকে পড়ে আমার জালের ভিতরে — যেমন করে মোটা সোটা ধনী লোকেরা ঢোকে গির্জায়। ফাঁদের মুখে ঢাকা দিয়ে দিতেই দারুণ অবাক হয়ে যায় ওরা। চোখ পাকিয়ে তাকায় আর পুরু পুরু ঠোঁট দিয়ে আমার আঙুল ঠোকরাতে আসে। খঞ্জনগুলো খুব ধীর গম্ভীর চালে এসে ঢোকে জালে। নীলকণ্ঠগুলো আজব ধরনের পাখি। ফাঁদের সামনে উড়ে এসে চওড়া লেজের উপরে ভর দিয়ে বহুক্ষণ বসে থাকবে, তারপর লম্বা চঞ্চুটা ধীরে একবার এদিক একবার ওদিক নাড়াতে থাকবে। ওদের স্বভাব হচ্ছে কাঠঠোকরার মতো: গাছের গুঁড়িতে উপর নিচ করে লাফালাফি করা আর দোয়েলগুলোকে তাড়া করে বেড়ানো। এই ছোট্ট ধূসর রঙের পাখিগুলোর সম্পর্কে একটা ভীতিজনক ব্যাপার হল ওদের নিঃসঙ্গতা: কোনো পাখিই ওদের পছন্দ করে না, ওরাও পছন্দ করে না কাউকে। ছাতারের মতো ওরা চকচকে খুদে কিছু দেখলেই চুপি চুপি ঠোঁটে করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দুপুর নাগাদ কাজ শেষ করে বন আর মাঠের পথে বাড়ি ফিরে আসতাম। গাঁয়ের ভিতরের বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলে অন্য ছেলেরা বা গাঁয়ের গুণ্ডা বখাটেরা আমার খাঁচা কেড়ে নিত, ফাঁদ ভেঙে দিত — এ শিক্ষা আমার হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি পেঁছাতাম। কিন্তু কিছু যে লাভ করতে পেরেছি, শক্তিতে জ্ঞানে যে বড়ো হয়ে উঠছি এই চেতনায় ভরপুর হয়ে উঠত অন্তর।

এই নতুন চেতনাই আমাকে ধীর স্থির ভাবে দাদুর গালমন্দ সহ্য করার শক্তি যোগাত। দেখে শুনে দাদু কঠোর সুরে উপদেশ দিতেন:

'ঢের হয়েছে, যত সব বাজে! যথেষ্ট হয়েছে এই তোকে বলে দিচ্ছি। পাখি ধরে কেউ কোনো দিন সংসারে বড়ো হতে পারে না। কোনো একটা কিছু ঠিক

করে লেগে পড়, মাথা খাটিয়ে বড়ো হতে চেষ্টা কর গে। আজে বাজে জিনিস নিয়ে মেতে থাকার জন্যে মানুষের জীবন নয়। মানুষ হচ্ছে ভগবানের বীজ, ভালো শস্য যাতে জন্মে তার জন্যেই সৃষ্টি! মানুষ হল টাকার মতো—ভালো কাজে খাটাও তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে। ভাবছিস বেঁচে থাকাটা খুবই সোজা? দারুণ শক্ত! সংসার হল অন্ধকার রাত, এখানে প্রত্যেক মানুষকেই জ্বালিয়ে নিতে হবে নিজ হাতে তার নিজের আলো। আমাদের সকলেরই আঙুল তো মোটে দশটা, কিন্তু সবাই চাই যত পারি হাত বাড়াতে, যতটা পারি থাবা পেতে ধরতে। হয় বল থাকা চাই, নয় বুদ্ধি। যারা দুর্বল ক্ষীণজীবী তাদের কিছু হবে না। সবার সঙ্গে বন্ধু ভাবে চলবি, কিন্তু মনে রাখবি তুই একা। বিশ্বাস করবি না কারুর কথা। নিজের চোখে দেখলেও দেখবি লোকে ওজনে কম দিয়ে দিয়েছে। মুখ বুজে থাকবি—কথা দিয়ে কিছু আর শহর নগর গড়ে ওঠে নি, উঠেছে টাকায় আর হাতুড়ির ঘায়ে। তুই তো উকুন আর ভেড়া নিয়ে জীবন কাটানো বাশ্‌কিরীয় বা কালমীক নোস...'

সারা সন্ধ্যা এমনি বক বক করে যেতেন দাদু, কথাগুলো আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগত, কিন্তু তার অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ জাগত মনে। তাঁর সমস্ত কথার ভিতর দিয়ে আমি একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলাম--সংসারে দুটো শক্তি আছে যা জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে: ভগবান আর মানুষ।

জানালার সামনে বসে লেস বোনার জন্যে সুতো কাটতেন দিদিমা। তাঁর নিপুণ আঙুলগুলোর ভিতরে বন্‌ বন্‌ করে গুঞ্জন তুলে ঘুরে চলত তকলি। দাদুর কথা কিছুক্ষণ চুপ করে শোনার পরে বলে উঠতেন:

'মেরীমার যা ইচ্ছে তাই তো হবে।'

'তার মানে?' খেঁকিয়ে উঠতেন দাদু, 'ভগবান! ভগবানের কথা আমি ভুলে যাই নি, ঠিকই জানি আমি তাঁকে! ভাবিস আমাদের এই দুনিয়াটা ভগবান শুধু বেকুফ লোক দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, যেমন তুই একটা বেকুফ বুড়ি?'

...ভাবতাম দুনিয়ায় কসাক আর সৈনিকদের মতো সুখী আর কেউ নেই; খুব সাদাসিধে ফুর্তির জীবন ওদের। রোদে ভরা সুন্দর সকালে ওরা জমা হত আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে পাহাড়ী খাদটার ওপারে। তারপর মাঠের

ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে এক দারুণ উত্তেজনাময় জটিল খেলায় মেতে উঠত। সাদা শার্ট গায়ে ঐ শক্ত সবল লোকগুলো রাইফেল হাতে আনন্দে মাঠ পেরিয়ে খাদের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিউগ্‌লের শব্দ জেগে উঠতেই 'হুর্‌রা' বলে চিৎকার করে ছুটে আসত মাঠের ভিতরে। ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠত ড্রামের বাজনা। সোজা আমাদের বাড়ির দিক লক্ষ্য করে ওরা এগিয়ে আসত, তীক্ষ্ণধার বেয়নেটগুলো উঠত ঝনঝনিয়ে। মনে হত ওরা বুঝি বা শুকনো খড়ের গাদার মতো আমাদের বাড়িটাকে উল্টে ফেলে দিতে চায়।

'হুর্‌রা' বলে চিৎকার করে উঠে আমিও ওদের পিছন পিছন ছুটে বেড়াতাম। ড্রামের সেই ভয়ংকর বাজনার শব্দে কিছু একটা ধ্বংস করে ফেলার, টান মেরে বেড়া ভেঙে দেয়ার বা কাউকে ধরে পেটানর এক অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠত আমার মনে।

ছুটির সময়ে সৈনিকেরা আমাকে খেতে দিত তামাক পাতার চুরুট, তাদের ভারি রাইফেলগুলো খুলে দেখাত। কেউ হয়ত তার হাতের বেয়নেটটা আমার পেটের দিকে তাক করে অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে উঠত:

'গেঁথে ফেল আরশুলাটাকে!'

রোদের ভিতরে বেয়নেটটা চক চক করে উঠত, মনে হত যেন ছোবল দেয়ার আগে জ্যান্ত একটা সাপ ফণা তুলে বেঁকে উঠেছে,—ভীষণ ভয় পেতাম বটে তবু আনন্দও লাগত।

একটা মর্দোভীয় ছেলে ড্রামের কাঠি চালানো শিখিয়ে দিল আমাকে; প্রথমে সে আমার হাতটা ধরে মুচড়ে দিতে লাগল। যখন ব্যথায় টন্‌ টন্‌ করে উঠল তখন সেই অবশ হয়ে আসা আঙুলগুলোর ভিতরে গুঁজে দিল কাঠিটা।

'বাজা? একবার, তারপর আবার, — একবার, তারপর আবার: টা-টা-টা-টা-আ-আ! বাঁয়াটা আস্তে, ডাইনেটা জোরে!' পাখির মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল ছেলেটা।

কুচকাওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওদের পিছন পিছন ঘুরতাম, ওদের সঙ্গে মার্চ করতে করতে গোটা শহর ঘুরে ছাউনিতে পেঁছতাম, শুনতাম ওদের দরাজ গলার গান, প্রসন্ন মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতাম— এমন নতুন আর এত উজ্জ্বল দেখাত যেন সদ্য টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসা দো-আনি।

একই রকম দেখতে এই লোকগুলো যখন দল বেঁধে ফুর্তি করে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে চলত, তখন আনন্দে মনপ্রাণ ভরে উঠত। নদীর জলে ডুব দেয়ার মতো ওদের এ দলের ভিতরে ডুবে যাওয়ার এক দুর্নিবার ইচ্ছে জেগে উঠত আমার মনে, ইচ্ছে হত বনে ঢোকার মতো করে ওদের ভিতরে ঢুকে পড়ি। কোনো কিছুকেই ভয় পায় না ওরা, সাহসের সঙ্গে সবকিছুর দিকেই তাকায় চোখ মেলে, সবকিছুই পারে জয় করে নিতে; ইচ্ছে করলেই পেতে পারে সব যা কিছু ওদের কাম্য আর সবচাইতে বড়ো কথা ওরা সরল আর হৃদয়বান।

কিন্তু একদিন বিশ্রামের সময়ে তরুণ বয়সের একটি ননকমিশন্ড অফিসার আমাকে মোটা একটা সিগারেট খেতে দিল।

'খাও! বিশেষ ধরনের সিগারেট এটা। তুমি বলে দিচ্ছি আর কেউ হলে দিতাম না, খুব ভালো ছেলে তুমি কিনা তাই!'

সিগারেটটা ধরাতেই সে দুপা পেছিয়ে গেল। আচমকা একটা লাল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠে আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল, হাতের আঙুল, নাক, আর ভ্রূ গেল ঝলসে, ধূসর ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় দারুণ ভাবে হাঁচতে আর কাশতে লাগলাম। আমি কানার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফালাফি করতে লাগলাম আর সৈনিকরা এসে ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে, দারুণ ফুর্তিতে হাসল হো হো করে। বাড়ি চলে এলাম। আসতে আসতে পিছনে শুনতে পেলাম ওদের উচ্চ হাসি, শিস, আর রাখালের হাতের চাবুক চালানোর মতো হিস্ হিস্ শব্দ। আমার আঙুল জ্বলছিল, জ্বালা করছিল মুখ, দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এই ব্যথার চাইতেও একটা বেদনাভরা ভোঁতা বিস্ময়ে আমার অন্তর নিপীড়িত হয়ে উঠল: কেন এমন করল আমার সঙ্গে? এমন সব ভালো লোক, কিন্তু কী মজা পেল ওরা এতে।

বাড়িতে পেঁাছে ছাদের উপরে বসে বহুক্ষণ ভাবলাম আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর ভিতরে যত সব অভাবনীয় নিষ্ঠুর ব্যাপার ঘটতে দেখেছি তাদের কথা। বিশেষ করে সারাপুলের সেই ছোট্ট রোগামতো সৈনিকটির কথা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল আমার মনে — সে যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে এল আমার কাছে, যেন বলল:

'কি রে, এবার বুঝলি তো?'

কিন্তু অল্প ক'দিন পরেই এর চেয়ে নিষ্ঠুরতর ও মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটতে দেখলাম চোখের সামনে।

পেচেরস্কায়া পাড়ার কাছে কসাকদের যে ছাউনি ছিল প্রায়ই যেতাম সেখানে। সৈনিকদের চাইতে কসাকরা একটু অন্য ধরনের মানুষ, অবশ্য তার কারণ এ নয় যে তারা ভালো ঘোড়সওয়ার বা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সুন্দর, — তাদের কথাবার্তার ধরনধারনই আলাদা, গায় অন্য ধরনের গান আর নাচেও চমৎকার। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা ঘোড়াগুলোকে ধোয়া মোছার পর ওরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে আস্তাবলের সামনে বসত গোল হয়ে। লালচুল একটি কসাক তার ঢেউ খেলানো চুলগুলো ঝাঁকুনি মেরে পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ক্লারিওনেটের মতো চড়া সুরে গাইত। স্থির ভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে সে গেয়ে চলত শান্ত দন বা নীল দানিউবের ব্যথা মধুর কোমল গান। যে পাখিগুলো গাইতে গাইতে এক সময়ে মাটির কোলে ঢলে পড়ে মরে যায়, সেই ভোরের পাখির মতোই চোখ বুজে থাকত সে। গলার কাছে জামার বোতাম খোলা, একটুকরো ব্রোঞ্জের মতো কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, সমস্ত দেহটাই মনে হত যেন ব্রোঞ্জ ঢালাই করা। মনে হত চোখে ও যেন কিছুই আর দেখছে না, শুধু হাত দুটো নড়ছে। আর সরু দুটো পায়ের উপরে ভর দিয়ে এমন ভাবে দুলছে যেন ওর পায়ের তলার মাটিটাই নড়ছে। ও যেন আর মানুষ থাকত না, রূপান্তরিত হয়ে যেত এক শিঙ্গাবাদকের শিঙ্গায়, রাখালের বাঁশিতে। মাঝে মাঝে আমার মনে হত এক্ষুণি বুঝি ও মাটির উপরে চিত হয়ে পড়ে সেই ভোরের পাখির মতোই মরে যাবে, কারণ ওর সবটুকু মনপ্রাণ ঢেলে সবটুকু শক্তি নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে ঐ গানে।

ওর সাথীরা কেউ পকেটে হাত ঢুকিয়ে, কেউ হাত দুটো পিছনে করে ওর ব্রোঞ্জের মতো মুখ আর দোলানো হাতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওকে। নিজেরাও গাইছে শান্ত সমাহিত ভাবে, গির্জার স্তোত্রদলের মতো। দাড়িওয়ালা, দাড়ি কামানো, সবগুলো মুখই দেখাচ্ছে ঠিক আইকনের মতো, তেমনি কঠোর, তেমনি বৈরাগ্যভরা। গানটিও এগিয়ে চলেছে রাজপথেরই মতো প্রশস্ত, সমতল আর কালস্রোতের প্রাজ্ঞতায় পরিপূর্ণ; শুনতে শুনতে দিনরাত খেয়াল থাকে না, ভুলে যাই আমি শিশু না বৃদ্ধ, সব কিছুই। তারপর ধীরে ধীরে গায়কের কণ্ঠের সুর নিভে যেতে শুনতে পেতাম মাঠের বুকের উপর দিয়ে শরত রাতের এগিয়ে চলার নিরবচ্ছিন্ন মন্থর পদধ্বনি, ঘোড়াগুলোর দীর্ঘশ্বাস — যেন ওরা স্তেপভূমির স্বাধীন জীবনের স্বপ্নে বিভোর। এই অপূর্ব অনুভূতির পরিপূর্ণতায় আর মাটি

ও মানুষের প্রতি এক বিরাট মৌন ভালোবাসায় বুক ভরে উঠত, ফেটে পড়তে চাইত।

মনে হত ঐ ছোট্ট ব্রোঞ্জে গড়া কসাকটি শুধুই মানুষই নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু, ও যেন কিসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত — যেন সমস্ত মর-জগতের বহু ঊর্ধ্বে কল্প-কথার এক প্রাণী। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। যদি কখনো কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করত, আনন্দে শুধু নীরব হাসি ফুটে উঠত আমার মুখে আর জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে থাকতাম। ওকে আরো ঘন ঘন দেখার জন্যে, আরো গান শোনার জন্যে আমি পোষা কুকুরের মতো ওর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতেও রাজী।

একদিন দেখলাম, আস্তাবলের এক কোণে দাঁড়িয়ে আঙুলে পরা সাদামাঠা একটা রুপোর আংটি খুব মনোযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ও দেখছে। সুন্দর ঠোঁটদুটো নড়ছে, লাল লাল পাতলা গোঁফ কাঁপছে আর মুখখানা ঘিরে ফুটে উঠেছে এক বিষণ্ণ আহত ভাব।

আর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পাখির খাঁচা নিয়ে গিয়েছি স্তারায়া সেন্নায়া স্কোয়ারের পাশের শরাবখানায়। শরাবখানার মালিকের পাখি পোষার দারুণ সখ, প্রায়ই সে আমার কাছ থেকে পাখি কিনত।

এক কোণে, উনুন আর দেয়ালের মাঝখানে বসে রয়েছে সেই কসাকটি। ওর পাশে মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোক, চেহারায় ওর প্রায় দ্বিগুণ। বার্নিশ কাগজের মতো তার মুখখানা চক চক করছে, কেমন যেন মায়ের মতো একটু উদ্বেগভরা স্নেহ কোমল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। কসাকটি তখন মাতাল, অনবরত মেঝের উপরে পা নাড়াচ্ছিল; হয়ত বা ঐ স্ত্রীলোকটিকেই লাথি মেরে থাকবে, কারণ সে যেন চমকে উঠে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল:

'অমন করবেন না, থামুন...'

অতি কষ্টে কসাক ভ্রূ তুলে তাকাল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল। গরম লাগছিল লোকটার, উর্দিটা খুলে দিল, শার্টের বোতাম টেনে খুলে দিল গলা পর্যন্ত। মাথার রুমালটা ঘাড়ের উপরে টেনে নামিয়ে দিয়ে স্ত্রীলোকটি তার সবল দুটো হাত রাখল টেবিলের উপরে। হাত দুটো এত শক্ত করে চেপে ধরেছিল যে আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে উঠেছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশি করেই মনে হচ্ছিল ঐ কসাকটি হচ্ছে এক স্নেহময়ী মায়ের অবাধ্য সন্তান: স্ত্রীলোকটি স্নেহভরা কণ্ঠে বকুনি দিচ্ছে আর

ও চুপ করে শুনছে শান্ত হয়ে, তার ন্যায্য ধমকানির প্রতিবাদ করার মতো কোনো কথাই যেন ওর নেই।

হঠাৎ যেন কোনো কিছুতে কামড়ে দিয়েছে এমনি ভাবে কসাকটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; টুপিটা কপালের উপরে টেনে দিয়ে হাত দিয়ে চাপড়ে মাথায় ভালো করে বসিয়ে দিল, তারপর উর্দির বোতাম না এঁটেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটিও উঠে দাঁড়াল, শরাবখানার মালিককে বলল:

'এক্ষুণি আসছি আমরা কুজমিচ...'

ওদের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকদের ভিতরে হাসি ঠাট্টা টিটকারির ধুম পড়ে গেল।

'সারেঙ্গ ফিরে আসুক, দেবে'খন ওকে আচ্ছা করে!' গম্ভীর গলায় কে একজন বলে উঠল ওদের ভিতর থেকে।

আমিও বেরিয়ে পড়লাম তাদের পিছু পিছু; আমার দশ বারো পা আগে আগে চলেছে ওরা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। কাদাভরা বাগান পেরিয়ে সোজা চলেছে ভলগার উঁচু তীরের দিকে। দেখতে পাচ্ছি কসাকটির ভারে স্ত্রীলোকটি একদিকে হেলে পড়েছে, শুনতে পাচ্ছি ওদের পায়ের তলায় কাদা ছিটকে ওঠার প্যাঁচ প্যাঁচ শব্দ।

'কোথায় যাচ্ছেন? চলেছেন কোন দিকে?' অনুচ্চ স্বরে বার বার জিজ্ঞেস করছে স্ত্রীলোকটি।

কাদা ভেঙে আমার নিজের পথের উল্টো মুখে ওদের পিছু পিছু এগিয়ে চললাম। বাঁধের কিনারায় এসে কসাকটি থমকে দাঁড়াল, এক পা পেছিয়ে গেল। পরক্ষণেই স্ত্রীলোকটির গালে খুব জোরে একটা চড় মারল। ভয়ে, বিস্ময়ে, চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি, 'আঃ! মারলে কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে কসাক স্ত্রীলোকটির কোমর জড়িয়ে ধরে রেলিং'এর ওপারে উল্টে ফেলে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ল তার উপরে। তারপর বাঁধের ঘাসের উপরে দুজনে জড়াজড়ি করে গড়াতে লাগল একটা অন্ধকার পিণ্ডের মতো।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিচে থেকে ভেসে আসছে ধ্বস্তাধ্বস্তি, কাপড় ছেঁড়ার শব্দ, আর কসাকের ভারি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। স্ত্রীলোকটি চাপা গলায় বলে চলেছে:

'চ্যাঁচাব কিন্তু আমি... চ্যাঁচাব...'

তারপর একবার জোরে চিৎকার করে কোঁকিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি,

পরক্ষণেই সব চুপ — নিস্তব্ধ। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বাঁধের ওপারে ছুঁড়ে মারলাম, শুধু কয়েকটা আগাছা নড়ে উঠল মাত্র। শরাবখানার কাঁচের দরজাটা ঝন ঝন করে উঠল, কে যেন উঠল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, যেন পড়ে গেছে আছাড় খেয়ে। পরক্ষণেই আবার নেমে এল সেই চাপা ভয়ে ভরা নিস্তব্ধতা।

তারপর বাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় দেখা গেল সাদা বড়ো মতো একটা কিছু। টলতে টলতে সেটা ধীরে ধীরে উঠে আসছিল উপরের দিকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর বিড় বিড় করছিল। চিনতে পারলাম, সেই স্ত্রীলোকটি। ভেড়ার মতো চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে আসছে। দেখতে পাচ্ছি ওর কোমর পর্যন্ত খোলা, আব্রুহীন, গোল গোল বড়ো বড়ো দুটো স্তন, সাদা ধব ধব করছে, মনে হচ্ছে যেন তিনটে মুখ। অবশেষে রেলিং'এর কাছে উঠে এসে স্ত্রীলোকটি আমার পাশে বসল। ঘোড়ার মতো হাঁপাচ্ছিল আর এলোমেলো চুলগুলোকে পাট করার চেষ্টা করছিল; ওর ফর্সা গায়ের উপরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছিট ছিট কাদার দাগ; কাঁদছে, আর বেড়াল যেমন করে থাবা দিয়ে মুখ মোছে তেমনি করে মুছছে চোখের জল।

'মা গো! কে রে তুই? ভাগ এখান থেকে বেহায়া ছোঁড়া কোথাকার!' আমাকে দেখতে পেয়ে চাপা গলায় বলে উঠল স্ত্রীলোকটি।

কিন্তু চলে যেতে পারছিলাম না। কী এক নিদারুণ বিস্ময়ে ব্যথায় সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে — মনে পড়ল দিদিমার বোনের সেই কথা:

'মেয়েমানুষের শক্তি যা-তা নয়। স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত ঠকিয়েছিল ইভ...

স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়াল, পোশাকের বাকি অংশটা টেনে এনে বুক ঢাকল, ফলে পায়ের কাপড় সরে গিয়ে পা দুটো বেরিয়ে পড়ল, তারপর দ্রুত চলতে আরম্ভ করল।

একটা সাদা জামা দোলাতে দোলাতে কসাক উঠে এসে দাঁড়াল বাঁধের উপরে। আস্তে করে একটা শিস দিয়ে উঠে কী যেন শুনল কান পেতে, তারপর ফুর্তির সুরে বলে উঠল:

'দারিয়া! আরে শোনো, তোমাকে বলি নি যে কসাকরা যা চাইবে তা নেবেই নেবে? ভেবেছিলে, আমি মাতাল হয়ে পড়েছি, তাই না? না গো না, তোমাকে বোকা বানাবার জন্যেই শুধু ভান করেছিলাম... দারিয়া!'

দুপায়ে ভর দিয়ে বেশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, গলার আওয়াজও স্বাভাবিক, পরিহাসভরা। নিচু হয়ে ঝুঁকে স্ত্রীলোকটির জামা দিয়ে বুটের কাদা মুছে আবার বলতে লাগল:

'এই যে, তোমার ব্লাউজটা নিয়ে যাও!.. চলে এসো দারিয়া, রাগ করো না!..'

তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা অশ্লীল মুখখিস্তি করল।

আগাছার স্তূপের উপরে তেমনি করেই বসে রইলাম আমি, রাত্রির নিস্তব্ধতার ভিতরে শুনলাম ওর একক কণ্ঠের স্বর—কুৎসিত ঔদ্ধত্যভরা।

ময়দানের লণ্ঠনের আলো নেচে উঠল আমার চোখের সামনে; ডান দিকে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করা ঘন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মেয়েদের স্কুল বাড়ি। অলস কণ্ঠে নোংরা কুৎসিত গাল পাড়তে পাড়তে আর স্ত্রীলোকটির ব্লাউজটা দোলাতে দোলাতে কসাকটা ময়দান পার হয়ে মিলিয়ে গেল এক দুঃস্বপ্নের মতো।

নিচে জলের ট্যাঙ্কের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে পাইপের মুখে বাষ্পের হিস্ হিস্ শব্দ, নদীর দিকের ঢালু রাস্তা বেয়ে চাকার ঘর্ঘর শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছে একটা ঘোড়ার গাড়ি, কোথাও একটি প্রাণীও দেখা যাচ্ছে না। ক্ষুব্ধ মনে নদীর পাড় বেয়ে হেঁটে চললাম আমি, হাতের ভিতরে তখনো ধরা রয়েছে একটা ঠাণ্ডা পাথরের নুড়ি—ভেবেছিলাম ওটা ছুঁড়ে মারব কসাকটাকে লক্ষ্য করে। দিগ্বিজয়ী সেণ্ট জর্জ গির্জার সামনে আসতেই পাহারাওয়ালা আমার পথ আটকাল। ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করল আমি কে, কী আছে আমার ঐ পিঠের উপরের ঝোলার ভিতরে।

কসাকটার সমস্ত বৃত্তান্ত যখন খুলে বললাম ওকে, হো হো করে হেসে উঠল পাহারাওয়ালা, বলল:

'খুব একখানা হয়ে গেল তাহলে! কসাকরা অতশত ভদ্রতার ধার ধারে না ভায়া, বুঝলে! আমরা ওদের সঙ্গে পারলে তো, আর ঐ মেয়েমানুষটা—ওটা তো আস্তো কুত্তি...'

বলেই আবার হাসির ধমকে ফেটে পড়ল। অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে আমিও চলতে শুরু করলাম আমার পথে—এর ভিতরে অমন হাসির ব্যাপার কী পেল সে?

দারুণ আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলাম: আচ্ছা, ঐ মেয়েমানুষটি যদি আমার মা হতেন কিংবা দিদিমাই হতেন, কী হত তাহলে?

৮

প্রথম বরফ পড়া শুরু হতেই দাদু আবার আমাকে নিয়ে এলেন দিদিমার বোনের কাছে।

'তোর কোনো ক্ষতি হবে না—একটুও না,' বললেন তিনি।

অনুভব করলাম গোটা গ্রীষ্মকাল প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এসে আমার বয়েস ও বুদ্ধি দুই-ই বেড়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু মনিব-বাড়ির জীবন আগের চাইতেও যেন বেশি নিরানন্দ। ঠিক আগেরই মতো ওরা গাদা গাদা গিলে নিজেদের শরীর মাটি করে চলেছে, তেমনিই একঘেয়ে বিরক্তিকর সুরে তাদের দুঃখকষ্টের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে, তেমনিই ভয়ঙ্কর বিদ্বেষভরা গলায় বুড়ি প্রার্থনা করছে তার ভগবানের কাছে। একটা বাচ্চা হওয়ায় ছোট গিন্নী অনেকটা রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে জায়গাটা একটু কম জুড়লেও সেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার মতোই একটা গম্ভীর কেউকেটা ভাব নিয়ে চলাফেরা করছে। বাচ্চার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে করতে গুন গুন করে গেয়ে চলেছে সেই একটি মাত্র জানা গান:

স্পিরয়্যা, স্পিরয়্যা, স্পিরিদোন—
ভাইটি স্পিরয়্যা লক্ষ্মীটি,
আমি বসব গাড়িতে,
তোমার হাতে লাগামটি...

আমি ঢুকলে অমনি গান থামিয়ে খেঁকিয়ে উঠত:

'কী চাই এখানে?'

এই একটি মাত্র গানই যে ও জানে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সন্ধ্যেবেলা আমার মনিব-গিন্নীরা খাবার ঘরে ডেকে বলত আমাকে:

'তোর স্টিমারের গপ্প বল, শুনি!'

স্নানের ঘরের দোরের সামনে চেয়ার টেনে বসে আমি ওদের আদ্যোপান্ত বলে যেতাম।

নিজের একান্ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে থাকতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে; তাই আমার এই বর্তমান জীবনের পরিবেশে আমার অন্যবিধ সেই জীবনের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেতাম। মেয়েরা কোনো দিন স্টিমারে চড়ে নি, তাই ওরা জিজ্ঞেস করত:

'ভয় লাগত না তোর?'

আমি ভেবেই পেতাম না এর ভিতরে ভয় পাবার কি আছে।

'গভীর জলে কোথাও যদি স্টিমারটা উল্টে গিয়ে ডুবে যেত?'

মনিব হেসে উঠত। আমি জানি যে স্টিমার কখনো গভীর জলে উল্টে ডুবে যায় না, মেয়েদের কিন্তু সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারতাম না। বুড়ির তো ধ্রুব বিশ্বাস স্টিমার কখনো জলে ভেসে চলে না, রাস্তার উপর দিয়ে যেমন গাড়ির চাকা চলে স্টিমারের চাকাও তেমনি নদীর তলার মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

'যদি লোহার তৈরীই হয় তবে ভাসবে কেমন করে? কুড়ুল জলে ভাসে কখনো?'

'কিন্তু লোহার বাটি তো ভাসে।'

'ভারি একটা কথা বললি! লোহার বাটি ছোট্ট, তাছাড়া খালি থাকে...'

স্মুরি আর তার বইয়ের কথা বলতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে রইল; বুড়ি মন্তব্য করল, যারা মূর্খ আর নাস্তিক তারাই বই লেখে।

'কিন্তু প্রার্থনা? রাজা ডেভিড?'

'ও হল গে ধর্মপুস্তক, তবুও ঐ স্তোত্র লেখার জন্যে রাজা ডেভিড ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।'

'কোথায় লেখা আছে সে কথা?'

'এই এখানে, আমার হাতে! মাথায় ঠাস করে এক চাঁটি মেরে শিখিয়ে দেব'খন কোথায় লেখা আছে!'

বুড়ি সবজান্তা। যা কিছু মন্তব্য করত, সবই একান্ত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এবং সব মন্তব্যই তার অসম্ভব বিদঘুটে।

'পেচোরকা স্ট্রীটের তাতারটা মরে যেতে কালো আলকাতরার মতো ওর আত্মাটা গলা বেয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছিল!'

আমি বললাম, 'কিন্তু আত্মা তো অদৃশ্য চৈতন্য।'

'আরে হাঁদা, এ যে তাতারের আত্মা!' মুখ বাঁকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল বুড়ি।

বই সম্পর্কে ছোট মনিব-গিন্নীরও দারুণ ভয়।

'বই পড়া খুব খারাপ, বিশেষ করে জোয়ান বয়সে। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে ছিল — গ্রেবেশক স্ট্রীটে। খুব ভালো বংশের মেয়ে। বই পড়তে আরম্ভ করল মেয়েটা, পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত কিনা প্রেমে পড়ল পুরুতের সঙ্গে। পুরুতের বৌ দিল ওকে খুব আচ্ছা করে! রাম ধোলাই!

একেবারে রাস্তার উপর সমস্ত লোকজনের সামনে! উঃ, কী সাংঘাতিক!

মাঝে মাঝে আমি স্মুরির বইয়ে যা পড়েছি সে জাতের সব কথা ব্যবহার করতাম। একটা বইতে পড়েছিলাম: 'সঠিক ভাবে বলতে কি, বারুদ কেউই একা আবিষ্কার করে নি। দীর্ঘদিনের ছোটখাটো অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ভিতর দিয়েই তার উৎপত্তি।'

কেন জানি এই কথাকটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। বিশেষ করে 'সঠিক ভাবে বলতে কি' কথাটা আমার খুবই ভালো লেগেছিল; মনে হত দারুণ জোরাল কথা। তা ব্যবহার করতে গিয়ে আমাকে ভীষণ দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল — অনাবশ্যক দুর্ভোগ।

একদিন সন্ধ্যায় ওরা সবাই আমাকে ডেকে আমার স্টিমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইল, আমি বললাম:

'সঠিক ভাবে বলতে কি, শোনাবার মতো কিছুই আর নেই।'

শুনে ওরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল, তারপর সবাই মিলে কলরব শুরু করে দিল:

'ওটা কী? কী বললি তুই?'

ওরা চারজনেই হেসে উঠল হো হো করে, বার বার করে বলতে লাগল:

'সঠিক ভাবে বলতে কি! হা রে কপাল!'

এমন কি মনিব পর্যন্ত বলল:

'কথাটা নেহাত বোকার মতো বলেছিস হে!'

এর পর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত ওরা আমাকে 'সঠিক ভাবে বলতে কি' বলেই ডাকত।

'আরে এই, সঠিক ভাবে বলতে কি! একবার এদিকে এসে মেঝে থেকে বাচ্চার মুতটা মুছে দিলে কেমন হয়, সঠিক ভাবে বলতে কি?'

ওদের এই নির্বোধ পরিহাসে আঘাত পাওয়ার চাইতে যেন অবাকই হতাম বেশি।

অন্তর অসাড় করে তোলা এক দুঃখের কুয়াশার ভিতর দিয়ে দিন কাটত আমার। ভুলে থাকার জন্যে প্রাণপণ খাটতাম। কাজও ছিল প্রচুর — বাড়িতে দুটো বাচ্চা। ছিদ্রান্বেষী মনিব-গিন্নীরা অনবরত আয়াকে জবাব দিয়ে দিত বলে বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানের বেশির ভাগ কাজ এসে পড়ত আমার ঘাড়ে। রোজ আমাকে ধুতে হত বাচ্চাদের কাঁথা কাপড় আর হপ্তায় একদিন করে

কাপড়চোপড় কেচে আনতে হত কোতোয়ালি ঝর্ণায় গিয়ে। ধোপানীরা হাসত আমাকে দেখে। ওরা বলত:

'এ সব মেয়েমানুষের কাজ করছিস কিসের জন্যে?'

ঠাট্টা বিদ্রুপের ফলে এক এক দিন ওদের ভেজা কাপড় দিয়ে পিটতাম, ওরাও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ত না। ওদের ভিতরে ভারি মজা লাগত আমার, আনন্দ পেতাম।

কোতোয়ালি ঝর্ণাটা ছিল একটা গভীর খাদের ভিতরে, সেটা মিশেছে আবার ওকা নদীর সঙ্গে। পুরাকালের স্লাভ দেবতা ইয়ারিলোর নাম অনুসারে যার নামকরণ সে মাঠটা শহর থেকে আলাদা হয়ে গেছে খাদটার জন্যে। শহরের লোকেরা সেমিক* দিনে এই মাঠে জড়ো হয়ে উৎসব করে। দিদিমার মুখে শুনেছি তাঁর যৌবন কালেও লোকেরা ইয়ারিলো দেবতার উপরে বিশ্বাস করত, পুজো দিত: একটা চাকায় আলকাতরা মাখিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। তারপর পাহাড়ের উপর থেকে দিত গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হল্লা আর গান চলত জোরে। চাকাটা যদি গড়িয়ে গড়িয়ে ওকা নদীতে গিয়ে পড়ত তবে ধরে নেয়া হত যে ইয়ারিলো পুজো গ্রহণ করেছেন: গ্রীষ্মকালটা চমৎকার হবে, লোকে সুখে শান্তিতে থাকবে।

বেশির ভাগ ধোপানীই থাকত ইয়ারিলো মাঠে, যেমন পরিশ্রমী, তেমনি ওদের জিভের ধার। শহর জীবনের সবকিছু সম্পর্কে ওরা ওয়াকিবহাল। ব্যবসায়ী, কেরানী, অফিসার, যাদের কাজ করে ওরা, তাদের সম্পর্কে ওদের গল্প শুনতে খুব মজা লাগত। শীতের দিনে বরফ-জমা ঝর্ণার জলে কাপড় কাচা খুবই একটা মর্মান্তিক ব্যাপার। কনকনে ঠান্ডায় ওদের হাত জমে যেত, ফেটে ফেটে যেত হাতের চামড়া। কাঠের তাগারীর ভিতরে জল ঝরে পড়ত আর ওরা তাগারীর উপরে ঝুঁকে কাচত কাপড়। মাথার উপরে কাঠের জীর্ণ ছাউনি, তাতে না আটকাত হাওয়া না বরফ। মুখগুলো লাল টকটকে হয়ে উঠত, তীব্র তুষারের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হাতের আঙুলগুলো জমে গিয়ে বাঁকানো যেত না, দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ত জল; কিন্তু তবুও অনবরত বক বক করে চলত ওরা, পরস্পরকে শুনিয়ে যেত টাটকা খবর। লোকজন আর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মত দিত আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে।

ওদের মধ্যে সবচাইতে ভালো গল্প বলতে পারত নাতালিয়া

* ইস্টারের পর সপ্তম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার। — সম্পাঃ

কজলোভ্‌স্কায়া, বছর ত্রিশেক বয়েস। মুখখানা বেশ চকচকে, শক্ত সমর্থ গঠন, চোখদুটো পরিহাসভরা; আর জিভখানা যেমন ধারালো তেমনি সবজান্তা। ও যখন বলত অন্যসব মেয়েরা মন দিয়ে শুনত। তারা ওর পরামর্শ নিত, শ্রদ্ধা করত ওকে ওর কাজে নৈপুণ্যের জন্যে, পোশাক পরিচ্ছদ পরার ফিটফাট ধরন আর বিশেষ করে মেয়েকে ইস্কুলে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছে বলে। দুটো বড়ো বড়ো ঝুড়ি বোঝাই ভিজে কাপড়ের ভারে নুয়ে পড়ে যখন পিছল পথ বেয়ে নেমে আসত সে, তখন সবাই কলরব করে উঠে ওকে সম্বর্ধনা জানাত:

'মেয়ে কেমন আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করত ওরা।

'ভগবানের দয়ায় ভালোই আছে, পড়ছে!'

'কালে কালে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠবে দেখে নিও, টেরও পাবে না তুমি?'

'সেইজন্যেই তো ইস্কুলে পাঠিয়েছি। ভদ্রজন চন্দ্রানন, এল কোত্থেকে? কোত্থেকে আবার, দুনিয়ার ছোটলোকদের মধ্যে থেকেই। যত বিদ্যে, তত সিদ্ধি, বেশি করে নেবে আর, যত বেশি গ্রহণ, তত নির্ভাবন... ভগবান আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন অবোধ শিশু করে, কিন্তু তিনি চান যেন হই জ্ঞানবন্ত বুড়ো। তার মানে লেখাপড়া করতে হবে!'

ও যখন কথা বলত সবাই চুপ করে মন দিয়ে শুনত ওর জোরালো গলার উপচে পড়া সাবলীল কথার স্রোত। ওর তেজ, সহ্যশক্তি আর চতুরতায় অবাক হয়ে যেত সবাই। সামনে বা আড়ালে, সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু কেউই ওর অনুকরণ করত না। কব্‌জি থেকে কনুই পর্যন্ত জামার হাতার আধখানা চামড়া দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল নাতালিয়া যাতে জামার হাতা জলে ভিজে না যায়। সবাই তারিফ করল; বলল, খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছে, কিন্তু কেউই সে রকম কিছু তৈরী করল না। কিন্তু আমি অমন তৈরী করে হাজির হতে মেয়েরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করল:

'ছিঃ! ছিঃ! মেয়েমানুষের কাছে শেখে!' ওরা দুয়ো দিতে লাগল।

নাতালিয়ার মেয়েকে নিয়ে আলোচনা করত ওরা:

'কী জাঁদরেল মেয়ে! বেশ আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলাই না হয় বাড়বে, তাতে আর কি? এমনও হতে পারে, হয়ত পড়াটাই শেষ করতে পারল না — হয়ত তার আগেই গেল মরে...'

'শিক্ষিত মানুষের জীবনটাও খুব সহজে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে না: ঐ বাখিলভের মেয়েকেই দেখো না — কতোদিন ধরে লেখাপড়া করেছে ভাব

তো, কিন্তু শেষটায় কি ফল হল তার? **ইস্কুল মাস্টারনী**। একবার মাস্টারনী হয়েছ তো আজীবন কুমারী হয়ে থাকো...'

'ঠিক কথা, পুরুষমানুষেরা যা নেবে তা সে পুঁথির বিদ্যে না থাকলেও নেবে। অবিশ্যি দেবার মতো ধন যতদিন আছে ততদিন!'

'মেয়েমানুষের মগজ তার মাথায় নেই ভাই, রয়েছে অন্য জায়গায়!'

নিজেদের সম্পর্কে এমন নির্লজ্জ কথা বলতে দেখে আমার কেমন অদ্ভুত লাগত, বিশ্রী মনে হত। সৈনিক, নাবিক, মাটি-খোঁড়ারা মেয়েদের সম্পর্কে কেমন আলোচনা করে তা জানতাম। শুনেছি তাদের নিজেদের শক্তির বড়াই করতে আর কে কতজন মেয়েমানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে তা নিয়ে জাঁক করতে। ওদের কথায় বার্তায় মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিজাতীয় মনোভাবের আভাস পেতাম, কিন্তু কোনো লোক তার জয়ের গপ্প করতে শুনতেই তার সেই বাহাদুরীর ভিতরে এমন একটা কিছু দেখতে পেতাম যাতে সত্যের চাইতে মিথ্যে ফলাও করার ভাবটাই যেন বেশি।

ধোপানীরা তাদের ভালোবাসাবাসির কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কখনো আলোচনা করত না, কিন্তু যখন পুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করত, বিদ্রূপ প্রতিহিংসার ভাব ফুটে উঠত ওদের কথায়। মেয়েমানুষের শক্তি কম নয় একথাটাকেই যেন প্রমাণ পাওয়া যেত।

'যতই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করো না কেন, ঘুরে ফিরে তোমাকে মেয়েমানুষের কাছে আসতেই হবে,' একদিন বলল নাতালিয়া।

'যা বলেছিস,' খনখনে গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল কুৎসিত চেহারার ঢেঙা বুড়িটা, 'মেয়েমানুষের জন্যে কতো সাধু সন্ন্যেসী খোদ ভগবানকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে আসে।'

খাদের তলার এই নোংরা গর্ত যা শীতের বরফে পর্যন্ত বিশেষ ঢাকা পড়ে না, সেখানে সাবান জলের ছপ্‌ছপানি আর ভিজে কাপড় আছড়াবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকত ঐ আলোচনা। সমস্ত মানুষের, সমস্ত মানব-গোষ্ঠীর জন্মের সেই মহান রহস্যময় উৎস সম্পর্কে এই নির্লজ্জ কুৎসিত আলোচনা আমার অন্তরে জাগিয়ে তুলত এক নিদারুণ বিতৃষ্ণা। আশেপাশে অহরহ ঘটতে দেখা ঐ সমস্ত 'প্রণয় ব্যাপারে' আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে আসত। বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণায় প্রেম ঐ নোংরা অশ্লীলতার সঙ্গে একাকার হয়ে যেত।

তবুও এখানে এই খাদের পারে, ধোপানীদের ভিতরে, রান্নাঘরে

অফিসারদের আর্দালীদের ভিতরে কিংবা মাটি-খোঁড়াদের ভিতরে এমন একটা আকর্ষণীয় জীবনের আভাস পেতাম যার তুলনা বাড়িতে মেলে না। বাড়ির ছক-বাঁধা কথাবার্তা, ভাবধারা আর ঘটনা স্রোত শুধু একটা গলা টিপে ধরা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতাই জাগিয়ে তোলে। আমার মনিবদের জীবন একটা কুৎসিত বিষ চক্রের ভিতরে ঘুরে মরে — খাওয়া, ঘুম, রোগভোগ; আবার সোরগোল করে খাওয়া, আবার ঘুম। ওরা অনবরত বলে চলেছে পাপ আর মৃত্যুর কথা, পাপভয় আর মৃত্যুভয়কে তারা অনবরত ছড়াচ্ছে, যেন যাতা কলে দেবার মতো শস্য, সব প্রতীক্ষা কেবল কখনো পিষে মরবে তার।

যখন কাজ থাকত না, চালাঘরের ভিতরে চলে যেতাম কাঠ চ্যালা করতে, যাতে কিছুক্ষণ নিরালায় একা থাকতে পারি। কিন্তু একা থাকাটা আর আমার ভাগ্যে ঘটে উঠত না। অফিসারদের আর্দালীরা এসে ঠিক জুটে যেত আর আশেপাশের লোকজনদের কেচ্ছা গাইতে শুরু করে দিত।

প্রায়ই হয় ইয়েরমোখিন নয়ত সিদরভ এসে জুটত। ইয়েরমোখিন লম্বা, গোলকাঁধ, কালুগা অঞ্চলের লোক; মাথাটা ছোট, চোখ দুটো ঘোলাটে আর সর্বাঙ্গ দড়া দড়া শক্ত শিরায় ছাওয়া। লোকটা যেমন অলস তেমনি বোকার একশেষ, চলে ফেরে ধীরে, বিশ্রী ভাবে। আর কোনো মেয়েমানুষের দিকে তাকালেই ওর কথা জড়িয়ে আসে, এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যায় তার দিকে যেন এক্ষুণি তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। ও যে কী করে অত তাড়াতাড়ি রাঁধুনী আর ঝি-চাকরানীদের পটিয়ে ফেলে তা আমাদের এখানকার কোনো লোকই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। সবাই ওকে হিংসে করে, ওর ভল্লুকের মতো গায়ের জোর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সিদরভ রোগা, হাড্ডিসার। ওর বাড়ি তুলা অঞ্চলে। বিষণ্ণ মনমরা গোছের ভাব। কথা বলে খুব আস্তে, কাশে ভয়ে ভয়ে। চোখে ওর ঝিক ঝিক করে একটা আলোর কাঁপুনি আর খালি খালিই অন্ধকার কোণের দিকে ঘন ঘন তাকায়। চাপা গলায় কথা বলার সময় নয়ত চুপ করে বসে থাকার সময় ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সবচেয়ে অন্ধকার কোণের দিকে।

'কী দেখছ?'

'ইঁদুর বেরিয়ে আসে কিনা... ইঁদুর খুব ভালো লাগে আমার কতো তাড়াতাড়ি চলে, শান্ত খুদে জীব...'

আর্দালীদের চিঠি লিখে দিতাম: কখনো তাদের প্রণয়িনীদের কাছে, কখনো বা তাদের গাঁয়ের বাড়িতে। তাতে বেশ আনন্দ পেতাম বিশেষ করে

সিদরুভের চিঠি লিখে। প্রত্যেক শনিবার সে তুলায় তার বোনের কাছে চিঠি দিত।

আমাকে ডেকে নিত রান্নাঘরে, তারপর টেবিলে আমার পাশে বসে কামানো ন্যাড়া মাথাটা হাত দিয়ে ঘসতে ঘসতে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলত:

'আচ্ছা, এবার শুরু করা যাক! প্রথমত — জানোই তো ঠিক যেমন করে শুরু করতে হয়: স্নেহের বোনটি আমার! কামনা করি যেন তুমি বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এবং বছরের পর বছর শারীরিক কুশলে থাকো ইত্যাদি। শেষ হল? বেশ। এখন লেখো: তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়াছি। তাহার জন্যে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু তুমি অমন কাজ আর কদাচ করিও না। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই, আমরা এখানে খুব ভাল আছি। মোটেই ভাল ভাবে থাকি না, এখানে কুকুরের মতোই থাকা, কিন্তু ওকে তা জানাবার দরকার নেই। আচ্ছা, লেখো: খুবই সুখে স্বচ্ছন্দে আছি আমরা। ওর বয়েস এখনো খুবই কম, মাত্র চোদ্দ বছর। এসব জেনে কী লাভ। তারপর যেমন করে চিঠি লিখতে হয় সব লিখে দাও...'

আমার বাঁ কাঁধের উপরে ঝুঁকে পড়ে মুখের উপরে গরম নিঃশ্বাসের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে অনবরত ফিস্ ফিস্ করত:

'লিখে দাও ওকে, কখনো যেন ছোঁড়াদের জড়িয়ে ধরিতে না দেয়। কাউকে যেন না ওর বুকে হাত দিতে দেয়। লেখো: কেউ যদি কখনো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, বিশ্বাস করিও না। তাহার আসল মতলব ভুলাইয়া তোমার সর্বনাশ করা...'

প্রাণপণে চেষ্টা করত সিদরুভ কাশি চাপতে। ধূসর মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠত, গাল দুটো উঠত ফুলে, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। চেয়ারের ভিতরে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ত যে আমার গায়ে ধাক্কা লাগত।

'আমার হাতে ধাক্কা দিচ্ছ যে!'

'ঠিক আছে, তুমি লিখে যাও: ফিটফাট ভদ্রলোকদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সাবধানে থাকিও। সুযোগ পাইলেই তাহারা মেয়েদের সর্বনাশ করে। তাহারা জানে কেমন করিয়া কথা বলিতে হয় আর নানান রকমের কথা বলিতে পারে। কিন্তু একবার যদি তাদের কথায় বিশ্বাস করো, তবে বেশ্যালয় ছাড়া আর কোথাও তোমার স্থান থাকিবে না। যদি কখনো দুই একটা রুবল জমাইতে পারো তবে পুরুতের কাছে জমা রাখিয়া দিও। তিনি যদি লোক ভালো হন

তবে তোমার জন্যে রাখিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার চাইতে কোথাও মাটিতে পঁুতিয়া রাখাই ভালো। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন না দেখিয়া ফেলে আর কোথায় রাখিলে জায়গাটা যেন মনে থাকে।'

মাথার উপরের জানালার হাঁসিকলের কিচ কিচ শব্দের ভিতরে প্রায় ডুবে যাওয়া ওর ফিস ফিস শুনতে খুবই কষ্ট হত। কালি পড়া উনুন আর মাছিতে কালো হয়ে ওঠা আলমারির দিকে তাকাতাম। রান্নাঘরটা ভীষণ নোংরা, ছারপোকায় ভর্তি; ধোঁয়া, কেরোসিন, আর পোড়া চর্বির বাষ্পে ভরা। উনুন আর জ্বালানী কাঠের উপরে সর সর করে হেঁটে বেড়াচ্ছে আরশুলা। মনটা দারুণ খারাপ হয়ে যেত। ঐ অভাগা সৈনিক আর তার বোনটির জন্যে কান্না ঠেলে উঠত আমার। এমনি করে বেঁচে থাকা কেমন করে সম্ভব?

সিদরভের ফিসফিসানিতে কান না দিয়ে লিখে যেতাম। লিখতাম জীবন কেমন নিরানন্দ, রূঢ়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সিদরভ বলত:

'অনেক লিখেছ, ধন্যবাদ! কাকে ভয় করতে হবে না হবে এবার ও বুঝতে পারবে!'

'কোনো কিছুকেই ভয় করতে নেই,' প্রত্যুত্তরে বলতাম রেগে উঠে। যদিও আমি নিজেও অনেক জিনিসকেই ভয় করি।

সৈনিক হেসে উঠত। তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলত:

'বোকা! ভয় না করে যাবে কোথায়? যত ফিটফাট ভদ্দরলোক, ভগবান? এমনি আরো অনেক কিছুকে ভয় করবে না?'

ওর বোনের কাছ থেকে চিঠি পেলেই দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বলত:

'জল্‌দি করে পড়ে শোনাও...'

তিন তিনবার করে সেই দুর্বোধ্য চিঠিটা পড়ে শোনাতে হত ওকে। চিঠিটা এত ছোট্ট আর এমন ক্লান্তিকর যে মনটা দমে যেত।

সিদরভ লোকটা সদাশয়, মনটাও কোমল, কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে ওর মনোভাব ঠিক অন্যেরই মতো — তেমনি বর্বর, তেমনি আদিম। অনেক সময়েই চোখের সামনে দেখেছি ইচ্ছেয়ই হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক কেমন করে দ্রুত ঐ সব ঘটে যেত। দেখতাম সিদরভ তার সৈনিক জীবনের কঠোরতার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে কোনো মেয়েমানুষের মনে করুণার উদ্রেক করত। তারপর ভান করা ভালোবাসার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিত। কিন্তু পরে যখন ইয়েরমোখিনের কাছে তার এই জয়ের গপ্প করত তখন

থুথু ফেলে মুখ বাঁকিয়ে এমন ভাব করত যেন এই মাত্র সে এক দাগ তেতো ওষুধ খেয়েছে। আমি এতে দারুণ আঘাত পেতাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম সৈনিকটিকে, কেন ওরা মিছে কথা বলে ভুলিয়ে মেয়েদের নিয়ে অমন ভাবে খেলা করে? কেন অনবরত হাত বদল করে? এমন কি মারধর পর্যন্ত।

প্রত্যুত্তরে সে একটু হেসে বলেছিল:

'এসব দিকে নজর দিস নে। খুব খারাপ ব্যাপার—এমন কি পাপ। তোর বয়েস খুব কম, এখনই এসব জানতে চাওয়া ঠিক নয়...'

কিন্তু একদিন খানিকটা স্পষ্ট জবাব আদায় করতে পেরেছিলাম ওর কাছ থেকে। কথাটা কোনো দিনই ভুলি নি।

'তুই কি ভাবিস ওরা জানত না যে আমি ওদের ঠকাচ্ছি?' একটু কেশে চোখ মটকে ও বলল, 'ঠিকই জানে তবুও চায় ঠকাই। এসব ব্যাপারে সবাই মিছে কথা বলে। সত্যি বলতে লজ্জা পায়, কারণ কেউ কাউকে সত্যি করে ভালোবাসে না — ফুর্তি করার জন্যে করে মাত্র। দারুণ লজ্জার ব্যাপার ওটা। একটু সবুর কর্, নিজে নিজেই টের পাবি সব। এসব কাজ করতে হয় রাত্রে, নয়ত দিনের বেলা গুদামঘরের মতো কোনো অন্ধকার ঘরের কোণা কাঞ্চিতে। এইজন্যেই তো ভগবান আদম আর ইভকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর এইজন্যেই মানুষের যতো দুঃখকষ্ট...'

এমন সুন্দর ভাবে, এমন করুণ অনুতাপভরা সুরে সে বলেছিল যে, তাতে যেন ওর ঐ ধরনের কার্যকলাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হল। ইয়েরমোখিনের চাইতে ওর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব জমে উঠল বেশি। ইয়েরমোখিনকে ঘৃণা করতাম। পদে পদেই চেষ্টা করতাম তাকে অপদস্থ করতে, প্রায়ই আমার সে চেষ্টা সফল হত। আর ইয়েরমোখিন তীব্র আক্রোশে উঠোনময় আমাকে তাড়া করে ফিরত। কিন্তু ওর চালচলনের সেই বিশ্রী গদাইলস্করী ভাবের জন্যে পারত না এঁটে উঠতে।

'ও কাজটা নিষিদ্ধ,' বলত সিদরভ।

আমিও নিষিদ্ধ বলেই জানতাম। কিন্তু ওটাই যে মানুষের জীবনের দুঃখ অশান্তির মূল তা বিশ্বাস হত না, কারণ, প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রেমে পড়া মানুষের চোখে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা। প্রেমিকদের ভিতরে পেয়েছি অনন্যসাধারণ উদারতার আভাস। প্রেম থেকে যে হৃদয়ের উৎসবের শুরু তা দেখা সৌভাগ্যের বিষয়।

কিন্তু যতদূর মনে পড়ে জীবন যেন তখন আরো বেশি একঘেয়ে, আরো

বেশি নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন যে ছক-বাঁধা কাঠামো ও সম্পর্ক দেখে আসছি তার মধ্যে বাঁধা পড়ছি চূড়ান্ত ভাবে। তা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। যে জীবনে আছি, দিনের পর দিন যে জীবন অচল অনড় হয়ে আমার সামনে রয়েছে, তার চাইতে ভালো কোনো কিছুর সম্ভাবনাও কোনো দিন কল্পনা করতে পারি নি।

কিন্তু একদিন ঐ সৈনিকেরা আমাকে এমন একটা কথা বলল যাতে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠল। বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে থাকত এক দর্জি। শহরের ভিতরের সবচাইতে সেরা দর্জির দোকানে কাজ করত। শান্ত নিরীহ গোছের মানুষ, রুশ নয়। ওর স্ত্রী দেখতে ছোটখাটো। ছেলেপুলে হয় নি, দিনরাত পড়া নিয়ে থাকত। উঠোনের হৈ-হল্লার ভিতরে, বাড়িভরা মাতালদের মধ্যে ওরা দুটি প্রাণী থাকত একান্ত নিরালায়—এতটুকুও সাড়া শব্দ পাওয়া যেত না ওদের। ওরা কাউকে নিমন্ত্রণ করত না, ছুটির দিনে থিয়েটারে ছাড়া আর কোথাও যেত না।

খুব ভোরে উঠে স্বামীটি যেত কাজে বেরিয়ে আর অনেক রাত করে ফিরত কাজ থেকে। বৌটি দেখতে ছিল একটি কিশোরী মেয়ের মতো। হপ্তায় দুদিন করে বিকেলের দিকে যেত লাইব্রেরীতে। অনেক দিন তাকে আমি গলির পথে দেখেছি। হালকা পায়ে চলেছে খুট খুট করে—ঈষৎ একটুখানি খোঁড়াতে খোঁড়াতে, তার ছোট ছোট হাতদুটি সুন্দর ভাবে দস্তানায় ঢাকা। ইস্কুলের মেয়েদের মতো চামড়ার ফিতেয় বাঁধা বইগুলি দোলাতে দোলাতে চলত রাস্তা দিয়ে—তেমনি সরল, তেমনি সতেজ, নতুন পরিপাটি। মুখখানা পাখির মতো: ছোট ছোট দুটি চোখ চঞ্চল। তাকের উপরে সাজিয়ে রাখা চীনে পুতুলের মতোই সুন্দরী। আর্দালিরা বলত ওর ডান দিকের পাঁজরের একটা হাড় নেই, তাই অমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু ওর ঐ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাটাই আমার দেখতে ভালো লাগত। ওতেই বাড়ির অন্যান্য অফিসারগিন্নীদের চাইতে ওকে স্বতন্ত্র মনে হত: তীক্ষ্ন রিনরিনে গলা, দামী পোশাক পরিচ্ছদ আর প্রচন্ড সোরগোল সত্ত্বেও এই সব অফিসারগিন্নীদের কেমন যেন ক্লান্ত, শীর্ণ বুড়োটে বুড়োটে দেখাত, যেন দীর্ঘকাল ধরে ওরা কোনো একটা অন্ধকার ঘরে অন্যান্য অব্যবহার্য ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের সঙ্গে পড়ে রয়েছে।

দর্জির ছোট বৌটিকে তার পড়শীরা কেউ খুব সুস্থ স্বাভাবিক বলে মনে করত না। তারা বলত, পড়ে পড়ে ওর মনটা এমন স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে যে

ঘরকন্না দেখার মতো সামর্থ্য আর ওর নেই। ওর স্বামী নিজে বাজার করত, মোটা তাগড়া চেহারার বিদেশী রাঁধুনীটাকে ফাইফরমাশ করত নিজেই। রাঁধুনীটার একটা চোখ, সেটাও আবার ফুলে লাল হয়ে থাকত সব সময়ে, জল পড়ত। অন্য চোখটার জায়গায় দেখা যেত ছোট একটুখানি একটা লালচে ফুটো। লোকে বলত গিন্নী নিজে কোনটা গরুর মাংস আর কোনটা বাছুরের তাই-ই চিনতে পারে না। একদিন নাকি বোকার মতো গাজরের বদলে নিয়ে এসেছিল মূল।

কী লজ্জার কথা ভাবো দেখি একবার!

বাড়িটার মধ্যে ওরা তিনটি প্রাণীই কেমন যেন ব্যতিক্রম, যেন দৈবাত এসে পড়েছে। শীতের ঝড়ো হাওয়ায় পাখিরা যেমন মানুষের নোংরা গুমোট আস্তানার জানালা গলে এসে ঢুকে পড়ে আশ্রয়ের আশায়।

আর্দালিরা আমায় জানাল যে অফিসারেরা মিলে একটা নীচ অসভ্য খেলা খেলতে শুরু করেছে দর্জির বৌয়ের সঙ্গে। প্রায় প্রত্যেক দিনই ওদের ভিতরের কেউ না কেউ ওর সৌন্দর্যের স্তুতি গেয়ে প্রাণের ব্যথা জানিয়ে প্রেম নিবেদন করে চিঠি পাঠায়। আর বৌটি জবাব দেয় ওকে যেন শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়। আর ওদের দুঃখের কারণ হয়েছে বলে দুঃখ জানিয়ে, ভগবানের কাছে ওদের মোহমুক্তির প্রার্থনা করে চিঠি দেয়। সেই চিঠি পেয়ে অফিসারেরা সবাই মিলে একসঙ্গে পড়ে, আর প্রাণভরে হাসাহাসি করে। তারপর আবার সবাই মিলে আর একখানা চিঠির মুসাবিদা করে কোনো একজনার সই দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ওর কাছে।

এ সব বলতে বলতে আর্দালিরাও খুবই হাসাহাসি করত আর গাল পাড়ত দর্জির বৌকে।

'বোকা, খুদে ল্যাংড়া বেকুব,' হেঁড়ে গলায় বলে উঠত ইয়েরমোখিন।

'সব মেয়েমানুষই ঠকতে ভালোবাসে,' পোঁ ধরত সিদরভ, 'ঠিকই বোঝে ওরা!'

ওরা যে তাকে নিয়ে এমনি করে হাসি-ঠাট্টা করছে একথা দর্জির বৌ বুঝতে পারছে বলে আমার বিশ্বাস হয় নি। মনে মনে ঠিক করলাম, ওকে গিয়ে বলব সব কথা। একদিন যেই দেখলাম ওদের রাঁধুনী নিচে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে অমনি পিছনের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে দর্জির বৌয়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম খালি, কেউ নেই। খাবার ঘরে ঢুকলাম। দেখি দর্জির বৌ বসে রয়েছে এক হাতে একটা ভারি সোনালী

কাপ, আর এক হাতে একখানা বই। আমাকে দেখে ভয়ে বইটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে ও চিৎকার করে উঠল:

'কে? আগস্তা! কে তুই?'

এলোমেলো কি কতকগুলো বললাম। প্রতি মুহূর্তেই আশা হচ্ছিল এই বুঝি হয় বইটা নয় হাতের কাপটা ছুঁড়ে মারবে আমায়। একটা বড়ো লাল রঙের আরাম-কেদারায় বসেছিল দর্জির বৌ। গায়ে একটা নীল ড্রেসিং গাউন, তলায় ঝালর দেয়া, গলায় আর কব্জিতে লেসের কাজ করা। ঢেউ খেলানো ঘন বাদামী চুলগুলো ঝর্ণার মতো বেয়ে নেমে এসেছে ঘাড়ের চারপাশ ঘিরে। গির্জার সিংহদ্বারের উপরের দেবদূতের মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল ওকে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সে প্রথমে তার ছোট ছোট দুটি চোখের ক্রুদ্ধ স্থির দৃষ্টি হেনে আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু একটু পরেই তার সে দৃষ্টি কোমল হয়ে এল, একটা বিস্ময়ভরা মৃদু হাসি ফুটে উঠল দুটি চোখে।

সবকিছু বলে চলে আসার জন্যে ফিরে দাঁড়াতে মহিলাটি বলে উঠল:

'দাঁড়া!'

ট্রের উপরে কাপটা রেখে দিয়ে বইটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপরে। তারপর দুটো হাত জোড়া করে গিন্নী-বান্নীর মতো ভরা গলায় বলল:

'কী অদ্ভুত ছেলে রে তুই... এদিকে আয়!'

ইতস্তত করতে করতে এগিয়ে গেলাম। আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার ছোট ছোট ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে বুলোতে লাগল।

'কেউ তোকে পাঠায় নি তো আমার কাছে, ওদের কেউ?' জিজ্ঞেস করল। 'বেশ বেশ, তোর কথা বিশ্বাস করলাম আমি--নিজের বুদ্ধিতেই এসেছিস তাহলে...'

আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে চোখ ঢাকল, তারপর কোমল ব্যথা-ভরা সুরে বলল:

'তাহলে ঐ নোংরা সৈনিকগুলো এই সব কথাই বলে আমার সম্পর্কে?'

'আপনি বরং উঠে যান এখান থেকে,' শান্ত গলায় বললাম।

'কেন?'

'ওরা আপনার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

স্নিগ্ধ হাসি হেসে উঠল মহিলা।

'লেখাপড়া শিখেছিস কখনো?' জিজ্ঞেস করল, 'বই পড়তে ভালো লাগে?'

'পড়ার সময় নেই আমার।'

'পড়ার ইচ্ছে থাকলে সময়ও পাবি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ!'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ডগায় টিপে ধরা একটা রুপোর টাকাশুদ্ধ ছোট হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। দারুণ লজ্জা লাগছিল তার ঐ শুকনো কৃতজ্ঞতার দান হাত পেতে নিতে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতেও সাহসে কুলল না। চলে আসার সময়ে সিঁড়ির থামের মাথায় টাকাটা রেখে দিয়ে চলে এলাম।

সম্পূর্ণ নতুন এক গভীর অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম; যেন এক নতুন প্রভাত হঠাৎ ফুটে উঠল আমার সামনে। তারপর থেকে কিছুদিন পর্যন্ত সেই খোলা-মেলা ঘরটার কথা, নীল পোশাক-পরা পরীর মতো দেখতে ঐ দর্জির বৌয়ের কথা মনে পড়ে মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠত। ওখানকার সবকিছুই যেন অচেনা রকমের সুন্দর। ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে সোনালী রঙের সেই পুরু গালিচা আর রুপোলী জানালার পথে শীতের দিন যেন ওরই সান্নিধ্যে উষ্ণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে আছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, আর একবার গিয়ে দেখে আসি তাকে। ওর কাছে যদি একখানা বই চাই তো কেমন হয়।

গেলাম। গিয়ে দেখলাম ঠিক একই জায়গায় বসে রয়েছে তেমনি করে, হাতে একটা বই। কিন্তু এবার দেখলাম ওর মাথা মুখ ঘিরে বাঁধা রয়েছে বাদামী রঙের একটা রুমাল, একটা চোখ ফুলে উঠেছে। আমার হাতে কালো মলাটের একখানা বই দিয়ে কী যেন বলল মাথায় ঢুকল না। বিষণ্ণ মনে ন্যাপথালিনের গন্ধ মাখা বইটা নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি এসে কাগজ আর একটা ফর্সা জামায় মুড়ে বইটা চিলেঘরে লুকিয়ে রেখে দিলাম পাছে মনিবেরা দেখতে পেয়ে বইটাকে নষ্ট করে দেয়। এ বাড়ির লোকেরা 'নিভা' পত্রিকা রাখত, বিশেষ করে পোশাকের রকমারী নমুনা দেখার জন্যে আর ওর সঙ্গে যে স্মৃতি উপহার দেয় তারই লোভে, কিন্তু কখনো পড়ত না। ছবি দেখা হয়ে যাবার পরে শোবার ঘরের কাপড়চোপড় রাখার আলমারির মাথায় তুলে রেখে দিত। বছরের শেষে সবগুলো বেঁধে তিনখন্ড 'সচিত্র পত্রিকা'র সঙ্গে লুকিয়ে রেখে দিত খাটের তলায়। যখনই আমি শোবার ঘর ধুতাম, নোংরা জলে ভিজে যেত বইগুলো। আমার মনিব ছিল 'রুশ কুরিয়ের' কাগজটারও গ্রাহক।

'কেন যে ওরা এসব ছাই-ভস্ম লেখে তা শয়তানই জানে,' সন্ধ্যা বেলায় কাগজটা পড়ার পরে বলত মনিব, 'কি বিশ্রী একঘেয়ে!'

শনিবার চিলেছাদে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মনে পড়ল বইটার কথা। বইটা বের করে খুললাম। পড়লাম প্রথম লাইন: 'মানুষেরই মতো বাড়িগুলোরও প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা চেহারা রয়েছে।' কথাটার সত্যতায় অবাক হয়ে গেলাম, পড়তে লাগলাম। চিলেকোঠার জানালার সামনে বসে কনকনে শীতের জ্বালায় না পালান পর্যন্ত পড়ে চললাম। সেদিন সন্ধ্যায় মনিবেরা গির্জার সান্ধ্য উপাসনা সভায় চলে গেলে পরে বইটা নিয়ে বসলাম রান্নাঘরে। তারপর শরতের বিবর্ণ হলদে গাছের পাতার মতো বইটার জীর্ণ পাতার ভিতরে ডুবে গেলাম। ওরা যেন এক অন্য জগতে নিয়ে এল আমাকে। সে জগতের নাম আলাদা, সম্পর্ক আলাদা। এমন সব মহৎ হৃদয় বীর পুরুষ, নরাধম দুর্বৃত্তের দেখা পেলাম, যারা আমার সমস্ত পরিচিত লোকজনের চাইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বইটা দ্যে মঁতেপিয়েঁর লেখা বড়ো একটা উপন্যাস — বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রে ভরা এক অদ্ভুত গতিশীল জীবনের চিত্র। সবকিছুই যেন আশ্চর্য রকমের সাবলীল। লাইনগুলোর ভিতরে ভিতরে যেন আলো লুকানো রয়েছে, সে আলো ভালো মন্দ দুটোর উপরেই প্রতিফলিত হয়ে পাঠককে ভালোবাসতে, ঘৃণা করতে সাহায্য করছে। ঘটনার সংকটময় জটিলতার ভিতরে বাঁধা পড়েছে চরিত্রগুলি, সে জটিলতা ভেদ করে চলেছে এগিয়ে। চরিত্রগুলোর কোনোটাকে সাহায্য করার, কাউকে প্রতিরোধ করার এক অত্যুগ্র কামনা জাগিয়ে তুলছে অন্তরে। পাঠক ভুলে যায়, এই যে জীবন, যা অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার চোখের সামনে, তার অস্তিত্ব ওই কাগজের বুকেই। বস্তুত মুহূর্তের আনন্দ, পরমুহূর্তের হতাশার ঘাত-প্রতিঘাতের ওঠা-নামার ভিতরে পাঠক আর সবকিছুই ভুলে যায়।

পড়তে পড়তে এতোই তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম যে দোরের ঘণ্টা বেজে উঠতে, প্রথমটায় কে বাজাচ্ছে কেনই বা বাজাচ্ছে তা বুঝতেই পারি নি।

মোমবাতিটা প্রায় সবটাই পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে আর দীপদানিটা, যেটাকে আমি সকাল বেলায়ই মেজে ঘসে চকচকে করে তুলেছিলাম সেটার সর্বাঙ্গে জমে উঠেছে গলানো মোম। আইকনের সামনের বাতিটা যাতে কখনো নিভে না যায় সেটা তদারক করার ভার ছিল আমার উপরে। দেখি সেটা দীপদানি থেকে খসে পড়ে গিয়ে নিভে রয়েছে। আমার অপরাধ ঢেকে ফেলার জন্যে রান্নাঘরময় ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিলাম: বইটাকে লুকিয়ে ফেললাম উনুনের তলায়, বাতিটা ঠিক করে রাখলাম।

'কালা হয়ে গেছিস না কি? ঘণ্টা শুনতে পাস না?' শোবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল আয়া।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম সামনের দরজায়।

'ঘুমোচ্ছিলি?' তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মনিব। আমারই জন্যে ওরা নাকি শীতে মরে গেল অভিযোগ করল তার বৌ আর বুড়ি আমার বাপ বাপান্ত করতে লাগল। রান্নাঘরে ঢুকেই পুড়ে যাওয়া মোমবাতিটা তার নজরে পড়ল, জিজ্ঞেস করল কী করছিলাম আমি এতক্ষণ।

পাছে বইটা চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে আমি পাথর হয়ে ছিলাম। যেন এইমাত্র অনেক উঁচু একটা জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বুড়ি চিৎকার করে জানাল ওরা যদি লক্ষ্য না রাখত তবে কোনোদিন আমি ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দিতাম। তারপর যখন মনিব আর তার বৌ খেতে এল, বুড়ি বলল:

'এই দেখো, গোটা মোমবাতিটাকে পুড়িয়ে শেষ করে রেখেছে, এখন বাকি আছে শুধু ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেয়া।'

রাত্রে খেতে বসে চারজনে মিলে আমার অতীতের সমস্ত ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের উল্লেখ করে গাল পাড়তে লাগল। এর পরিণাম একদিন খুবই খারাপ হবে বলে শাসাল, কিন্তু আমি জানতাম যে ওদের এই সব কথার পিছনে না আছে বিদ্বেষ, না আছে আমার ভালো করার সদিচ্ছা — যা আছে সেটা হচ্ছে নিছক বিরক্তি, একঘেয়েমি। অবাক লাগছিল এই দেখে, যে বইয়ের চরিত্রগুলির তুলনায় ওরা কতোই না নির্বোধ, কতোই না তুচ্ছ।

খাওয়া শেষ হলে পেট বোঝাই করে ওরা ক্লান্ত হয়ে ঢুকল বিছানায়; খাওয়ার পরে বুড়ি প্রথমে ভগবানের কাছে খানিকটা হিংস্র অভিযোগ পেশ করে সুড় সুড় করে উনুনের উপরে উঠে পরক্ষণেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমিও তখন উনুনের তলা থেকে বইটা বের করে জানালায় গিয়ে বসলাম। জ্যোৎস্না রাত, ভরা চাঁদের আলোয় ঝলমল। কিন্তু তবুও ছাপার অক্ষরগুলো এতো ছোট ছোট যে পড়া যায় না। পড়ার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠল। তাক থেকে একটা তামার কড়া এনে তাতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত করে ফেললাম বইয়ের পাতার উপরে, কিন্তু সেটা আরো খারাপ হল — আরো বেশি ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল। শেষে কোণের দিকের বেঞ্চটার উপরে দাঁড়িয়ে আইকনের সামনের প্রদীপের আলোয় পড়তে লাগলাম। ক্লান্ত হয়ে কখন যে বেঞ্চের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানতেও পারি নি। হঠাৎ বুড়ির চেঁচামেচি

আর কিল চড়ে ঘুম ভেঙে গেল। খালি পায়ে বুড়ি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে শুধু মাত্র রাত্রিবাস। রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। আর বইটা হাতে নিয়ে আমার কাঁধের উপরে পিটে চলেছে।

'আঃ! মা থামুন, চেঁচাবেন না!' মাচার ওপর থেকে ঘোঁৎ করে উঠল ভিক্তর, 'নাঃ, আপনার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব!'

আমি ভাবলাম, 'বইটার দফা শেষ — নিশ্চয়ই বুড়ি ছিঁড়ে ফেলবে কুটি কুটি করে।'

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময়ে আমার কৈফিয়ত তলব করা হল।

'ও বইটা পেয়েছিস কোথায়?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল মনিব।

দুই মেয়েছেলে পাল্লা জুড়ে দিল কে বেশি গাল পাড়তে পারে আমাকে। আর ভিক্তর বইটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে আরম্ভ করল।

'আরে তাই তো, খোশবাই ছাড়ছে,' বলল ভিক্তর।

যখন বললাম যে বইটা পুরুতের, অবাক হয়ে ওরা উলটে-পালটে দেখতে লাগল। একটু ক্ষুব্ধও হল যে পুরুত হয়ে কিনা উপন্যাস পড়ে। এতে অবশ্য ওরা খানিকটা দমেও গেল তবুও মনিব আমাকে শাসিয়ে বলল বই-পড়াটা ভীষণ বিপজ্জনক আর ক্ষতিকর কাজ।

'সেই যে রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছিল যারা, তারা এই বই-পড়ুয়ার দলই ছিল।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে ওকে বাধা দিয়ে বলল ওর বৌ, 'কী সব কথা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছ?'

দ্যে মঁতেপিয়েঁর বইটা নিয়ে আমি আর্দালির কাছে গেলাম, ওকে যা যা ঘটেছে সব বললাম। একটিও কথা না বলে সিদরভ বইটা টেনে নিল, তারপর একটা ছোট বাক্স খুলে কাচা একখানা তোয়ালে বের করে বইটা মুড়ে বাক্সের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দিল।

'আরে, ওদের কথায় কান দিস নে, এখানে এসে পড়িস,' বলল সিদরভ, 'আর যদি কখনো এসে দেখিস যে আমি বাড়ি নেই আইকনের পেছনে চাবিটা থাকবে। বাক্স খুলে যতক্ষণ প্রাণ চায়, পড়িস...'

বই সম্পর্কে আমার মনিবদের ধারণাকে ধন্যবাদ: এরই ফলে বইয়ের উপরে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ আর বিস্ময় জাগানো রহস্যের ভাব জেগে উঠল আমার মনে। কোন 'পড়িয়ে-লোক কোথাকার' রেল লাইন উড়িয়ে দিয়ে কাকে খুন করতে গিয়েছিল সে খবরে এতটুকুও আগ্রহ ছিল না আমার। কিন্তু তবুও

পাপ-স্বীকারের সময়ে পুরুতের সেই প্রশ্ন ভুলে যাই নি, ভুলে যাই নি একতলার ঘরের সেই ছাত্রীটির পড়ার কথা, স্মুরির 'ঠিক বই' সম্পর্কে মন্তব্য, কিংবা দাদুর মুখে শোনা সেই ফ্রীমেসনারদের কাহিনী — যারা সব গুহ্য বই পড়ত আর তুকতাক করে বেড়াত:

'তারপর একদিন জার আলেক্সান্দার পাভলভিচের সুখ-শান্তি-ভরা রাজত্বকালে বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত লোকেরা গুহ্য বই-পড়িয়ে জেসুইটরা ফ্রীমেসনারদের সঙ্গে চক্রান্ত করল রুশবাসীদের রোমের পোপের হাতে তুলে দেবে, কিন্তু তখন এগিয়ে এলেন সেনাপতি আরাকচেয়েভ, খেতাব বা পদমর্যাদার বাছ-বিচার না করে সবগুলোকে ধরে পাঠিয়ে দিলেন সাইবেরিয়ায়। সেখানে সাধারণ কয়েদীদের মতো খেটে খেটে নোংরা আবর্জনার মতো পচে গলে শেষ হয়ে গেল তারা...'

আরো মনে আছে 'নক্ষত্র খচিত প্রচ্ছায়া' আর 'গেরভাসি'র কথা। মনে আছে সেই গম্ভীর বিদ্রূপের বাণী:

'হে অবোধ প্রাণী, তোমরা বুঝতে চাও আমাদের কাণ্ডকারখানা, কোনো কালেই তোমাদের ক্ষুদ্র মন তার কাছে পর্যন্ত পেঁছিতে পারবে না!'

মনে হত, আমি যেন কী এক বিরাট রহস্যের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। আর এই অনুভূতি আমাকে যেন ভূতে পাওয়া মানুষের মতো করে তুলেছিল। বইটা শেষ করে ফেলার জন্যে এক নিদারুণ ব্যাকুলতা জেগে উঠল আমার মনে। ভয় হত পাছে আর্দালির রান্নাঘর থেকে বইটা হারিয়ে যায় বা ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে কী কৈফিয়ত দেব দর্জির বৌয়ের কাছে?

বুড়ি কড়া নজর রাখতে শুরু করল আমার উপরে, যাতে আর্দালির ঘরে না যেতে পারি। চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লাগত:

'এই বইয়ের পোকা, শোন, বই শুধু চরিত্তির নষ্ট করতে শেখায়। দেখ না কেন ঐ বৌটাকে, দিন রাত্তির বই মুখে করে পড়ে থাকে, বাজারে পর্যন্ত যেতে পারে না। আর সব সময়েই অফিসারদের সঙ্গে নটঘট চালাচ্ছে। কেমন করে দিনের বেলায় তাদের ঘরে ঢোকায় তা কি আর জানি না?'

ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে উঠি:

'মিথ্যে কথা! তাদের সঙ্গে ওর কোনো নটঘট নেই!'

কিন্তু দর্জির বৌয়ের পক্ষ হয়ে কিছু বলতে সাহস হল না, পাছে বুড়ি অনুমানে বুঝে ফেলে বইটা তার।

বহুদিন ধরে দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটতে লাগল আমার: কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম, রাত্রে ঘুম আসত না চোখে। সে মঁতেপিয়ের

কপালে কী যে আছে ভেবে ভেবে দারুণ দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলাম। একদিন উঠোন দিয়ে যেতে দর্জি'র ঘরের রাঁধুনী আমাকে ডেকে বলল:

'বইটা ফেরত দিয়ে যেয়ো!'

ঠিক করলাম, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে যখন আমার মনিবেরা ঘুমোবে তখন যাব। হতাশাভরা বিব্রত মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম দর্জি'র বৌয়ের সামনে।

প্রথম দিন যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনিই দেখলাম, শুধু পোশাকটা অন্যরকমের। পরনে ধূসর রঙের স্কার্ট, গায়ে কালো মখমলের ব্লাউজ, গলায় নীল পাথরের একটা ক্রুশ। ওকে দেখে আমার মনে পড়ল বৌ-কথা-কও পাখির কথা।

ওকে বললাম বইটা শেষ করার সময় পাই নি। বললাম, আমার বই পড়া মানা। বলতে বলতে এই দুঃখের সঙ্গে আবার যে ওকে দেখতে পেয়েছি তার আনন্দ মিলে দুচোখ জলে ভরে উঠল।

'কী সব মূর্খের দল!' সুন্দর ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলল, 'অথচ দেখতে তো তোমার মনিব বেশ বুদ্ধিমান। যাক গে, মন খারাপ করিস না। ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক করব'খন। ওকে চিঠি দেব আমি!'

ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম যে, মনিবের কাছে মিথ্যা করে বলেছি বইটা পুরুতের।

'লিখবেন না দয়া করে,' মিনতি করে বললাম, 'ওরা শুধু আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে আর আকথা কুকথা বলবে। আমাদের উঠোনের কেউই আপনাকে দেখতে পারে না। ওরা আপনাকে নিয়ে হাসি মস্করা করে, বলে বোকা, বলে, আপনার পাঁজরার একটা হাড় নেই...'

কথাগুলো সব একই সঙ্গে তোড়ের মতো বেরিয়ে এল। আর বলা শেষ হয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম, কথাগুলো অভদ্র। উপরের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বৌটি পাছার উপরে একটা চড় মারল যেন ঘোড়ার পিঠে উঠেছে। আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতরে গিয়ে ঢুকি। কিন্তু হঠাৎ সে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে হাসির ধমকে ফেটে পড়ল।

'ওঃ কী বেকুব, কী বেকুব! কিন্তু আমি তার কী করতে পারি?' আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন নিজের কাছেই প্রশ্ন করল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলে উঠল, 'ভারি অদ্ভুত ছেলে তুই— ভারি অদ্ভুত!'

ওর পাশের আয়নাটার দিকে তাকালাম। দেখলাম গালের হাড় দুটো উঁচু, থ্যাবড়া নাকওয়ালা একখানা মুখ। কপালের উপরে বড়ো কালশিটে আর এক মাথা এলোমেলো চুল চারদিক দিয়ে ঝুলে ঝুলে পড়েছে। এরই জন্যে কি বললে 'ভারি অদ্ভুত ছেলে'? নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত ছেলেটার সঙ্গে ঐ ফিটফাট চীনা পুতুলের কোথাও এতটুকু সাদৃশ্য নেই।

'সে দিন তোকে যে টাকাটা দিয়েছিলাম তা নিস নি। কেন নিলি না?'

'দরকার ছিল না আমার।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল মহিলা।

'বেশ, তাহলে আর কি উপায় আছে! ওরা যদি কখনো পড়তে দেয়, আয়, আমি বই দেব...'

তাকের উপরে তিনখানা বই রয়েছে; যেটা আমি এইমাত্র ফিরিয়ে দিলাম সেটাই সবচাইতে মোটা। কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বইটার দিকে। দর্জির বৌ একখানি ছোট গোলাপী রঙের হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, বলল:

'আচ্ছা, আয় তবে!'

একান্ত সন্তর্পণে আমি তার হাতখানি একটু ছুঁয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

হয়ত ওরা যা বলে তাই-ই ঠিক, কিছুই জানে না সে। এইতো, বিশ কোপেককে সে বাচ্চাছেলেদের মতো বলল টাকা!

অথচ সেটা আমার ভালোই লাগল।

৯

আমার সেই হঠাৎ পেয়ে বসা পড়ার নেশার দরুন কতোই না অপমান, কতোই না আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, কতোই না ভয়ে ভয়ে দিন কাটত— সে সব কথা আজ ভাবতে যেমন মজাও লাগে তেমনি দুঃখও হয়।

ধারণা হয়েছিল দর্জির বৌয়ের বইগুলি অনেক দামী। পাছে বুড়ি গিন্নী সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে দেয় তাই সেগুলোর কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তার বদলে যেখান থেকে ভোরবেলা প্রাতরাশের রুটি আনতাম, সেই রুটিওয়ালার দোকান থেকে ছোট ছোট রঙচঙে বই আনতে আরম্ভ করলাম।

দোকানী লোকটা বিশ্রী বদখত চেহারার মানুষ: পুরু পুরু ঠোঁট, ঘাম

চেটচেটে, ময়দার তালের মতো ফুলো ফুলো মুখ, মুখময় ছোট ছোট আব আর কাটা দাগ, চোখ দুটো ঘোলাটে, ফুলো ফুলো দুটো হাতে বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙুল। সন্ধ্যাবেলা ওর দোকানটা পাড়ার নষ্ট ছোঁড়া-ছুঁড়িদের প্রমোদ-কুঞ্জ হয়ে উঠত। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায়ই আমার মনিবের ভাই বিয়ার টানতে আর তাস পিটতে যেত ওখানে। প্রায় রাত্রের খাবার সময়ে আমায় গিয়ে তাকে সেখান থেকে ডেকে আনতে হত। একাধিক দিন দেখেছি দোকানের পিছনের ছোট ঘরটায় দোকানীর নির্বোধ রাঙা বৌটা হয় ভিক্তর বা অন্য কোনো যুবকের কোলের উপরে বসে রয়েছে। বোধ হয় দোকানী তাতে আদৌ রাগ করত না। দোকানীর বোন খদ্দেরদের দেখাশুনো করায় সাহায্য করত দোকানীকে। সৈনিক গাইয়ে বা যে কেউই ওকে আলিঙ্গন করতে চাইলে তাতেও দোকানী মোটে ভ্রূক্ষেপ করত না। দোকানে বিক্রির মালপত্র ছিল অতি সামান্যই। কৈফিয়ত দিয়ে দোকানী বলত, নতুন দোকান— এখনো ঠিক ভালো করে কারবারটা গুছিয়ে উঠতে পারি নি; যদিও দোকানটা খোলা হয়েছিল শরৎকালে। খদ্দেরদের ও দেখাত অশ্লীল ছবি, যে চাইত তাকেই টুকে নিতে দিত কুৎসিত গান।

এক কোপেক দক্ষিণা দিয়ে আমি মিশা ইয়েভ্স্তিগ্নেয়েভের পানসে পানসে বইগুলো নিয়ে এসে পড়তাম। এতটা খরচা আমার পক্ষে কুলিয়ে উঠত না, তাছাড়া পড়ে মোটেই আনন্দ পেতাম না। 'গিউয়াক বা অপরাজেয় বিশ্বস্ততা', 'ফ্রানসিল ভেনেসিয়ান', 'রুশ-কাবাদীয় যুদ্ধ বা প্রিয়তমের কফিনের উপরে সুন্দরী মুসলমান তরুণীর মৃত্যু' — এই ধরনের সাহিত্য পড়ে একটুও আনন্দ পেতাম না, বরং বিতৃষ্ণাই জাগত। এমন সব অসম্ভব ঘটনা এতো বিশ্রী ভাষায় লেখা থাকত, মনে হত যেন বইগুলো আমাকে বোকা বানাতে চায়।

তার চাইতে 'লক্ষ্যভেদী', 'ইউরি মিলোস্লাভ্স্কি', 'রহস্যময় সন্ন্যাসী', 'তাতার অশ্বারোহী ইয়াপান্চা' বইগুলোই পড়ে বেশি আনন্দ পেলাম। অন্তত মনে খানিকটা দাগ কেটে রেখে যেত। কিন্তু সবচাইতে বেশি ভালো লাগল 'সাধু জীবনী' — এর ভিতরে তবু কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় ছিল, মাঝে মাঝে অন্তরেও গভীর ভাবে নাড়া দিত। কেন জানি যত পুরুষ মেয়ে শহীদদের কথা মনে হলেই মনে পড়ত 'বাঃ বেশ' সেই লোকটা আর দিদিমাকে, আর ধর্মযাজকের কথা মনে হলে মনে পড়ত আগের সেই সুদিনের দাদুকে।

হয় চিলেকোঠায় নয়ত কাঠ চ্যালাবার জন্যে যখন গুদাম ঘরে যেতাম বসে বসে বই পড়তাম। দুটো জায়গাই যেমন ঠাণ্ডা তেমনি অস্বস্তিকর। বইটা খুবই ভালো লাগলে বা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফিরিয়ে দেবার তাড়া থাকলে, রাত্রে উঠে মোমবাতি জেবলে পড়তাম। কিন্তু বুড়ির নজরে পড়ল মোমবাতিটা রাত্রে কমে যায়, তাই একটুকরো কাঠের চটা দিয়ে মেপে কাঠটা লুকিয়ে রেখে দিত। আমিও কাঠটা খুঁজে খুঁজে বের করতাম আর মাপ মতো ভেঙে ঠিক করে রেখে দিতাম। কিন্তু যেদিন পারতাম না, ভোরে উঠে যদি বুড়ি তার মাপের সঙ্গে মোমবাতিটার গরমিল দেখতে পেত সেদিন রান্নাঘরে এমন সোরগোল তুলত যে এক একদিন দারুণ চটে গিয়ে মাচার উপর থেকে চিৎকার করে উঠত ভিক্তর:

'আপনার ঘেউ ঘেউ থামান মা! আপনার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব! নিশ্চয়ই ও বাতি জেবলে বই পড়ে। দোকান থেকে বই আনে। আমি দেখেছি ওকে দোকান থেকে বই আনতে। চিলেঘরে দেখুন গে খুঁজে!'

বুড়ি ছুটে চলে গেল চিলেঘরে। খুঁজে পেতে একটা ছোট বই পেয়েই সেটাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল।

দারুণ আঘাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে আমার পড়ার স্পৃহা আরো বাড়িয়ে দিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বর্গ থেকে কোন সাধু এদের বাড়িতে নেমে এলেও আমার মনিব-গিন্নীরা তাকে মনের মতো করে গড়ে পিটে তোলার জন্যে আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিতে লেগে যেত। আর তা করত করার মতো তাদের হাতে আর কোনো ভালো কাজ ছিল না বলেই। ওরা যদি ঝগড়া চেঁচামেচি, পরনিন্দা-পরচর্চা না করত তবে বোবা হয়ে যেত -- নিজেদের শক্তিটুকুও ফেলত হারিয়ে, নিজেদের ভুলেও যেত। অপরের সঙ্গে সচেতন সম্পর্কে এসেই মানুষ নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু আমার মনিবেরা দুনিয়ায় একটিমাত্র সম্পর্কের কথাই জানত — গুরুমশাই আর বিচারকের সম্পর্ক। কেউ যদি ওদের ধরণ ধারণে, ওদেরই মতো করে জীবনকে গড়ে তোলে তবে ওরা সেইজন্যেই তার সমালোচনা করবে। এমনিই ওদের স্বভাব।

পড়ার নানান ফন্দিফিকির বের করলাম। অনেকবার বুড়ি আমার বই ছিঁড়ে দিয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত দোকানীর কাছে সাতচল্লিশ কোপেকের এক বিরাট দেনার ফেরে পড়ে গেলাম। দোকানী দাবি জানাল এক্ষুণি দেনা শোধ না করলে সকালে যখন রুটি কিনতে যাব তখন মনিবের পয়সা থেকে পয়সা কেটে রেখে দেবে।

'কেমন মজাটি হবে তখন?' আমাকে খোঁচা দিয়ে বলল দোকানী।

লোকটা আমার কাছে অসহ্য বিরক্তিকর। সেটা সে টের পেত বলেই মনে হয়, কারণ নানা ভাবে আমাকে শাসিয়ে, পীড়ন করে সে আনন্দ পেত। যখনই আমি দোকানে ঢুকতাম, ময়দার তালের মতো মুখটা তার দন্ত বিকশিত হয়ে উঠত।

'ধারের পয়সা এনেছিস?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করত।

'না।'

সঙ্গে সঙ্গেই বিরূপ হয়ে উঠত, কপাল কোঁচকাত।

'না? তাহলে কী করব আমি তোকে নিয়ে? আদালতে নালিশ ঠুকে দেব? ওরা তবে তোকে জাহাজে পুরে দূর দেশের কোনো ছোকরা জেলে চালান করে দিক!'

পয়সা যোগাড় করার কোনো উপায় ছিল না আমার। কারণ আমার মাইনে দেয়া হয় দাদুর হাতে। কী যে করব জানি না। দোকানীকে কয়েক দিন সবুর করতে বলায় ভাজা পিঠের মতো তেলতেলে ফুলো ফুলো হাতটা সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'চুমু খা, তাহলে সবুর করব!'

ওর কাউণ্টার থেকে একটা বাটখারা তুলে ওর মাথাটা তাক করে উঁচিয়ে ধরলাম। মাথাটা নিচু করে ও চিৎকার করে উঠল:

'আরে, আরে করিস কী? আমি ঠাট্টা করছিলাম!'

বুঝতে পারলাম ও মোটেই ঠাট্টা করে নি। ঠিক করলাম ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে চুরি করে এনে মিটিয়ে দেব পয়সাটা। সকালে যখন মনিবের পোশাক ঝাড়তাম প্রায়ই দেখতাম খুচরো পয়সা থাকত পকেটে। কোনো কোনো দিন মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে যেত। একবার একটা মুদ্রা গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির তলার কাঠের স্তূপের তলায় গিয়ে পড়েছিল, কথাটা মনিবকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পরে হঠাৎ যখন কাঠের ভিতরে বিশ কোপেকটা কুড়িয়ে পেলাম তখন মনে পড়ল। পয়সাটা যখন ফিরিয়ে দিলাম মনিবকে, তার বৌ বলল:

'দেখলে তো? পকেটে রাখার সময়ে পয়সাকড়ি গুণে রেখে দিও।'

'আরে, ও চুরি করবে না!' আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মনিব বলেছিল।

এখন চুরি করব ঠিক করতেই মনে পড়ে গেল তার সেই কথাটা। চোখের

সামনে ভেসে উঠল তার একান্ত বিশ্বাসভরা মৃদু হাসি — চুরি করাটা শক্ত হয়ে উঠল আমার কাছে। অনেকদিন তার পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করেছি, গুণেছি, তারপর আবার রেখে দিয়েছি পকেটে। তিনদিন যুঝলাম নিজের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ অতি সহজেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

'কী হয়েছে তোর আজকাল, পেশকভ?' অপ্রত্যাশিত ভাবে জিজ্ঞেস করল মনিব, 'যেন তুই আর সেই তুই নস, শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

আমার দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা অকপটে খুলে বললাম তাকে।

'দেখ দেখি বই তোকে কোথায় এনে ফেলেছে,' ভ্রূ কুঁচকে বলল। 'যেভাবেই হোক বই নিশ্চয়ই তোর অনিষ্ট করবে, জেনে রাখিস এ কথা।'

কিন্তু সে আমাকে পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে একটু শাসিয়ে দিল:

'খবর্দার আমার বৌ বা মা যেন এ কথা জানতে না পারে, তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে।'

তারপর একটু স্মিত হেসে বলল:

'তুই একটা একগুঁয়ে ভূত, যাক গে! ঠিক আছে — খুব খারাপ লক্ষণ নয়, কিন্তু ঐ বই পড়াটা ছেড়ে দে! নতুন বছর থেকে একটা খুব ভালো দেখে খবরের কাগজ আনাব, তখন অনেক কিছু পড়তে পাবি।'

তাই হল: সন্ধ্যার চায়ের পর্ব থেকে রাত্রের খাবার সময় পর্যন্ত মনিবদের 'মস্কো পত্র' পড়ে শোনাতাম। তাতে ভাশকভ, রকশানিন, রুদনিকভ্স্কি প্রভৃতি অনেক লেখকের উপন্যাস বেরত। কর্মহীন একঘেয়েমীতে যারা ভুগছে তাদের উদ্দেশ্যেই ঐ উপন্যাসগুলি লেখা।

জোরে জোরে পড়তে আমার বিশ্রী লাগত: তাতে মূল বক্তব্য বোঝার দিক থেকে অসুবিধা হত আমার। কিন্তু আমার শ্রোতারা খুব মন দিয়ে পরম উৎসাহে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। নৃশংসতার ঘটনা শুনে মুখ হাঁ করে আঁৎকে উঠত, আর গর্বের সঙ্গে পরস্পর বলাবলি করত:

'ভগবান বাঁচিয়েছেন! এখানে কেমন আমরা শান্ত ভাবে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করছি। বাইরে কী ঘটছে না ঘটছে তার ধার ধারি না!'

ওরা সবকিছুই ঘুলিয়ে ফেলত। বিখ্যাত দস্যু চুরকিনের কার্যকলাপ চাপিয়ে দিত কোচোয়ান ফোমা কুচিনার ঘাড়ে। অনবরতই নাম উলট-পালট করে বসত। তারপর যখন আমি সেগুলো শুধরে দিতাম অবাক হয়ে বলাবলি করত ওরা:

'ছেলেটার কী মাথা!'

'মস্কো পত্রে' প্রায়ই লিওনিদ গ্রাভে'র কবিতা ছাপা হত। খুবই ভালো লাগত আমার, খাতায় টুকে নিতাম। আমার মনিব-গিন্নীরা কিন্তু কবি সম্পর্কে বলত:

'দেখ দিকি নি একবার — বুড়োমানুষ কিনা পদ্য লেখে!'

'ওর মতো একটা মাতাল, দুর্বল চরিত্রের লোকের পক্ষে এ আর এমন বেশি কথা কী!'

আমার ভালো লাগত স্ত্রুঝকিন আর কাউণ্ট মেমেন্তো-মোরির কবিতা, কিন্তু বুড়ি আর যুবতী দুই গিন্নীই বলত কবিতা হচ্ছে নেহাৎ বাজে জিনিস।

'শুধু ভাঁড় আর নাটুকেরাই পদ্য আওড়ায়।'

শীতের সন্ধ্যেয় সেই দম আটকে আসা ছোট ঘরটায় মনিবদের চোখের সামনে বসে থাকতে কী ভীষণ বিরক্তিই না লাগত! জানালার বাইরে মৃত্যু-নিথর রাত: থেকে থেকে জেগে উঠছে তুষার পড়ার অনুচ্চ শব্দ। কিন্তু এখানে বরফের ভিতরে জমে যাওয়া মাছের মতোই সবাই চুপচাপ বসে আছে টেবিল ঘিরে। কখনো কখনো দেয়ালের গায়ে, জানালার কাচে ঝাপটা মারে ঝড়ো হাওয়া, তীব্র আর্তনাদ নামে চিমনি বেয়ে, কোঁকিয়ে ওঠে ড্যাম্পার, আর বাচ্চাদের ঘর থেকে জেগে ওঠে শিশুদের কান্না। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে কোনো অন্ধকার নিরালা কোণে বসে নেকড়ের মতো গর্জন করে চলি।

টেবিলের একদিকে বসে মেয়েছেলেরা সেলাই করত নয়ত মোজা বুনত। আর একদিকে বসে ভিক্তর একান্ত অনিচ্ছায় কোনো একটা নক্সা নকল করত, আর একটু পরে পরেই খেঁকিয়ে উঠত:

'খবর্দার, টেবিল নাড়িও না বলে দিচ্ছি! তোমাদের সঙ্গে বাস করাই অসম্ভব দেখছি! যত সব কাদাখোঁচার দল!'

একটু দূরে একপাশে বসে মনিব বড়ো একটা ফ্রেমে টেবিল ক্লথে বুটি তোলে। তার সঞ্চরমান আঙুলের তলায় ফুটে উঠছিল লাল রঙের কাঁকড়া, নীল রঙের মাছ, হলদে প্রজাপতি, বাদামী রঙের শরতের পাতা। নিজেই ছবি এঁকেছে ক্লথে আর বুটি তুলছে গত তিন শীত ধরে,—এই কাজটায় বিরক্তি ধরে গেছে ওর, তাই দিনের বেলা যখন আমার হাতে কোনো কাজ থাকত না, বলত:

'পেশকভ, টেবিল ক্লথটায় একটু হাত লাগা তো!'

মোটা ছুঁচটা তুলে নিয়ে আমিও লেগে যেতাম: মনিবের জন্যে সব সময়েই দুঃখ হত আমার, যেটুকু পারি সাহায্য করতে চাইতাম আমি। আমার মনে হত ঐ নক্সা আঁকা, টেবিল ক্লথে এমব্রয়ডারি তোলা, তাস খেলা ইত্যাদি ছেড়ে সে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিছু একটা করবে। মাঝে মাঝে যখন হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে অবাক বিস্ময়ে লোকটা তাকিয়ে থাকত তার আঁকার দিকে তখন ওর চোখে যে স্বপ্ন ফুটে উঠত সেই স্বপ্নের মতো। যেন সেটা এই প্রথম পড়ল তার চোখে, তখন নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকত। চুলগুলো গালে ভ্রূর উপরে পড়ত, তরুণ সন্ন্যাসীর মতোই দেখাত।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করত ওর বৌ।

'বিশেষ কিছু না,' আবার কাজ আরম্ভ করে দিয়ে বলত।

অবাক হয়ে চুপ করে থাকতাম। কী করে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারে সে কি ভাবছে? কেমন করেই বা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব? মানুষ একই সঙ্গে অনেক কিছুই ভাবে — এইমুহূর্তে চোখের সামনে যা দেখছে, যা কাল বা গত বছর দেখেছে এ সবকিছুরই তালগোল পাকানো অস্পষ্ট ছায়া প্রতিমুহূর্তেই আবর্তিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে।

'মস্কো পত্রে' যেসব লেখা থাকত তাতে গোটা সন্ধ্যাটা কাটত না। আমি একদিন প্রস্তাব করলাম শোবার ঘরে খাটের নিচে যে মাসিক পত্রিকাগুলো স্তূপ করা রয়েছে সেগুলো এনে পড়া যাক।

'ওগুলোর ভিতরে পড়ার কী আছে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল ছোট গিন্নী, 'শুধু তো ছবিতে ভর্তি।'

কিন্তু শুধু যে খাটের তলার সেই স্তূপের ভিতরে 'সচিত্র পত্রিকা'ই ছিল তা নয়, 'শিখা'ও ছিল। তাতে আমরা সালিয়াসের 'কাউন্ট তিয়াতিন-বালতিইস্কি' পড়তে আরম্ভ করলাম। গল্পের বোকা নায়ক তরুণ ভদ্রলোকের করুণ ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী শুনতে শুনতে হাসির চোটে মনিবের দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

'ওঃ কী অদ্ভুত!' চিৎকার করে উঠল মনিব।

'ওসব তো বানানো গপ্প,' নিজের যে একটা স্বাধীন মত আছে তা জাহির করার জন্যে বলে উঠল ওর বৌ।

খাটের তলার ঐ কাগজগুলো দারুণ উপকার করল আমার: ওগুলোর

দৌলতেই মাসিক পত্রগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে রাত্রে পড়ার অধিকার অর্জন করলাম।

ভাগ্যি ভালো যে আয়া ভয়ানক মদ ধরায় বুড়ি ছেলেমেয়েদের ঘরে ঘুমোতে আরম্ভ করেছিল। ভিক্তর আমার পড়ায় বাগড়া দিত না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পরে সে পোশাক-আশাক চড়িয়ে রাত্রের মতো বাইরে চলে যেত আর ফিরত ভোরবেলা। বুড়ি গিন্নী প্রায়ই মোমবাতিটা অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখত যাতে আমি অন্ধকারে থাকি। মোমবাতি কেনার মতো পয়সা ছিল না বলে, গোপনে দীপদানীর গা থেকে মোম সংগ্রহ করতে লাগলাম। তারপর একটা খালি মাছের টিন যোগাড় করে আইকনের প্রদীপ থেকে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে সুতো পাকিয়ে পলতে করে দিলাম। এমনি করে একটা ধোঁয়াটে আলো তৈরী করে উনুনের উপরে রাখতাম।

যখনই সেই বিরাট আকারের বইটার পাতা ওল্টাতাম, দীপশিখার সেই ছোট লাল জিভটা কেঁপে কেঁপে উঠে ভয় দেখাত নিভে যাবে বলে। পলতেটা ক্রমেই সেই দুর্গন্ধভরা মোমের ভিতরে ডুবে যেত আর ধোঁয়ায় আমার চোখ কড় কড় করে উঠত, কিন্তু ছবি দেখে আর তার নিচের ব্যাখ্যাগুলো পড়ে যে আনন্দ পেতাম তার তুলনায় ঐ সব বাধা ছিল অতি তুচ্ছ।

বিরাট বিরাট নগরী, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়-পর্বত আর সুন্দর সুন্দর সমুদ্রতীরে ভরা এই পৃথিবী সম্পর্কে আমার ধারণা ক্রমেই ব্যাপকতর হতে লাগল। জন আর জনপদ আর বিষয়বস্তুর যতো বৈচিত্র্য আমার জ্ঞানের মধ্যে ধরা দিতে লাগল ততই জীবন যেন অপূর্ব ব্যাপ্তি নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠল, সুন্দরতর হয়ে বেড়ে উঠল পৃথিবী। ভলগার ওপারের ঐ বিশাল সুদূরের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলাম ওটা শুধুই একটা বিরাট শূন্যতা নয় — তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি। তীরের ঐ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে এতদিন আমার অন্তর শুধু ভারাক্রান্তই হয়ে উঠত: মাঠের পর মাঠ পড়ে রয়েছে, স্থানে স্থানে শুধু কালো কালো ঝোপ; মাঠের ওপারে তীক্ষ্ণাগ্র বন-রেখা ঘিরে ঘোলাটে হিমেল আকাশ। মাটি নিঃসঙ্গ, শূন্য। আমার অন্তরও তেমনি শূন্য, কী এক কোমল বেদনায় বিচলিত। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মুছে যাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে, কিছুই ভাববার নেই, চিন্তা করার নেই। শুধু ইচ্ছে করে চোখ বুজে পড়ে থাকি। যা কিছু আছে সব নিংড়ে নেওয়া এ বিরস শূন্যতায় আশার কিছু নেই।

ছবিগুলোর নিচের সহজ সরল ভাষায় লেখা থাকত অন্য দেশ, অন্য

মানুষের কথা। অতীত বর্তমানের বহু কাহিনী লেখা থাকত যার অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারতাম না। এতে বিরক্তি লাগত আমার। কখনো কখনো 'আধিবিদ্যা' 'হিলিয়জম' 'চার্টিস্ট' প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দের তোড়ে মাথা ঝিম ঝিম করত। শব্দগুলো বড়ো হতে হতে মনের সবটুকু স্থান জুড়ে সবকিছু আচ্ছাদিত করে ফেলে জ্বালিয়ে মারত। মনে হত এই শব্দগুলোর অর্থ না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত কখনো কিছুই আমি আর বুঝে উঠতে পারব না। এরাই যেন সমস্ত রহস্যের দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায়ই গায়ের মাংস কেটে খোঁচা বিঁধে থাকার মতো একটা গোটা বাক্যই আমার স্মৃতিতে বিঁধে যেত, কোনো কিছুই তখন আর ভাবতে পারতাম না।

মনে আছে কয়েকটা অদ্ভুত লাইন পড়েছিলাম:

মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে
ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আতিল্লা,
বর্মে চর্মে সুসজ্জিত হূন সর্দার,
কবরের অন্ধকারের মতো কালো, নিস্তব্ধ।

তার পিছনে পিছনে কালো মেঘের মতো ছুটে আসছে অশ্বারোহী যোদ্ধার দল। থেকে থেকে গর্জে উঠছে:

কোথা রোম, কোথা সেই পরাক্রান্ত রোম?

জানতাম রোম একটা নগরীর নাম, কিন্তু 'হূন' কারা? কথাটার মানে খুঁজে বের করতে হবে।

একদিন একটু সুযোগ হতে জিজ্ঞেস করলাম মনিবকে।

'হূন?' একটু অবাক হয়ে সে বলল, 'শয়তানই জানে ওরা কারা, যত সব বাজে কথা...'

তারপর বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল:

'তোর মাথাটা রাজ্যের বাজে জিনিসে ভরা, বুঝলি পেশকভ, খুবই খারাপ এসব!'

ভালোই হোক আর খারাপই হোক জানতেই হবে আমাকে।

ভাবলাম সেনাবাহিনীর পুরুত সলভিয়ভ নিশ্চয়ই জানে 'হূন' কারা! একদিন উঠোনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

লোকটির রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা। সবসময়েই ভুগছে, তাই খিটখিটে মেজাজ। চোখ দুটো লাল, ভ্রূ নেই, আছে খুব অল্প একটুখানি হলদে দাড়ি।

'কী দরকার তোর?' হাতের কালো লাঠিটা দিয়ে কাদার ভিতরে খোঁচাতে খোঁচাতে জিজ্ঞেস করল।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট নেস্তেরভকে জিজ্ঞেস করতে সে তো ভীষণ মূর্তি ধারণ করে গর্জে উঠল:

'কী?'

ঠিক করলাম ওষুধের দোকানে গিয়ে রাসায়নিককে জিজ্ঞেস করব। লোকটা সহৃদয়, মুখখানা বেশ বুদ্ধিমানের মতো, লম্বা নাকের উপরে সোনার ফ্রেমের চশমা পরে।

'হূন?' বলল রাসায়নিক পাভেল গোলড্‌বের্গ, 'কিরগিজীয়দের মতোই এক রকমের যাযাবর জাতি। ওদের বংশ এখন লোপ পেয়ে গেছে, সব মরে শেষ।'

শুনে মনটা দমে গেল; বিরক্ত হয়ে উঠলাম। হূনরা মরে গেছে বলে নয়, মনটা দমে গেল এইজন্যেই যে যে-শব্দটা আমাকে এতোখানি ভোগাল সেটার মানে কিনা এতো সহজ, এতো অকিঞ্চিৎকর আমার কাছে।

কিন্তু হূনদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ: এই অভিজ্ঞতার পরে কোনো শব্দই আর আমাকে তেমন বেগ দিত না। তাছাড়া ধন্যবাদ আতিল্লাকে, ওরই দৌলতে রাসায়নিক গোলড্‌বের্গের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে গেল। সে সমস্ত সাধু ভাষার শব্দের সহজ সরল মানে জানত। সমস্ত গোপন রহস্যের চাবিকাঠি ছিল তার দখলে। দু'আঙুলে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাত। এমন ভাবে কথা বলত যেন গজাল ঠুকে ঠুকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার মাথার ভিতরে।

'শব্দ হচ্ছে গাছের পাতার মতো, বুঝলে হে খুদে বন্ধু! সুতরাং, পাতাগুলোর গঠন এমন কেন, সে কথা জানতে হলে আগে জানতে হবে কেমন করে গাছ জন্মায়। পড়তে হবে তোমাকে। বই, বুঝলে বন্ধু, বইয়েরা যেন এক সুন্দর বাগান: যা কিছু আনন্দের, যা কিছু উপকারী — সব তাতে খুঁজে পাবে।'

প্রায়ই বড়োদের জন্যে সোডা আর ম্যাগনেসিয়া আনতে যেতাম ওর দোকানে, কারণ সব সময়েই ওরা ভুগত বুকশূল ব্যথায়। বাচ্চাদের জন্যে আনতে যেতাম

ক্যাস্টর অয়েল বা অন্য কোনো জোলাপ। রাসায়নিকের সুমার্জিত উপদেশের ফলে বই সম্পর্কে আমার ভিতরে আরো দায়িত্বশীল একটা মনোভাব জেগে উঠল। ক্রমে মাতালের কাছে মদের মতোই নিজের অজ্ঞাতেই বই আমার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

ওরা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল এক অন্য জীবন। বিপুল কামনা, বিপুল আবেগে ভরপুর সে জীবন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় -- কাউকে অপরাধের পথে, কাউকে বীরত্বের পথে। লক্ষ্য করে দেখেছি আমার আশপাশে যত মানুষ তারা না অপরাধ করতে সক্ষম, না বীরোচিত কোনো কিছু করতে। বইয়ের ভিতরে যে জীবনের সন্ধান পাই, সে জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে ওরা জীবন কাটায়। তাই ওদের জীবন থেকে চিত্তাকর্ষক কোনো কিছুরই হদিস মিলত না। শুধু এইটুকুই জানলাম আমি ওদের মতো করে বেঁচে থাকতে চাই না।

ছবির তলার লেখা পড়ে জানলাম যে প্রাগ, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি শহরের বুকের উপরে নোংরা আবর্জনাভরা কোনো নালা ডোবা নেই। রাস্তাগুলো চওড়া, সোজা। গির্জা আর বাড়িগুলো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। শীতের ছয় মাস মানুষকে ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় না, কিংবা শুধুমাত্র নোনা বাঁধাকপি, নোনা ব্যাঙের ছাতা, ওটের ময়দা আর তিসির তেলে ভাজা আলু খেয়ে কাটাবার মতো লেণ্ট মাসও সেখানে নেই। লেণ্ট মাসে বই পড়া বারণ। 'সচিত্র পত্রিকা'টা নিয়ে নেওয়া হল আমার কাছ থেকে: বাধ্য হয়ে শূন্য উপোসী জীবন যাপন করতে হল। ইতিমধ্যে বইয়ে-পড়া জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনের তুলনা করতে শিখেছি বলে এ জীবন আমার কাছে আরো বেশি নোংরা, আরো বেশি কুৎসিত হয়ে উঠেছে। বই-পড়ার প্রভাবে নিজেকে আগের তুলনায় আরো বেশি শক্তিমান মনে হতে লাগল। কাজ করতে লাগলাম একটা জেদ নিয়ে, কেননা আমার সামনে লক্ষ্য ছিল: যতো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলতে পারব ততো বেশি পড়ার সময় পাব। বই না পেলে কেমন যেন অস্থির, অলস লাগত নিজেকে! এমন অসুস্থ ভুলো ভুলো মন আগে কখনো হত না।

মনে পড়ে এই রকম একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলির মাঝে একদিন এক দারুণ রহস্যজনক ঘটনা ঘটল। একদিন রাত্রে সবাই উঠে আলুথালু অবস্থায় জানালায় ছুটে এসে দাঁড়াল। এ ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল:

'পাগলা ঘণ্টি! আগুন লেগেছে?'

শুনতে পেলাম পাশের ফ্ল্যাটের লোকজনদের চলাফেরার শব্দ, দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ। কে যেন একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে উঠোনের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। গির্জায় ডাকাতি হয়েছে বলে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি গিন্নী, কিন্তু মনিব থামিয়ে দিল তাকে:

'চুপ করুন মা, ওটা যে পাগলা ঘণ্টি নয় তা সবাই বুঝতে পারছে!'

'বেশ, তাহলে নিশ্চয়ই বিশপ মারা গেছেন...'

মাচার উপর থেকে নেমে এল ভিক্তর।

'আমি বলতে পারি কী হয়েছে, আমি জানি!' কাপড়চোপড় পরতে পরতে বিড় বিড় করে বলে উঠল ভিক্তর।

মনিব আমাকে আকাশের গায়ে আগুনের আভা ফুটেছে কিনা তা দেখে আসার জন্যে চিলেকোঠায় পাঠিয়ে দিল। ছুটে উপরে চলে গেলাম। তারপর ছাদের কিনারার দিকের একটা ঘুলঘুলি বেয়ে উঠে তাকালাম: কোথাও আগুনের আভা নেই, শুধু শান্ত জমাট বাতাসের ভিতর দিয়ে ভেসে আসছে একটা বিরাট ঘণ্টার শব্দ, ছুটে-চলা অদৃশ্য লোকজনের পায়ের তলায় বরফের আওয়াজ, জেগে উঠছে ধাবমান স্লেজের কিচ্ কিচ্ শব্দ আর কেবলই অমঙ্গলসূচক ধ্বনি তুলে বেজে চলেছে ঘণ্টা। নিচে নেমে এলাম।

'আগুন দেখা যাচ্ছে না কোথাও।'

'দেখলে তো!' বলল মনিব। ইতিমধ্যেই সে টুপি আর কোট পরে তৈরি হয়ে নিয়েছিল। কলারটা তুলে অস্থির ভাবে গালশের ভিতরে পা ঢোকাবার চেষ্টা করল সে।

'যেও না, যেও না!' অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলল ওর বৌ।

'বাজে বোকো না!'

ভিক্তরও কোট টুপি পরে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সে বার বার করে 'আমি জানি কী!' বলে সবাইকে খেপিয়ে তুলল।

দু'ভাই বেরিয়ে যাবার পরে মেয়েরা আমাকে সামোভার গরম করার হুকুম করল। নিজেরা দাঁড়িয়ে রইল জানালায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনিব ফিরে এসে দোরের ঘণ্টা টিপল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উঠে এসে হলঘরের দরজা খুলে গম্ভীর গলায় বলল:

'জার খুন হয়েছেন!'

'খুন! কী বলছ!' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল বুড়ি গিন্নী।

'হ্যাঁ, খুন হয়েছেন, একজন অফিসার বলল আমাকে... কী হবে এখন?'

খানিক বাদেই ভিক্তরও এসে ঘণ্টা টিপল। তারপর জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে রুক্ষ গলায় বলে উঠল:

'আর আমি ভাবছিলাম যুদ্ধ!'

তারপর সবাই মিলে চা খেতে খেতে চাপা গলায় একান্ত সন্তর্পণে আলোচনা করতে লাগল। বাইরে নিস্তব্ধতা। ঘণ্টা থেমে গেছে। দু'দিন ধরে লোকজন চাপা গলায় আলোচনা করল, এর বাড়ি তার বাড়ি গেল, অভ্যাগতদের ডেকে বসাল, যা ঘটেছে পুঙখানুপুঙখ তা আলোচনা করল। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা বুঝে ওঠার, কিন্তু মনিব খবরের কাগজটা লুকিয়ে রাখল আমার কাছ থেকে। শেষে যখন সিদরভকে জিজ্ঞেস করলাম কেন জারকে ওরা খুন করেছে, সে চুপি চুপি বলল:

'এসব কথা আলোচনা করা নিষিদ্ধ...'

ঘটনাটা দু'দিনেই ভুলে গেল সবাই। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুশ্চিন্তায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। আর তার পরেই আমার জীবনে এল এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এক রবিবার বাড়ির সবাই সকালের উপাসনা সভায় চলে গেলে পরে প্রথমে সামোভার গরম করে আমি ঘর-দোর গোছগাছ করছিলাম। এই সময় বড়ো বাচ্চাছেলেটা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। তারপর সামোভারের গা থেকে ট্যাপটা টেনে খুলে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলায় গিয়ে খেলা করতে থাকে। সামোভারের নলটা ছিল জ্বলন্ত কয়লায় ঠাসা, সুতরাং সব জল পড়ে যেতেই গোটা নলটারই রাংঝাল গেল গলে। পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম সামোভারটার অদ্ভুত ক্রুদ্ধ গর্জন। ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢুকেই তো ভয়ে চক্ষু ছানাবড়া: দেখি সামোভারটা কালো হয়ে গেছে আর কম্পজ্বরের মতো কাঁপছে থর থর করে, ঝালাই খুলে যাওয়া নলটা, যেটার সঙ্গে ট্যাপটা আটকানো ছিল সেটা হতাশ হয়ে দুলছে, ঢাকনাটা পড়েছে কাত হয়ে, হাতলের তল বেয়ে ঝরে পড়ছে গলিত সীসা। নীলচে কালো সামোভারটাকে মনে হচ্ছে যেন মাতাল একটা। ওটার উপরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতেই হিস্ হিস্ করে উঠে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দোরের ঘণ্টা বেজে উঠল। গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। বুড়ির প্রথম প্রশ্নই হল সামোভার ফুটছে কিনা।

'হ্যাঁ, ফুটছে!' সংক্ষেপে জবাব দিলাম।

জবাবটা বেরিয়ে এসেছিল ভয়ে আর লজ্জায়, কিন্তু সেটাকে পরিহাস করার

একটা দুষ্ট প্রচেষ্টা ধরে নিয়ে সেই অনুপাতে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হল। দারুণ প্রহার দিল আমাকে। বুড়িটা এক আঁটি পাইনের ডালই শেষ করে ফেলল। খুব যে ব্যথা লেগেছিল তা নয়, কিন্তু অসংখ্য কাঁটা মাংস কেটে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে পিঠটা ফুলে বালিশের মতো হয়ে উঠল, আর পরের দিন দুপুরের দিকে আমাকে নিয়ে মনিবকে হাসপাতাল যেতে হল।

ডাক্তারের এমন অদ্ভুত লম্বা আর রোগা চেহারা যে দেখলে হাসি পায়। আমাকে পরীক্ষা করে দেখার পর শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন:

'এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আমি সরকারী এজেহার লিখে দেব।'

মনিবের মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, উসখুস করতে শুরু করে দিল আর অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে কী যেন বলতে লাগল ডাক্তারকে। কিন্তু ডাক্তার তার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন:

'না, এ চলতে পারে না। কোনো অধিকার নেই।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন:

'নালিশ করতে চাও তুমি?'

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল পিঠে, তাই বললাম:

'না, চাই না, বরং আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন শীগ্‌গির...'

ওরা আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে শুইয়ে দিল। তারপর ডাক্তার একটা অদ্ভুত আরামদায়ক ঠাণ্ডা চিমটে দিয়ে কাঠের কাঁটাগুলো তুলে দিতে দিতে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন:

'ওরা তোমার পিঠের চামড়াকে বেশ বানিয়েছে তো, খোকা। বর্ষাতির কাপড়ের মতো এখন থেকে তোমার গায়েও আর জল ঢুকবে না...'

অসহ্য সুড়সুড়ি দিয়ে কাজ শেষ করার পর বললেন:

'বিয়াল্লিশটা টুকরো তুলেছি, বুঝলে খোকা? সঙ্গীসাথীদের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে! কাল আবার এই সময়ে এসে ব্যাণ্ডেজ বদলে যেও। প্রায়ই মারে তোমাকে, না?'

'আগে আরো বেশি মারত...' একটু ইতস্তত করে বললাম।

গম্ভীর গলায় হেসে উঠলেন ডাক্তার।

'যা কিছু ঘটে ভালোর জন্যেই ঘটে, বুঝলে খোকা, ভালোর জন্যেই ঘটে!'

আমাকে মনিবের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন:

'এই নাও, ঠিক নতুনের মতো ভালো করে দিয়েছি। কাল আবার পাঠিয়ে

দিও, নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দেব। তোমাদের ভাগ্য ভালো যে ছেলেটার পরিহাস-বোধ আছে।'

ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে মনিব বলল আমাকে:

'আমাকেও মার খেতে হয়েছে, বুঝলি পেশকভ। কী করা যায় বল? আর কী মারটাই মারত, ভাই! তোর জন্যে দুঃখ করার লোক তবু তো আমি রয়েছি, কিন্তু আমার জন্যে দুঃখ করার কেউ ছিল না, কেউ না! গাদা গাদা লোক কিন্তু কোনো ব্যাটা বেজন্মাই একটু দরদও দেখাত না! হায় রে, এমন সব কুঁদুলে মুরগীর ছানা!'

গোটা পথটাই মনিব এই ধরনের কথা বলল। ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছিল আমার, আমার জন্যে এমন সমবেদনাভরা কথা শুনে কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম।

বাড়ি পেঁাছে বিজয়ী বীরের মতো সম্বর্ধনা পেলাম। ডাক্তার কী বললেন, কেমন করে কাঠের কাঁটাগুলো তুললেন, সব মেয়েছেলেদের কাছে আমাকে বলতে হল। শুনতে শুনতে কখনো আঃ! উঃ! করে ওরা ঠোঁটে চুমকুড়ি দিচ্ছিল, কখনো ভ্রূ কুঁচকে আমার কাহিনী শুনছিল। ব্যথা ব্যাধি ইত্যাদি যাবতীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার সম্পর্কে ওদের বিশেষ কৌতূহল দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

ওদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করতে না চাওয়ায় ওরা দারুণ খুশি দেখে দর্জির বৌয়ের কাছ থেকে বই এনে পড়ার অনুমতি চেয়ে বসলাম। অবস্থাচক্রে পড়ে ওরা আর না করতে সাহস করল না, কিন্তু অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল বুড়িটা:

'আচ্ছা, খুদে শয়তান বটে বাপু!'

পরের দিনই দাঁড়ালাম দর্জির বৌয়ের সামনে। সে বলল:

'কিন্তু ওরা যে বলছিল তুই অসুস্থ। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তোকে, দেখ দেখি মানুষ কী মিথ্যে গুজবই না ছড়ায়!'

প্রতিবাদ করলাম না। সত্যি ঘটনা বলতে কেমন যেন লজ্জা হল। এমন একটা নিষ্ঠুর স্থূল ব্যাপার জানিয়ে কেন ওকে আর বিচলিত করে তোলা? ও যে অন্য সবার মতো নয়, তাতেই আমি খুশি।

আবার পড়তে শুরু করলাম মোটা মোটা বই—বড়ো দুমা, পঁস দু তরাইল, মঁতেপিয়েঁ, জাকোনি, গাবোরিয়ো, এমার আর বোয়াগবে'র।

খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা বই শেষ করে চললাম। আমার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল। অনুভব করলাম আমিও যেন এক অসাধারণ জীবন

প্রবাহের অংশ বিশেষ। অন্তর এক সুমধুর আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে জাগিয়ে তুলল অদম্য উদ্দীপনা। আবার আমার হাতে-তৈরী আলোটা ধোঁয়া চড়াতে শুরু করল। রাতভোর, দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত জেগে জেগে পড়ে চোখ দুটো ফুলে উঠল আর বুড়ি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষভরা খুশির সুরে বলল:

'দাঁড়া না, বইয়ের পোকা, চোখের মণি দুটো তোর একদিন ফেটে বেরিয়ে আসবে, তুই অন্ধ হয়ে যাবি!'

অল্প দিনের ভিতরেই বুঝতে পারলাম, এই সমস্ত চমৎকার বই, তাদের প্লট আর পরিবেশনের ঢঙের পার্থক্য সত্ত্বেও একটা কথাই শুধু বলে, যথা: দুনিয়ায় ভালো লোকেরা অসুখী হয়, নির্যাতিত হয় দুষ্ট লোকের হাতে। দুষ্ট লোকেরা ভালো মানুষদের চাইতে বেশি চালাক চতুর, বেশি সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন কোনো একটা দুর্জ্ঞেয় ঘটনা এসে হাজির হয় যাতে মন্দ পরাজিত হয়ে অনিবার্য ভাবে ধর্ম জয়যুক্ত হয়ে ওঠে। 'প্রেম' সম্পর্কে দারুণ বিরক্তি ধরে গেল আমার। সমস্ত পুরুষ সমস্ত মেয়েই একই ধরনের, একই ভাষায় তারা কথা বলে। একঘেয়েমি ছাড়াও এই সব নির্লজ্জ মুখরতায় কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে আসত আমার মনে।

কখনো কখনো কয়েক পাতা পড়ার পরেই ভাবতে শুরু করে দিতাম শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, কে হারবে। যেই জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে উঠত অমনি লেগে যেতাম জট ছাড়াবার চেষ্টায়। বইটা সরিয়ে রেখে অঙ্কের সমস্যা সমাধানের মতো করেই ভাবতে শুরু করে দিতাম, ক্রমেই দেখতাম সঠিক সমাধানে গিয়ে পৌঁছেছি। কোন চরিত্রটা স্বর্গে যাবে, কোনটা যাবে প্রেতলোকে তা ঠিক ঠিকই অনুমান করতে পেরেছি।

কিন্তু এসব ছাড়াও আরো একটা বিষয়ের কথা জানতে পারলাম যার গুরুত্ব আমার কাছে বিরাট। সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পর্ক, ভিন্ন সম্বন্ধভরা আলাদা এক জীবনের ছবি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, প্যারিসের কোচোয়ান মজুর সৈনিক আর অন্যান্য সব 'ইতর ছোটলোক' নিজনি নভগরোদ, কাজান, পেরম'এর 'ইতর ছোটলোকদের' মতো নয়। তারা ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঢের বেশি সাহসের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সামনে ঢের বেশি সহজ স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করে। বইয়ে একজন সৈনিককে পেলাম যার সঙ্গে আমার পরিচিত কোনো সৈনিকের একটুকুও সাদৃশ্য নেই।

না সিদরভের, না জাহাজের সেই সৈনিকের, এমন কি ইয়েরমোখিনেরও না। এদের চাইতে ঢের বেশি মানুষ বলে মনে হয় তাকে। ওর খানিকটা মিল আছে স্মুরির সঙ্গে, কিন্তু একটু কম অমার্জিত, কম জান্তব। কিংবা বইয়ের একটা দোকানদারের চরিত্র। আমার পরিচিত যে কোনো দোকানদারের চাইতে লোকটা ভালো। বইয়ের পাদ্রী-পুরুতরাও আমার চেনাশোনা পুরুতদের মতো নয়। মানুষের উপরে তাদের ঢের বেশি ভালোবাসা, ঢের বেশি সহানুভূতি। এক কথায় বইয়ের ভিতরে বিদেশের জীবনের যে চিত্র পেতাম আমার চেনা-জানা জীবনের তুলনায় সে জীবন অনেক বেশি সুন্দর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যময়, অনেক বেশি আকর্ষণীয়। বিদেশে লোকেরা এমন কথায় কথায় মারপিট করে না। মারপিট করে না এমন নির্মম পাশবিক হিংস্রতায়, কাউকে নিয়ে অমন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে না—জাহাজের যাত্রীরা যেমন করে লেগেছিল সেই সৈনিকটির পিছনে। কিংবা আমার বুড়ি মনিব-গিন্নীর মতো অমন হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গেও কেউ প্রার্থনা করে না ঈশ্বরের কাছে।

বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখেছি যে বইয়ে যখন কুৎসিত লোভী দুর্বৃত্তের চরিত্র আঁকা হয়, তখনো যে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা আর অন্যাকে বিদ্রূপ করার উদ্দাম প্রবৃত্তি আমি নিজের চোখে অহরহ দেখেছি ঠিক তেমন করে আঁকা হয় না। বইয়ের দুর্বৃত্তেরা শুধু ব্যবহারিক দিক থেকে নিষ্ঠুর, তাদের নৃশংসতা বোধগম্য। কিন্তু আমি দেখেছি অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা—নিছক একটু মজা ছাড়া যা থেকে আর কোনো লাভ নেই।

প্রত্যেকটা নতুন বইই যেন রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রার পার্থক্য সজোরে প্রতিপন্ন করতে শুরু করল। তার ফলে একটা আবছা অসন্তুষ্টি জেগে উঠল আমার অন্তরে। কেমন যেন একটা সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল ঐ হলদে পাতাগুলোয় যা লেখা আছে তা পুরো সত্য নয়।

এর পরে গঁকুরের 'ভাইয়েরা' উপন্যাসখানা আমার হাতে এল। এক রাত্রের ভিতরেই পড়ে ফেললাম। বইটার অভিনবত্বে এমনই অবাক হয়ে গেলাম যে আর একবার ঐ সহজ সরল মর্মস্পর্শী গল্পটা পড়ে ফেললাম। গল্পের প্লটে কোনো জটিলতা নেই, নেই কোনো কৃত্রিম আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস। প্রথমে মনে হয়েছিল 'মহাত্মাদের জীবনী'র মতোই বুঝিবা নীরস, গুরুগম্ভীর হবে। ভাষা এমন যথার্থ ও অলঙ্কারবর্জিত, যে প্রথমটায় হতাশ হয়েই পড়েছিলাম, কিন্তু বইটার কাটা কাটা কড়া কথা সোজাসুজি আমার অন্তরে গিয়ে পেঁছল।

তাতে ঐ বাজিকর ভাইদের কাহিনী এমন জীবন্ত হয়ে উঠল যে আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। ঐ হতভাগ্য বাজিকর যখন তার ভাঙ্গা পা নিয়ে চিলেকোঠায় তার ভাই যেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের সেই প্রিয় খেলার চর্চা করছিল সেখানে গিয়ে হাজির হল তখন আমি কেঁদে ফেললাম। সে কান্নায় যেন বুক ভেঙ্গে যাবার জোগাড়।

দর্জির বৌকে এই চমৎকার বইখানা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ঠিক ঐ রকমের আর একখানা বই চাইলাম।

'ঠিক এইটের মতো মানে কী?' একটু হেসে জিজ্ঞেস করল সে।

ওর হাসিতে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লাম, কিছুতেই আর বুঝিয়ে উঠতে পারি না কী আমি চাই। সে তখন বলল:

'বইটা নীরস। দাঁড়া, আমি একটা খুব ভালো বই খুঁজে রেখে দেব তোর জন্যে, খুব আনন্দ পাবি পড়ে।'

কয়েকদিন পরে গ্রিনউডের 'একটি ছোট্ট হাঘরে ছেলের সত্যি কাহিনী' বইটা পড়তে দিল। নামটা দেখেই মনটা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে উঠল, কিন্তু প্রথম পাতা পড়তে গিয়ে মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল শেষ পাতা পর্যন্ত সে হাসি বজায় রইল। কতগুলো জায়গা দু'তিনবার পড়লাম।

তাহলে বিদেশেও ছোট ছেলেদের জীবন খুবই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে কাটে! তুলনায় আমার জীবন তো অনেক সহজ। তার মানে, হতাশ হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই!

গ্রিনউডের কাছে প্রচুর উৎসাহ পেলাম। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই সেই 'সাচ্চা' বইয়ের একটা এসে আমার হাতে পড়ল—'ইউজীন গ্রাঁদে'।

বুড়ো মানুষ গ্রাঁদের কথা পড়তে পড়তে হুবহু দাদুর ছবি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। বইটা এতো ছোট যে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অমন খাঁটি সত্যি কথা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। জীবনে আমার এইসব সত্যের পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু বইটা যেন সেগুলোকে একটা নতুন চোখে দেখাল, শান্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টির আলোয়। গংকুর ছাড়া আর যাঁদের বই পড়েছি, দেখেছি সেগুলো আমার মনিবদের মতোই কঠোর ভাষায় সোরগোল তুলে মানুষের বিচার করে। ফলে প্রায়ই দুর্বৃত্তদের উপরেই পাঠকের সহানুভূতি জেগে ওঠে আর সব সাধু চরিত্রের উপরে জেগে ওঠে বিরক্তি। একটা লোক যতো চিন্তা যতো চেষ্টাই করুক না কেন, ঐ সব সাধু লোক যারা বইয়ের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত অচল অনড় পাথুরে দেয়ালের মতো

ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের কাছে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ এ দেখে বিরক্ত ধরে যেত। একথা নিশ্চিত যে পাপের যা কিছু কুমতলব তা এই দেয়ালে আছাড় খেয়ে চূর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু পাথর এমন একটা কিছু নয় যার উপরে কারুর ভালোবাসা জন্মাতে পারে। দেয়াল সে যতোই মজবুত, যতই সুন্দর হোক না কেন, কেউ যদি সে দেয়ালের ওপারের আপেল পেড়ে আনতে চায় তবে সে কখনো দেয়ালের পাথরগুলোকে তারিফ করতে বসে না। অনবরত আমার মনে হত যে সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাই এই সব নীতিবান লোকেদের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

গংকুর, বালজাক, গ্রিনউড—এঁদের লেখায় কোনো দুর্বৃত্তও নেই, কোনো বীরপুরুষও নেই। আছে মানুষ, অদ্ভুত রকমের সজীব মানুষ। এঁদের বইয়ের চরিত্রগুলি যা কিছু বলেছে করেছে, তা ঠিক ঐ ভাবেই না বলে না করে হয়ত অন্যভাবে বলা বা করা যেত, এরকমের সন্দেহ কারুর মনেই জেগে উঠত না।

এমনি করেই 'সৎ' সাহিত্য, 'সাঁচ্চা' সাহিত্য পড়ার অপার আনন্দ লাভ করতে শিখলাম। কিন্তু কোথায় পাব এ সব বই? দর্জির বৌ আমাকে এদিক থেকে একটুও সাহায্য করতে পারল না।

'এই নে কয়েকখানা ভালো বই', বলে দর্জির বৌ। আমাকে আরসেন গুসে'র 'এক মুঠো গোলাপ, সোনা আর রক্ত' বইটা দিল। আর তার সঙ্গে বেইলি, পল দ্যে কক, আর পল ফিভাল'এর উপন্যাস। কিন্তু এখন এসব বই পড়তে গেলে খুবই চেষ্টা করে পড়তে হয়।

মারিয়েত আর ওয়েরনারের উপন্যাস খুব ভালো লাগে দর্জির বৌয়ের, কিন্তু আমার বিশ্রী একঘেয়ে মনে হত। স্পিলহাগেনের লেখাও আমার ভালো লাগে না। কিন্তু অয়েরবাকের গল্প পড়ে দারুণ আনন্দ পেলাম। স্যু আর হুগোর চাইতে ভালো লাগল স্যার ওয়াল্টার স্কট। আমার আবেগে নাড়া দিয়ে মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর করে তুলতে পারে এমন বইই চাইতাম, বালজাকের অপূর্ব বইয়ের মতো বই। চীনে পুতুল আজকাল তেমন করে মুগ্ধ করতে পারত না আমাকে।

দর্জির বৌয়ের কাছে যেতে হলেই একটা ফর্সা জামা পরতাম, চুলগুলি আঁচড়ে নিতাম, চেষ্টা করতাম সব রকমে নিজেকে একটু ফিটফাট করে তুলতে। কতোটা সফল হতাম সেটা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু মনে মনে আশা করতাম, আমার ঐ ভদ্রগোছের চেহারা দেখে বুঝিবা একটু সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে

কথা সে বলবে আমার সঙ্গে, তার ঝকঝকে পরিষ্কার মুখে ফুটে উঠবে না সেই ঠুনকো হাসির রেখা। আমার সব সময়েই মনে হত সে হাসি যেন সে ঠিক এই উপলক্ষ্যেই বিশেষ করে ফোটাচ্ছে। কিন্তু সে ঠিক তেমনি হাসি হেসেই মিষ্টি ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করত:

'পড়েছিস বইটা? ভালো লেগেছে?'

'ভালো লাগে নি।'

শুনে তার সুন্দর ভ্রূদুটো একটু তুলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সেই পরিচিত অনুনাসিক স্বরে বলত:

'কেন?'

'ও জিনিস আগেই পড়েছি।'

'কী জিনিস?'

'এই ভালোবাসা...'

একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাত। তারপর একটু জোর করা হাসি হেসে বলত:

'হা কপাল! কিন্তু সব বই-ই তো ভালোবাসা নিয়ে লেখা।'

বড়ো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারের ভিতরে বসে ফারের চটির ভিতরে ঢোকানো পা দুটো দোলাত সে, হাই তুলত, নীল রঙের ড্রেসিং গাউনটা টেনে তুলে কাঁধ দুটো ঢেকে দিত, আর ছোট ছোট গোলাপী আঙুলের ডগা দিয়ে টোকা দিত কোলের উপরের বইটার মলাটে।

ইচ্ছে হত ওকে বলি:

'আপনি এখান থেকে কেন উঠে যান না? অফিসাররা এখনো আপনাকে চিঠি লেখে, এখনো আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে...'

কিন্তু মনের কথা মুখে আনতে সাহস হত না। তাই মোটা আর একখানা প্রেমের উপন্যাস আর বুকভরা হতাশা নিয়ে ফিরে চলে আসতাম।

উঠোনে এই মহিলাটি সম্পর্কে গুজব ক্রমেই আরো বেশি বিদ্রূপ ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে লাগল। এই সব নোংরা কুৎসিত কথা শুনে মনে মনে দারুণ আঘাত পেতাম। ওগুলো যে নিছক মিথ্যা তাতে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। যখন ওর কাছে থাকতাম না, তখন ওর জন্যে আমার করুণা হত, আশঙ্কা হত। কিন্তু যখনই সামনে দাঁড়িয়ে সেই তীক্ষ্ন চোখ, বেড়ালের মতো কোমল কমনীয় ছোট্ট দেহটি, আর মুখের সেই চটুল ভঙ্গীর দিকে তাকাতাম, আমার ভয় অনুকম্পা সব কিছুই কুয়াশার মতো দূর হয়ে যেত।

বসন্তকালে হঠাৎ একদিন সে চলে গেল, আর তার কয়েক দিন পরে তার স্বামীও উঠে গেল বাড়ি ছেড়ে।

ফ্ল্যাটটা তখনো খালি পড়ে। গেলাম ওদের ঘরে। শূন্য দেয়াল বাঁকানো পেরেক আর পেরেকের গর্তে ভরা। যেখানে যেখানে ছবি ঝোলানো ছিল সে জায়গাগুলো বিবর্ণ—রঙ-চটা দাগে ভর্তি। রঙিন মেঝেটার উপরে ছড়ানো রয়েছে টুকরো টুকরো ছেঁড়া কাগজ, খালি ওষুধের বাক্স, শূন্য আতরের শিশি, আর ঐ সমস্ত আবর্জনার ভিতরে চক চক করছে একটা বড়ো পিতলের চুলের কাঁটা।

বিষণ্ণ লাগছিল। দর্জির ছোট বৌটিকে আর একটিবার দেখার জন্যে, তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল।

১০

দর্জি আর তার বৌ চলে যাবার আগে থেকেই আমাদের ফ্ল্যাটের নিচের তালায় এসেছিলেন এক কৃষ্ণাক্ষী মহিলা। সঙ্গে পাঁচ বছরের একটি মেয়ে আর তাঁর মা। মা বৃদ্ধা, চুলগুলি সব পাকা। সব সময়েই হলদে একটা পাইপে করে সিগারেট টানতেন। অল্পবয়েসী মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু যেমন অহঙ্কারী তেমনি দাম্ভিক। গম্ভীর সুন্দর গলার স্বর। চোখ কুঁচকে মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে এমন ভাবে লোকের সঙ্গে কথা বলতেন যেন তারা অনেক দূরে রয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় প্রত্যেক দিনই তাঁর ফৌজী-চাকর তুফিয়ায়েভ সরু সরু পাওয়ালা একটা বাদামী রঙের ঘোড়া নিয়ে আসত তাঁর ফ্ল্যাটের বারান্দার সামনে। পরনে ইস্পাত-ধূসর মখমলের রাইডিং পোশাক, হাতে সাদা দস্তানা আর পায়ে বাদামী রঙের বুট পরে মহিলা এসে দাঁড়াতেন। এক হাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া ঘাগরার প্রান্ত আর হাতলে পদ্মরাগমণি বসানো চাবুকটা ধরে অন্য হাতে ঘোড়াটার নাকের উপরে একটু চাপড়াতেন। ঘোড়াটা দাঁত বের করত, চোখ পাকাত, শক্ত মাটির উপরে পা ঠুকত আর উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করত।

ঘোড়াটার সুন্দর বাঁকানো গ্রীবার উপরে পরম আদরে আস্তে আস্তে চাপড়িয়ে কোমল কন্ঠে ডেকে উঠতেন, 'রবি, রবি!'

তারপর তুফিয়ায়েভের হাঁটুর উপরে একটা পা দিয়ে আস্তে লাফিয়ে

জিনের উপরে উঠে বসতেন, ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে বাঁধ বরাবর ছুটতে আরম্ভ করত। মহিলা এমন ভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন মনে হত যেন জন্ম থেকেই ঘোড়ায় চড়ে আছেন।

মহিলা রূপবতী। এমন অসাধারণ তাঁর রূপ যে দেখলেই মনে হবে অভিনব, অতুলনীয়। এক অপূর্ব আনন্দে অন্তর মাতাল হয়ে ওঠে। ও'র দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত পইতিয়ে ডায়না, রাণী মার্গো, তরুণী লা ভোল্যেঁর প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতো সব মোহিনী নায়িকারা বুঝিবা এমনিই ছিল দেখতে।

আমাদের শহরের সেনাবাহিনীর অফিসারেরা সব সময়েই ঘিরে থাকত তাঁকে। সন্ধ্যেবেলায় সবাই এসে জুটত তাঁর ঘরে। বাজাত পিয়ানো, বেহালা, গিটার, চলত নাচগান। সবাইকে ছাড়িয়ে যেত মেজর ওলেসভ। বেঁটে বেঁটে পায়ে ঘুর ঘুর করত তাঁর সামনে। লোকটা মোটা সোটা, চুল পাকা, লাল মুখখানা এমন তেলতেলে যেন মেশিনে তেল দেয়া মিস্ত্রি। চমৎকার গিটার বাজাত মেজর, আর ঐ সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে এমন বিনীত ব্যবহার করত যেন সে তাঁর একান্ত বশংবদ ভৃত্য।

তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েটির হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা, মাথাভরা কোঁকড়া চুল, মায়ের মতোই উজ্জ্বল আর সুন্দরী। আয়ত নীল দুটি চোখের দৃষ্টি শান্ত, গম্ভীর, প্রত্যাশাকুল। সে গাম্ভীর্যের ভিতরে এমন একটা কিছু ছিল যেটা ঠিক শিশুসুলভ নয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওর দিদিমা ব্যস্ত থাকতেন ঘরকন্না নিয়ে। তাঁকে সাহায্য করত গোমড়া-মুখ স্বল্পবাক তুফিয়ায়েভ আর মোটা সোটা টেরা ঝিটা। মেয়েটির জন্যে কোনো আয়া ছিল না। বলতে গেলে সে প্রায় অযত্নে আপনা থেকেই বেড়ে উঠছিল। হয় বারান্দায় নয়ত কাঠের স্তূপের উল্টো দিকে বসে সারাদিন খেলা করত। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই আমি ওর সঙ্গে খেলতাম। ক্রমে খুবই ভালোবেসে ফেললাম মেয়েটিকে আর মেয়েটিও আমার ন্যাওটা হয়ে উঠল। আমার কোলে শুয়ে রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমিয়ে পড়লে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসতাম। ক্রমে ব্যাপারটা এতদূর গিয়ে গড়াল যে আমি এসে ওকে শুভরাত্রি না জানানো পর্যন্ত কিছুতেই ঘুমোতে যেত না। ওর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই গম্ভীর ভাবে মোটা সোটা ছোট নরম হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠত:

'বিদায় কাল সকাল পর্যন্ত। আর কী বলতে হয় দিম্মা?'

'ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন,' দাঁত আর নাকের ভিতর থেকে ধোঁয়ার সূক্ষ্ম রেখা ছাড়তে ছাড়তে বলতেন ওর দিদিমা।

'ভগবান আগামীকাল পর্যন্ত তোমাকে রক্ষা করুন। এখন আমি ঘুমোতে যাচ্ছি,' ঝালর দেয়া লেপের তলায় ঢুকতে ঢুকতে বলত মেয়েটি।

'আগামীকাল পর্যন্ত নয়, বল্ সব সময়ে!' শুধরে দিতেন দিদিমা।

'আগামীকাল মানেই তো সব সময়ে, তাই না?'

'আগামীকাল' কথাটা ওর ভারি পছন্দ। যা কিছু ওর প্রিয় সবই ঐ ভবিষ্যত কালে নিয়ে ফেলত। এক গোছা ফুল বা ডালপালা মাটিতে পুঁতে দিয়ে বলত:

'দেখো আগামীকাল এটা বাগান হয়ে যাবে...'

'আগামীকাল আমি একটা ঘোড়া কিনব। তারপর আম্মার মতো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব...'

মেয়েটি বেশ চালাক চতুর, কিন্তু তেমন ছটফটে নয়। খেলতে খেলতে প্রায়ই মাঝপথে গুম হয়ে বসে থাকত তারপর হঠাৎ এক সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবেই বলে উঠত:

'পুরুতরা মেয়েদের মতো চুল রাখে কেন?'

একদিন তার আঙুলে কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। কাঁটাগুলোর দিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে সে শাসাল:

'দেখবে মজাটা কী হয়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব তিনি শাস্তি দেবেন তোমাকে। সক্কলকে শাস্তি দিতে পারেন তিনি। এমন কি আম্মাকেও...'

কখনো, কখনো কী যেন এক শান্ত বিষণ্ণতা এসে ভর করত ওকে। এগিয়ে এসে আমার গায়ের সঙ্গে মিশে নীল উৎসুক চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলে বলত:

'দিম্মা বকেন কোনো কোনো দিন। কিন্তু আম্মা কক্ষণো বকে না, খালি হাসে। সব্বাই আম্মাকে ভালোবাসে। আম্মা একটুকুও সময় পায় না কিনা তাই। সব্বাই আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। আম্মা খুউব সুন্দর কিনা, তাই সব্বাই দেখতে আসে তাকে। আম্মা খুউব চমৎকার। তাই তো ওলেসভ বলে: আম্মা চমৎকার!'

শিশুটির মুখে আমার অপরিচিত জগতের কথা শুনে খুবই আনন্দ

পেতাম। পরম উৎসাহে একান্ত আগ্রহ নিয়ে ও বলে যেত তার মায়ের কথা, খুলে ধরত এক নতুন জগত। শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যেত রাণী মার্গোর কাহিনী। ফলে বইয়ের উপরে আমার বিশ্বাস যেমন বেড়ে গেল, তেমনি আমার সব পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্পর্কে আরো বেশি ঔৎসুক্য জেগে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় খুকিটিকে নিয়ে বসে আছি। অপেক্ষা করছি কখন মনিব বেড়িয়ে ফেরে। কোলে খুকিটি তখন ঢুলছিল ঘুমে। ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলেন ওর মা। খুব হালকা ভাবে জিনের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে এসেই মাথাটা পিছনের দিকে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি?'

সৈনিক তুফিয়ায়েভ ছুটে এসে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। চাবুকটা কোমরবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তরুণী হাত বাড়ালেন:

'আমার কাছে দে!'

'আমিই দিয়ে আসছি!'

'না, তোকে যেতে হবে না!' মাটিতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা যেন আমি তাঁর ঘোড়া।

মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ পিট পিট করতে করতে মাকে দেখতে পেয়ে সেও হাত বাড়িয়ে দিল। চলে গেল দুজনে।

গালমন্দ খাওয়ার অভ্যেস আমার আছে, কিন্তু এই মহিলাটিও যে খেঁকিয়ে উঠতে পারেন তা দেখে ভারি বিশ্রী লাগল আমার। না খেঁকিয়ে যত আস্তেই উনি বলুন প্রত্যেকেই তো ওঁর হুকুম মেনে চলতে বাধ্য।

কয়েক মিনিট পরেই ট্যারা ঝিটা এসে ডাকল আমাকে: গোঁ ধরেছে মেয়েটি, আমাকে শুভরাত্রি না জানিয়ে কিছুতেই সে ঘুমোতে যাবে না। মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ নিয়েই ঢুকলাম ড্রয়িং রুমে। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন মহিলা আর দ্রুত হাতে ওর জামাকাপড় খুলে দিচ্ছিলেন।

'এই যে, এসে গেছে তোর সেই দত্যিটা,' বললেন মহিলা।

'ও দত্যি নয়, আমার খেলার সাথী...'

'বটে? ভালো কথা। তোর খেলার সাথীকে তাহলে একটা কিছু উপহার দেয়া যাক, কি বলিস?'

'হাঁ হাঁ, দাও না!'

'বেশ, তুই ছুটে বিছানায় গিয়ে ঢুকে পড়, আমি ওকে কিছু দিচ্ছি।'

'আগামীকাল পর্যন্ত বিদায়!' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ছোট্ট মেয়েটি, *'আগামীকাল পর্যন্ত ভগবান তোমাকে রক্ষে করুন...'*

'কে শিখিয়েছে তোকে এসব বলতে?' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ওর মা, 'দিদিমা?'

'হাঁ।'

মেয়েটি চলে যেতেই মহিলা ইশারায় ডাকলেন আমাকে।

'কী দিই তোকে বল্ তো?'

বললাম কিছু দিতে হবে না আমাকে। অবশ্যি একখানা বই টই হলে পড়তে দিতে পারেন।

উষ্ণ গন্ধমাখা আঙুল দিয়ে আমার থুতনিটা তুলে ধরলেন, তারপর একটু মধুর হেসে বললেন:

'তুই বই পড়তে ভালোবাসিস? কী কী বই পড়েছিস?'

হাসলে আরো যেন সুন্দর দেখায় ওঁকে। একটু থতমত খেয়ে গিয়ে যা মনে এল বলে দিলাম কয়েকটা উপন্যাসের নাম।

'ওর ভিতরে কোনটা খুব ভালো লাগে তোর?' টেবিলের উপরে টোকা দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন মহিলা।

ফুলের তীব্র মধুর গন্ধ কেমন যেন ঘোড়ার ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসছে তাঁর গা থেকে। আয়ত দুটি চোখের পাপড়ি মেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন আমাকে। এমনি করে কেউ আর কোনো দিন তাকায় নি আমার দিকে।

সুন্দর সুন্দর পর্দা ঢাকা আসবাবপত্রে ঠাসাঠাসি হয়ে ঘরটা যেন পাখির বাসার মতো ছোট মনে হচ্ছিল। কচিগাছের পুরু পুরু পাতার আড়ালে জানালা ঢাকা পড়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তুষারের মতো সাদা দেখাচ্ছে উনুনের টালিগুলি, পাশেই চকচকে কালো রঙের একটা পিয়ানো। অনুজ্জ্বল সোনালী রঙের ফ্রেমে বাঁধানো পুরাকালের স্লাভ অক্ষরে লেখা মলিন পট ঝুলছে দেয়ালে। প্রত্যেকটা ফ্রেমের সঙ্গে একটা করে ফিতে ঝুলছে, ফিতের ডগায় বড়ো সীলমোহর। সবকিছুই যেন আমারই মতো বিনীত শ্রদ্ধায় তাকিয়ে রয়েছে ঐ মহিলার দিকে।

আমার সব শক্তিসামর্থ্য দিয়ে বুঝিয়ে বললাম যে জীবন নিতান্তই একঘেয়ে, দুঃখকষ্টে ভরা, কিন্তু মানুষ বই পড়তে বসলেই সে সব ভুলে যায়।

'সত্যি?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মহিলা। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন। 'তা অবশ্যি ভালই বলেছিস কথাটা। মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছিস... তা বেশ, বই দেব তোকে কিন্তু এখন তো একটাও নেই... ও এই একটা আছে, এটা নিয়ে যেতে পারিস।'

সোফার উপর থেকে হলদে মলাটের একটা ছেঁড়া বই তুলে নিলেন হাতে।

'এটা শেষ হয়ে গেলে পরে দ্বিতীয় খণ্ড দেব। চারটে খণ্ড আছে মোট...'

প্রিন্স মেশ্চের্স্কির লেখা 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের গুপ্ত কথা' বইটা নিয়ে চলে এলাম। তারপর একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলাম। খানিক দূর পড়েই মনে হল মাদ্রিদ, লণ্ডন, প্যারিসের তুলনায় 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের গুপ্ত কথা' ঢের বেশি একঘেয়ে। একমাত্র 'মুক্তি' আর 'মুগুরের' কাহিনী ভালো লাগল।

'আমি তোমার চাইতে ভালো,' বলল 'মুক্তি', 'কারণ আমি বেশি বুদ্ধিমতী।'

'উঁহুঁ, তা নয়, তোমার চাইতে আমি ভালো, কারণ আমার গায়ে জোর বেশি,' প্রত্যুত্তরে বলল 'মুগুর'।

তর্ক করতে করতে দুজনে হাতাহাতি শুরু করে দিল। যতদূর মনে পড়ে মুগুর দারুণ ভাবে পিটল 'মুক্তিকে'। সেই আঘাতে 'মুক্তি' হাসপাতালে মারাই গেল।

বইটার ভিতরে এক নিহিলিস্টের চরিত্র ছিল। মনে পড়ে, প্রিন্স মেশ্চেরস্কির মতে নিহিলিস্টরা এমন সাংঘাতিক যে একবার তারা একটা মুরগীর দিকে তাকালেই তক্ষুণি সেটা পথের উপরেই মুখ থুবড়ে মরবে। নিহিলিস্ট কথাটা কুৎসিত, অপমানজনক বলেই ধরে নিলাম, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তাতে মনটা দমে গেল। বোঝাই যায় যে সাধারণত ভালো বই বোঝার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু এটা ভালো বই নয় এমন কথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয় নি। এমন সুন্দরী এক কেউকেটা গোছের মহিলা নিশ্চয়ই কিছু আর খারাপ বই পড়বেন না!

'কেমন, ভালো লাগল বইটা?' মেশ্চেরস্কির উপন্যাসটা যখন ফিরিয়ে দিতে গেলাম জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

বইটা ভালো লাগে নি বলতে বাধছিল। ভয় হল পাছে ক্ষুণ্ণ হন।

কিন্তু তিনি শুধু একটু হাসলেন। তারপর শোবার ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গিয়ে নীল রঙের মরক্কো বাঁধানো ছোট একটা বই হাতে করে ফিরে এলেন।

'এটা খুব ভালো লাগবে তোর। কিন্তু সাবধান, দেখিস যেন ময়লা না হয়ে যায়।'

বইটা পুশকিনের একটা কবিতার বই। হঠাৎ একটা অপূর্ব সুন্দর জায়গায় এসে পড়লে মানুষের মনে যেমন একই সঙ্গে সমস্ত দিকের সমস্ত কিছু দেখার এক আকুল আগ্রহ জেগে ওঠে, তেমনি এক পরম লুব্ধতা জেগে উঠল আমার অন্তরে। এক নিঃশ্বাসে বইটা পড়ে ফেললাম। এ যেন জলাভূমির ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ রোদ মাখানো ফুল বিছনো পথ, পায়ে পায়ে কোমল ঘাসের ছোঁয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে বেড়াবার আগে খানিকক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

পুশকিনের কবিতার সহজ সরল সঙ্গীতময়তায় এমন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে বহুদিন পর্যন্ত আমার গদ্য জিনিসটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হত, পড়তে কষ্ট হত। 'রুস্‌লান ও লুদ্‌মিলা'র মুখবন্ধ ঠিক যেন দিদিমার মুখে শোনা সবচাইতে সুন্দর রূপকথার মতো। কতগুলি লাইনের অপূর্ব নিখুঁত সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম:

সেখানের ঐ অজানা পথের বুকে
অচেনা পশুর পায়ের চিহ্ন আঁকা,

—এই লাইনগুলো আওড়াতে আওড়াতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত অতি পরিচিত সব ক্ষীণ অস্পষ্ট পথরেখা, রহস্যময় পায়ের চিহ্নভরা দলিত ঘাসের বুকে ঝলমলে শিশিরবিন্দুর কম্পিত রুপোলি আভা। যে কোনো ভাবই প্রকাশ করুক না কেন ঐ অলঙ্কারবহুল ঝঙ্কারময় কবিতাগুলি মনে রাখা এতো সহজ যে অবাক লাগে। আনন্দে মনপ্রাণ ভরে উঠল। দিনগুলি সহজ আনন্দময় হয়ে উঠল। কবিতাগুলো সত্যিই যেন এক নতুন জীবনের সূচনা ঘোষণা করল। পড়তে পারাটা কতই না আনন্দেরই!

পুশকিনের অন্যান্য লেখার চাইতে তাঁর ঐ মনোরম কাব্য-কাহিনী ঢের বেশি সাড়া জাগাত আমার মনে। বারবার পড়তে পড়তে ওগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর যখন বিছানায় গিয়ে ঢুকতাম, চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে আওড়াতে আওড়াতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কখনো কখনো অফিসারদের আর্দালী মহলে আবৃত্তি করে শোনাতাম। অবাক বিস্ময়ে ওরা হেসে উঠত।

আদর করে আমার মাথার উপরে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে সিদরভ মৃদুকণ্ঠে বলত:

'উঃ কী চমৎকার, কী বলিস?'

মনিবরা আমার সেই উন্মনা অবস্থা লক্ষ্য করল। বুড়ি-গিন্নী শুরু করল গাল পাড়তে:

'ও পড়া পড়া করে এমনই মত্ত হয়ে উঠেছে যে আজ চার-চার দিন সামোভারটার গা পর্যন্ত একটুও রগড়ায় নি। পাজী বদমাইশ কোথাকার, বেলুনী দিয়ে একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব!'

কিন্তু বেলুনী কি করবে আমাকে? আমি আত্মরক্ষা করলাম কবিতা দিয়ে:

ডাইনী বুড়িটার
মনটা যেমন নিকষ অন্ধকার,
শয়তানীতে তেমনি ঠেসে ভরা...

ঐ সুন্দরী মহিলাটি সম্পর্কে আমার ধারণা আরো উঁচু হয়ে উঠল। তাহলে ঐ ধরনের বই-ই উনি পড়েন! উনি তাহলে আর সেই দর্জির চীনে পুতুলটি নয়...

বইটা এনে যখন একান্ত দুঃখিত মনে ফিরিয়ে দিলাম, একটু জোর দিয়েই বলে উঠলেন মহিলা:

'বইটা নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে তোর, তাই না? পুশকিনের নাম শুনেছিস কখনো?'

বললাম, না। কবে যেন কোন একটা মাসিক পত্রিকায় কিছু পড়েছিলাম বটে ঐ কবির সম্পর্কে, তবু শুনতে চাইছিলাম উনি কি বলবেন।

সংক্ষেপে পুশকিনের জীবনী, তাঁর মৃত্যুর কথা বলে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনের মতো একটু হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন:

'এখন বুঝতে পেরেছিস তো, মেয়েমানুষকে ভালোবাসা কী সাংঘাতিক?'

যত বই পড়েছি সমস্ত বইয়েই দেখেছি ভালোবাসাটা সাংঘাতিক, তবু — ভালো। বললাম:

'হতে পারে সাংঘাতিক, কিন্তু সবাই-ই তো প্রেমে পড়ে, মেয়েরাও তো কষ্ট পায়...'

সব কিছুর দিকেই যেমন তাকান তেমনি করেই চোখের পাতার তলা দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন:

'সত্যি? তুই এর মানে বুঝিস? যদি বুঝিস, আশা করি ভুলবি না কোনো দিন।'

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন বিশেষ করে কোন্ কোন্ কবিতা আমার ভালো লাগল।

বলতে বলতে হাত মুখ নেড়ে পরম উৎসাহে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে দিলাম। নীরব গম্ভীর মুখে শুনতে শুনতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মেঝের উপরে পায়চারি করতে করতে চিন্তিত মুখে বললেন:

'ইস্কুলে ভর্তি হওয়া উচিত, বুঝলি রে খুদে বাঁদর! এ বিষয়ে ভেবে দেখব আমি। যাদের বাড়ি কাজ করিস তারা কি তোর আত্মীয়?'

হ্যাঁ বলতে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ওঃ!' যেন সেটা আমারই একটা অপরাধ।

লাল মরক্কো বাঁধানো খোদাই করা সোনালী ধারওয়ালা 'বেরাঞ্জের গান' বইখানার একটি শোভন সংস্করণ আমাকে দিলেন। গানগুলির তীব্র তিক্ততা আর অবাধ আনন্দের সংমিশ্রণ আমার অন্তর এক মোহময় আনন্দে ভরপুর করে তুলল।

'বৃদ্ধ ভিখারীর সেই তীব্র তিক্ত উক্তিতে আমার শিরায় শিরায় রক্ত যেন জমে হিম হয়ে উঠল:

ঘৃণ্য কীটের মতো কেন তোমরা আমাকে
পায়ের তলায় দলে পিষে নিঃশেষ করে দিলে না,
ওগো ভালো মানুষেরা?
আঃ! মানব জাতির উপকারের জন্যে যদি তোমরা
আমাকে শেখাতে কঠোর শ্রম করতে!
তবে শীতের তুষার-ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে
এই কীটাণুকীটও হয়ে উঠতে পারত
পরিশ্রমী পিপীলিকা।
ভাইয়ের মতোই তবে তোমাদের পারতাম ভালোবাসতে,
কিন্তু আজ আমি বৃদ্ধ ভবঘুরে — তোমাদের মরণশত্রু হয়ে
মৃত্যুর দিন গুণছি।

পরক্ষণেই 'কাঁদুনে স্বামীর' কবিতা পড়তে পড়তে এমন হাসতে শুরু করলাম যে চোখে জল নেমে এল। বিশেষ করে বেরাঞ্জে'র সেই মন্তব্য আজও মনে আছে আমার:

খোলা মেলা দিলে
খুশি হওয়া সোজা!..

বেরাঞ্জে পড়ে আমার ভিতরে জেগে উঠল কেমন একটা অদম্য ঔদ্ধত্য, দুষ্টুমি করার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার এক উদ্ধত বাসনা। অনতিবিলম্বেই সে ইচ্ছের প্রশ্রয়ও দিয়ে বসলাম। বেরাঞ্জের কবিতাও মুখস্থ করে ফেললাম। আর্দালিদের রান্নাঘরে যাবার সময় পেলেই সেখানে দারুণ উৎসাহে কবিতা আবৃত্তি করতাম।

কিন্তু এই কয়েকটা লাইনের জন্যে আমার ঐ আবৃত্তি করা ছেড়ে দিতে হল:

যে টুপিটিই দাও না কেন আহা,
সপ্তদশীর যোগ্য কি নয় তাহা!

লাইনদুটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের সম্পর্কে কুৎসিত আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তাতে কেমন যেন এক অপমানবোধ জেগে উঠে আমাকে পাগল করে তুলল। একটা প্যান দিয়ে ইয়েরমোখিনের মাথার উপরে এক ঘা কষিয়ে দিলাম। সিদরভ আর অন্যান্য আর্দালীরা ওর ভল্লুকের মতো থাবার আক্রমণ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনল। তারপর থেকে আর্দালীদের রান্নাঘরে যেতে আর ভরসা হত না।

বেড়াতে যাবার হুকুম ছিল না আমার, বলতে কি সময়ও ছিল না। আমার কাজ আরো বেড়ে গিয়েছিল কেননা ঝিয়ের কাজ, উঠোন ঝাড়ুদারের কাজ, ফাইফরমাস-খাটার ছোকরা-চাকরের কাজ করার পরেও এখন থেকে আমার দৈনন্দিন কাজের তালিকায় যোগ হল পেরেক ঠুকে একটা বড়ো ফ্রেমে কাপড় এঁটে তাতে মনিবের আঁকা নকশা আঠা দিয়ে জুড়ে দেয়া, তার বাড়ি তৈরীর এস্টিমেটের নকল তৈরী করা, ঠিকাদারদের হিসেব পরীক্ষা করা। সকাল থেকে সন্ধ্যে যন্ত্রের মতো খেটে যেত মনিব।

এই সময়ে মেলার মাঠের সরকারী বাড়িগুলো ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি করে দোকানের সারিগুলোকে ঢেলে সাজানর জন্যে তোড়জোড় শুরু হল। মনিবের সঙ্গে চুক্তি হল অস্থায়ী চালাঘরগুলো মেরামত করার আর নতুন বাড়ি তৈরী করার। 'খাড়া তোরণ তৈরী করার, শোবার ঘরের জানালা ইত্যাদি ফিরে বানাবার' প্ল্যান আঁকল মনিব। সেই প্ল্যান আর খামে করে পঁচিশ রুবলের নোট নিয়ে এক বুড়ো স্থপতির কাছে যেতাম। টাকাটা পেয়েই সে প্ল্যানের উপরে লিখে দিত:

প্ল্যান পরীক্ষা করে নির্মিত বাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। যাবতীয় কাজ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সমাধা হয়েছে। অবশ্য তৈরী বাড়ির সঙ্গে কিছুই মিলিয়ে দেখা হত না। পারতও না বাড়ি তৈরীর কাজের তত্ত্বাবধান করতে! কারণ তার স্বাস্থ্যের অবস্থা যা তাতে ঘরের বার হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মেলার ইনস্পেকটার আর অন্যান্য লোকদের ঘুষ দিয়ে আসতাম এবং মনিবের ভাষায়, 'বে-আইনী নানান রকমের কাজের হুকুমনামা' নিয়ে আসতাম।

এসব কাজের পুরস্কার হিসেবে মনিবরা যখন কোথাও বাইরে নিমন্ত্রণে যেত, তখন আমাকে উঠোনে তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকার অধিকার দেয়া হত। সেটা অবশ্য ঘটত কদাচিৎ কখনো। কিন্তু যখনই ঘটত ওরা দুপুর রাতের আগে ফিরে আসত না। ফলে বহুক্ষণ ধরে আমি বারান্দায় বা ওপাশের কাঠের স্তূপের উপরে বসে আমার সেই মহিলার ফ্ল্যাটের জানালার পথে তাকিয়ে থাকার সময় পেতাম। শুনতাম সেখান থেকে ভেসে আসা আনন্দমুখর সঙ্গীত আর আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার শব্দ।

জানলা খোলা থাকত। জানালার পর্দা আর ফুলের জাফরির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেতাম সুঠাম চেহারার অফিসাররা ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব সহজ অথচ সুন্দর করে সাজ-করা আমার মহিলাটির পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে ফিরছে সেই নাদুসনুদুস মেজর।

মনে মনে আমি তাঁর নাম দিয়েছিলাম রাণী মার্গো।

'এই ধরনের আনন্দভরা জীবনের কথাই তাহলে লেখা থাকে ফরাসী উপন্যাসে!' জানালার পথে তাকিয়ে ভাবতাম মনে মনে। কেমন যেন একটু ব্যথা অনুভব করতাম। ফুলের আশপাশে মৌমাছিরা যেমন গুন গুন করে ফেরে তেমনি রাণী মার্গোকে ঘিরে ঐসব লোকদের ঘুর ঘুর করতে দেখে আমার অন্তরে জেগে উঠত এক শিশুসুলভ ঈর্ষা।

ওদের ভিতরে একজন ছিল গম্ভীর লম্বা চেহারার অফিসার। কপালে কাটা দাগ আর চোখ দুটো গভীরে বসানো। অন্যান্যদের তুলনায় সে আসত খুবই কম। যখন আসত সঙ্গে করে আনত বেহালা। এমন চমৎকার বাজাত যে পথের লোক পর্যন্ত শুনত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মহল্লার লোক এসে জমা হয়ে কাঠের গাদার উপরে বসে বসে শুনত ওর বাজনা। আমার মনিবরা

বাড়ি থাকলে তারাও জানালা খুলে দিয়ে শুনত আর তারিফ করত বেহালা-বাদকের। একমাত্র গির্জার ছোট পুরুত ছাড়া ওদের মুখে আর কারুর প্রশংসা কোনো দিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। গান-বাজনার চাইতে মাছের পিঠে ওদের বেশি প্রিয়।

কখনো কখনো অফিসারটি গান গাইত; কিংবা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় আবৃত্তি করত।

একদিন যখন জানালার নিচে বসে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করছি শুনলাম রাণী মার্গো ওকে গাইবার জন্যে অনুরোধ করছেন । কিছুক্ষণ না না করে সে খুব স্পষ্ট করেই আবৃত্তি করল:

মধুরতা সে তো গানটিরই প্রয়োজন,
যা মধুর তার গানে প্রয়োজন নেই...

লাইনকটি আমার খুব ভালো লাগল। কেন জানি ঐ অফিসারটির জন্যে মনে মনে দুঃখ হল আমার।

মহিলাটিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে আমার সবচাইতে ভালো লাগত ঘরে যখন আর কেউ থাকত না, শুধু একা তিনি বসে থাকতেন পিয়ানোর সামনে। সেই সময়ে সুর আমার সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে মস্তিষ্কে বাসা বাঁধত। চোখের সামনে থেকে সব কিছুই যেত মিলিয়ে। শুধুমাত্র ঐ জানালাটা জেগে থাকত আমার দৃষ্টিপথে। আর দেখা যেত জানালার ওপারে বাতির হলদে আলো গায়ে জড়িয়ে মহিলাটির সুঠাম দেহভঙ্গি, গর্বিত হালকা মুখের একটা পাশ, আর উড়ন্ত পাখির ডানার মতো পিয়ানোর পর্দার উপরে সঞ্চরমান তাঁর দুখানি হাত।

তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঐ ব্যথাভরা সঙ্গীত শুনতে শুনতে মনে মনে কতোই না আকাশকুসুম স্বপ্নের জাল বুনে চলতাম। নিশ্চয়ই কোনো দিন আমি আবিষ্কার করে বসব এক গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার। আর উজাড় করে সমস্ত ধনরত্ন ঢেলে দেব তাঁর হাতে—ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠুন মহিলাটি! আমি যদি স্কোবেলেভ হতাম, তাহলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করতাম। তারপর বন্দীদের মুক্তি-মূল্য দিয়ে শহরের সবচাইতে সুন্দর জায়গায় ওঁর জন্যে একটা প্রাসাদ গড়ে দিতাম, যাতে এই বাড়ি, এই পাড়া যেখানে সবাই ওঁর সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলে, নোংরা গুজব ছড়ায়, সেটা ছেড়ে সেখানে গিয়ে বাস করতে পারতেন।

বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর, সমস্ত বাসিন্দে, বিশেষ করে আমার মনিবেরা বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলত রাণী মার্গোর কথা, দর্জির বৌ সম্পর্কে যেমন বলত। শুধু তফাৎ এটুকুই যে ওঁর সম্পর্কে বলত খুব সাবধানে, ফিস ফিস করে আর ঠারেঠোরে।

সম্ভবত উনি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বিধবা বলেই ওরা ভয় পেত। তুফিয়ায়েভ একবার আমাকে বলেছিল ওঁর ঘরের ঐ সব বাঁধানো দলিলপত্রগুলো হচ্ছে ওঁর স্বামীর পূর্বপুরুষেরা বিভিন্ন জারের কাছ থেকে যে সব খেতাব পেয়েছিল তারই নির্দেশনামা। ওর ভিতরে আছে জার গদুনভ, আলেক্সেই আর মহান পিটারের দেয়া খেতাবের নির্দেশনামা। তুফিয়ায়েভ লেখাপড়া জানত—নিয়মিত গোসপেল পড়ত। পাছে মহিলা তাঁর হাতের ঐ পদ্মরাগমণি বসানো চাবুক দিয়ে আচ্ছা করে পিটে দেন এই ভয় ছিল লোকদের। তারা বলে একবার নাকি এক পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে চাবকেছিলেন উনি।

কিন্তু মুখর আলোচনার চাইতে চাপা গুঞ্জন মোটেই ভালো নয়। এমন একটা বিদ্বেষের ঘনায়মান মেঘের ভিতরে বাস করতেন মহিলা যে দারুণ আঘাত পেতাম আমি মনে মনে, বিমূঢ় হয়ে পড়তাম। ভিক্তর বলল, একদিন দুপুর রাতে বাড়ি ফেরার পথে সে নাকি রাণী মার্গোর শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছিল। দেখেছে মহিলাটি অন্তর্বাস পরে একটা সোফার উপরে বসে রয়েছেন আর মেজর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ের নখ কেটে দিয়ে স্পঞ্জ ভিজিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনে বুড়ি-গিন্নী ঘৃণায় থুথু ফেলে গাল পেড়ে উঠল। ছোট গিন্নী লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।

'ছিঃ! ভিক্তর!' রুক্ষ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'লজ্জা করে না তোমার? ঐ সব ফুলবাবু ভদ্রলোকগুলো কী লম্পট রে বাবা!'

মনিব শুধু একটু হাসল, একটি কথাও বলল না। তার জন্যে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম। কিন্তু ভয় হতে লাগল পাছে সেও এদেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিছু বলে বসে। অনেক বার 'ছিঃ ছ্যাঃ' করার পরে মেয়েছেলেরা ভিক্তরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, মহিলাটি কেমন ভঙ্গীতে বসেছিলেন, কেমন করে বসেছিল মেজর; আর ভিক্তরও মুখরোচক গল্প ছুঁড়ে দিতে লাগল ওদের দিকে:

'তার মুখটা লাল টক টক করছিল আর জিভটা বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল...'

মেজর মহিলার পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে এতে আমি তো লজ্জাকর কিছু দেখতে পাই নি। কিন্তু মেজরের জিভটা বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল একথা বিশ্বাস করি নি। এটা কুৎসিত মিথ্যে কথা বলেই মনে হল, বললাম:

'ব্যাপারটা যদি অতই অশ্লীল জানো, তাহলে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে গিয়েছিলে কেন? তুমি তো এখন আর খোকাটি নও...'

স্বভাবতই ওরা গাল পাড়ল আমাকে। কিন্তু ওদের গালাগাল আমি গায়ে মাখি নি। *তখন একটিমাত্র ইচ্ছেই আমার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে জেগে* উঠেছিল—ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে নিচে গিয়ে ঐ মেজরের মতোই মহিলার পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বলি:

'চলে যান, এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যান দয়া করে!'

এখন আমার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে অন্য রকমের এক জীবন, অন্য ধরনের মানুষ, অন্য ধরনের অনুভূতি আর ভাবধারা। ফলে এই বাড়ি, বাড়ির লোকজন সবার উপরেই ক্রমে যেন আরো বেশি ধিক্কার জাগত। সমস্ত কিছু যেন একটা কুৎসিত নোংরা গুজবের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তার হাত থেকে একটি লোকেরও নিষ্কৃতি নেই। সেনাবাহিনীর পুরুত বেচারা রোগা মানুষ। লম্পট মাতাল বলে তার দুর্নাম। আমার মনিবদের কথামতো সব অফিসার আর তাদের বৌয়েরাই চরিত্রহীন। মেয়েদের সম্পর্কে আর্দালীদের বিরক্তিকর আলোচনা শুনতে ঘেন্না হত। কিন্তু মনিবদের আমি সবচাইতে বেশি ঘেন্না করতাম। অন্যের সম্পর্কে ওরা যে সব রায় দিয়ে বসত তার সত্যিকার মূল্য কতোখানি তা আমার খুবই ভালো জানা ছিল। অন্যকে দুনখে ছিঁড়ে কুটি কুটি করাটাই হল একমাত্র ব্যসন যাতে পয়সা লাগে না। সুতরাং এটাই হল ওদের একমাত্র ফূর্তি। যেন এমনি করে ওরা ওদের নিজেদের জীবনের একঘেয়েমি, ধর্মান্ধতা ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করত।

রাণী মার্গোর সম্পর্কে ওরা যখন কুৎসিত গল্প বলত, এমন এক তীব্র আবেগে অন্তর মুচড়ে উঠত যেটা আমার বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক। ঐ নিন্দুক পরচর্চাকারীদের উপরে সুতীব্র ঘৃণায় বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইত। ওদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা, ওদের আক্রমণ করার এক অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠত মনে। আবার কখনো বা নিজের প্রতি, সমস্ত মানুষের প্রতি এক অনুকম্পার প্লাবন অভিভূত করে ফেলত। এই অব্যক্ত অনুকম্পা বহন করা ঘৃণার চাইতেও কঠিন।

আমার রানী মার্গোর সম্পর্কে ওদের চাইতে ঢের বেশি জানতাম আমি। ভয় হত আমি যা জানি পাছে সে সব কথা ওরা জেনে ফেলে।

রবিবার সকালে যখন গোটা পরিবার উপাসনা সভায় যেত সেই সময়ে আমি যেতাম আমার ঐ মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বসাতেন তাঁর শোবার ঘরে। সোনালী রঙের সিল্কের কাপড়ে মোড়া একটা চেয়ারে বসতাম। ছোট মেয়েটি উঠে এসে বসত আমার কোলে, আর আমি তার মায়ের কাছে বলে যেতাম যে বইটা পড়েছি তারই কথা। শোবার ঘরের অন্যান্য সবকিছুর মতোই সোনালী রঙের একটা চাদরে গা ঢেকে ছোট ছোট দুটি হাত গালের তলায় রেখে চওড়া বিছানার উপরে শুয়ে থাকতেন আমার রাণী। নিবিড় কালো চুলের বেণীটা এলিয়ে পড়ে থাকত তাঁর হলদে কাঁধের উপরে। কখনো বা বিছানার কিনারা বেয়ে ঝুলে মেঝের উপরে পড়ত লুটিয়ে।

শুনতে শুনতে তাঁর দুটি কোমল চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতেন আমার মুখে। আর একটুখানি মৃদু হাসি হেসে বলতেন:

'সত্যি?'

আমার মনে হত তাঁর হাসিটি পর্যন্ত রাণীর মুখের হাসির মতোই বরদা। তিনি কথা বলতেন গভীর সুরে, কোমল কণ্ঠে। কিন্তু আমার মনে হত তিনি যেন বারে বারে শুধু একটি কথাই পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন:

'আমি জানি অন্যের তুলনায় আমি ঢের বেশি ভালো, ঢের বেশি মার্জিত। তাই ওদের কাউকেই আমি তোয়াক্কা করি না।'

কোনো কোনো দিন গিয়ে দেখতাম আয়নার সামনে নিচু একটা আরাম-কেদারায় বসে চুল বাঁধছেন। দিদিমার মতোই লম্বা আর ঘন তাঁর চুল। আরাম-কেদারার হাতল বেয়ে সে চুল নেমে আসত তাঁর হাঁটুর উপরে আর পিছন দিক থেকে প্রায় মেঝের উপরে পড়ত লুটিয়ে। আয়নার ভিতরে দেখতে পেতাম তাঁর সুডৌল সুদৃঢ় দুটি স্তন। আমার সামনেই তিনি কাঁচুলি আর মোজা পরতেন। কিন্তু তাঁর ঐ নগ্নতা এতটুকুও লজ্জার ভাব জাগিয়ে তুলত না আমার মনে। তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর দেহসৌষ্ঠব এক আনন্দভরা গর্বে আমার মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলত। সব সময়েই তাঁর গা থেকে বেরিয়ে আসত ফুলের সুগন্ধ। তাঁর সম্পর্কে কোনো রকমের কামভাব জেগে ওঠার বিরুদ্ধে এটাই ছিল এক দুর্ভেদ্য বর্ম।

আমি শক্তি-স্বাস্থ্যে ভরপুর। যৌন-সম্পর্কের গোপন রহস্য জানতাম। কিন্তু কী নির্মম কুৎসিতভাবে, কী উৎকট আনন্দ নিয়ে লোকেরা যৌন-সম্পর্কের কথা বলে তাও শুনেছি। তাই কোনো পুরুষ এই মহিলাকে আলিঙ্গন করে একথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না ওঁর দেহ উপভোগের জন্যে কোনো লোকের নির্লজ্জ দুঃসাহসী হাত মেলে ওঁকে জড়িয়ে ধরতে পারার অধিকার আছে। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল রান্না-বাড়ি আর চালাঘরের যা কিছু প্রেম তা রাণী মার্গোর সম্পূর্ণ অজানা। তিনি জেনেছেন উন্নততর এক আনন্দের সংবাদ, ভিন্নতর এক প্রেমের বার্তা।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পরে একটু রাত করেই তাঁর ড্রইং রুমে ঢুকেছি। শোবার ঘরের পর্দার ওপাশ থেকে রিনরিনে হাসির ঝংকারের সঙ্গে পুরুষের গলার স্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পুরুষটি মিনতি করছিল:

'তাড়াতাড়ি করো না!.. এ কী! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য!'

চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অনুভব করলাম নড়ার ক্ষমতাটুকুও যেন আর আমার নেই।

'কে ওখানে?' ডাকলেন মহিলা, 'ও, তুই? ভিতরে আয়...'

ফুলের গন্ধে ঘরের ভিতরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। ঘরটা অন্ধকার। জানালায় জানালায় পর্দা টানা। গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছেন মহিলা। আর তারই পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সেই বেহালা-বাদক অফিসার। গায়ে শুধুমাত্র একটা শার্ট, বোতাম খোলা। ডান কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত একটা কাটা দাগ বেরিয়ে পড়েছে। কাটা দাগটা এত লাল চকচকে যে সেই আবছা আলোর ভিতরেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অফিসারের চুলগুলো হাস্যকর ভাবে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। আর ওর চিরবিষণ্ণ কাটা দাগে ভরা মুখে এই প্রথম দেখতে পেলাম আমি হাসির রেখা। অদ্ভুত ভাবে লোকটা হাসছিল, আর বড়ো বড়ো মেয়েলী দুটো চোখ মেলে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল আমার রাণীর মুখের দিকে যেন এই প্রথম সে তাঁর রূপ দেখল। রাণী মার্গো বললেন:

'এটি হল আমার বন্ধু,' বুঝতে পারলাম না কথাটা আমাকে না ঐ অফিসারটিকে লক্ষ্য করে বলা হল।

'এতো ভয় পেয়ে গেলি কেন?' মনে হল তাঁর গলার স্বর যেন বহুদূরে থেকে ভেসে আসছে। 'আয় এদিকে...'

এগিয়ে যেতেই তাঁর তপ্ত খালি হাতখানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন:

'যখন বড়ো হবি, তোর জীবনেও আসবে আনন্দ... এখন চলে যা!'

বইটা তাকের উপরে রেখে আর একখানা বই নিয়ে আমি চলে এলাম তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো।

বুকের ভিতরে কী যেন কড় কড় করে উঠল। সত্যি বলতে কি, কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভাবতে পারি নি আমার রাণী কখনো সাধারণ মানুষের মতো প্রেম করতে পারেন। ঐ অফিসারটির সম্পর্কেও একথা ভাবতে পারি নি। অফিসারটির সেই হাসি ভেসে উঠতে লাগল আমার চোখের সামনে। হঠাৎ অবাক হয়ে যাওয়া শিশুর মুখে যেমন ফুটে ওঠে অনাবিল আনন্দের হাসি তেমনি হাসি ফুটেছিল তার মুখে। আর ওর বিষণ্ণ মুখের চেহারা গিয়েছিল সম্পূর্ণ বদলে। নিশ্চয়ই সে ওঁকে ভালোবাসে। ওঁকে ভালো না বেসে পারে এমন কেউ আছে কি? আর ঐ অফিসারটির উপরেও যে তিনি তাঁর ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তারও ন্যায্য কারণ আছে। কী সুন্দর বেহালা বাজায় লোকটি আর কী গভীর আবেগের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করে।

কিন্তু এই যে আমি মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছিলাম এতেই বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপারটা সব ঠিক হ্যায় গোছের নয়। যা দেখলাম তার ভিতরে আর ঐ রাণী মার্গোর সম্পর্কে আমার মনোভাবে কোথায় যেন খানিকটা গলদ লেগে রইল। অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলাম, কী যেন হারিয়ে ফেলেছি। বহুদিন পর্যন্ত দুঃখে ক্ষোভে অন্তর ভারি হয়ে ছিল।

একদিন খুব বিশ্রী হৈচৈ করলাম। পরে আর একখানা বই-এর জন্যে যেতে কঠোর স্বরে তিনি বললেন:

'মনে হচ্ছে তুই একটি খুদে বর্বর বিশেষ! সংশোধনের বাইরে! তোর কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি!'

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বলতে আরম্ভ করলাম লোকে যখন তাঁর সম্পর্কে কুৎসা রটায় তখন কী কষ্ট হয় আমার, জীবনের উপরে কি রকম ঘেন্না ধরে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপরে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উনি শুনছিলেন আমার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠে আমাকে একটু ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন।

'থাক হয়েছে, থাম! ওসবই আমি জানি, বুঝলি? সব কিছুই জানি আমি, সব, সব!'

তারপর আমার দুটো হাত তাঁর মুঠোয় তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন:

'এসব নোংরা ব্যাপারে যত কম কান দিবি ততই তোর পক্ষে ভালো। তোর হাত দুটোও ভালো করে ধোয়া নয় দেখছি...'

একথা উনি না বললেও পারতেন। আমার মতো যদি ওঁকে পিতলের জিনিসপত্র মাজতে হত, ঘরের মেঝে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হত, বাসন মাজতে হত তবে ওঁর হাত দুটোও আমার চাইতে বেশি ভালো দেখতে হত না।

'কেউ যদি বাঁচার মতো বাঁচতে জানে তবে সবাই তাকে ঘৃণা করে, হিংসা করে। যদি না জানে তবে আবার তাকে হেয় জ্ঞান করে,' গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে বললেন। তারপর আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললেন:

'তুই আমায় ভালোবাসিস?'

'বাসি।'

'খুউব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু—কেন?'

'তা জানি না।'

'ধন্যবাদ, তুই লক্ষ্মীছেলে! লোকে আমাকে ভালোবাসলে আমি খুবই আনন্দ পাই।'

একটু হেসে উঠলেন। মনে হল যেন কিছু একটা বলতে চাইছেন। কিন্তু শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। আমার হাত দুটো তখনো তাঁর মুঠোর ভিতরে ধরা।

'আরো ঘন ঘন আসিস আমার কাছে, কেমন, যখনই সময় পাবি তখনই...'

এই আমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করলাম। ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে লাভবানও হলাম প্রচুর। দুপুরে খাওয়ার পরে যখন আমার মনিবেরা ঘুমোত, আমি ছুটে নিচে চলে আসতাম। আর তিনি ঘরে থাকলে তাঁর কাছে বসে ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি কাটিয়ে দিয়ে আসতাম।

'তোকে রাশিয়ার বই পড়তে হবে। জানতে হবে রাশিয়ার জীবন,' দ্রুত

সঞ্চরমান গোলাপী রঙের আঙুলগুলো দিয়ে সুগন্ধি চুলের ভিতরে কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে শেখাতেন আমাকে।

তারপর তিনি এক এক করে রুশ লেখকদের নাম বলে যেতেন। বলতেন:

'মনে থাকবে তো নামগুলো?'

হঠাৎ হঠাৎ কখনো চিন্তিত সুরে বলে উঠতেন, হয়ত বা একটু বিরক্তিও থাকত সে কথার সুরে:

'সত্যি! তোকে যে পড়তে হবে! সে কথা একদম ভুলেই যাই আমি...'

তাঁর পাশে খানিকক্ষণ কাটিয়ে একটা নতুন বই নিয়ে ছুটে চলে আসতাম উপরে। মনে হত যেন স্নান করে পবিত্র হয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যেই পড়া হয়ে গিয়েছিল আক্সাকভের 'পারিবারিক ইতিহাস', সুন্দর রুশ কবিতা 'বনে বনে', অদ্ভুত কাহিনী 'এক শিকারীর কথা', গ্রিবেঙ্কো আর সল্লোগুবের কয়েক খন্ড উপন্যাস এবং ভেনির্ভিতিনভ, ওদোয়েভস্কি আর ত্যুৎচেভের কবিতা। এই সব বই আমার অন্তর থেকে দীনহীন তিক্ত বাস্তবতার খোলস ঝরিয়ে দিল। এতো দিনে বুঝতে পারলাম ভালো বই বলতে কী বোঝায়, আমার পক্ষে তারা কতো অপরিহার্য। ওরা আমার ভিতরে জাগিয়ে তুলল এই শান্ত সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় যে দুনিয়ায় আমি একা নই, আর নিশ্চয়ই একদিন আমি আমার জীবনে পথ করে নিতে পারব।

দিদিমা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। উল্লসিত হয়ে বললাম তাঁকে রাণী মার্গোর কথা।

বড়ো এক টিপ নস্যি নিয়ে তিনি বললেন:

'ভারি আনন্দের কথা! দুনিয়ায় অনেক ভালো মানুষ আছে রে, একটু শুধু খুঁজে দেখলেই দেখা পাবি তাঁদের!'

একদিন তিনি বললেন:

'তোকে এতো ভালোবাসেন, বোধ হয় আমায় গিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানিয়ে আসা উচিত, কী বলিস?'

'না, যেও না।'

'বেশ, তাহলে যাব না... ভগবান, ভগবান, কতোই না সুন্দর সবকিছু! চিরকাল যদি বেঁচে থাকতে পারতাম কী আনন্দই না হত আমার!'

আমি ইস্কুলে যাচ্ছি তা দেখার সুযোগ কিন্তু রাণী মার্গো পেলেন না।

'হুইট সান্‌ডে' পরবের দিনে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটল। ঘটল আমারই কৃতকর্মের বিপর্যয়ে।

ছুটির কয়েকদিন আগে আমার চোখের পাতা দুটো ফুলে উঠে চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ বুজে গেল। মনিবদের ভয় হল বুঝিবা আমি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাব। আমারও সেই ভয়ই হল। ওরা আমাকে *হেনরিখ রোদজেভিচ* নামে ওদের পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমার চোখের পাতার ভিতরের দিকে অস্ত্র করলেন। ফলে দীর্ঘদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখে ব্যথায় আর অন্ধকারে বিছানায় পড়ে রইলাম। হুইট সান্‌ডে'র আগের দিন সন্ধ্যায় আমার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল যেন কবর থেকে উঠে এলাম — সে কবরে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে রাখা হয়েছিল। অন্ধ হওয়ার চাইতে ভয়ংকর আর কিছুই নেই। সেটা দুর্ভাগ্যের কথা বলার অতীত। দুনিয়ার দশ ভাগের ন'ভাগ থেকেই বঞ্চিত হতে হয়।

'হুইট সানডে'র আনন্দমুখর দিনে অসুস্থতার জন্যে দুপুরে সব কাজ থেকে রেহাই পেয়ে রান্নাঘরে রান্নাঘরে আর্দালীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যে বেরলাম। দেখি ভারভার্তিক তুফিয়ায়েভ ছাড়া আর সবাই মাতাল হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার দিকে ইয়েরমোখিন একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে সিদরভের মাথায় মারল এক বাড়ি। মেঝের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল সিদরভ। আর ভয় পেয়ে ইয়েরমোখিন গিয়ে লুকল খাদের ভিতরে।

দেখতে দেখতে পাড়াময় গুজব রটে গেল, সিদরভ খুন হয়েছে। রান্নাঘর আর বাড়ি ঢোকার পথের মাঝখানে আর্দালীর নিশ্চল নিস্পন্দ দেহটা দেখবার জন্যে বারান্দার সিঁড়ির উপরে ভিড় জমে উঠল। লোকে ফিস ফিস করল, পুলিস ডেকে আনা উচিত। কিন্তু কেউ পুলিস ডাকল না, সিদরভকে ছুঁয়ে দেখার সাহসও হল না কারো। এল ধোপানী নাতালিয়া কজলোভ্‌স্কায়া। ওর গায়ে ফিকে নীল রঙের একটা নতুন পোশাক, কাঁধের উপরে জড়ানো একটা সাদা রুমাল। রেগে মেগে ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে দোরের পথে এগিয়ে গিয়ে ওর দেহটার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল সে।

'যত সব বেকুবের দল!' চেঁচিয়ে বলে উঠল নাতালিয়া, 'ও তো বেঁচে আছে! একটু জল আন!'

লোকে ওকে হুঁশিয়ার করে দিল, 'পরের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না বাপু!'

'বলছি জল আন!' যেন আগুন লেগেছে এমনি করে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া। তারপর ক্ষিপ্রহাতে তার ফ্রকটা হাঁটুর উপরে টেনে তুলে ঝাঁকি দিয়ে টেনে পেটিকোটটা নামিয়ে দিল। তারপর ওর রক্তাক্ত মাথাটা নিজের কোলের উপরে তুলে নিল।

কাজটা যাদের তেমন পছন্দ হচ্ছিল না সেই সব ভীতু দর্শকের দল কেটে পড়তে লাগল। দরজার আধ আলো-ছায়ায় দেখতে পেলাম নাতালিয়ার টলটলে চোখ দুটো গোলগাল ফর্সা মুখের উপরে চক চক করছে। আমি এক কলসী জল নিয়ে এলাম। নাতালিয়া বলল সিদরভের মাথায় আর বুকে জল ঢেলে দিতে। আমাকে সাবধান করে বলল:

'কিন্তু দেখিস আমাকে যেন ভিজিয়ে দিস নে। আমি যাচ্ছি নিমন্ত্রণে...'

আর্দালীর জ্ঞান ফিরে এল। ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে কাতরে উঠল।

'তুলে ধর ওকে,' যাতে নিজের পোশাকটা না নোংরা হয়ে যায় এমনি ভাবে দূর থেকে ওর বগলের তলায় হাত দিয়ে আলতো করে ধরে বলল নাতালিয়া। আমরা দুজনে ধরাধরি করে ওকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ভেজা কাপড় দিয়ে নাতালিয়া ওর মুখ মুছে দিল, তারপর বেরিয়ে যেতে বলল:

'কাপড়টা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দিস আর মাথার উপরে চেপে ধরে রাখিস। দেখি ততক্ষণে আমি ও বেকুবটাকে ধরে আনতে পারি কিনা। শয়তানগুলোর মাথা খারাপ, মাতলামি করে জেলে যাবে তবে হবে!' রক্তমাখা পেটিকোটটা খুলে ফেলে এক কোণে ছুঁড়ে দিল। তারপর হাত বুলিয়ে নতুন ফ্রকটা ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিদরভ টান হয়ে হিক্কা তুলল, গোঙাল; ওর মাথা থেকে তখনো ঘন রক্ত ঝরে ঝরে আমার পায়ের ওপর পড়ছিল। সেটা অসহ্য লাগছিল, কিন্তু ভয়ে পাটা সরাতে পারছিলাম না।

নিদারুণ তিক্ততায় মনটা দমে গেল। বাইরে সবকিছু ঘিরেই উৎসব আনন্দের কলভাষ। কচি বার্চ পাতায় সাজানো হয়েছে গেট, জানালা, প্রত্যেক থামে থামে দেবদারু ডালপালার রূপসজ্জা। রাস্তা জুড়ে চলেছে আনন্দ উৎসবের সমারোহ। সবকিছু নতুন, সবকিছু যৌবনময়। ভোরবেলা মনে হয়েছিল এই বসন্তোৎসব চিরন্তন। এর পরে জীবন হয়ে উঠবে পবিত্র, উজ্জ্বল, আনন্দময়।

আর্দালী বমি করল। গরম ভদকা আর কাঁচা রসুনের দুর্গন্ধে ভরে উঠল

রান্নাঘরের বাতাস। থেকে থেকে জানালার কাঁচের গায়ে চেপে ধরা চওড়া মুখ আর থ্যাবড়া নাকের অস্পষ্ট ছায়া উঁকিঝুঁকি মারছিল। দুপাশ থেকে মেলা হাতগুলো বিরাট বিরাট কানের মতো দেখাচ্ছিল।

মাথাটা পরিষ্কার হতেই আর্দালি বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'কী হয়েছিল? আমি কি পড়ে গিয়েছিলাম? ইয়েরমোখিন? বন্ধুর মতো বন্ধু বটে!'

আর্দালী কাশতে আরম্ভ করল, তারপর কাঁদল মাতালের কান্না। শেষটায় কাতরাতে লাগল:

'আমার ছোট বোনটি... বেচারা ছোট বোনটি আমার...'

সর্বাঙ্গ ভেজা, ধুলোকাদা মাখা, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা ঘুরে ধপ করে আবার বিছানার উপরে ঢলে পড়ল।

'ও আমাকে একেবারে খুন করে ফেলেছে?'

এতে ভারি মজা লাগল আমার।

'হাসছিস কেন, ব্যাটা শয়তান?' বিমূঢ়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'হাসি আসে কোত্থেকে — এমনি ভাবে খুন হয়ে গেলাম আমি — একেবারে জন্মের মতো শেষ হয়ে গেলাম...'

দুহাতে আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে বিড় বিড় করে বলতে লাগল:

'প্রথম রাতে রাণী রূপসী বিলাসিনী, শেষ রাতে রাণী হাড় মড় মড় ডাইনী। ভাগ আমার সামনে থেকে, শয়তান...'

'চুপ করো, বক বক করো না!' বললাম আমি।

রাগে গর্জে উঠল আর্দালী, পা ঠুকে চিৎকার করে উঠল:

'আমাকে খুন করে ফেলল আর তুই কিনা..!'

ওর ভারি নোংরা অবশ হাতটা দিয়ে আমার চোখের উপরে ঘুসি মারল। চিৎকার করে উঠে অন্ধের মতো ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি ইয়েরমোখিনকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে নাতালিয়া আর গাল পাড়ছে:

'চল, ব্যাটা ঘোড়া!' তারপর আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞেস করল:

'কী হল?'

'মারপিট শুরু করেছে।'

'মারপিট শুরু করেছে?' অবাক হয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল নাতালিয়া। তারপর ইয়েরমোখিনকে জোরে একটা টান দিয়ে বলল:

'এবারের মতো খুব বেঁচে গেলি, ভগবানকে ধন্যবাদ দে!'

ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়ে ফিরে এসে দোরের পথে রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মাতালের পুনর্মিলনের কান্না। তারপর ওরা দুজনে মিলে নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই নাতালিয়া চড় মেরে ওদের দূর করে দিল।

'খবর্দার বলছি, আমার গায়ে হাত দিবি নে, কুত্তা কোথাকার! কী পেয়েছিস তোরা আমাকে, তোদের ঐ নষ্ট মাগীদের কেউ? শুয়ে পড়ে ঘুমো মনিব ফিরে আসার আগে। নইলে কপালে দুঃখু আছে বলে দিচ্ছি!'

বাচ্চাছেলেদের মতো করে নাতালিয়া ওদের শুইয়ে দিল — একটাকে খাটে আর একটাকে মেঝের উপরে। ওরা নাক ডাকাতে শুরু করতে ও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

'দেখ একবার আমার ফ্রকটার অবস্থা — নেমন্তন্নে যাচ্ছিলাম, সব কুঁচকে একশা হয়ে গেছে!.. ও মেরেছে নাকি তোকে? ব্যাটা মুখ্যু গোঁয়ার! দেখ, ভদকা কী জিনিস বুঝে দেখ! কক্ষণো মদ খাবি না, বুঝলি ছেলে! কোনো দিন ঐ অভ্যেসটি করবি না!'

গেটের সামনে বেঞ্চের উপরে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ও মাতালকে ভয় পায় না এটা কেমন করে সম্ভব।

'এমনি সুস্থ মানুষকেই ভয় করি না, তো মাতাল! এইটি দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে রাখি!' লাল শক্ত মুঠোর একটি ঘুসি উঁচিয়ে বলল আমাকে। 'আমার স্বামীও এমনি করত। মরে গেছে। দারুণ মাতাল ছিল। আমি ওর হাত-পা বেঁধে রাখতাম, তারপর যখন ঘুম ভেঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠত, প্যাণ্ট খুলে একটা শক্ত লাঠি দিয়ে আগাপাছতলা ঢিট করে দিতাম: মদ খাওয়া ছাড়ো, মাতলামো করা ছাড়ো, ফুর্তি করতে চাও, ঘরে বৌ আছে মজা লোটো, কিন্তু মদের গ্লাসটি নয়! ঠিক এমনি করে এমন পেটা পিটতাম যে পিটতে পিটতে আর পেটার শক্তি থাকত না। তারপর থেকে আমার হাতের মুঠোয় কাদামাটিটি হয়ে থাকত...'

সেই মেয়ে ইভের কথা মনে হল আমার, যে নাকি ঈশ্বরকে পর্যন্ত প্রতারণা করেছিল। বললাম, 'আপনার গায়ে খুব জোর।'

প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল নাতালিয়া:

'পুরুষের চাইতে মেয়েদের গায়ে ঢের বেশি জোর থাকা উচিত। দুটো

মরদের শক্তি থাকা দরকার। কিন্তু প্রভু সেদিক থেকে ঠকিয়েছেন মেয়েদের। কিন্তু চাষা-মরদ যে কী করবে কিছু বলা যায় কখনো!'

শান্ত গলায় বলল নাতালিয়া। এতটুকুও বিদ্বেষ নেই ওর কথায়। বড়ো বড়ো দুটো স্তনের উপরে হাত দুটো জোড়া করে রেখে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। বিষণ্ণ দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি নোংরা জঞ্জালভরা বাঁধের উপরে নিবদ্ধ। ওর মূল্যবান কথাগুলো শুনতে শুনতে সময়ের খেয়াল ছিল না আমার। হঠাৎ দেখতে পেলাম দূরে বাঁধের ওপাশ থেকে আসছে মনিব আর তার বাহুলগ্না হয়ে মনিব-গিন্নী। মোরগ দম্পতির মতো ধীরে ভারিক্কি চালে ওরা হাঁটছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে আর কী যেন আলোচনা করছে।

ছুটে গেলাম দোর খুলে দিতে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মনিব-গিন্নী:

'শেষটায় ধোপানীর সঙ্গে আশনাই আরম্ভ করেছিস? নিচের তালার মহিলার কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিস বুঝি?'

এমন বেকুবের মতো কথায় রাগ হয় নি আমার। কিন্তু মনিব যখন একটু হেসে সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল তখন দারুণ আঘাত পেলাম মনে:

'বেশ তো, এই তো সময়, কী বলিস তাই না?'

পরের দিন সকালে চালাঘরে কাঠ আনতে গিয়ে দেখি দোরের কাছে বেড়ালের খোঁদলের সামনে একটা খালি মানিব্যাগ পড়ে রয়েছে। ব্যাগটা বহুদিন দেখেছি সিদরভের কাছে। তক্ষুণি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে চলে গেলাম।

'টাকাকড়ি কোথায়?' ভিতরে আঙুল দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জিজ্ঞেস করল, 'এক রুবল আর ত্রিশ কোপেক ছিল ভিতরে। দে শীগ্‌গির!'

ওর মাথায় একটা তোয়ালে জড়ানো। মুখটা হলদে, শুকনো। ফোলা চোখটা পিট পিট করতে করতে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না যে ব্যাগটা আমি খালিই পেয়েছিলাম।

ইয়েরমোখিন ছুটে এল, ওকে বোঝাতে চাইল যে আমিই চোর।

'ওই নিয়েছে,' আমার দিকে দেখিয়ে বলল, 'নিয়ে চল ওকে ওর মনিবের কাছে! এক সৈনিক কখনো আরেক সৈনিক ভাইয়ের কিছু চুরি করে না!'

ওর কথায় আমার ধারণা হল যে ওই টাকাপয়সা চুরি করে ব্যাগটা আমাদের

চালাঘরের সামনে ফেলে রেখেছে। তাই তক্ষুণি আমি ওর মুখের উপরে বললাম:

'মিথ্যে কথা! তুই চুরি করেছিস!'

ভয়ে রাগে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠতে দেখে দৃঢ় ধারণা হল আমার অনুমানই ঠিক।

'প্রমাণ কর!' চেঁচিয়ে উঠল ইয়েরমোখিন।

কিন্তু সে কথা প্রমাণ করব কেমন করে? চিৎকার করে উঠে আমাকে টেনে হিঁচড়ে উঠোনে নামিয়ে আনল ইয়েরমোখিন। পিছন পিছন এল সিদরভ গাল পাড়তে পাড়তে। আর জানালায় জানালায় মুখগুলো উঁকি দিতে আরম্ভ করল। রাণী মার্গোর মা তেমনি সিগারেট টানতে টানতে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন আমাদের দিকে। 'আমার মহিলাটির' চোখে আমার প্রতিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে টের পেয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

মনে পড়ে দুই সৈনিক মিলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে মনিবের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল। আর মনিব আমার বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগ শুনতে শুনতে ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল।

'নিশ্চয় ওরই কাজ!' বলে উঠল মনিবের বৌ, 'কাল রাত্রে গেটের সামনে বসে ধোপানীর সঙ্গে আশনাই করতে দেখেছি ওকে নিজের চক্ষে। নিশ্চয়ই টাকা ছিল ওর কাছে — টাকাকড়ি ছাড়া মাগনা কিছু পাবার জো নেই ধোপানীর কাছ থেকে...'

'ঠিক কথা!' চেঁচিয়ে বলে উঠল ইয়েরমোখিন।

আমার মাথাটা ঘুরছিল। এক বন্য আক্রোশ পেয়ে বসেছিল আমাকে। চিৎকার করে গাল পাড়তে শুরু করলাম মনিব-গিন্নীকে। ফলে হাড়ভাঙা পিটুনি খেলাম।

কিন্তু মারের চাইতেও বেশি কষ্ট পেলাম এই ভেবে যে এর পর কী ভাববেন রাণী মার্গো আমার সম্পর্কে? কী করে তাঁর কাছে প্রমাণ করব আমি নির্দোষ? আমার পক্ষে সে এক অসহ্য সময়।

ভাগ্যি ভালো যে সৈনিকরা কী ঘটেছিল না ঘটেছিল সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে না দেখতে বাড়িময় পাড়াময় রাষ্ট্র করে দিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি চিলেকোঠায় শুয়েছিলাম, শুনলাম নিচে নাতালিয়া কজলোভস্কায়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে:

'কেন মুখ বুজে থাকতে যাব, কেন? আয় ইদিকে, আমার সাধু পুরুষ, আয় দেখি একবার! চলে আয় বলছি! নইলে এক্ষুণি তোর মনিবের কাছে যাব, তখন দেখব আসিস কিনা...'

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল ব্যাপারটা যেন আমার সংক্রান্ত কোনো কিছু। আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে নাতালিয়া। ক্রমেই তার গলা চড়ে যাচ্ছিল। ক্রমেই যেন একটা বিজয় উল্লাস ফুটে উঠছিল ওর স্বরে।

'কতো টাকা তুই আমাকে দেখিয়েছিলি কাল? কোথায় পেয়েছিলি সে টাকা, বল? শুনি সবাই।'

আনন্দে গলা বুজে এল। শুনতে পেলাম সিদরভ করুণ গলায় গোঙিয়ে উঠল:

'আরে, ইয়েরমোখিন...'

'আর দোষ দিলি কিনা ছেলেটার ঘাড়ে, মার খাওয়ালি ওকে!'

ইচ্ছে হল ছুটে নিচে গিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে করতে নাতালিয়ার হাতটা চুমোয় চুমোয় ভরে দিই। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম মনিব-গিন্নীর গলা। সম্ভবত জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলছিল:

'ছেলেটাকে মারা হয়েছে মুখ খারাপ করে গাল পাড়ার জন্যে। তুই-ই শুধু ধরে নিয়েছিস যে ও টাকা চুরি করেছে, খানকী কোথাকার!'

'খানকী তুমি নিজে, বুঝলে ঠাকরুন! আর যদি কিছু মনে না করো তো বলি, তুমি একটি মোটা সোটা ঢেপসী গাই!'

ওদের ঝগড়া যেন সঙ্গীতের মতো এসে বাজতে লাগল আমার কানে। ব্যথার তপ্ত অশ্রু আর নাতালিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তরে বান ডেকে উঠল। সে বন্যা চাপতে গিয়ে গলা বন্ধ হয়ে এল।

ধীরে ধীরে মনিব চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে খানিকটা বেরিয়ে থাকা কড়িটার উপরে বসল আমার পাশে।

'দেখা যাচ্ছে তোর ভাগ্যটাই খুব খারাপ, পেশকভ!' হাত দিয়ে চুলগুলো পাট করতে করতে বলল।

কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসলাম।

মনিব বলে যেতে লাগল, 'কিন্তু তুই যে ভীষণ কুৎসিত ভাষায় গাল পেড়েছিলি তা তো আর অস্বীকার করা যায় না।'

'একটু সেরে উঠলেই আমি চলে যাব,' বললাম শান্ত ভাবে।

কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ ধরে সিগারেট টানতে লাগল মনিব।

তারপর একান্ত নিবিষ্ট মনে সিগারেটের শেষটুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখতে দেখতে বলল:

'বেশ, সেটা তোর নিজের ব্যাপার! এখন আর ছোট ছেলেটি নোস। কী করবি না করবি নিজেই ভালো বুঝবি...'

স্মিব উঠে দাঁড়াল, তারপর নিচে চলে গেল। প্রতিবারের মতোই এবারও কষ্ট হল ওর জন্যে।

চারদিন পরে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম। দারুণ ইচ্ছে ছিল যাবার আগে রাণী মার্গোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই, কিন্তু তাঁর সামনে যাবার মতো সাহস আমার ছিল না। মনে মনে আশা করছিলাম তিনি নিজে থেকেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

ছোট মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে তাকে বললাম:

'মাকে বলো, আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ! মনে থাকবে তো?'

'থাকবে,' একটু স্নিগ্ধ মধুর হাসি হেসে কথা দিল মেয়েটি, 'বিদায়, আগামীকাল পর্যন্ত!'

প্রায় বিশ বছর পরে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। সে তখন এক পুলিস অফিসারের বৌ।

১১

আবার নিলাম বাসন মাজার কাজ। এবার 'পের্ম'এ। একটা বড়ো দ্রুতগামী স্টিমার রাজহাঁসের মতো ধবধবে সাদা। এবারের কাজ হল বাসন মাজার বা রান্নাঘরের বয়'এর কাজ। মাইনে মাসিক সাত রুবল। আমার কাজ ছিল বাবুর্চিকে সাহায্য করা।

স্টুয়ার্ড লোকটা যেমন মোটা তেমনি ঔদ্ধত্যে ভরা। রবারের বলের মতো মাথাজোড়া টাক। গরমের দিনে শুয়োর যেমন ছায়া খুঁজে বেড়ায়, হাত দুটো পিছনে করে দিনভর সে ডেকের উপর তেমনি করে পায়চারী করে ফিরত। বুফে'টাতে শোভা পেত ওর বৌ। মহিলার বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বয়েস কালে সুন্দরী ছিল। কিন্তু এখন বয়েসের ফলে একেবারে হতকুচ্ছিত। এতো পুরু করে পাউডার মাখত যে গাল থেকে আঁশের মতো চটা উঠে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ত তার জমকালো পোষাকের উপরে।

রান্নাঘরের কর্তা বাবুর্চি ইভান ইভানভিচ। ওকে সবাই ডাকত ভালুক বাছা বলে। গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা, নাকটা বড়শির মতো বাঁকানো, কৌতুকভরা চোখ। চাল-চলন বাবু-বাবু গোছের। সব সময়েই কড়া ইস্ত্রি-করা কলার। রোজ দাড়ি কামাত বলে গালে একটা নীলচে আভা ফুটে থাকত। কোঁকড়ানো কালো গোঁফ মুচড়ে উপর দিকে বাঁকিয়ে তুলে দিত। অবকাশ সময়ে ছোট একটা গোল আয়না মুখের সামনে ধরে লাল লাল ঝলসানো আঙুল দিয়ে সগর্বে তা দিত তাতে।

স্টিমারের ভিতরে সবচাইতে মজার লোক ছিল ফায়ারম্যান ইয়াকভ শুমভ। চওড়া কাঁধওয়ালা গাঁট্টাগোঁট্টা এক চাষী। ওর থ্যাবড়া নাকওয়ালা মুখখানা কোদালের মতো চ্যাপ্টা। মোটা রোমশ ভ্রূর তলায় শুয়োরের মতো কুতকুতে দুটো চোখ। বিলের শেওলার মতো দু'গালভরা কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ি। মাথাটা এমন ঘন কোঁকড়া চুলে ভরা যে তার ভিতর দিয়ে ওর গেঁটেল আঙ্গুলগুলো চালানো কষ্টকর।

জুয়াড়ী হিসেবে লোকটার নসীব যেমন খোলতাই, তেমনি ছিল অদ্ভুত পেটুক। এক টুকরো মাংস বা এক টুকরো হাড়ের জন্যে রাত দিন রান্নাঘরের আশেপাশে উপোসী কুকুরের মতো ঘুর ঘুর করে ফিরত। সন্ধ্যেয় ভালুক বাছার সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে নিজের সম্পর্কে অদ্ভুত সব গপ্প শোনাত।

ছেলেবেলায় রিয়াজানের শহর-মেষপালকের সহকারী হিসেবে কাজ করত সে। এই সময়ে পথচলতি এক সন্ন্যাসীর নজরে পড়ে। সে ওকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে মঠে। সেখানে শিক্ষার্থী হিসেবে ছিল চার বছর।

'সাধুই হয়ে যেতাম, ঈশ্বরের আকাশে একটি কালো তারা,' তার সেই চিরাচরিত বড়াই করার সুরেই বলত, 'যদি পেন্‌জা থেকে এক ধার্মিক মহিলা না আসত আমাদের মঠে। মহিলাটি ছিল একটি ছোটোখাটো মোহিনী। মুণ্ডুটি ঘুরিয়ে দিল আমার। বলতে লাগল, 'ওঃ কী সুন্দর ছেলে, কেমন বলিষ্ঠ চেহারা, আর এই দেখো না আমি, এক সতী-সাধ্বী বিধবা, কেউ নেই আমার — একেবারে একা। চলো না আমার দারোয়ান হয়ে কাজ করবে?' আরো বলল, 'আমার নিজের বাড়ি আছে, মুরগীর পালকের ব্যবসা আছে।'

'আমার আপত্তি ছিল না। তাই সে আমাকে তার দারোয়ান করে রাখল। আর আমিও তাকে আমার মেয়েমানুষ করে প্রায় তিন বছর আরামে কাটিয়ে দিলাম...'

'তুই একটা বেদম মিথ্যুক,' তার নাকের উপরের ব্রণটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে

দেখতে দেখতে ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠত ভালুক বাছা, 'মিথ্যে কথা বলে লোকে যদি টাকা রোজগার করতে পারত তবে তুই মস্ত ধনী হতে পারতিস!'

ইয়াকভ চিবতে লাগল। আংটির মতো গুটি পাকানো কালো দাড়ির থোকাগুলো ওঠানামা করতে লাগল। রোমশ কান দুটো নড়ল একটু। বাবুর্চির কথার পরেই আবার তেমনি সহজ গলায় বলে চলল:

'সে ছিল আমার চাইতে বয়সে ঢের বড়ো। বিশ্রী লাগত আমার, একদম ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তাই ওর বোনঝিটার সঙ্গে লটকে পড়লাম। যখন জানতে পারল, আমার ঘাড়টি ধরে দূর করে দিল...'

'উচিত মজুরিই দিয়েছে তাহলে,' ইয়াকভের মতোই স্বচ্ছন্দ গলায় বলে উঠল বাবুর্চি।

ইয়াকভ গালের ভিতরে এক ডেলা চিনি ফেলে বলে চলল:

'তারপর কিছুকাল হাওয়ায় ভেসে বেড়ালাম। শেষ পর্যন্ত ভ্লাদিমিরের এক বুড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভিড়ে পড়লাম। সে আর আমি, আমরা দুজনে মিলে আধখানা দুনিয়া চক্কর দিয়ে এলাম পায়ে হেঁটে। গেলাম গিয়ে সেই পাহাড়পর্বতের দেশে, যাকে বলে বল্‌কান। তুর্কী, রুমানীয়, গ্রীক, আর বিভিন্ন অস্ট্রীয় জাতের কাছে—সব রকমের মানুষের কাছে—এর কাছে কিনি, ওর কাছে বেচি...'

'চুরি করতিস?' গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল বাবুর্চি।

'সেই বুড়োটা কিছু চুরি করে নি — একটি কুটোও না। তাই সে আমাকে বলত, 'বিদেশের মাটিতে সৎ ভাবে চলবি। একটু কিছু চুরি করলেই ওরা মাথা কেটে নেয়।' তবে হ্যাঁ, চুরি করার চেষ্টা অবশ্য করেছিলাম। কিন্তু ধোপে টিকল না। এক সওদাগরের আস্তাবল থেকে চেষ্টা করেছিলাম একবার একটা ঘোড়া সরাবার। কিন্তু হল না। ধরে ফেলল। তারপর যা হয়,—বেদম প্রহার। মারতে মারতে যখন হয়রান হয়ে গেল, তখন টেনে নিয়ে গেল থানায়। সেখানে ছিলাম আমরা দুজন। একজন হল আসল ঘোড়া চোর, আর আমি, কী হয় দেখিই না করে এই ভেবেই ও কাজে হাত দিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি কাজ করতাম ঐ সওদাগরের কাছে। ওর নতুন স্নানের ঘরে চুল্লী ফিট করছিলাম। সওদাগর অসুখে পড়ল। আর ঘুমের ঘোরে আমাকে স্বপ্ন দেখতে লাগল—দুঃস্বপ্ন। দারুণ ঘাবড়ে গেল লোকটা। উপরওয়ালাদের কাছে গিয়ে বলল, 'ছেড়ে দিন ওকে,' মানে আমাকে, 'ছেড়ে দিন। কেননা ও আমাকে কেমন যেন স্বপ্নে দেখা দিতে শুরু করেছে। ওকে

যদি মাপ না করি, হয়ত আমি নিজেই মরব, ও লোকটা যে যাদুকর তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই!' মানে আমি যাদুকর। সওদাগর ছিল মান্যি-গণ্যি লোক, তাই ওরা আমাকে ছেড়ে দিল।'

বাবুর্চি বলল, 'উচিত হয় নি তোকে ছেড়ে দেয়া। তোর গলায় পাথর বেঁধে তিন দিন তোকে নদীর ভিতরে ডুবিয়ে রাখা উচিত ছিল, যাতে তোর ভিতরকার সবটুকু বেকুবি সাফ হয়ে যায়।'

ইয়াকভ চট করে কথাটা লুফে নিল:

'ঠিক বলেছ ভাই, ঢের বেকুবি আছে আমার ভিতরে—এতো বেকুবি আছে, সত্যি বলতে কি একটা গোটা গাঁয়ের সবখানি বেকুবির সমান...'

বাবুর্চি রেগেমেগে জামার কলারের ভিতরে আঙুল পুরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল। তারপর বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল:

'আরে ছ্যা! এর মতো সব জেলের আসামী বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাদা গাদা গিলছে, জালা জালা টানছে আর ঢুলছে পড়ে পড়ে, কিসের জন্যে শুনি? বল দেখি—কেন তুই বেঁচে আছিস?'

ঠোঁটে চুমকুড়ি দিয়ে বলল ফায়ারম্যান, 'তা আমি জানি না। অন্য পাঁচজনা যেমন বেঁচে বর্তে আছে আমিও তেমনি আছি। কেউ শুয়ে থাকে, কেউ ঘুরে বেড়ায়, কেরাণীরা চেয়ার ঠেসে বসে থাকে সারাদিন কিন্তু খেতে তো হয় সবাইকেই।'

এতে বাবুর্চি আরো বিরক্ত হয়ে উঠল।

'তুই এমন একটা শুয়োর যে তা আর কহতব্য নয়। তুই হলি গিয়ে শুয়োরের খোরাক, ঠিক তাই!'

'খেপে গেলে কেন ভাই?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ইয়াকভ। 'আমরা চাষীরা একই ওক গাছের ফল। মাথা খারাপ করো না। তাতে আমাকে কিছু আর শোধরাতে পারবে না...'

দুদিনেই এই লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। অফুরন্ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম ওকে। হাঁ করে শুনতাম ওর কথা। আমার মনে হত জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার এক শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে ও নিজের ভিতরে। ও সবাইকেই 'তুমি' বলত। মোটা ভুরুর তল দিয়ে অকপট আর মুক্ত দৃষ্টিতে তাকাত সবার দিকে। ক্যাপ্টেন, স্টুয়ার্ড, কি প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট যাত্রী সবাইকেই জাহাজী, বুফে'র পরিচারক, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে আর নিজের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলত।

কোনো কোনো সময়ে ক্যাপ্টেন বা মেকানিকের সামনে তার বনমানুষের মতো লম্বা হাত দুটো পিছনে করে দাঁড়াত। ওরা তার কুঁড়েমি বা একান্ত নির্বিকার ভাবে তাস খেলে কাউকে সর্বস্বান্ত করার দরুন যা গাল পাড়ত, তা নীরবে শুনত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ স্পষ্টই বোঝা যেত তাদের গালাগাল বা ধমক ওর মনে এতটুকুও রেখাপাত করে না। এমন কি সামনের স্টেশনে ওকে স্টিমার থেকে তাড়িয়ে দেবার শাসানিতেও ভয় পেত না এতটুকুও।

ইয়াকভ আর 'বাঃ বেশ'—এদের দুজনার ভিতরে মিল ছিল অনেক। বেশ বোঝা যেত ইয়াকভেরও দৃঢ় ধারণা ছিল যে সে অন্যের চাইতে স্বতন্ত্র, ওকে বুঝবে না কেউ।

লোকটাকে কখনো চিন্তিত বা বিষণ্ণ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অনেকক্ষণ ধরে কথা না কয়ে আছে এমনও দেখি নি। প্রায় ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসত অফুরন্ত কথার স্রোত। যখনই শুনত কেউ ওকে গাল পাড়ছে বা কোনো মজার গল্প করছে ওর ঠোঁট দুটো সঙ্গে সঙ্গে নড়তে থাকত। যেন যা শুনছে তা আবার আউড়ে নিচ্ছে মনে মনে। কিংবা হয়ত বা সে নিজে যা ভাবছে তাই-ই নীরবে বলে চলেছে। রোজই তার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে সে বেরিয়ে আসত ফায়ারম্যানদের ওখান থেকে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, জামায় তেল-কালির দাগ, খালি পা। বেল্টহীন জামাটা বুক পর্যন্ত খোলা। বুকের ওপর কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন চুল। ডেকের উপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যেত তার বৃষ্টির ফোঁটার মতো গম্ভীর একটানা কথার ধারাস্রোত।

'নমস্কার মা! চলেছ কোথায়? চিস্তোপোল? চিনি আমি জায়গাটা। সেখানে এক ধনী তাতার চাষীর কাছে কাজ করতাম। তার নাম ছিল উসান গুবাইদুলিন। তিন-তিনটে বৌ ছিল বুড়োর। লাল মুখো অত্যন্ত শক্তসমর্থ লোক। ওর তিনটে জোয়ান বৌয়ের মধ্যে একটা ছিল ছোটোখাটো চেহারার এক মোহিনী তাতার মেয়েমানুষ। মেয়েটার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলাম, মা।'

ও না ছিল হেন জায়গা নেই। আর যত সব মেয়েমানুষ ওর সংস্পর্শে এসেছে প্রায় সবার সঙ্গেই ছিল ওর অবৈধ সম্পর্ক। শান্ত দরদভরা কণ্ঠে সবকিছুই সে এমন ভাবে বলে যেত, যেন কেউ ওকে কোনো দিন এতটুকুও আঘাত দেয় নি, একটি বারের জন্যেও গালমন্দ করে নি। একটু পরেই মনে হত ওর কথার আওয়াজ যেন ভেসে আসছে পাছ গলুইয়ের ওপাশ থেকে।

'কে খেলবে তাস? পেটাপিটি, তে-তাস, বা বিন্তি? আরামের খেলা। শুধু বসে যাও আর সওদাগরের মতো দুহাতে টাকা পয়সা খিঁচে নাও।'

লক্ষ্য করে দেখেছিলাম ও 'ভালো' 'খারাপ' বা 'দুষ্ট'—এ জাতের কথা ব্যবহার করত কদাচিৎ। দরকার হলে প্রায় সব সময়েই বলত হয় 'মোহিনী', নয় 'দরদী' নয়ত বা 'অদ্ভুত'। সুন্দরী মেয়েমানুষকে ও বলবে 'ছোটোখাটো একটি মোহিনী', চমৎকার রোদভরা দিনকে বলবে 'দরদী দিন'। ওর সবচাইতে প্রিয় লব্জ ছিল:

'থুঃ! থুঃ!'

সবাই ওকে ভাবত কুঁড়ে। কিন্তু আমার মনে হত নিচের ঐ দম আটকে আসা ভ্যাপসা নোংরা খোলের ভিতর যে কোনো লোকের মতোই দায়িত্বশীল ভাবে ও কাজ করে যায়, শুধু অন্য ফায়ারম্যানদের মতো একটি দিনের জন্যেও ওর মুখে কোনো অভিযোগ শুনতে পাই নি।

একদিন যাত্রীদের ভিতরের এক বুড়ির মানিব্যাগ চুরি গেল। সে দিন সন্ধ্যাটা ছিল বেশ পরিষ্কার, শান্ত। সবাই বেশ খুশি খুশি। ক্যাপ্টেন বুড়িকে পাঁচ রুবল দিল, যাত্রীরাও সবাই চাঁদা করে কিছু কিছু তুলে দিল। টাকাটা বুড়ির হাতে দিতেই ক্রুশ করে বুড়ি মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে নমস্কার করে বলল:

'আহা গো, আমার ব্যাগে যা ছিল তার চাইতেও তিন রুবল দশ কোপেক বেশি দিলে যে আমাকে!'

কে যেন খুশির সুরে বলে উঠল:

'আরে নিয়ে নাও দিদিমা, ধন্যবাদ দিয়ে নিয়ে নাও। বাড়তি তিনটে রুবল বেশ কাজে দেবে।'

আর একজন যুৎসই করে বলে উঠল:

'টাকা তো আর মানুষ নয় যে বাড়তি হবে...'

কিন্তু ইয়াকভ এগিয়ে গেল বুড়ির সামনে তার নিজের প্রস্তাব নিয়ে:

'বাড়তি টাকাটা আমায় দিয়ে দাও,' বলল ইয়াকভ, 'ওটা দিয়ে আমি তাস খেলব।'

ঠাট্টা করছে ভেবে সবাই হেসে উঠল। কিন্তু সত্যি করেই ও পেড়াপীড়ি করতে লাগল।

'দাও দিদিমা, দিয়ে দাও! কী করবে তুমি টাকা দিয়ে? আজ বাদে কাল তো গোরের তলায় গিয়ে সেঁধোবে!'

সবাই ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিল। পরে ও অবাক হয়ে বলল আমার কাছে:

'কী সব অদ্ভুত লোক! অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে কেন আসা বাপু? বুড়ি তো নিজেই বলল, বাড়তি টাকাটার তার দরকার নেই। তিন তিনটে রুবল পেলে বেশ আরাম হত আমার।'

মনে হত যেন টাকাপয়সা চোখে দেখাতেও ওর দারুণ আনন্দ। কথা বলতে বলতে একটা তামার বা রুপোর পয়সা প্যান্টে ঘসে ঘসে চকচকে করে তুলত। তারপর ওর খাঁদা নাকের সামনে তুলে ধরে ওটার চাকচিক্য পরখ করে দেখত। কিন্তু তা বলে ও লোভী ছিল না।

একদিন ইয়াকভ আমাকে তাস খেলতে ডাকল। পেটাপিটি খেলা। আমি খেলতে জানতাম না।

'খেলতে জানিস না?' অবাক হয়ে বলল ইয়াকভ, 'সে কী কথা, আর তুই কিনা পড়তে জানিস! শিখিয়ে দিতে হবে তোকে। চলে আয়, মিছামিছি করে খেলব, চিনির ডেলা বাজি রেখে...'

আমার কাছ থেকে আধসের খানেক চিনি জিতে নিয়ে ইয়াকভ ভেঙ্গে ভেঙ্গে টপাটপ গালে ফেলে দিতে লাগল। যখন বুঝল যে খেলাটা আমি শিখে গেছি, তখন বলল:

'আয় এবার ঠিক ভাবে খেলি—পয়সা দিয়ে। আছে কিছু?'

'পাঁচ রুবল।'

'আমার কাছে আছে রুবল দুইয়ের মতো।'

স্বভাবতই ও আমার সব টাকাকড়ি জিতে নিল। শোধ তোলার জন্যে আমার শীতের কোটটা দান রাখলাম পাঁচ রুবলের বদলে। হেরে গেলাম। নতুন বুটজোড়া রাখলাম তিন রুবলের বদলে—আবার হেরে গেলাম। অতঃপর বিরক্ত হয়ে প্রায় চটে উঠেই বলল ইয়াকভ:

'তুই খেলোয়াড় নোস—বড্ডো মাথা গরম। এই নে তোর কোট আর বুট। চাই নে আমি ওগুলো। এই যে নে। আর এই নে তোর টাকা—চার রুবল। একটা কেটে নিলাম তোকে শেখাবার মজুরি হিসেবে। অবশ্য যদি কিছু মনে না করিস!'

মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

আমার কৃতজ্ঞতার জবাবে ও বলল, 'থুঃ থুঃ! খেলা হল খেলা—তার মানে মজা করা। কিন্তু তুই ধরে নিলি যেন এটা একটা লড়াই। লড়াইয়ের

সময়েও খবর্দার মাথা গরম করবি নি—ঠান্ডা মাথায় ঢিট করে দিবি! মাথা গরম করে লাভ কী? তোর বয়েস অল্প, নিজেকে শক্ত করে মুঠোর ভিতরে রাখতে হবে। একবার পারলি না, পাঁচবার পারলি না, হারলি সাতবার—থুঃ থুঃ! ফিরে যা। মাথা ঠান্ডা কর। তারপর ফের লাগ্! এমনি করেই খেলতে হয়!'

ক্রমেই ওকে আরো বেশি ভালো লাগতে শুরু করল আমার এবং মাঝে মাঝে আরো খারাপও। মাঝে মাঝে যখন কথা বলত মনে পড়ত আমার দিদিমার কথা। ওর ভিতরে এমন অনেক কিছু ছিল যা আমাকে আকর্ষণ করত। কিন্তু খুবই বিশ্রী লাগত আমার মানুষ সম্পর্কে ওর স্থূল ঔদাসীন্য। মনে হত যেন ওর সমস্ত জীবন-ধারার ভিতর দিয়ে অমন একটা উদাসীনতা গড়ে উঠেছে।

একদিন সূর্য ডোবে ডোবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর এক যাত্রী, পের্মের এক ব্যবসায়ী, মাতাল হয়ে স্টিমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। উন্মাদের মতো হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে লোকটা স্রোতের টানে স্টিমারের পিছনকার লাল সোনালী ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করে স্টিমারটাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। চাকার গা থেকে অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় রক্ত-রাঙ্গা ফেনা ছড়াল চারদিকে। ঐ টগবগে রক্তের ভিতরে একটা কালো দেহ হাবুডুবু খাচ্ছে। এতক্ষণে স্টিমারের পিছন ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। আর জলের ভিতর থেকে জেগে উঠছে মর্মান্তিক চিৎকার। যাত্রীরাও সব চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে, ঠেলাঠেলি করে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গলুইয়ের দিকে। ডুবন্ত মানুষটার বন্ধু, মাথাভরা টাক আর দাড়ির রং লাল, সেও মাতাল। দুহাতে ভিড় ঠেলে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল:

'পথ ছাড়! আমি ওর কাছে যাব!..'

ইতিমধ্যেই দুজন জাহাজী নেমে পড়েছে জলে। ডুবন্ত লোকটিকে লক্ষ্য করে ওরা সাঁতরে চলেছিল। নামিয়ে দেয়া হচ্ছিল লাইফ-বোট। জাহাজীদের চেঁচামেচি, মেয়েদের চিৎকার, সব ছাপিয়ে জেগে উঠল ইয়াকভের শান্ত কর্কশ স্বর:

'গায়ে কোট রয়েছে, ও ডুবেই যাবে। গায়ে লম্বা ঝুলের জামাকাপড় থাকলে লোক ডুবে মরতে বাধ্য। মেয়েদের দেখো, ওরা পুরুষের চাইতে আগে ডুবে যায় কেন? কারণ ওদের স্কার্ট। মেয়েমানুষ জলে পড়া মাত্র একেবারে

ওজনের বাটখারার মতো সোজা গিয়ে সেঁধবে তলায়। ঐ দেখো—ডুবে গেছে লোকটা। কী বলেছিলাম আমি?'

সত্যিসত্যিই ডুবে গেল লোকটা। ঘণ্টা দুই ধরে মিছেই ওরা খোঁজাখুঁজি করল দেহটার জন্যে। এতক্ষণে ওর বন্ধুর নেশা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। সান্ত্বনাহীন বিষাদে লোকটা রইল বসে পাছ-গলুইয়ের উপরে আর বিড় বিড় করে বলল:

'দেখো দেখি কী হল! কী করি এখন? ওর আপনার জনের কাছে গিয়ে কী যে কৈফিয়ত দেব? যদি ওর পরিজনের জন্যে না হত...'

পিছমোড়া করে হাত রেখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ ওকে সান্ত্বনা দিল:

'উপায় আর কী, সওদাগর! কী ভাবে যে কার মরণ হয় তা তো কেউ বলতে পারে না। একটা লোক হয়ত ব্যাঙের ছাতা খেল, আর বিষক্রিয়া হয়ে চলে গেল কবরের তলায়! অথচ হাজার হাজার মানুষ তো ব্যাঙের ছাতা খেয়ে সুস্থ সবল থাকে। কিন্তু মরল শুধু একটা লোক। আর ব্যাঙের ছাতাই বা কী?'

সওদাগরের সামনে পাথরের যাঁতার মতো অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ তার কথা বিলিয়ে চলল। সওদাগরের কান্না প্রথমটায় একটু নরম হল। চওড়া হাতের পাতা দিয়ে দাড়ির উপরে ঝরে পড়া চোখের জল মুছল সে। কিন্তু ইয়াকভের কথার অর্থ মাথায় ঢুকতে সে চিৎকার করে ককিয়ে উঠল:

'দূর হ শয়তান! কী চাস তুই? আমার কলজেটা মুচড়ে ছিঁড়ে নিতে? ভগবানের দোহাই, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে! নইলে যদি কিছু ঘটে যায় তো তার জন্যে আমি দায়ী নই!'

ধীরে ইয়াকভ চলে গেল। যেতে যেতে বলল:

'মানুষ সত্যিই অদ্ভুত! তাদের ভালো করতে যাও, কিছুতেই বুঝবে না...'

এক এক সময়ে মনে হত ইয়াকভ বুঝি খুব সাদাসিধে সরল গোছের লোক। কিন্তু অনেকবারই লক্ষ্য করে দেখেছি ওটা ওর ভান মাত্র। কোন কোন দেশে ও গিয়েছে, কী কী দেখেছে তা শোনার ভীষণ ইচ্ছে হত আমার। কিন্তু ও যা বলেছে তাতে বিশেষ সাধ মেটে নি আমার। মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে ভল্লুকের মতো কালো চোখ দুটো আধখানা বুজে

টেবা টেবা গালের উপরে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে ও টেনে টেনে বলত তার অতীতের স্মৃতি:

'সবখানে মানুষ, বুঝলে ভাই, পিঁপড়ের মতো কিলবিল করছে। এখানে মানুষ, ওখানে মানুষ—মানুষের পাল। বেশির ভাগই অবশ্য চাষী। শরৎকালের ঝরা পাতার মতো দুনিয়াময় ছড়িয়ে আছে। বুলগারীয়রা? হাঁ হাঁ, বুলগারীয়দের দেখেছি, দেখেছি গ্রীকদেরও। আর তারপর আছে সার্বীয়, রুমানীয় আর হরেক রকমের যাযাবর — সব জাতের! কেমন দেখতে? কেমন আবার? শহরে সব শহুরে মানুষ, আর গাঁয়ে গেঁয়ো লোক। আমাদের দেশে যেমন তেমনিই। একেবারে এক রকম। কেউ কেউ আবার কথাও বলে ঠিক আমাদেরই মতো। অবশ্য একেবারে এক রকমের নয়, যেমন ধর্ তাতার আর মর্দোভীয়রা। গ্রীকরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে না — যা কিছুই মনে আসুক না, হড়হড় করে বলবে। শুনতে ঠিক কথার মতোই শোনায়, কিন্তু কী বলছে তা বোঝার সাধ্যি হবে না। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে হাত নেড়ে। আমার সেই বুড়োটা ভাবত সে বুঝি গ্রীকদের কথাও বুঝবে — 'কারামারা' 'কালিমেরা' করে চালাত। দারুণ চালাক ছিল লোকটা! খেপিয়ে দিতেও পারত ওদেরকে!.. কী বলছিস? আবার জিজ্ঞেস করছিস ওরা দেখতে কেমন? বোকা! কেমন আবার হবে? হাঁ হাঁ, ওরা ঘোর রঙের তো বটেই। রুমানীয়রাও ঘোর রঙের, কিন্তু ওদের ধর্ম একই। বুলগারীয়রাও ঘোর রঙের, কিন্তু ওরা আমাদের মতোই প্রার্থনা করে। কিন্তু গ্রীকরা — ওরা হচ্ছে তুর্কীদের মতো...'

মনে হত ও আমাকে সবকিছু বলছে না, কী যেন চেপে চেপে যাচ্ছে।

সেই ছবির পত্রিকা থেকে জেনেছিলাম গ্রীসের রাজধানী হল এথেন্স্ — পুরাকালের এক অতি সুন্দরী নগরী। কিন্তু সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নেড়ে ইয়াকভ এথেন্স্'এর অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসল।

'ওরা তোকে মিথ্যে কথা বলেছে ভাই। এথেন্স্ বলে কোনো কিছু নেই। আছে আথোন। সেটা শহর নয়, একটা পর্বত। আর সেই পর্বতের উপরে আছে একটা মঠ। ব্যস্, আর কিছু না। ওটাকে বলা হয় আথোনের পবিত্র পর্বত। ওর ছবি আছে অনেক। বুড়ো সে ছবি বিক্রি করত। দানুবে নদীর পারে একটা শহর আছে, নাম তার বেলগরোদ — খানিকটা ইয়ারস্লাভ্ল বা নিজনি নভগরোদের মতো দেখতে। ওদের শহরগুলো সম্পর্কে বলার বেশি কিছু নেই বটে, কিন্তু গাঁগুলোর কথা আলাদা আর ওদের মেয়েমানুষগুলোও

— এমন মোহিনী যে কী বলব। একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে আমি তো প্রায় থেকেই যাব ঠিক করেছিলাম। আরে, কী যেন তার নাম?'

দ্রুত গালের উপরে হাত বুলিয়ে চলেছে ইয়াকভ। দাড়িগুলোয় ঘসা লেগে মৃদু শব্দ উঠছে। আর ওর গলার ভিতরের কোন এক গভীর থেকে যেন ভাঙা কাঁসির মতো একটা ঝনঝনে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

'দেখ দেখি, একেবারে ভুলে গেছি! অথচ ওতে আমাতে যে... যখন চলে এলাম তখন সে কেঁদে ফেলল, বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আমিও কেঁদে ফেললাম।'

তেমনি শান্ত ধীর নির্লজ্জ ভাবে আমাকে শেখাতে আরম্ভ করল কী করে মেয়েমানুষ পটাতে হয়।

পাছ-গলুইয়ের উপরে বসে রইলাম আমরা দুজনে। উষ্ণ জ্যোৎস্না রাত ভেসে ভেসে আসছে আমাদের দিকে। বাঁয়ে রুপোলি জলের শেষ প্রান্তে দেখা যায় আবছা তৃণভূমি, ডাইনে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বন্দী তারার মতো ঝিকমিকিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে হলদে আলো। সবকিছুই নড়ছে, সবকিছুই সজাগ, কম্পমান। এক শান্ত অথচ তীব্র জীবনের স্পন্দন উঠেছে সবকিছু ঘিরে। সেই সুমধুর ব্যথাভরা নীরবতার ভিতরে ওর রুক্ষ কণ্ঠের কথাগুলো ঝরে পড়ছে:

'এমন হল যে যখনই মেয়েটা জেগে উঠত, তখনই দুহাত বাড়িয়ে দিত...'

ইয়াকভের কাহিনী নির্লজ্জ, কিন্তু ঘৃণা জাগাত না, তার ভিতরে বড়াই থাকত না, থাকত না নিষ্ঠুরতার কথা। বর্ণনায় চাতুরী নেই, একটু যেন কেবল স্মৃতিচারণার বিষাদে ভরা। আকাশের বুকে চাঁদও তেমনি নির্লজ্জ-নগ্ন, তেমনি-ই অস্থির করে তুলে কেন জানি ব্যাকুলতা জাগায়। শুধু ভালো ভালো জিনিসের কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কথাটি — রাণী মার্গো আর সেই কয়েকছত্র কবিতা যার সত্য ভোলার নয়।

মধুরতা সে তো গানটিরই প্রয়োজন,
যা মধুর তার গানে প্রয়োজন নেই...

ঘনিয়ে আসা তন্দ্রার মতো আনমনা চিন্তার আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার ফায়ারম্যানকে অনুরোধ করি তার জীবনের কাহিনী শোনাতে, কী কী সে দেখেছে।

'তুই একটা আজব চিড়িয়া,' বলে ইয়াকভ, 'কী বলি তোকে বল্ তো? সবকিছু দেখেছি আমি। মঠ? হাঁ, মঠও দেখেছি। পানশালা, তাও দেখেছি।

ভদ্দরলোকদের জীবন, চাষীদের জীবন, সব দেখেছি। আমীর হয়েছি, ফকির হয়েছি, সব...'

যেন গভীর জলস্রোতের উপরের একটা নড়বড়ে সাঁকোর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এমনি ধীরে ধীরে ইয়াকভ বলে যেত তার অতীতের কথা।

'যেমন ধর: ঘোড়া চুরির অপরাধে তখন হাজতে বন্ধ হয়ে রয়েছি। মনে মনে ভাবছি নির্ঘাৎ এবার সাইবেরিয়ায় পাঠাবে। সেখানে ছিল একজন পুলিস অফিসার। ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার নতুন বাড়ির চুল্লী থেকে ধোঁয়া ছাড়ত বলে। তা আমি বললাম: আমি ঠিক করে দিতে পারি হুজুর! সে তেড়ে এল আমাকে। 'মুখ নাড়িস নি, চুপ করে থাক্! শহরের নাম-করা চুল্লীর মিস্ত্রিরা পারল না সারাতে!' কিন্তু আমি বললাম, 'গরুর রাখালও হুজুরের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়।' সাইবেরিয়া তো চোখের সামনে ঝুলছে, তাই সাহস করে বলেই বসলাম। বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখ। তোর মেরামতের পরে যদি আগের চাইতে বেশি ধোঁয়া ছাড়ে তবে পিটে ছাতু করে দেব কিন্তু!' তা দুদিনেই চুল্লীটা মেরামত হয়ে গেল। সে তো ভাবতেই পারে নি, — ঐ পুলিস অফিসারটি। আবার সে তেড়ে এল আমাকে, 'বেটা আলসে, বেটা গবেট! তুই এমন একটা কাজ-জানা মিস্ত্রি হয়ে কিনা ঘোড়া চুরি করতে গেছিস! কী কৈফিয়ত দিবি এর, বল্?' বললাম: 'নেহাৎ আহাম্মুকি হয়েছিল, হুজুর।' 'ঠিক কথা,' বলল পুলিস অফিসার, 'নিছক বেকুবি। কী ভীষণ পরিতাপের কথা! তোর জন্যে দুঃখ হয় আমার!' বুঝলি তো? একটা পুলিস অফিসার। এসব পেশায় এতটুকু নরম হবার জো নেই সে কিনা দুঃখ করল আমার জন্যে...'

'হুঁ, তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তারপর আবার কী, কিছুই না। তার শুধু করুণা হল আমার জন্যে, ব্যস্। আর কী চাস তুই বল?'

'কেন সে করুণা করবে তোমাকে? এমন পাথরের মতো শক্ত মানুষ তুমি।'

প্রসন্ন হাসি হেসে উঠল ইয়াকভ।

'একটা আজব চিড়িয়া বটে তুই — বলছিস পাথর? পাথরকেও সমীহ করতে হয়। পাথরও তার নিজের কাজ করে। পাথর দিয়েই লোকে রাস্তা বাঁধায়। সবকিছুকেই সম্মান করতে হয়। সমস্ত কিছুরই দরকার আছে। যেমন ধর বালি। বালি আবার কী? তবুও তার ভিতর থেকে ঘাস গজায়...'

ফায়ারম্যান যখন এই সমস্ত কথা বলত, তখন আমার কাছে বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে উঠত ওর নিশ্চয়ই আমার অজানা অনেক কিছু জানা আছে।

'বাবুর্চি সম্বন্ধে কী ধারণা তোমার?' জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে।

'কে ভালুক বাছা?' নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইয়াকভ, 'কী আর ধারণা? কিছুই না।'

কথাটা সত্যি। ইভান ইভানভিচ এমন নির্বিবাদী খাঁটি মানুষ যে ওকে নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ওর মধ্যে একটা ব্যাপার আমার ভারি মজার মনে হত। ফায়ারম্যানকে সে একদম দেখতে পারত না, সব সময়েই গালমন্দ করত, তবুও রোজই ওকে ডাকত চা খাবার সময়ে।

একদিন সে বলল ইয়াকভকে:

'আগের কালের মতো যদি আমাদের গোলাম রাখার চল থাকত এখনো, আর আমি যদি তোর মনিব হতাম তাহলে হপ্তার সাত দিনই তোর পিঠের খাল খিঁচে দিতাম। বুঝলি রে, ব্যাটা হাঘরে!'

'হপ্তায় সাত দিন, একটু বাড়াবাড়ি হল না?' গম্ভীর মুখে বলল ইয়াকভ।

দিনরাত গাল পাড়লেও বাবুর্চি কেন জানি খাওয়াতও ওকে। কিছু একটা খাবার ওর হাতে দিয়ে বলত:

'নে, রাক্ষস!'

ধীরে ধীরে খাবারটা চিবোতে চিবোতে ইয়াকভ বলত:

'তোমার দৌলতে প্রচুর তাকত্ জমাচ্ছি বটে, ধন্যবাদ, ইভান ইভানভিচ!'

'তাকত্ দিয়ে করবিটা কী রে ব্যাটা, কুঁড়ের বাদশা?'

'তার মানে? সামনে এখনো ঢের দিন পড়ে রয়েছে জীবনের...'

'বেঁচে থাকার তোর দরকারটা কী, ব্যাটা শয়তান!'

'শয়তানরাও তো বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার মধ্যে তুমি কি কোনো মজা পাও না? জীবনটা বড়োই মোহিনী, ইভান ইভানভিচ।'

'তুই একটা নির্বোধ!'

'কী বললে?'

'নি-র্বোধ!'

'দ্যাখো দিকি, এ আবার কী কথা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত ইয়াকভ।

'শোন কথা,' আমাকে লক্ষ্য করে বলল ভালুক বাছা, 'তুই আর আমি ঐ নচ্ছার উনুনটার পাশে ঘেমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আর ও কিনা শুধু বসে বসে শুয়োরের মতো চিবোচ্ছে!'

'যার যেমন কপাল,' ধীরেসন্স্থে চিবোতে চিবোতে জবাব দিত ইয়াকভ।

আমি জানতাম, উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে চুল্লী উস্কনো ঢের বেশি শক্ত কাজ, ঢের বেশি তাত লাগে ওতে। ইয়াকভের পাশে দাঁড়িয়ে দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না কেন ও বলে না যে ওর কাজটা ঢের বেশি শক্ত। ওর হাবভাব দেখে আমার আরো বেশি দৃঢ় ধারণা হল যে ওর নিশ্চয় একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞান আছে।

সবাই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত — ক্যাপ্টেন, মেকানিক, সারেঙ্গ, — যাদেরই ওর সংস্পর্শে আসতে হত সবাই। অবাক হয়ে যেতাম তবু কেন তারা ওকে তাড়িয়ে দেয় না। অন্যান্য ফায়ারম্যানরা অবশ্য একটু সদয় ছিল ওর উপরে। তবু তারাও ওর বকবকানি আর তাস খেলার জন্যে ওকে বিদ্রূপ করত। একদিন আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম:

'ইয়াকভ লোকটা কি ভালো?'

'ইয়াকভ? তোফা লোক। কখনো চটে না। ওকে নিয়ে যা খুশি তাই করা যায়। এমন কি ওর বুকে জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দাও না কেন, কিচ্ছু বলবে না...'

জ্বলন্ত চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে ওর সেই কঠোর পরিশ্রম, আর প্রচণ্ড ক্ষুধা সত্ত্বেও ঘুমোত খুবই কম। ওর সিফ্‌ট শেষ হতেই ঘাম-ঝরা নোংরা দেহেই ডেকের উপরে এসে হাজির হত। অনেক সময়ে জামাকাপড় পর্যন্ত বদলাত না। তারপর সারা রাত ধরে যাত্রীদের সঙ্গে বসে হয় গল্প করত নয়ত তাস খেলত।

আমার কাছে ও যেন একটা তালা-বন্ধ সিন্দুক। মনে হত কী যেন ওর ভিতরে লুকনো আছে যেটা আমার খুব দরকার। তাই সেটা খোলার জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে চাবি খুঁজে খুঁজে ফিরতাম।

'কী যে ছাই তুই চাইছিস কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, ভাই!' রোমশ ভ্রূর তলায় ডুবে যাওয়া দুটো চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত ইয়াকভ। 'দুনিয়া সম্পর্কে শুনতে চাস? গোটা দুনিয়াটাই আমি ঘুরে এসেছি, তা সত্যি। কিন্তু কী হয়েছে তাতে? সত্যি একটা আজব চিড়িয়া বটে তুই। আচ্ছা, তবে শোন, আমার এক দিনের একটা ঘটনা বলি তোকে।'

তারপর সে এই গল্পটা শোনাল। এক সময়ে কোনো এক প্রাদেশিক শহরে এক ক্ষয়রোগগ্রস্ত অল্পবয়সী জজ সাহেব আর তার জার্মান বৌ থাকত।

বৌটি স্বাস্থ্যবতী, নিঃসন্তান। সে প্রেমে পড়ল এক সওদাগরের সঙ্গে। সওদাগরের সুন্দরী স্ত্রীর তিনটি সন্তান। জার্মান মহিলাটি ওর প্রেমে পড়েছে বুঝতে পেরে সওদাগর ঠিক করল ওকে নিয়ে একটু মজা করবে। রাত্রে বাগানে দেখা করার জন্যে মহিলাটিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। আর দুজন বন্ধুকে রাখল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে।

'তারপর যা একখানা হল! ঘেমে নেয়ে পড়িমরি করে তো ছুটে এল জার্মান মহিলা। ও যে তারই জানিয়ে দিল সে কথা। কিন্তু সওদাগর বলল, 'আমি তোমাকে তো নিতে পারি না, কারণ আমি বিবাহিত। কিন্তু আমার দুজন বন্ধুকে এনেছি তোমার জন্যে — একজন অবিবাহিত, আর একজন বিপত্নীক।' মেয়েছেলেটি একবার চিৎকার করে উঠেই তাকে এমন জোরে এক ঘুসি মারল যে, বেঞ্চের উপর থেকে উল্টে পড়ে গেল সওদাগর। আর তারপর তার মুখে লাথি মারতে লাগল মনের সুখে। আমিই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম বাগানে। তখন আমি ছিলাম জজ সাহেবের খাস নোকর। বেড়ার একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম কান্ড-কারখানা। ঝোপের ভিতর থেকে ওর বন্ধুরা ছুটে বেরিয়ে এসে ওর চুল ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। তাই আমিও বেড়া টপকে তেড়ে গিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিলাম। আমি বললাম, 'এমন কাজ করা উচিত হয় নি মশায়রা! মহিলা সরল বিশ্বাসে এসেছেন ওঁর কাছে আর উনি কিনা তাঁকে এমনি করে অপমান করলেন?' আমি ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম তাকে। কিন্তু ওরা আমার মাথায় ইট ছুঁড়ে মারল। মহিলার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কী করবে না করবে বুঝে উঠতে না পেরে উঠোনময় পায়চারী করে ফিরতে লাগল। তারপর আমায় বলল, 'চলে যাব আমি জার্মানীতে। আমার নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাব, ইয়াকভ। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরেই আমি চলে যাব।' আমি বললাম, 'তা-ই ভালো! নিশ্চয়ই চলে যাওয়া উচিত আপনার!' সত্যিই জজ সাহেব মরে যেতেই সে চলে গেল। মেয়েছেলেটি ছিল খুবই ভদ্র আর বুদ্ধিমতী। জজ সাহেবও ছিলেন খুবই ভদ্দরলোক। তাঁর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুক...'

গল্পটার তাৎপর্য কিছু বুঝে উঠতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম, কোনো কথা বললাম না। অনুভব করলাম কেমন যেন একটা পরিচিত নিষ্ঠুরতা, অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা রয়েছে ওর ভিতরে। কিন্তু তাতে আর বলার কী আছে?

'ভালো লাগল গল্পটা?' জিজ্ঞেস করল ইয়াকভ।

অস্পষ্ট গলায় কী যেন বললাম বিড় বিড় করে। ও কিন্তু শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বলল:

'ওদের মতো লোক যারা ভালো খায়-দায়, আরামে থাকে, কোনো কোনো সময়ে তাদের খেয়াল জাগে কিছু একটা আমোদ-ফুর্তি করার। কিন্তু সেটা সব সময়ে ঠিকমতো হয়ে ওঠে না — জানে না কী করে করতে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ওরা খুব ওজনদার ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসায় করতে হলে মাথা লাগে। সব সময়ে মাথা খাটাতে খাটাতে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তাই একটু আমোদ-ফুর্তি খুঁজে বেড়ায়।'

জাহাজের গলুইয়ের মন্থনে নদীর বুকে জেগে উঠছে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মেঘ। শুনতে পাচ্ছি ধাবমান স্রোতের কল কল শব্দ। দেখতে পাচ্ছি নদীর কালো তীর-রেখা ধীরে পিছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। ডেকের উপর থেকে ভেসে আসছে ঘুমন্ত যাত্রীদের নাক ডাকার শব্দ। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা একটি লম্বা রোগা চেহারার মেয়েছেলে বেঞ্চ আর ঘুমন্ত দেহগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে চলেছে। তার ধূসর মাথাটা খোলা, আবরণহীন। ইয়াকভ আমার গা টিপে ফিস ফিস করে বলে উঠল:

'দেখ, মেয়েটার কষ্ট দেখ...'

আমার মনে হল যেন অন্যের ব্যথা-বেদনায় ও মনে মনে আনন্দ পায়।

সব সময়েই ইয়াকভ আমার সঙ্গে গল্প করত। আর আমিও পরম আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। ওর সমস্ত গল্পই মনে আছে আমার। কিন্তু কখনো ওর মুখে কোনো আনন্দের গল্প শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বইয়ের চাইতেও নির্বিকার ভাবে ও গল্প বলে যেত। বইয়ের ভিতরে প্রায়ই লেখকের অনুভূতির হদিস পেতাম — টের পেতাম লেখকের আনন্দ, ব্যথা, রাগ অথবা বিদ্রূপ। কিন্তু ফায়ারম্যান কখনো বিদ্রূপ করত না কিংবা কোনো রকম রায় দিত না। কোনো কিছুতেই ও তেমন খুশি হত না, দুঃখ পেত না। বলে যেত যেন সে একজন আদালতের নিস্পৃহ সাক্ষী। ওর কাছে আসামী, ফরিয়াদী, বা বিচারক সবই সমান। ওর এই উদাসীনতায় পীড়িত বোধ করতাম, বিরক্ত ধরে যেত, ওর ওপর বিরূপতা জেগে উঠত। মনে হত যেন ওর কাছে জীবন নেচে চলেছে বয়লারের তলার উনুনের লকলকে আগুনের শিখার মতো আর সে তার ভল্লুকের মতো থাবার ভিতরে মুগুরটা আঁকড়ে ধরে জ্বালানী বাড়ানো কমানোর হাতলটার উপরে আস্তে আস্তে ঘা মেরে চলেছে।

'কারো কাছ থেকে কখনো ঘা খেয়েছ তুমি?'

'আমাকে ঘা দিতে পারে এমন সাধ্য কার? যে কোনো লোককে ঘায়েল করার মতো গায়ের জোর আমার আছে!..'

'তা বলি নি। বলেছি ভিতরে ঘা দেয়ার কথা, অন্তরে।'

'কোনো মানুষেরই অন্তরে কেউ ঘা দিতে পারে না। মানুষের আত্মা কখনো আহত হয় না,' বলল ইয়াকভ। 'এমন কি কেউ ছুঁতেই পারবে না — কোনো কিছু দিয়েই না...'

ডেকের যাত্রীরা, জাহাজীরা এবং অন্য সবাই প্রায়ই বলত আত্মার কথা। যেমন করে ওরা বলে থাকে জমি, কাজ, রুটি বা মেয়েমানুষের কথা। আত্মা কথাটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কথার একটা মামুলী লব্জ। আনি-দুয়ানির মতোই তার ব্যাপক প্রচলন। দুঃখ লাগত যখন দেখতাম কোনো নোংরা কুৎসিত মুখ থেকে অশ্লীল গালাগালির সঙ্গে দ্রুত ঝরে পড়ছে এই কথাটা। যখনই কোনো চাষী কুৎসিত গাল পাড়তে শুরু করে ঠাট্টা করেই হোক, বা সত্যিসত্যিই করেই হোক আত্মাকে অভিসম্পাত করত তখন আমার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগত।

মনে পড়ত কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই না দিদিমা উচ্চারণ করতেন আত্মার কথা — আনন্দ, প্রেম আর সৌন্দর্যের এই রহস্যময় ভাণ্ডারের কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যখনই কোনো সৎ লোকের মৃত্যু হয় সাদা পোশাক পরা দেবদূতেরা তার আত্মা বয়ে নিয়ে যান নীল আকাশে, দিদিমার দয়ালু ভগবানের কাছে। তিনি পরম স্নেহে ডেকে নেন তাকে:

'আয় রে, আমার পরম স্নেহের ধন, আমার পবিত্র ধন, পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সয়েছিস না? অনেক ঘা খেয়ে এসেছিস?'

তারপর তিনি সেই আত্মাকে উপহার দেন দেবদূতের ছ'খানি সাদা পাখা। ইয়াকভ শুমভও আত্মার কথা বলত দিদিমারই মতো শ্রদ্ধার সঙ্গে, তেমনিই অনিচ্ছায়, কদাচিৎ-কদাচিৎ। যখন গালমন্দ করত তখনো আত্মাকে অভিসম্পাত করত না। অন্যকে করতে শুনলে তক্ষুণি সে চুপ করে যেত, নুয়ে পড়ত ষাঁড়ের মতো গর্দান। যখন জিজ্ঞেস করতাম ওকে আত্মা কী, ও বলত:

'আত্মা হচ্ছে চৈতন্য, ভগবানের নিঃশ্বাস...'

এতে আমার মন ভরত না। যখন আমি আরো সব প্রশ্ন তুলে জবাবের জন্যে ওকে পেড়াপীড়ি করতাম, ও তখন চোখ নিচু করে বলত:

'এমন কি পুরুতরাও আত্মা সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু জানেন না ভাই। অজানা এমন একটা কিছু আছে...'

আমি সব সময়েই ভাবতাম ওর কথা। সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে চেষ্টা করতাম ওকে, কিন্তু বৃথা। শুধু ইয়াকভকে ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়ত না। ওর ঐ বিরাট দেহখানায় বাকি সবকিছুই আড়ালে পড়ত।

স্টুয়ার্ডের বৌ খুব সন্দেহজনক ভাবে আমার উপরে নজর দিতে আরম্ভ করল। রোজ ভোরে আমাকে ওর হাতমুখ ধোয়ার জল ভরে দিয়ে আসতে হত। যদিও ন্যায়ত সেটা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই ছিমছাম হাসিখুশি ছোট পরিচারিকা লুশার কাজ। সেই অপরিসর কেবিনে ওর কোমর পর্যন্ত খোলা, পচা ময়দার তালের মতো থলথলে হলদে দেহটার পাশে দাঁড়ানো মাত্র আমার সমস্ত দেহ-মন ঘিন ঘিন করে উঠত। কিছুতেই আমি মনে মনে তার সঙ্গে রাণী মার্গোর সেই সুগঠিত ব্রোঞ্জের মতো দেহটির তুলনা না করে পারতাম না। স্টুয়ার্ডের বৌ এটা ওটা বক বক করে যেত। কখনো অভিযোগের সুরে, কখনো বা কপট রাগে।

সে যে কী বলতে চাইত তা আমার কাছে পরিষ্কার হত না। যদিও আমি আন্দাজ করতে পারতাম সে সব কথার মানে; সে অর্থ বিশ্রী, লজ্জাকর। তাতে কিন্তু এতটুকুও বিচলিত করতে পারত না আমাকে। মনের দিক থেকে স্টুয়ার্ডের বৌয়ের কাছ থেকে আমি ছিলাম বহু দূরে, জাহাজের উপরের যাবতীয় ঘটনা থেকে বহু দূরে। একটা বিরাট শেওলা-ধরা পাথর যেন আমার চারদিকের জগত থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছিল। দিনের পর দিন সেটা ভেসে চলেছে দূরে, বহু দূরে।

'স্টুয়ার্ড গিন্নী তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে,' যেন স্বপ্নের ঘোরেই শুনতাম লুশার পরিহাস-ভরা কথা। 'সুযোগ যখন পেয়েছ নাও না ফুর্তি লুটে...'

লুশাই যে শুধু ঠাট্টা করত তা নয়। খাবার ঘরের সমস্ত চাকর-বাকরই জেনে গিয়েছিল মেয়েছেলেটার নেকনজরের কথা। বাবুর্চি একটু মুখ টিপে মন্তব্য করল:

'ভদ্রমহিলা সবকিছুই চেখে দেখেছেন, এবার ইচ্ছে হয়েছে কিছু ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি পরখ করার। আরে ছ্যা! বুঝলি পেশকভ, চোখ দুটো খোলা রাখিস। নইলে বিপদে পড়ে যাবি!'

ইয়াকভও খানিকটা পিতৃসুলভ উপদেশ দিল:

'এ কথা ঠিক তোর বয়েস আর দুটো তিনটে বছর বেশি হলে আমি অন্য কথা বলতাম। কিন্তু তোর এই বয়সে — ওতে ফেঁসে না যাওয়াই ভালো। তবুও, তোর যা ভালো মনে হয় করিস...'

'আরে, ছেড়ে দাও ও কথা,' বললাম আমি, 'যত সব নোংরামি...'

'ঠিক কথা...'

কিন্তু একটু পরেই তার সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে ছোট ছোট গোল গোল কথার বীজ ছড়িয়ে চলল:

'ওর দিকটাও দেখতে হবে — কী আছে ওর একঘেয়ে শীতের দিন ছাড়া। কুকুরও একটু আদর চায় — আর ও তো মানুষ। ব্যাঙের ছাতা যেমন বৃষ্টির জল নইলে বাঁচে না, মেয়েমানুষও তেমনি আদর না পেলে বাঁচে না। দেখা যাচ্ছে এতে ওর লাজলজ্জার বালাই নেই। কিন্তু করবেই বা কী? গা-গতরের নাম কী? গতরের নাম খানকি...'

তার ঐ রহস্যভরা দুটো চোখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'ওর জন্যে দুঃখ হয় না তোমার?'

'আমার? ও তো আর আমার মা নয়, বটে কিনা বল্? তাছাড়া এমন লোকও আছে নিজেদের মায়ের জন্যেও যাদের দুঃখ হয় না। সত্যি তুই একটা আজব চিড়িয়া!'

সেই ভাঙ্গা কাঁসির সুরে একটু হেসে উঠল ইয়াকভ।

কোনো কোনো সময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত আমি যেন একটা নিঃশব্দ শূন্যের ভিতরে ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি এক অন্ধকার অতল গহ্বরে।

'সবাই বিয়ে করে ইয়াকভ। তুমি কেন বিয়ে করো না?'

'প্রয়োজনটা কী? ইচ্ছে করলেই মেয়েমানুষ জোটাতে পারি — ভগবানকে ধন্যবাদ, ওটা খুব সহজ ব্যাপার। বিয়ে করলে লোককে বাড়িতে বসে থাকতে হয় আর খাটতে হয় জমিতে। আমার যে জমি আছে তা ভালো নয়। আর নেইও বেশি। যেটুকুও ছিল আমার খুড়ো মশাই সেটুকু নিয়ে নিয়েছেন। আমার ভাই তো সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে খুড়োর সঙ্গে বিবাদ শুরু করে দিল। ভয় দেখাল আইন আদালতের। শেষটায় ডাণ্ডা হাঁকড়াল তাঁর মাথায়, রক্তারক্তি করল। ফলে, দেড় বছরের জন্যে তাকে জেল খেটে আসতে হল। আর একবার জেলে গেলে তারপর একটা রাস্তাই খোলা থাকে — ফের

জেলে ফিরে যাবার রাস্তা। ওর বৌটা ছিল ছোটোখাটো মোহিনী... কিন্তু বলার আর কী আছে! একবার যদি কেউ বিয়ে করল তো শুধু দাঁড়ে বসে লেজ নাড়ানো ছাড়া তার আর কিছুই করবার থাকে না। কিন্তু যে একবার সৈনিক হয়, নিজের জীবনটা তো আর তার নিজের হাতে থাকে না।'

'তুমি ভগবানের উপাসনা করো?'

'কী আজব চিড়িয়া তুই! নিশ্চয়ই করি...'

'কেমন করে?'

'নানান ভাবে।'

'কোন প্রার্থনাটা জানা আছে তোমার?'

'কোনো প্রার্থনাই আমি জানি না। আমি শুধু বলি: হে প্রভু যীশু, যারা বেঁচে আছে তাদের তুমি দয়া করো। আর যারা মরে গেছে তাদের শান্তি দাও। রোগের হাত থেকে আমার রক্ষা করো — এমনি আর দু-চারটে সব কথা...'

'আর কী কথা?'

'সে আমি জানি না। যা কিছুই বল্ না কেন, ঠিক গিয়ে পেঁছয় ভগবানের কাছে!'

আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল খুব কোমল, একটু কৌতূহলভরা। আমি যেন একটি চতুর কুকুর-শাবক, মজাদার সব খেলা দেখাতে ওস্তাদ। কোনো কোনো দিন একটা গোটা সন্ধ্যা ওর পাশে বসে কাটিয়ে দিতাম। ওর গা থেকে বেরত তেল, আগুন, আর রসুনের গন্ধ। রসুন খুব ভালোবাসত ইয়াকভ। আপেলের মতো কাঁচা কাঁচাই কামড়ে খেত। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠত:

'নে আলিয়শা, কিছু কবিতা শোনা!'

অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল আমার। তাছাড়া মোটা একটা নোট বইয়ে আমার পছন্দমতো কবিতাগুলো টুকে রেখেছিলাম। 'রুসলান ও ল্যুদমিলা' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম। আর ও স্তব্ধ হয়ে বসে বসে শুনত। তখন কিছুই দেখত না, কিছু বলত না, ওর সেই প্রবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসত। তারপর ধীরে ধীরে বলত:

'এক মোহিনী কাহিনী বটে। তুই নিজে নিজেই সবটা তৈরী করেছিস? কী বললি, পুশকিন? মুখিন-পুশকিন নামে এক ভদ্রলোক ছিল। একবার আমি দেখেছি তাকে...'

'সে এ নয়! বহুদিন আগেই এ খুন হয়েছে!'

'কেন?'

রাণী মার্গোর মুখে শোনা গল্পটা সংক্ষেপে বললাম। শেষ হতেই শান্ত গলায় ও বলে উঠল:

'মেয়েমানুষের জন্যে বহুলোক এমনি করে ধ্বংস হয়ে যায়...'

প্রায়ই ওকে আমি বইয়ে পড়া গল্প শোনাতাম। সব গল্প মিলিয়ে মিশিয়ে বুনে বুনে একটা লম্বা কাহিনী বানিয়ে তুলতাম তা যেমন উদ্দাম তেমনি সুন্দর। তাতে থাকত রঙীন ভাবাবেগ, উন্মাদ দুঃসাহসিকতা, মহান বীর, অবিশ্বাস্য সুখ-সম্পদ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, মৃত্যু, কতো মধুর কথা, কতো ঘৃণ্য কাজ। রোকাম্বোলের সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম ল্যা মলিয়া, হ্যানিবল আর কলোনের বীরত্ব। একাদশ লুইয়ের সঙ্গে গ্রাঁদের বাবার গুণপনা। কর্ণেত ওতলেতায়েভের আর চতুর্থ হেনরীর ভিতরে কোনো পার্থক্য থাকত না। ভাবাবেগের নির্দেশে বদলে দিতাম লোকের চরিত্র, ঘটনার করতাম পুনর্বিন্যাস। এমন এক জগত সৃষ্টি করে তুলতাম যেখানে দাদুর ভগবানের মতো আমার অধিকার একচ্ছত্র। মানুষকে নিয়ে দাদুর ভগবানও ঠিক এমনি যথেচ্ছ ভাবে খেলা করেন। জীবনের বাস্তব দিগদর্শনে বাধা সৃষ্টি না করে, জীবন্ত মানুষকে বোঝবার জন্যে আমার আগ্রহকে এতটুকুও না দমিয়ে বইয়ের জগতের ঐ কুহেলিকা আমাকে ঘিরে এমন এক স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করেছিল যাতে আমার জীবনের চারপাশের বিষাক্ত নোংরামি ও অসংখ্য সংক্রামক জীবাণুর হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পেয়েছিলাম।

বহু কিছু থেকেই বই আমাকে রক্ষা করেছিল। কেমন করে মানুষ প্রেম করে আর দুঃখ পায় তা জানা থাকায় বেশ্যালয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সব শস্তা লাম্পট্য দেখে তীব্র অশ্রদ্ধা জেগে উঠত আমার মনে। আর যারা এতে আনন্দ পেত তাদের প্রতি জাগিয়ে তুলত অপরিসীম ঘৃণা। রোকাম্বোল পড়ে শিখেছিলাম নিস্পৃহ বৈরাগ্যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রকে প্রতিরোধ করতে। দ্যুমা'র নায়কদের দেখে জেগে উঠেছিল কোনো এক মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার কামনা। হাসিখুশি ফুর্তিবাজ রাজা চতুর্থ হেনরী ছিল আমার আদর্শ চরিত্র। মনে হত তাঁর কথা ভেবেই বেরাঞ্জে লিখেছিলেন:

সরল মানুষ সবার নিমন্ত্রণে
পান-পাত্র তুলত নিজের মুখে।

রাজ্য জুড়ে সবাই যখন সুখী
রাজা কেন থাকবে নাকো সুখে?

উপন্যাসে চতুর্থ হেনরীকে আঁকা হত সকলের অতি প্রিয় হৃদয়বান মানুষ হিসেবে। তাঁর চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখে আমার সুদৃঢ় ধারণা হল ফরাসী দেশটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে চমৎকার দেশ, বীরের দেশ। সে-দেশের চাষীর পোশাক-পরা মানুষও রাজবেশ-পরা মানুষের মতোই মহৎ। আঁজে পিতো দে আরতাগ'নার মতোই বীর। হেনরী যখন মারা পড়ল তখন নিদারুণ শোকে আমি কাঁদতে লাগলাম। রেভাইলাকের উপরে ঘৃণায় দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছিল। ফায়ারম্যানের কাছে যখনই আমি গল্প বলতাম প্রায় সব সময়েই আমার গল্পের নায়ক হত হেনরী। আমার মনে হল ইয়াকভও যেন 'হেনরীক' আর ফ্রান্সকে পছন্দ করতে শুরু করছে।

'চমৎকার মানুষ ঐ রাজা হেনরীক। ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে মাছ ধরতেও যেতে পারিস, কি, যা খুশি তাই করতে পারিস,' বলত ইয়াকভ।

গল্প শুনে ইয়াকভ কখনো উল্লাস প্রকাশ করত না বা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে গল্পের মাঝপথে বাধা দিত না। শুনত নীরবে চুপ করে বসে, ভ্রূ দুটো কুঁচকে। মুখের ভাবের একটুকুও পরিবর্তন হত না: যেন প্রাচীন কালের একটা পাথর, সর্বাঙ্গে শেওলা ছাওয়া। কিন্তু কোনো কারণে যদি হঠাৎ আমি একটু থামতাম সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠত:

'শেষ হয়ে গেল!'

'না এখনো হয় নি।'

'তাহলে থামিস নি।'

একদিন আমরা ফরাসী দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছি, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল ইয়াকভ:

'ওদের জীবন খুব সুন্দর, ঠাণ্ডা।'

'তার মানে, কী বলতে চাও?'

'তুই আর আমি, আমরা বাস করি আগুনের মধ্যে—সব সময়েই কাজ করি। কিন্তু ওরা কী সুন্দর ঠাণ্ডা ভাবে জীবন কাটায়। কিছুই করতে হয় না! শুধু মদ খায় আর ঘুরে বেড়ায়। বেশ মোহিনী জীবন বটে!'

'ওরা কাজও করে।'

'কিন্তু তোর বলা গল্প শুনে তা তো মনে হয় না,' ন্যায্য মন্তব্য করল

ফায়ারম্যান। হঠাৎ ভোরের আলোর মতোই আমার মনে জেগে উঠল যতো বই পড়েছি তারা বেশির ভাগই লোকগুলো কেমন করে কাজ করে, অভিজাত বংশের নায়কেরা কার শ্রমে প্রতিপালিত হয় সে সম্পর্কে প্রায় নীরব।

'আচ্ছা, আমি একটু ঘুমিয়ে নি,' বলেই ইয়াকভ চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পরক্ষণেই পরম শান্তিতে নাক ডাকাতে শুরু করে দিল।

শরৎকালে কামা'র তীর যখন গাঢ় বাদামী, গাছে গাছে সোনালী রং আর সূর্যের তেরছা আলোর রেখা ম্লান তখন হঠাৎ ইয়াকভ জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগের সন্ধ্যায় আমায় বলল:

'পরশু তুই আর আমি পৌঁছব পের্মে, বুঝলি আলিয়শা। তারপর আমরা যাব স্নানের ঘরে। প্রাণভরে গরম জলে স্নান করব। সেখান থেকে সোজা চলে যাব কোনো একটা সরাইখানায় যেখানে গান বাজনা হয়। ভারি আরামের ব্যাপার হবে সেটা। হাত-অর্গান বাজানো দেখতে কী মজাই না লাগে আমার।'

কিন্তু সারাপুল'এ পৌঁছতেই মোটা সোটা নাদুসনুদুস মেয়ে-মুখো মাকুন্দ একটা লোক এসে উঠল জাহাজে। তার গায়ে লম্বা কোট আর মাথায় শেয়ালের কানওয়ালা টুপির ফলে লোকটাকে আরো বেশি মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা রান্নাঘরের পাশে একটা গরম কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়ল টেবিলে। তারপর চায়ের হুকুম করল। কোট টুপি না খুলেই লোকটা ফুটন্ত পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে দারুণ ভাবে ঘামতে আরম্ভ করল।

খুব মিহি গুঁড়ি গুঁড়ি শরতের মেঘ-ঝরা বৃষ্টি পড়ছিল। মনে হচ্ছিল লোকটা তার ডোরা-কাটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই সেই ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টির বেগ কমে আসবে, আর যতো বেশি ঘামবে ততোই বাড়বে।

একটু পরেই ইয়াকভ এসে বসল লোকটার পাশে। তারপর দুজনে মিলে একটা ক্যালেন্ডার খুলে ম্যাপ দেখতে শুরু করল। লোকটা আঙুলের ডগা দিয়ে কী যেন দেখাল ওকে। আর শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল ফায়ারম্যান:

'তাতে কী? আমার মতো লোকের পক্ষে ওতো সোজা। আরে থুঃ থুঃ...'

'বেশ,' ক্যালেন্ডারটা তার পায়ের কাছের খোলা ব্যাগটার ভিতরে পুরে ফেলতে ফেলতে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল যাত্রীটি। তারপর ওরা চা খেতে খেতে ধীরে ধীরে আলোচনা করতে লাগল।

ইয়াকভের কাজ শুরু হবার একটু আগে ওকে জিজ্ঞেস করলাম—লোকটা কে? জবাবে একটু হেসে বলল ইয়াকভ:

'বুনো বুনো দেখতে, তাই না? তার মানে ও হচ্ছে খোজা। সাইবেরিয়ার বহু দূর দেশ থেকে এসেছে। আজব চিড়িয়া! মনে হয় যেন প্ল্যান ভেঁজেই বেঁচে আছে...'

বলেই ঘোড়ার ক্ষুরের মতো কালো কালো শক্ত গোড়ালি দিয়ে ডেকের উপরে দুম্ দুম্ শব্দ তুলে আমার সামনে থেকে চলে গেল। খানিক দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁজরা চুলকতে চুলকতে বলল:

'ওর কাছে কাজ নিয়েছি। পের্মে পেঁছেই জাহাজ ছেড়ে চলে যাব। একেবারে শেষ বিদায়, বুঝলি আলিয়শা! সেখান থেকে যাব ট্রেনে। আবার নদী পথে, তারপর ঘোড়ায়—এমনি করে পাঁচ হপ্তা পরে পেঁছাব সেখানে। দেখ দেখি মানুষকে কতো দূর দূর দেশের কোণা-কাণ্ডিতে গিয়ে হাজির হতে হয়!'

'ওকে চেনো তুমি?' ইয়াকভের অপ্রত্যাশিত আচমকা সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কেমন করে চিনব? জীবনে কোনো দিন দেখি নি ওকে, ও যেখানে থাকে সেখানেও যাই নি কোনো দিন...'

পরদিন সকালে একটা খাটো চর্বি মাখা ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে, মাথায় বনাত-শূন্য একটা খড়ের টুপি—সেটা এককালে ছিল ভালুক বাছার সম্পত্তি—আর পায়ে ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো একজোড়া বুট পরে ইয়াকভ এসে হাজির হল। লোহার মতো শক্ত আঙ্গুলগুলো দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল:

'চলে আয় আমার সঙ্গে, কী বলিস? আমি যদি একবার ওকে বলি তবে লোকটা তোকেও সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে যাবে। কী, বলব? তোর কাজে আসে না এমন একটা জিনিস ওরা কেটে ফেলে দেবে। অবশ্য তার জন্যে কিছু টাকাকড়িও দেবে তোকে। যে দিন ওরা কাউকে খোজা করে সে দিন ওদের উৎসব হয়। এমন কি সে লোকটাকেও ওরা তার বদলে টাকাকড়ি দেয়...'

রেলিং-এর পাশে একটা বোচকা বগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে খোজাটা। নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে ইয়াকভের দিকে। ওর শরীরটা এমন ভারি আর ফ্যাকাশে যেন একটা জলে-ডোবা মরা মানুষ। দাঁতে দাঁত চেপে ওকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। ফায়ারম্যান আবার আমার হাতটা ওর শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

'থুঃ থুঃ ওর মুখে! যে যেমন পারে তেমনি করে ভগবানকে ডাকে—তোর তাতে কী এল গেল! আচ্ছা বিদায়! আশা করি তুই সুখী হবি!'

বিরাট ভল্লুকের মতো থপ থপ করতে করতে চলে গেল ইয়াকভ শুমভ। পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগে আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। দারুণ কষ্ট হল আমার ফায়ারম্যানের জন্যে, আবার রাগও হল খুব। মনে পড়ে, একটু ঈর্ষা, একটু ভয় মেশানো বিস্ময়ে মনে মনে ভাবলাম কেন সে অত দূর অজানা দেশে চলে গেল অমন করে?

সত্যি, কী ধরনের মানুষ ও — ঐ ইয়াকভ শুমভ?

১২

শরতের শেষের দিকে যখন জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, তখন এক আইকন-চিত্রশালায় নিলাম শিক্ষানবিশের কাজ। কিন্তু শিক্ষানবিশি শুরু করার দ্বিতীয় দিনে দোকানের মালিক—বেঁটেখাটো নরম সরম চেহারার একটি বৃদ্ধা, মদ খান প্রচুর, এসে বললেন:

'এখন দিন ছোট, রাত বড়ো, তাই সকালে উঠে তুমি দোকানে যাবে বেচাকেনায় সাহায্য করতে। আর রাত্রে এসে কাজ শিখবে!'

তারপর তিনি আমাকে দোকানের তরুণ বড়ো সাকরেদের জিম্মা করে দিলেন। লোকটার চেহারা মিষ্টি মিষ্টি। কনকনে শীতের ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুমন্ত ইলিংকা স্ট্রীট ধরে শহর পেরিয়ে পেঁছতাম 'নিচের' বাজারে। দোকান ঘরটা ছিল তেতলায়। এক সময়ে ওটা ছিল একটা গুদামঘর। ছোট, অন্ধকার। একটা মাত্র লোহার দরজা, আর লম্বালম্বি টিনের ছাদওয়ালা ঝুল-বারান্দার দিকে একটা ছোট জানালা। ঘরটা ছোট বড়ো নানান আকারের আইকন, আর আইকন-ফ্রেমে ঠাসা। কতগুলো সাদাসিধে, কতগুলো আবার ফুল পাতার নকশা-কাটা, চিত্র-বিচিত্র। আর আছে ধর্মগ্রন্থ—হলদে মলাটে বাঁধাই, প্রাচীন স্লাভ লিপিতে ছাপা। পাশের ঘরটা হচ্ছে আর একটা আইকন আর বইয়ের দোকান। দোকানের পরিচালক কালো-দাড়িওয়ালা এক ব্যবসায়ী। ভল্‌গা ছাড়িয়ে কেরঝেনেৎস নদী অঞ্চলে সুপরিচিত এক প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবাগীশের জ্ঞাতি। দোকানীর একটা রোগাপটকা ছেলে ছিল আমারই বয়সী। মুখখানা চিম্‌সে, বুড়োটে বুড়োটে, চোখ দুটো ইঁদুরের মতো কুৎকুতে।

দোকান খোলার পরে আমার কাজ ছিল কাছের সরাইখানায় গিয়ে গরম জল নিয়ে আসা। চা খেয়ে নিয়ে দোকান সাজাতাম, জিনিসপত্রের ধুলো ঝাড়তাম। সব গোছগাছ হয়ে গেলে পর দাঁড়াতাম বারান্দায় যাতে খদ্দেররা পাশের দোকানে না গিয়ে আসে আমাদের দোকানে।

'খদ্দেররা হচ্ছে বোকা,' বড়ো সাকরেদ বলত আমাকে, 'কোত্থেকে কিনবে সেটা আদৌ বড়ো কথা নয় তাদের কাছে, শস্তা হলেই হল। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তাও জানে না!'

ক্ষিপ্র হাতে আইকন-পটগুলো ধরে সশব্দে চাপড় মেরে ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে তার জ্ঞান জাহির করতে করতে আমাকে শিক্ষা দিত:

'এটা একটা চমৎকার কাজ—খুব শস্তা। লম্বা চওড়ায় তিন চার। এটা: ছয় আর সাত—যেমন দাম তেমনি জিনিস বটে... সাধুদের চিনিস তো? মনে রাখিস: এ হল ভনিফার্তি—মাতলামি সারান। শহিদ ভারভারা—ইনি হচ্ছেন দাঁতের ব্যথা আর অকাল মৃত্যুর সাধু-মা। ভাগ্যবান ভাসিলি—জ্বর আর বিকারের। কুমারী মাতাদের চিনিস? দেখ: ইনি হলেন দুঃখী মাতা। ইনি ত্রি-বাহু কুমারী। ইনি ক্রন্দিতা কুমারী; আমার-ব্যথা-হরণ কুমারী, কাজান, পোক্‌রভ, সেমিস্ত্রেলনায়া...'

শিল্পকর্ম ও আকারের অনুপাতে বিভিন্ন আইকনের বিভিন্ন দাম আমার মুখস্থ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। কুমারী মাতাদের বিভিন্ন মূর্তিও চিনে ফেললাম। কিন্তু কোন্ সাধু কী উপকার করেন সেটা কিছুতেই আমার মনে থাকত না।

যখনই দেখত দোকানের দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছি তখনই বড়ো সাকরেদ আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিত:

'বল্ দেখি কে সন্তান জন্মের ব্যথা উপশম করান?'

যদি ভুল হত তবে অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে বলত:

'তোর মাথাটা আছে কিসের জন্যে বল্ দেখি?'

কিন্তু খদ্দেরদের মাল গছানো ব্যাপারটা ছিল আরো কঠিন কাজ। আইকনের উপরের কুৎসিত মুখগুলো ভারি বিশ্রী লাগত আমার আর কী করে ওগুলো বিক্রি করতে হয় বুঝে পেতাম না। দিদিমার গল্পের ভিতর দিয়ে ধারণা হয়েছিল মেরীমা হচ্ছেন সুন্দরী, যুবতী, আর খুবই দয়ালু। মাসিক পত্রিকার ভিতরেও এমনি ছবিই দেখেছি। কিন্তু আইকনে তাঁর চেহারা হল বৃদ্ধা, কুটিলা। নাকটা লম্বা বাঁকা, হাত দুটো কাঠের মতো।

হাটের দিনে বুধবার আর শুক্রবার বেচাকেনা হত খুব ভালো। ক্রমাগতই চাষী আর বুড়ি মেয়েছেলেরা ওঠানামা করত আমাদের সিঁড়ি দিয়ে। কখনো কখনো আসত গোটা এক একটা পরিবার। ওরা সবাই সনাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী—গোমড়া মুখ, ভলগার ওপারের বনাঞ্চলের সেয়ানা লোক সব। দেখতাম থপথপে মোটা বিশ্রী বিরক্তিকর কোনো লোক—গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোর্তা, পরনে হাতে তৈরী মোটা পোশাক, ধীরে বারান্দা দিয়ে যেন ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। এজাতের লোকেদের ডাকাডাকি করতে আমার ভারি লজ্জা লাগত, বিব্রত বোধ করতাম। অনেক আয়াসে সে ভাব চেপে দাঁড়াতাম তার পথ আটকে। তারপর মশার মতো ভন ভন করতে শুরু করতাম তার বিরাট বুটপরা পায়ের আশেপাশে:

'কী চাই বড়ো কর্তা? নিত্যকর্মপদ্ধতি, প্রার্থনার বই, সটীক পুসালতির। ইয়েফ্রেম সিরিন আর কিরিলের বই। একবার এসে দেখুনই না! আইকন চাই? রকম রকম দামের আছে। চমৎকার কাজ, ঘোর-রঙের যে কোনো সাধু বা কুমারী মাতার আইকন চান আমরা অর্ডার নিয়ে এঁকে দেব। আপনি কোনো কুলগুরু সাধু বা পারিবারিক সাধুর আইকন আঁকাবেন কি? সমস্ত রাশিয়ার মধ্যে আমাদের দোকানটাই সেরা। শহরের সবচাইতে ভালো দোকান!'

অনমনীয় খদ্দের নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত আমার মুখের দিকে, যেন আমি একটা কুকুর। তারপর হঠাৎ শক্ত হাতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে পাশের দোকানে গিয়ে ঢুকত। আর আমার বড়ো সাকরেদ তার বড়ো বড়ো কান দুটো চুলকতে চুলকতে ক্রুদ্ধকণ্ঠে খিচ্ খিচ্ করে উঠত:

'দিলি তো ছেড়ে? তোফা দোকানদারি বটে তোকে দিয়ে!'

ওদিকে পাশের দোকান থেকে জেগে উঠত নরম সুরের মধুর কথা:

'বুঝলেন মশাই, ভেড়ার চামড়ার ব্যবসা নয় এটা। চামড়ার জুতোর দোকানও নয়। আমাদের ব্যবসা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিলি, সোনা রুপোর চাইতেও তার দাম ঢের বেশি, সংসারের যে কোনো মূল্যের চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান...'

'ধুত্তোরি সব!' প্রশংসাভরা ঈর্ষাকাতর কণ্ঠে বলে উঠত বড়ো সাকরেদ, 'কান দিয়ে শোন্ কেমন করে চাষাটার কানে তেল দিচ্ছে। শেখ্ ওর কাছ থেকে!'

মনপ্রাণ দিয়ে আমি চেষ্টা করতাম শিখতে। বিশ্বাস ছিল কাজটা নিয়েইছি, তখন নিশ্চয়ই আমার ভালো করে করা উচিত। কিন্তু খদ্দেরদের ভুলিয়ে

ভালিয়ে জিনিস গছানোর ব্যাপারে দেখা গেল আমার বুদ্ধিটা নিতান্তই কম। মুখচোরা গোমড়ামুখো চাষী আর ভ্যাবাচাকা খাওয়া ইঁদুরের মতো দেখতে বুড়িগুলোকে দেখে আমার কেবলি দুঃখ হত। ইচ্ছে হত ওদের কানে কানে বলে দিই আইকনের ন্যায্য দামটা কতো, যাতে ওদের পকেট থেকে বিশ কোপেক বেশি খসে না যায়। ওদের দেখে আমার এত গরিব, এতো ক্ষুধার্ত মনে হত যে ওরা সাড়ে তিন রুবল দিয়ে ঐ নিতান্ত বাজারচলতি প্সালতির কিনত দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

বই সম্পর্কে ওদের জ্ঞান আর আইকনের কারুকার্য সম্পর্কে ওদের তারিফ দেখে অবাক হয়ে যেতাম। একদিন পাকাচুল এক বুড়োকে আমাদের দোকানে আসার জন্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতেই বুড়ো বলল:

'তোমাদের দোকানটাই রাশিয়ার ভিতরে সেরা দোকান এ কথাটা তুমি সত্যি বলছ না খোকা। রগোজিন কারখানাটা হল সবচাইতে সেরা!'

লজ্জায় অপমানে একপাশে সরে দাঁড়াতেই বুড়ো পাশের দোকানেও না ঢুকে সোজা ধীর পায়ে চলে গেল।

'কী, থোঁতা মুখ ভোঁতা!' ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল বড়ো সাকরেদ।

'কিন্তু রগোজিন কারখানার কথা তো কোনো দিন আপনি বলেন নি আমাকে!'

বড়ো সাকরেদ গাল পাড়তে শুরু করল:

'শালা সবজান্তা, দেখতে নিরীহ হলে হবে কি, পিছলে পিছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ। বক্তৃতা ঝাড়ছে, সাপের জাত...'

চাষীদের প্রতি এই ফিটফাট হৃষ্টপুষ্ট দাম্ভিক লোকটার দারুণ বিতৃষ্ণা। একদিন আমাকে বলল:

'আমি বুদ্ধিমান লোক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসি। সুন্দর গন্ধ — সুগন্ধি জল, ধূপ-ধুনো ইত্যাদি পছন্দ করি ভেবে দেখ্, আমার মতো রুচি-সম্পন্ন একটা লোককে কিনা চাষাভুষোর কাছে মাথা নুইয়ে 'আজ্ঞে মশাই' করতে হচ্ছে, কেননা মালিক পাঁচ কোপেক পাবে। একেবারে সইতে পারি না। চাষাগুলো কী? নোংরা দুর্গন্ধ। দুনিয়ার বুকে উকুনের মতো থুক থুক করে বেড়াচ্ছে! আর আমি...'

নিদারুণ বিরক্তিতে চুপ করে গিয়েছিল সে।

চাষীদের আমার খুব ভালো লাগত। ওদের প্রত্যেকের ভিতরে কেমন যেন একটা রহস্যের আভাস পেতাম, যেমন পেতাম ইয়াকভের ভিতরে।

হয়ত দেখা গেল আনাড়ীর মতো একটি লোক ভেড়ার চামড়ার কোর্তার উপরে আলখাল্লা চাপিয়ে এসেছে দোকানে। ছেঁড়াখোঁড়া পশমের টুপিটা খুলে ফেলে দু-আঙুলে ক্রুশ করে কোণের দিকে আইকনের সামনে যেখানে মিট মিট করে আলো জ্বলছে সে দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। যে আইকনগুলো শুদ্ধ করে নেওয়া হয় নি তার দৃষ্টি এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। অবশেষে নির্বাক দৃষ্টিতে বড়ো সাকরেদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল:

'সটীক প্সাল্তির দেখি একখানা!'

আলখাল্লার হাতা গুটিয়ে বইটার নামের অক্ষরগুলো পড়বার জন্যে হিমসিম খেল বহুক্ষণ। আর সরবে মেটে-রঙ্গের ফাটা-ফাটা ঠোঁট দুটো নেড়ে চলল।

'এর চাইতেও পুরনো কোনো বই আছে?'

'আরো পুরনো দিনের পুঁথি হলে দাম পড়বে হাজার টাকা, তা জানেন?..'

'জানি।'

আঙুলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে চাষীটি পাতা ওল্টাল। বইটার ধারে লাগল ওর আঙুলের কালো ছাপ, ওর মাথার উপর দিয়ে তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল বড়ো সাকরেদ:

'সব পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বয়সই একই। প্রভু তাঁর বাণীর কখনো বদল ঘটান না।'

'তা জানি। প্রভু তাঁর বাণীর বদল ঘটান না, কিন্তু নিকন করেছিল।'

তারপর বইটা বন্ধ করে রেখে খদ্দেরটি নিঃশব্দে দোকান ছেড়ে চলে গেল।

মাঝে মাঝে এই সব বন-গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে তর্ক বেঁধে যেত বড়ো সাকরেদের। দেখতাম পবিত্র-ধর্ম-সংক্রান্ত লেখার বিষয় ওরা বড়ো সাকরেদের চেয়ে ঢের বেশি জানে।

'জলার ভূত যতো,' বিড় বিড় করে বলত বড়ো সাকরেদ।

দেখতাম, আধুনিক বই চাষীরা তেমন পছন্দ করে না, তবুও তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এতো ভয়ে ভয়ে, এতো সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করত যে মনে হত বুঝিবা ভয় হচ্ছে যে এক্ষুণি পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে চলে যাবে ওদের হাত থেকে। এতে আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে

উঠত। কারণ বই আমার কাছে এক অপূর্ব বস্তু, যার ভিতরে লেখকের মন, প্রাণ, আত্মা রয়েছে বন্দী হয়ে। যখনই আমি কোনো বই পড়তাম ঐ আত্মাকে মুক্ত করে নিতাম। আর সেই আত্মা এক রহস্যময় সঙ্গ দিত আমাকে।

প্রায়ই ঐ সব বুড়ো-বুড়িরা ধর্ম-সংস্কারক নিকনেরও বহু আগের লেখা বইপত্র বিক্রি করতে আনত আমাদের কাছে। নয়ত আনত ইরগিজ বা কেরঝেনেৎসের সন্ন্যাসীদের চমৎকার সুন্দর করে লেখা এসব বইয়ের অনুলিপি। আনত সাধু-জীবনী — যেগুলো দিমিত্রি রস্তোভ্‌স্কির দ্বারা সংশোধিত হয় নি। আর আনত বহু পুরনো দিনের আইকন, ক্রুশ, এনামেল-করা পিতলের তিন-পলা আইকন, সমুদ্র-পথের দূরে দেশ থেকে আনা ধাতুর জিনিসপত্র। মস্কোর রাজা-মহারাজারা খুশি হয়ে পানশালার মালিকদের যে সব রুপোলী হাতা উপহার দিয়েছিল, সেই সব। চারদিকে চোরের মতো তাকাতে তাকাতে ঐসব জিনিস ওরা গোপনে বেচতে আসত।

আমার বড়ো সাকরেদ আর পাশের দোকানী দুজনেই তীক্ষ্ণ নজর রাখত ঐসব পণ্যের দিকে। কেনার ব্যাপারে চতুরতায় দুজনেই দুজনকে ছাড়িয়ে যেতে চাইত। পয়সাওয়ালা ধনী সনাতনপন্থীদের কাছে যে সব প্রাচীন সম্পদ ওরা বেচত একশ' রুবলে, তা কেনার জন্যে দশ রুবলের বেশি ব্যয় করত না।

'ঐসব বুড়ি ডাইনী আর ভূতগুলোর উপরে কড়া নজর রাখিস,' বড়ো সাকরেদ তালিম দিত আমাকে, 'ওদের ঐ বাণ্ডিলের ভিতরে শাঁসাল মাল থাকে।'

এরকমের কোনো ভালো জিনিস এলেই, বড়ো সাকরেদ আমাকে পাঠিয়ে দিত শাস্ত্রবাগীশ পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কাছে। পুরানো বই আইকন ইত্যাদি সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান।

লম্বা চেহারার বুড়ো মানুষ। বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ, হাসিখুশি মুখ। আর ভাগ্যবান ভাসিলির মতোই লম্বা দাড়ি। একটা পায়ের আঙুলগুলো কাটা পড়ায় চলত লাঠি ভর দিয়ে। কি শীত কি গ্রীষ্ম পুরুতদের মতো একটা হাল্‌কা আলখাল্লা পরত। আর মাথায় হাঁড়ির মতো দেখতে একটা মখমলের টুপি। সাধারণত হাঁটত সোজা হয়ে বুক টান করে, কিন্তু যে-মুহূর্তে দোকানে ঢুকত কেমন যেন ইচ্ছে করেই একটু কুঁজো হয়ে পড়ত। ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ত, তারপর সনাতন-ধর্মাবলম্বীদের মতো দু'আঙুলে

ক্রুশ করে স্তোত্র আর প্রার্থনা আওড়াত। বার্ধক্য ও ভগবদ্‌ভক্তির এই ঠাট দেখে ঐ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের বিক্রেতাদের মনে জেগে উঠত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব।

বুড়ো জিজ্ঞেস করত, 'তারপর পার্থিব কোন ব্যাপারে ডেকেছ হে?'

'এই লোকটি একটা আইকন নিয়ে এসেছে — বলছে যে এটা স্ত্রোগানভ।'

'কী বলছে?'

'স্ত্রোগানভ আইকন।'

'আমি একটু কানে কম শুনি। নিকনের চেলাদের প্রচার-করা কুকথা শোনার হাত থেকে প্রভু আমার কান দুটোকে বাঁচিয়েছেন।'

টুপি খুলে আইকনটা সমান করে পটের উপরটা ভালো করে পরীক্ষা করত বুড়ো। দেখত ধারগুলো আর কাঠের খিল। তারপর চোখ কুঁচকে বিড় বিড় করে বলত:

'নাস্তিক নিকনের চেলারা সেকালের কাজগুলো সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখে, শয়তানের কাছ থেকে জাল করা শিখেছে খুব, কী রকম পাকা হাতে পবিত্র-মূর্তি সব নকল করছে আজকাল — দক্ষতা আছে বটে! প্রথম দেখে মনে হবে সত্যিই যেন খাঁটি স্ত্রোগানভ বা উস্তুজ। সুজ্‌দাল হলেও হতে পারে। কিন্তু ভেতরের চোখ থাকলে তক্ষুণি বলে দেবে ওটা নকল!'

ও যখন একবার 'নকল' বললে বুঝতে হবে আইকনটা দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান। কতোগুলো আগে থেকে বলে রাখা শব্দ আছে যা থেকে বড়ো সাকরেদ বুঝতে পারে কতো দাম বলতে হবে। কথাগুলো জানতাম আমি। 'দুঃখ আর বিষন্নতা' মানে দশ রুবল। আর 'নিকন-বাঘ' মানে পঁচিশ রুবল। কী ভাবে যে ওরা বিক্রেতাদের ঠকাত তা দেখে সত্যিই লজ্জা হত। কিন্তু বুড়োর সেই চাতুরীতে আমিও আকৃষ্ট হতাম।

'নিকন-পন্থীরা হচ্ছে নিকন-বাঘের কালো বাচ্চা, খোদ শয়তানের কাছ থেকে ওদের এই ধরনের সব কাজের শিক্ষা। যেমন এই দেখো, ভাবছ যে ভিতটা খাঁটি। আর গোটা কাপড়টা একই হাতের আঁকা। কিন্তু মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখো — ভিন্ন হাতের তুলি দিয়ে মুখটা আঁকা! সেকালের সিমন উশাকভের মতো ওস্তাদ কারিগররা, হোক না কেন সে নিজে ধর্মত্যাগী, গোটা ছবিটাই আঁকত নিজের হাতে — কাপড়চোপড়, মুখ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত — সব। কিন্তু আজকের, আমাদের একালের হতভাগাদের সে যোগ্যতা

নেই। আইকন-আঁকা সেকালে ছিল একটা ঈশ্বর দত্ত ব্যাপার, কিন্তু আজকাল ওটা হয়ে উঠেছে একটা কৌশল মাত্র, বুঝলে হে ঈশ্বরপুত্রেরা!'

অবশেষে আইকনটা কাউণ্টারের উপরে রেখে দিয়ে টুপিটা পরতে পরতে বলত:

'পাপ, পাপ ওদের আত্মায়!'

তার মানে, চালাও — কিনে ফেল্‌!

শাস্ত্রবাগীশের বক্তৃতার তোড়ে আর ওর জ্ঞানের বহর দেখে ভয় পেয়ে বিক্রেতা শ্রদ্ধাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করত:

'তা হলে আইকনটা সম্পর্কে কী বলেন, আজ্ঞে?'

'আইকনটা হচ্ছে নিকন-পন্থীদের তৈরী।'

'কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমাদের ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা, তাঁরা এই আইকনের সামনে বসে প্রার্থনা করে গেছেন।'

'তোমার ঠাকুর্দার বাবার জন্মের আগেই যে নিকন জন্মেছিল হে।'

বুড়ো তখন আইকনটা লোকটার মুখের সামনে তুলে ধরে গম্ভীর ভাবে বলতে আরম্ভ করত:

'কী রকম হাসিখুশি ভঙ্গীটা দেখো, একে কি আইকন বলতে চাও? নিছক একটা ছবি। অন্ধ শিল্পকর্ম। নিকন-পন্থীদের এক খামখেয়ালী উৎকল্পনা, এর ভিতরে প্রাণ নেই! কেন আমি মিথ্যে কথা বলতে যাব? আমি বুড়ো মানুষ, ঢের অত্যাচার সহ্য করেছি ধর্মবিশ্বাসের জন্যে। শীগ্‌গিরই আমি আমার ঈশ্বরের সঙ্গে মিলতে যাচ্ছি। আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে কী লাভ হবে আমার?'

বলতে বলতে বুড়ো দোকান ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসত। দেখাত যেন বার্ধক্যের ভারে ক্ষীণ, তার মতামত সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশে আহত অন্তর। আইকনটার দরুন বড়ো সাকরেদ কয়েকটা টাকা ধরে দিত। তারপর পিওতর ভাসিলিয়েভিচ্‌কে আভূমি নমস্কার করে বেরিয়ে যেত বিক্রেতা। আমাকে তখন যেতে হত সরাইখানায় গরম জলের জন্যে। ফিরে এসে দেখতাম বুড়ো আবার তেমনি উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঝলমল করে উঠেছে। মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কেনা আইকনটার দিকে আর বড়ো সাকরেদকে বলছে:

'দেখ দেখ, কী চমৎকার সহজ ভাবে আঁকা — প্রতি রেখায় রেখায় ভগবৎভীতির চিহ্ন। মরজগতের মরমানুষের কিছুই এতে নেই...'

'কার হাতের আঁকা এটা?' প্রবল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে চকচকে চোখে জিজ্ঞেস করত বড়ো সাকরেদ।

'এতো তাড়াতাড়ি কি আর জানতে পারা যায় সেটা!'

'জহুরী লোক হলে কতো দাম দিতে পারে এটার জন্যে?'

'জানি না। দেখিয়ে নেওয়া যাক...'

'আঃ পিওতর ভাসিলিয়েভিচ...'

'আমি যদি বিক্রি করি তবে তুমি পাবে পঞ্চাশ রুবল। তার উপরে যা হবে সেটা আমার!'

'আজ্ঞে!..'

'ওসব আজ্ঞে টাজ্ঞে চলবে না...'

চা খেতে খেতে নির্লজ্জের মতো ওরা দর-কষাকষি শুরু করে দিত। দুজন দুজনকে চোরের মতো আড়চোখে চেয়ে দেখত। স্পষ্টই দেখা যেত বড়ো সাকরেদ পুরোপুরিই বুড়োর দয়ার উপরে নির্ভরশীল। বুড়ো চলে যেতেই ও আমাকে বলত:

'দেখিস, মালিক ঠাকরুণ যেন এই কেনা-বেচার কথা কিছু না জানতে পায়!'

আইকনটা বিক্রির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বড়ো সাকরেদ বলত:

'তারপর শহরের নতুন খবর কী, পিওতর ভাসিলিয়েভিচ?'

হলদে হাতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে তেলতেলে ঠোঁট বের করে বুড়ো গল্প করে যেত ধনী-ব্যবসায়ীদের জীবন নিয়ে, ব্যবসায়ে কার কি রকম লাভ হল, কার কী রোগ, কার বিয়ে হল, কোথায় পানোৎসব হয়েছে, কোন স্বামী কোন স্ত্রী কাকে প্রতারণা করছে তার কথা। ঐ সব দামী দামী গল্প যেন নিপুণ হাতে তপ্ত-তাওয়া থেকে ঢেলে তাতে তার হিসহিসে হাসির মিষ্টি রসের ফোড়ন দিয়ে পরিবেশন করত বুড়ো ঠিক নিপুণ রাঁধুনীর মতো। বড়ো সাকরেদের গোল গোল মুখখানা ঈর্ষাভরা আনন্দে চক চক করে উঠত আর চোখ দুটো জড়িয়ে আসত এক স্বপ্নময়তায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলত:

'কেউ কেউ কী সুখেই না জীবন কাটায়, আর আমি...'

'যার যেমন অদৃষ্ট,' গম গম করে উঠত বুড়োর কণ্ঠস্বর, 'কাউকে গড়েছে দেবদূত ছোট রুপোর হাতুড়ি দিয়ে আর কাউকে গড়েছে শয়তান, কুড়ুলের উল্টোপিঠ দিয়ে...'

শক্ত পেশীবহুল চেহারার বুড়োটা ছিল সবজান্তা — গোটা শহরের সবকিছু তার নখদর্পণে। ব্যবসায়ী, কেরাণী, পুরুত, কারিগর — সবার গোপন রহস্য। ঈগলের মতো তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি। নেকড়ে আর খেঁকশিয়ালের মতো কিছু একটা আছে ওর ভিতরে। আমি সব সময়েই চেষ্টা করতাম ওকে খোঁচা দিয়ে কথা বলতে, কিন্তু ওর তাকানোর ধরনের সামনে আমি সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন হয়ে পড়তাম। যেন কোন এক আবছা সুদূর থেকে সে তাকাত আমার দিকে। মনে হত যেন ওর চারপাশে ঘিরে রয়েছে এক অতল গহ্বর। যে কেউই সাহস করে এগুতে যাবে ওর দিকে তাকেই ঐ অতল গহ্বর গ্রাস করে ফেলবে। অনুভব করতাম, এই বুড়ো আর ফায়ারম্যান ইয়াকভ শুমভের ভিতরে কোথায় যেন খানিকটা মিল রয়েছে।

বুড়োর বুদ্ধি আর চতুরতায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল বড়ো সাকরেদ। একথা তার সামনে পিছনে সব সময়েই স্বীকার করত সে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সেও চাইত ওকে রাগিয়ে দিতে, আঘাত করতে।

বুড়োর মুখের দিকে বেপরোয়া ভাবে তাকিয়ে একদিন সে বলল, 'মানুষের চোখে তুমি কী ধুলোই না দাও!'

'ঈশ্বরই শুধু মানুষকে ঠকান না,' আলস্য জড়িত কণ্ঠে মুচকি হেসে বলল বুড়ো, 'বাকি আমরাও সবাই বোকা ঠকিয়েই বেঁচে থাকি। বোকাকে যদি বোকাই না বানাবে তবে তাকে দিয়ে হবেটা কী?'

রেগে উঠল বড়ো সাকরেদ:

'সব চাষীরাই কিছু আর বোকা নয়। চাষীদের ভিতর থেকেই তো ব্যবসায়ীরা আসে।'

'যারা ব্যবসায়ী হতে পেরেছে তাদের কথা তো হচ্ছে না। বেকুবরা কখনো জোচ্চোর হতে পারে না। ওরা হচ্ছে সাধু, শুধু মগজ নেই...'

টেনে টেনে মোক্ষম মোক্ষম কথা বলে চলেছে বুড়ো, দেখে বিরক্তি ধরে যায়। ও যেন একক একটি লোক চতুর্দিকে জলাভূমির মাঝখানে একটা মাটির ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে। ওকে রাগিয়ে দেওয়া অসম্ভব। হয় রাগ শরীরে ঢুকতেই পারে না নয় তা চেপে রাখতে জানে।

কিন্তু প্রায়ই বুড়ো নিজে এসে লাগত আমার পেছনে। মুখটা আমার মুখের কাছে এনে দাড়ির আড়ালে মুচকি হাসি হেসে বলত:

'কী যেন বলিস সেই ফরাসী লেখকের নাম, শুনি তো, পঁতোস?'

ওর বিকৃত করে নাম উচ্চারণের ধরনে দারুণ চটে যেতাম আমি, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলতাম:

'প'স' দ্য তরাইল।'

'কার চোখ?'

'বোকার মতো কথা বলবেন না — আপনি তো আর ছেলেমানুষটি নন।'

'ঠিক কথা বলেছিস। ছেলেমানুষ নই আমি। কী পড়ছিস ওটা?'

'ইয়েফ্রেম সিরিন।'

'কে ভালো লেখে: গপ্প লেখকেরা, না ও?'

কোনো জবাব দিলাম না।

'কী নিয়ে ওরা বেশির ভাগ গপ্প লেখে?' বুড়ো চেপে ধরল।

'যা কিছু ঘটে, যা কিছু হয়, সবকিছু নিয়ে।'

'কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে? ওগুলোও তো হয়।'

বড়ো সাকরেদ হো হো করে হেসে উঠত আর আমি উঠতাম গরম হয়ে। ছুটে পালাবার ইচ্ছে হত। কিন্তু পালাতে গেলেই বড়ো সাকরেদ খে'কিয়ে উঠত:

'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

বুড়ো আমায় ধৈর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত খেপিয়ে চলত:

'তাহলে এবার এই ধাঁধাটার উত্তর দে তো দেখি পণ্ডিত: তোর সামনে এক হাজার ন্যাংটো মানুষ আছে। পাঁচ-শ' পুরুষ পাঁচ-শ' মেয়েমানুষ। ওদের ভিতরে আদম আর ইভও রয়েছে। কী করে বলবি কে আদম আর কে ইভ?'

জবাবের জন্যে বহুক্ষণ ধরে আমাকে পেড়াপেড়ি করার পরে বিজয়গর্বে নিজেই বলে উঠত:

'ওরে মুর্খ! ওদের তৈরী করেছেন ঈশ্বর। মায়ের পেট থেকে জন্মায় নি ওরা। তার মানে তাদের নাভি নেই।'

এমনি অসংখ্য ধাঁধা জানত বুড়ো। আর তা দিয়ে আমাকে উত্যক্ত করে মারত।

দোকানে আসার পরে প্রথমটা আমি বড়ো সাকরেদের কাছে আমার পড়া বইয়ের গল্প কিছু বলেছিলাম। কিন্তু পরে সেটাই একটা নিদারুণ পরিতাপের বিষয় হয়ে ফিরে এল আমার কাছে। বড়ো সাকরেদ ইচ্ছে করে সেগুলিকে বিকৃত করে নোংরা কদর্থ যোগ করে বলেছিল পিওতর ভাসিলিয়েভিচের

কাছে। বুড়ো আরো সব নোংরা নোংরা প্রশ্ন করে ওকে বলতে সাহায্য করত। আমার প্রিয় ইউজীন গ্রাঁদে, ল্যুদমিলা আর চতুর্থ হেনরীর উপরে ওরা ওদের কুৎসিত ভাষার কাদা ছিটিয়ে নোংরা করে তুলেছিল।

জানতাম, ওদের এসব করার পেছনে বিদ্বেষের ভাব নেই, আছে একঘেয়েমি কাটাবার চেষ্টা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো সহ্য করা খুব সহজ ছিল না আমার পক্ষে। ওদের নিজেদের সৃষ্টি-করা পাঁকে নিজেরাই শুয়োরের মতো গড়াগড়ি দিত। আর যা কিছু সুন্দর অথচ ওদের কাছে নতুন, দুর্বোধ্য, তাই মনে করত মজার। সেসব কিছুকেই নোংরা পঙ্কিল করে তুলে ওরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করত আনন্দে।

চকের খিলানের দুদিকে সারি সারি দোকানের দোকানী, দোকান কর্মচারী — সবাই এক অদ্ভুত জীবন যাপন করে। ওরা মানুষকে ঠকিয়ে, ধোঁকা দিয়ে আনন্দ পেত। আর সে আনন্দ যেমন নির্বোধ, বালসুলভ, তেমনি হিংস্র। আমাদের শহরে প্রথম এসেছে এমন কোনো চাষী যদি কোনো একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করে ওরা তাকে ঠিক উলটো দিকের পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এ ব্যাপারটাও এত সাধারণ, এত মামুলি হয়ে পড়েছিল যে এতে আর ওরা তেমন মজা পেত না। তাই দুটো ইঁদুর ধরে লেজে লেজে বেঁধে দিত। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত ইঁদুর দুটোর কামড়াকামড়ি আঁচড়া-আঁচড়ি আর দুটোর দুদিকে যাওয়ার জন্যে টানাটানি। কোনো কোনো সময়ে ওরা বেচারা জীব দুটোর উপরে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিত। কিম্বা কুকুরের লেজে একটা ভাঙা লোহার বালতি বেঁধে ছেড়ে দিত। জন্তুটা ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করত। বালতিটা বাজতে থাকত ঝন ঝন করে। আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত ওরা।

এমনি ধরনের আরো অনেক রকমের তামাশা করত ওরা। যেন সবাই — বিশেষ করে গাঁ থেকে আসা লোকগুলোর একমাত্র তাৎপর্য হল বাজারের লোকেদের আনন্দের খোরাক যোগানো। ব্যবসায়ীরা, তাদের কর্মচারীরা, সবাই সব সময়েই কোনো না কোনো লোকের পিছনে লেগে কিংবা কাউকে ব্যথা দিয়ে, অসুবিধায় ফেলে মজা করার সুযোগ খুঁজত। অবাক লাগত আমার পড়া বইয়ে এই ধরনের মনোবিকৃতির কোনো কথাই আমি খুঁজে পাই নি।

একটা ব্যাপার বিশেষ করে আমাকে সবচাইতে বেশি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

আমাদের দোকানের নিচেই একটা পশম আর ফেল্টের দোকানে ছিল এক কর্মচারী। গোটা নিচের বাজারে 'পেটুক' বলে ছিল ওর নাম। মানুষ যেমন তার কুকুরের হিংস্রতা, বা ঘোড়ার গায়ের জোর নিয়ে বড়াই করে তেমনি দোকানের মালিকও তার ঐ কর্মচারীটির খাওয়া নিয়ে বড়াই করত। প্রায়ই সে তার আশপাশের দোকানীদের সঙ্গে বাজি ধরত।

'কে দশ রুবল বাজি ধরবে? আমি বাজি রেখে বলতে পারি মিশ্কা দু'ঘণ্টায় দশ পাউন্ড শুয়োরের মাংস খেয়ে ফেলতে পারে।'

কিন্তু মিশ্কার এ ক্ষমতায় কারুরই সন্দেহ ছিল না। সুতরাং ওরা বলত:

'না, বাজি ধরছি না আমরা। বরং মাংসটা কিনে দিচ্ছি। ও খাক, আমরা মজা দেখি।'

'শুধু দশ পাউন্ড মাংস, হাড় নয় কিন্তু।'

একটু বাদানুবাদ করত ওরা যতক্ষণ না অন্ধকার গুদামঘর থেকে বেরিয়ে আসত রোগা দাড়ি-গোঁফহীন একটি লোক। চেয়ালের হাড় দুটো উঁচু। গায়ে লম্বা সুতীর কোট, দলা দলা পশমে ভর্তি। আর কোমরে লাল রঙের একটা কাপড় শক্ত করে বাঁধা। সসম্ভ্রমে টুপি খুলে তার ছোট্ট মাথাটা বের করে ঘোলাটে চোখে মনিবের গো-মাংসের মতো লাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখটার দিকে তাকাত।

'এই শুয়োরের মাংসটা খেয়ে শেষ করতে পারবি?' জিজ্ঞেস করল মনিব।

'কতোক্ষণের ভেতর?' কাজের লোকের মতো সরু গলায় জিজ্ঞেস করল মিশ্কা।

'দু'ঘণ্টা।'

'সেটা একটু শক্ত হবে!'

'তোর পক্ষে নয়।'

'মগ দুই বিয়ার থাকবে না সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল মিশ্কা।

'লেগে পড়্!' বলল ওর মনিব। তারপর সগর্বে পাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে করো না ও খালি পেটে খাচ্ছে! না হে, না। দু-পাউন্ড রুটি ঠুকেছে সকালে, দুপুরেও খেয়েছে পেট ভরে...'

শুয়োরের মাংস নিয়ে আসা হল। এক দল লোক এসে ভিড় করে দাঁড়াল দেখার জন্যে। সবার গায়ে ভারি ভারি শীতের কোট। তাতে ওদের দেখাচ্ছে

বিরাট বিরাট বাটখারার মতো। পেট-মোটা ভুঁড়িওয়ালা সব লোক, খুদে খুদে চোখ চর্বিতে ঢাকা, শেষহীন একঘেয়েমিতে ঢুলু ঢুলু।

হাতার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ওরা ঘন হয়ে পেটুকটাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটা ছুরি আর বড়ো একখানা রাইয়ের রুটি নিয়ে তৈরী হয়েছে পেটুক। বার কয়েক খুব তাড়াতাড়ি ক্রুশ করে ও পশমের স্তূপের উপরে বসল। শুয়োরের মাংসটা রাখল একটা প্যাকিং বাক্সের উপরে। শূন্য চোখের দৃষ্টি মেলে তারিফ করতে লাগল।

তারপর পাতলা এক টুকরো রুটি আর পুরু এক টুকরো মাংস কেটে নিখুঁত করে একটা আর একটার উপরে রেখে দুহাতে মুখে তুলল। কুকুরের মতো লম্বা জিভ বের করে কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুটো চাটল একবার। বেরিয়ে পড়ল কুকুরেরই মতো খুদে খুদে ধারালো দাঁত। তারপর কুকুরেরই মতো দাঁত বসাল মাংসে।

'শুরু করেছে!'

'সময় দেখ!'

সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পেটুকের মুখের দিকে। তাকিয়ে রইল ওর চর্বণরত চোয়াল, কানের দুপাশে ফুলে ফুলে ওঠা মাংসপেশী, তালে তালে ওঠা-নামা-করা সরু থুতনিটার দিকে। আর থেকে থেকে নিজেদের মন্তব্য করল:

'ভল্লুকের মতো চিবুচ্ছে!'

'কোনো ভল্লুককে চিবুতে দেখেছিস কখনো?'

'আমি কি জঙ্গলে বাস করি নাকি? ওটা হল গে' কথার কথা: ভল্লুকের মতো চিবোয়।'

'কথাটা হল: শুয়োরের মতো চিবোয়...'

'শুয়োরে কি আর শুয়োর খায়?'

আনন্দহীন শুকনো হাসি হাসতে লাগল সবাই। আর একজন বিজ্ঞলোক মন্তব্য করল:

'শুয়োরে সবকিছু খায়—এমন কি নিজের বাচ্চা বা নিজের বোনকে পর্যন্ত...'

পেটুকের মুখখানা ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে। নীল হয়ে উঠছে দুটো কান। ওর বসে যাওয়া চোখ দুটো বেরিয়ে পড়েছে কোটর থেকে। শ্বাস প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঠিক একই তালে নড়ে চলেছে ওর চোয়াল দুটো।

'জলদি কর্ মিশা—তোর সময় ফুরিয়ে আসছে কিন্তু!' ওকে তাড়া দিতে লাগল সবাই। মাংস কতোটা বাকি আছে একবার পরখ করে দেখে নিয়ে একটু উদ্বেগের সঙ্গেই এক ঢোক্ বিয়ার খেল সে। তারপর আবার চিবিয়ে চলল। দর্শকরা আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঘন ঘন তাকাচ্ছে মিশকার মনিবের হাতের ঘড়ির দিকে। আর পরস্পর পরস্পরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে:

'লক্ষ্য রাখিস যেন কাঁটা না ঘুরোয়—বরং ঘড়িটা ওর হাত থেকে নিয়ে নে!'

'মিশ্কার দিকে নজর রাখিস। খানিকটা হাতার ভিতরে লুকিয়ে ফেলতে পারে!'

'ঠিক সময়ের ভিতরে পারবে না শেষ করতে!'

'এরই উপরে পঁচিশ রুবল বাজি রাখছি আমি,' বেহিসেবীর মতোই চিৎকার করে বলে উঠল মিশ্কার মনিব, 'আমাকে বেইজ্জত করিস নে মিশ্কা!'

সবাই চিৎকার করে মনিবের পিছনে লাগল। কিন্তু কেউই বাজি ধরতে এগিয়ে এল না।

মিশ্কা চিবিয়ে চলেছে তো চলেছেই। ওর মুখখানাও ঠিক ঐ শুয়োরের মাংসের মতোই হয়ে উঠেছে। সরু নরম হাড়ের মতো নাকটার ভিতর থেকে বাঁশির মতো আওয়াজ বেরচ্ছে। ওর দিকে তাকাতে ভয় হয়। মনে হচ্ছিল যেন যে কোনো মুহূর্তে ও চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলবে:

'দয়া করো...'

কিংবা হয়ত শুয়োরের মাংস যখন ওর গলা গলা হয়ে উঠবে তখন দর্শকদের পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে মরে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মাংসটা শেষ করে ফেলল ও। ভিড়ের দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে তাকিয়ে নিদারুণ ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল:

'একটু জল দাও!'

ওর মনিব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গজ গজ করে উঠল:

'চার মিনিট দেরি হয়ে গেছে, বেজন্মা কোথাকার!'

'তোমার সঙ্গে বাজিটা না ধরে খুব খারাপই হল দেখছি!' টিটকারি দিতে লাগল ভিড়ের ভিতর থেকে, 'হেরে যেতে তুমি তাহলে!'

'কিন্তু একথা মিথ্যে নয় যে লোকটা একটা আস্তো ঘোড়া!'

'ওর উপযুক্ত স্থান হচ্ছে সার্কাসের দলে...'

'ভগবান কোনো কোনো মানুষকে এমন আজব করে সৃষ্টি করেন যে তা আর বলার নয়!'

'চলো এবার একটু চা খাওয়া যাক, কী বলো?'

সারবন্দী গাধাবোটের মতো ওরা দল বেঁধে চলল চাখানার দিকে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম ঐ ধুমসো আকাট লোকগুলো কেন ঐ হতভাগা বেচারার পিছনে অমন করে এসে ভিড় জমায়। এমন একটা ক্ষতিকর পেটুকপনার ভিতরে কী আনন্দ পায় ওরা?

চকের সারবন্দী সরু গেলারি অন্ধকার, বিষাদময়। পশমের পেটি, ভেড়ার চামড়া, শণ, দড়ি, ফেল্ট্ বুট, ঘোড়ার জিন ইত্যাদিতে ঠাসা। পুরু পুরু ইটের থাম দিয়ে রাস্তা থেকে আলাদা করা। থামগুলো যেমন স্থূল আর পুরনো ঝরঝরে তেমনি রাস্তার ধুলো-ময়লায় কালো। বোধ হয় হাজার বার ঐ ইটগুলো গুণে দেখেছি। গুণেছি ওদের ভিতরের ফাটল। ফলে ওগুলোর কুৎসিত গড়ন আমার স্মৃতিতে গভীরভাবে বসে গেছে।

পায়ে-চলা পথ বেয়ে মন্থর পায়ে আসছে পথচারী। রাস্তা ধরে তেমনি ধীর অলস গতিতে চলেছে পণ্য বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়ি আর স্লেজ। রাস্তার শেষদিকে দূরে দোতলা লাল পাকা দোকানবাড়িগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা স্কোয়ার। সেখানে মাটির উপরে ছড়ানো প্যাকিং বাক্স, খড়, মুড়বার কাগজ—পায়ে পায়ে সব নোংরা বরফের সঙ্গে মিশে গেছে।

নিরবচ্ছিন্ন গতি সত্ত্বেও মনে হয় যেন সবকিছু — মায় ঐ মানুষ ঘোড়া সব স্থির, গতিহীন। যেন এক অদৃশ্য শিকলে বাঁধা পড়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আবিষ্কার করলাম এখানকার এই জীবনে যেন শব্দের অভাব ঘটেছে। ফলে কেমন যেন বোবা হয়ে আছে সব। বরফের উপরে ধাবমান স্লেজচালকের চিৎকার, দোকানের দরজার খট খট শব্দ, পিঠে-ওয়ালারা হেঁকে চলা সত্ত্বেও মানুষের কণ্ঠ এতো নির্জীব, এতো নিষ্প্রাণ একাকার যে কিছু দিনের মধ্যে তাদের গলার স্বর আর কানে লাগত না।

গির্জার ঘণ্টা বেজে চলত যেন কার অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে। অমন ক্লিষ্ট সুর কোনো দিনই আমি ভুলতে পারব না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঐ শব্দ যেন মানুষের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে সব

ধারণা কল্পনাকে গুঁড়ো গুঁড়ো পিতলের ধুলো দিয়ে ঢেকে দিয়ে বাজারের ওপরেঁ ভেসে থাকত।

সবকিছু থেকে যেন এক শৈত্যময় ক্ষয়িষ্ণু অবসাদ বেরিয়ে আসছে—নোংরা বরফের কালো কম্বলের আস্তরণে ঢাকা মাটির ভিতর থেকে, ছাদের উপরে জমে-ওঠা ধূসর বরফের স্তূপের ভিতর থেকে, আর মাংসের মতো রাঙ্গা বাড়ির ইটের গা বেয়ে। চিমনির মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে পাক খেয়ে উঠছে ঐ অবসাদ। তারপর লতিয়ে লতিয়ে নিচু ধূসর শূন্য আকাশের গায়ে পড়ছে ছড়িয়ে। ঘোড়ার গা আর মানুষের নাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে অবসাদের ঢেউ। একটা বিশেষ নিজস্ব গন্ধ আছে ঐ অবসাদের--ঘাম, চর্বি, ধোঁয়া, শণের বিচির তেল, আর চর্বি মেশা মটরশুঁটির মিলিত গন্ধের মতো সোঁদা আর ভারি। সে গন্ধ আঁট গরম টুপির মতো মাথাটাকে আটকে ধরে বুকের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন এক রকমের মত্ততায় মাতাল করে তুলত যে, ইচ্ছে হত চোখ বুজে সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে সামনের পাথুরে দেয়ালে মাথা কুটে মরি।

প্রায়ই আমি ব্যবসায়ীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে করে দেখতাম—সে মুখ পরিতৃপ্ত, ঘন রক্তের মতো টকটকে লাল, তুষার-আহত, আর এমন অচল অনড় মনে হত যেন ঘুমিয়ে আছে। তীরের বালিতে আটকে-যাওয়া মাছের মতো ওরা হাঁ করে হাই তুলত কেবল।

শীতের দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা। গরমকালে যে সতর্ক হিসেবী দৃষ্টিতে ওদের চোখগুলো চক চক করে উঠত, যে সজীবতা ফুটে উঠে এমন কি ওদের সুন্দরও দেখাত তা এখন আর নেই। ভারি ভারি কোটগুলো চলা-ফেরায় বাধা দিয়ে ওদের যেন আটকে রেখে দিত মাটির সঙ্গে। ওরা কথা বলত ধীর অলস ভাবে, আর যখন রেগে যেত তখন দীর্ঘ তর্ক জুড়ত। মনে হত তর্কটা যেন ওরা করছে ইচ্ছে করেই — ওরা যে বেঁচে আছে শুধু সেটাই প্রমাণ করার জন্যে।

স্পষ্টই দেখতে পেতাম ওরা ঐ সর্বাত্মক অবসাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণে ঝিমিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারতাম ওদের ঐ নিষ্ঠুর নির্বোধ আমোদ শুধু ঐ ক্লান্তিকর অবসাদ কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা হত আমার পিওতর ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে। যদিও সাধারণত আমার প্রতি ওর ছিল বিদ্রূপাত্মক খোঁচানোর

মনোভাব, তবুও আমার বইয়ের উপরে টান দেখে ও মনে মনে খুশি হত। কখনো কখনো সে সত্যি সত্যি গভীর ভাবে আলোচনা করত আমার সঙ্গে, উপদেশ দিত।

'ব্যবসায়ীরা যেমন করে জীবন কাটায় সেটা আদৌ ভালো লাগে না আমার,' আমি বলতাম।

খানিকটা দাড়ি আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে প্রশ্ন করত:

'ওরা কেমন করে জীবন কাটায় তা তুই জানলি কী করে, প্রায়ই তুই যাস নাকি ওদের বাড়ি? এটা রাস্তা বুঝলে হে, মানুষ রাস্তায় বাস করে না। রাস্তায় কারবার করে, কিংবা রাস্তার উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি করে হেঁটে চলে যায় বাড়ির দিকে। রাস্তায় সবাই চলে কাপড়চোপড়ের বাণ্ডিল হয়ে, তার ভিতরে কে কী তা কেউই বলতে পারে না। ওরা যখন বাড়িতে থাকে — চার দেয়ালের ভিতরে, তখনই মাত্র ওরা মেলা-খোলা হয়ে বাস করে। কিন্তু কেমন করে থাকে তা তুই জানবি কী করে?'

'কিন্তু বাড়িতেই হোক আর এখানেই হোক ওদের ভাবনা-চিন্তার রকম তো একই!'

'কে বলতে পারে তার পাশের লোকটা কী ভাবছে?' আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর ভারি গলায় বলত বৃদ্ধ। 'চিন্তা হচ্ছে উকুনের মতো। বুড়োরা বলে না? ও গুণে হিসেব করা যায় না। এমনও হতে পারে বাড়ি ফিরে গিয়ে কেউ হয়ত হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করে: হে প্রভু, তোমার পবিত্র দিনটিকে কলুষিত করার জন্যে ক্ষমা করো—কিংবা হয়ত তার বাড়িঘরই তার কাছে মঠের মতো, সেখানে সে বাস করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে একলা। প্রত্যেকটি মাকড়সাই তার নিজের কোণটিতে থাকে—নিজের ওজন বুঝে নিজের ভর সইবার মতো করেই জাল বোনে।'

যখন ও গম্ভীর ভাবে কথা বলত তখন ওর গলার স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠত। যেন কোনো মূল্যবান গোপন কথা শেখাচ্ছে:

'এক্ষুণি তুই সবকিছুর কার্যকারণ খুঁজতে শুরু করেছিস, এ সব বোঝার বয়স হয় নি তোর। তোর মতো বয়সে বুদ্ধি দিয়ে চলতে হয় না, চলতে হয় চোখ দিয়ে। মানে, চোখ দিয়ে দেখ্, মনে করে রাখ্ আর মুখটি বুজে থাক্। মস্তিষ্ক দরকার ব্যবসার জন্যে, আত্মার প্রয়োজন বিশ্বাসে। বই পড়াটা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সবকিছুরই একটা

মাত্রা আছে। কোনো কোনো লোক এত পড়ে যে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইষ্টনাম পর্যন্ত ভুলে যায়...'

আমার মনে হত বুড়োটা যেন অমর। কিছুতেই ভাবতে পারতাম না ও বদলাচ্ছে, আরো বুড়ো হয়ে পড়ছে। যে সব ব্যবসায়ী, ডাকাত কিংবা জালিয়াত বিখ্যাত হয়েছে, বুড়ো তাদের গল্প বলতে ভালোবাসত। এমনি অনেক গল্প শুনেছি আমি দাদুর মুখেও। দাদু বলতেন ওর চাইতে ঢের সুন্দর করে। কিন্তু গল্পের বক্তব্য ছিল একই: মানুষ আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করেই ধন-সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। মানুষ সম্পর্কে পিওতর ভাসিলিয়েভিচের কোনো সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু চোখ বুজে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে একান্ত অনুরাগের সঙ্গে বলত ঈশ্বরের কথা।

'দেখছিস, মানুষ কেমন করে তাদের ঈশ্বরকে ধোঁকা দিয়ে চলে। কিন্তু প্রভু যীশু সবকিছুই দেখেন আর ওদের জন্যে কাঁদেন, 'হায় আমার মানুষ, আমার মানুষ, হায় রে আমার অভাগা মানুষ, তোদের কপালে যে নরক জুটবে!''

এক দিন সাহস করে বলে ফেললাম ওকে:

'আপনিও তো চাষীদের ঠকান!'

রাগ করল না।

বলল, 'হুঁ, আমি যা করি তা অতি সামান্য ক্ষতি! আমি চারটে কি পাঁচটা রুবল ঠকিয়ে নি নিজের জন্যে। শুধু ঐটুকুই, তার বেশি না।'

আমাকে পড়তে দেখলেই বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে বইটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করত। তারপর একটু সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বড়ো সাকরেদের দিকে তাকিয়ে বলত:

'দেখ না—ও বই পড়ে বোঝেও আবার, খুদে বাঁদর!'

তারপর সংক্ষেপে উপদেশের মতো করে যা বলত তা ভোলার নয়।

'শোন আমার কথা—শুনলে উপকার হবে তোর। এক সময়ে দুজন কিরিল ছিল। দুজনেই ছিল বিশপ। একজন আলেক্সান্দ্রিয়ায়, আর একজন জেরুসালেমে। আলেক্সান্দ্রিয়ার কিরিল নাস্তিক নেস্তোরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কারণ নেস্তোর প্রচার করত মেরীমা ছিলেন মর-জগতের মানুষ। সুতরাং তাঁর গর্ভে কখনো ঈশ্বর জন্ম নিতে পারেন না। তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন একজন মানুষ। নাম তাঁর খৃষ্ট—দুনিয়ার পরিত্রাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে

তাঁকে আমাদের ঈশ্বরের মাতা বলা উচিত নয়। বলা উচিত খৃষ্টের মাতা, বুঝলি? একেই বলে ধর্মদ্রোহিতা। তারপর জেরুসালেমের কিরিল যুদ্ধ করল ধর্মদ্রোহী নাস্তিক আরিয়ার সঙ্গে...'

গির্জার ইতিহাস সম্পর্কে ওর জ্ঞান দেখে আমি গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়তাম।

পুরুতের মতো কোমল হাতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গর্বের সঙ্গে বলত:

'এসব ব্যাপারে আমি একটা সেনাপতি। 'হুইট সানডে' পরবের সময়ে মস্কো গিয়েছিলাম নিকন-পন্থী পুরুত আর সাধারণ অজ্ঞলোকদের বিষাক্ত প্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে। মহা মহা পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করলাম। এক পুরুতকে তো এমন বুলি ঝাড়লাম যে তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। ব্যাপার বোঝ!'

বলতে বলতে ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠত। চক চক করে উঠত চোখ দুটো।

স্পষ্টই বোঝা যেত প্রতিপক্ষের নাক দিয়ে রক্ত ঝরানোটা ও জীবনের সবচাইতে বড়ো সাফল্য, ওর গৌরবের স্বর্ণ-মুকুটের উজ্জ্বল রত্ন বলে মনে করত। তাই গর্বের সঙ্গে বলত:

'লোকটার চেহারা ছিল খুব সুন্দর। দৈত্যের মতো জোয়ান। দাঁড়িয়ে আছে আর নাক দিয়ে টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। কিন্তু এই লজ্জাকর অবস্থা সম্পর্কে আদৌ খেয়াল ছিল না লোকটার। সিংহের মতো ভয়ংকর। ওর গলার আওয়াজ কখন গম্ভীর ঘণ্টার শব্দ। কিন্তু সারাটাক্ষণ শান্ত ভাবে আমি আমার কথার ছোরা চালিয়ে যেতে লাগলাম ওর হৃৎপিণ্ডের উপরে—ঠিক পাঁজরার হাড়ের ভিতর দিয়ে দিয়ে। আর সেও তার ঐ দুষ্ট ধর্মদ্রোহিতার আগুনে গরম হতে হতে স্টোভের মুখের মতো গনগনে হয়ে উঠল। আঃ, কী সব দিনই না গেছে!'

অন্যান্য সব শাস্ত্রবাগীশরাও প্রায়ই আসত আমাদের দোকানে। একজন ছিল পাখোমি। বেঁটেমোটা লোক, বিরাট ভুঁড়ি। একটা চোখ কানা। কথা বলত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর সব সময়েই ওর গায়ে থাকত একটা তেলচিটে কোট। আসত বুড়ো লুকিয়ান—ইঁদুরের মতো ছোট মসৃণ চেহারা। ব্যবহার ভদ্র, খুব হাসিখুশি ফুর্তিবাজ লোক। ওর সঙ্গে সব সময়েই আসত আর একটি লোক, লম্বা-চওড়া চেহারা, গম্ভীর মুখ, লম্বা-দাড়ি

কোচোয়ানের মতো দেখতে। সুন্দর অথচ শ্রীহীন মুখের উপরে ড্যাবা ড্যাবা দুটো ভাবলেশহীন চোখ।

ওরা প্রায়ই আমাদের কাছে বিক্রি করতে চেষ্টা করত পুরনো পুঁথি, ধুনোচি, আর গির্জার বাসনপত্র। সময়ে সময়ে অন্য কাউকেও আনত সঙ্গে করে--ভলগার ওপার থেকে আসা কোনো বুড়ো বা বুড়িকে। তারাও আনত বিক্রি করার জিনিসপত্র। কেনা-বেচা হয়ে গেলে পরে ওরা বেড়ার ওপর বসা কাকের মতো কাউণ্টারের উপরে বসে মিষ্টি রুটি আর ফলের গন্ধওয়ালা চিনি দিয়ে চা খেত। আর নিকন-পন্থী গির্জের জুলুমের কথা আলোচনা করত: কোথায় খানাতল্লাসী করে পবিত্র গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছে, কোথায় পুলিস ওদের গির্জা বন্ধ করে দিয়ে ১০৩ ধারা অমান্য করার জন্যে গির্জার সবাইকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। ১০৩ ধারা ছিল ওদের সবচাইতে মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু তা নিয়ে ওরা কথা বলত নিতান্ত নির্বিকার ভাবে, যেন ওটা শীতকালের তুষারের মতোই একটা অনিবার্য ব্যাপার।

তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্যে নির্যাতন ভোগের প্রসঙ্গে পুলিস, খানাতল্লাসী, আদালত, জেলখানা, সাইবেরিয়া ইত্যাদি যে সমস্ত কথাগুলো ওরা বার বার ব্যবহার করত সেগুলো যেন জ্বলন্ত কয়লার মতো এসে পড়ত আমার বুকে, আর এই সব বুড়োলোকদের জন্যে সদিচ্ছা আর সহানুভূতি জাগাত। আমার পড়া বইগুলি থেকে শিখেছিলাম নৈতিক সাহসকে প্রশংসা করতে, আর যাঁরা তাঁদের লক্ষ্যপথে অবিচল থাকেন—তাঁদের শ্রদ্ধা করতে।

প্রাচীন ধর্মমতের এই প্রচারকদের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ভুলে যেতাম। শুধু মনে থাকত তাঁদের শান্ত অধ্যবসায় যার অন্তরালে, আমার মনে হত, রয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রতি এক অবিচল বিশ্বাস আর তারই জন্যে সমস্ত রকমের কঠোরতা, নির্যাতন সহ্য করার ইচ্ছে।

পরে এই ধরনের বহু শিক্ষিত বা সাধারণ লোকের সংস্পর্শে এসে দেখেছি যে ওদের ঐ দৃঢ়তা আসলে নিষ্ক্রিয় সহনশীলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার যেখানে গিয়ে পেঁৗছেছে সেখান থেকে যেন আর কোথাও তাদের যাবার জায়গা নেই, যাবার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। অপ্রচলিত শব্দ আর জীর্ণ ভাবধারার ভিতরে ওরা রয়েছে বন্দী হয়ে। ওদের ইচ্ছেশক্তি পঙ্গু, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ যদি ওদের মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামা পাথরের মতোই ওরা আপনা থেকেই

গড়িয়ে পড়ে যাবে নিচে। অতীতমুখী দৃষ্টির নিষ্প্রাণ টান আর নির্যাতন ভোগ করার এক রুগ্ন বিকৃত আকর্ষণে ওরা বন্দী হয়ে আছে এক মৃত ভাবধারার গোরস্থানে। নির্যাতিত হবার সুযোগ থেকে যদি ওরা একবার বঞ্চিত হয়, তাহলে মুহূর্তে ওদের যা কিছু সত্তা সব নিঃশেষ হয়ে হাওয়াভরা পরিষ্কার সুন্দর দিনের আকাশে মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

যে ধর্মবিশ্বাসের জন্যে ওরা এমন আকুল আগ্রহে, এমন মিথ্যে গরিমায় আত্মবলি দিয়ে চলেছে সে বিশ্বাসের ভিত সুদৃঢ় সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যেন একটা পুরনো পোশাকের উপরের ধুলো ময়লার পুরু আস্তরণ—যা এমনই বোঝাই যে আর নষ্ট হবার নয়। ওরা ওদের চিন্তা, ওদের অনুভূতি, গোঁড়ামী আর কুসংস্কারের শক্ত খাঁচার ভিতরে দৃঢ় ভাবে বন্দী থেকে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তাতে করে ওরা যে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, অচল, অনড় হয়ে পড়েছে—তার জন্যে এতটুকুও বিক্ষুব্ধ নয়।

এই অভ্যেসে পাওয়া বিশ্বাস আমাদের জীবনের একটা ভীষণ দুষ্ট ক্ষত, একটা নিদারুণ পরিতাপের ব্যাপার। পাথুরে দেয়ালের ঘেরা ছায়ার মতো এই বিশ্বাসের গণ্ডির ভিতরেও নতুন জন্ম নিয়ে অতি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে বিকৃত, রক্তশূন্য হয়ে। ঐ অন্ধ বিশ্বাসের তমসা ভেদ করে প্রেমের আলোক রেখা আসে অতি অল্প, অনেক বেশি পরিমাণে আসে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা আসে প্রচুর পরিমাণে। এই বিশ্বাসের অগ্নিশিখা শুধু ধ্বংসেরই উত্তাপহীন দীপ্তিমাত্র।

কিন্তু বহু বছরের কঠোর জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে, বহু দেবতার মূর্তি ভেঙে আর বহু রকমের ধারণা সমূলে উপড়ে ফেলে তবে এ সম্পর্কে আমি স্থির প্রত্যয় হতে পেরেছিলাম। বাস্তবিক, আমাকে ঘিরে চারদিকের সেই নিরানন্দ নীতিজ্ঞানহীনতার ভিতরে যখন প্রথম ঐসব প্রচারকদের দেখা পেলাম, তখন মনে হয়েছিল ওরা খুবই নৈতিক শক্তিসম্পন্ন লোক, দুনিয়ার সেরা মানুষ। ওদের প্রায় প্রত্যেককেই যেতে হয়েছে আদালতে, বন্দী হতে হয়েছে জেলে, বিতাড়িত হয়েছে শহর থেকে, সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে চলতে হয়েছে নির্বাসনের দুর্গম পথে। ওরা সকলেই জীবন কাটাচ্ছে উদ্বেগ নিয়ে আত্মগোপনের মধ্যে।

অবশ্য লক্ষ্য করতাম ওরা নিজেরা নিকন-পন্থীদের 'শিকারী কুকুরের মতো আত্মার পিছনে তাড়া করে ফেরা'র কথা বলে গালমন্দ করত, কিন্তু

ঐ বুড়ো লোকগুলো স্বেচ্ছায় সানন্দে পরস্পর পরস্পরকে তেমনি শিকারী কুকুরের মতোই তাড়া করত।

মদের গেলাস হাতে পড়লেই কানা পাখোমি তার সত্যিকার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির বড়াই করতে ভালোবাসত। হিব্রু লিপিকারদের যেমন 'তালমুদ' মুখস্থ ওরও তেমনি কতগুলো ধর্মগ্রন্থ ছিল একেবারে 'নখাগ্রে'। বইয়ের যে কোনো একটা শব্দের উপরে খুশিমতো আঙুল রেখে সেখান থেকে তার কোমল অনুনাসিক সুরে মুখস্থ বলে যেত। ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত মেঝের উপরে, আর একটা মাত্র চোখ যেন আকুল আগ্রহে কী এক মূল্যবান বস্তু খুঁজে খুঁজে ফিরত। বেশির ভাগ সময়েই ও প্রিন্‌স মীশেৎস্কির 'রুশ দ্রাক্ষা' থেকে আবৃত্তি করে ওর প্রতিভার পরিচয় দিত। 'সাহসী, নির্ভীক শহিদদের পরম ধৈর্য ও অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ নির্যাতন ভোগ'এর কথাটা ওর জানা ছিল সবচাইতে বেশি। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ সব সময়েই চেষ্টা করত ওর ভুল ধরতে।

'ভুল! ওটা হয়ে ছিল বিশুদ্ধাত্মা দেনিসের বেলায়, পবিত্র কিপরিয়ানের নয়।'

'দেনিস? দেনিসের নাম কে কবে শুনেছে? নামটা হল দিওনিসি...'

'নাম নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করবে না বলে দিচ্ছি!'

'তুমি আর আমাকে শেখাতে এসো না!'

একটু পরেই রেগে লাল হয়ে উঠে রক্তচক্ষু মেলে দুজন দুজনার দিকে তাকাত আর বলত:

'তুই একটা পেটুক, নির্লজ্জ শুয়োরের নাক। তাকিয়ে দেখ্‌ তোর ভুঁড়িটার দিকে!'

যেন অংক করছে এমনি একটা নির্লিপ্ত ভাবে পাখোমি জবাব দিত:

'আর তুই একটা ছাগল, একটা দুশ্চরিত্র, মাগীর ভেড়ুয়া।'

জামার হাতা গুটিয়ে বড়ো সাকরেদ হাসত শয়তানী হাসি, আর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের এই দুই অধিকর্তাকে উস্কে দিত, যেন ইস্কুলের ছেলে ওরা:

'লেগে যাও ওর সঙ্গে! ঠিক হ্যায়!'

সত্যি সত্যিই একদিন মারপিট লেগে গেল বুড়োদের ভিতরে। পিওতর ভাসিলিয়েভিচ টেনে এক চড় কসিয়ে দিল পাখোমির গালে। আর বাধ্য করল তাকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে। তারপর শ্রান্ত হয়ে কপালের

ঘাম মুছতে মুছতে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল:

'দাঁড়া দেখবি মজা—এই পাপ লাগবে তোর আত্মায়! তুই-ই আমার হাতটাকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করেছিস। ধিক তোকে!'

সঙ্গী-সাথীদের পর্যাপ্ত ধর্মবিশ্বাস নেই, ওরা 'নৈতিবাদ'এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে বলে পিওতর ভাসিলিয়েভিচ তাদের দোষারোপ করে আনন্দ পেত।

'আলেক্সান্দর তোদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। এসব হচ্ছে ওরই ফল। ঐ চ্যাঁচানো মোরগটা!'

নৈতিবাদের কথায় ও খেপে উঠত, ভীত হয়ে পড়ত। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হত তাতে কোন মত প্রচার করা হয় তখন ও সেটা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলে উঠতে পারত না।

'নৈতিবাদ হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরকে পর্যন্ত উড়িয়ে দেয়। একমাত্র মনের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করে না। ধর্ যেমন কসাকরা—ওরা মানে শুধু বাইবেল। আর বাইবেল আনা হয়েছিল সারাতভের জার্মানদের কাছ থেকে। লুথারের কাছ থেকে। লুথার সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'যোগ্য নামই হয়েছে লুথার। লুথার কথাটা এসেছে লুসিফার থেকে। লম্পট-লুথার। কামুক-লুথার।' সমস্ত জার্মান জাতটাকেই আখ্যা দেয়া হয়েছে হতভাগ্য বলে। আর এ সবকিছু আসছে ঐ পশ্চিম থেকে—ওখানকার ঐ ধর্মদ্রোহীদের কাছ থেকে।'

খোঁড়া পাটা মাটিতে ঠুকে কঠিন গম্ভীর গলায় বলে যেত:

'ওদেরই খুঁজে খুঁজে বের করে দেয়া উচিত, নির্যাতন করা উচিত ওদেরকেই, উচিত খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা। আমাদের নয়! আবহমান কাল থেকে আমরা হলাম রুশ। আমাদের ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে খাঁটি পূর্বী ধর্মবিশ্বাস — মজ্জায় মজ্জায় রুশ। আর পশ্চিমের ওই ওরা ··· ওদের হল যত প্যাঁচালো স্বাধীনচিন্তা। জার্মান ফরাসী ওদের কাছ থেকে আবার ভালো কী আসবে? একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আঠারো শ' বারো সালে...'

উৎসাহের চোটে ভুলেই যেত যে সে এসব বলছে নেহাৎ একটা বাচ্চা ছেলের কাছে। শক্তমুঠোয় আমার কোমরের বেল্ট চেপে ধরে কখনো কাছে টেনে কখনো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুন্দর যৌবনোচিত উদ্যমে বলে চলত:

'মানুষের জ্ঞান তার নিজেরই গড়া মিথ্যা কল্পনার জঙ্গলে ঘুরে মনে।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হল মানব-আত্মা। সেই আত্মাকে অনন্ত নরক যন্ত্রণায় ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে শয়তানের উস্কানীতে তুলে সে জ্ঞান হিংস্র নেকড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবে ভেবে কী বের করেছে ওরা, ঐ শয়তানের দাসেরা? নৈতিবাদের পান্ডাদের এই হল শিক্ষা: শয়তানও ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খৃষ্টের বড়ো ভাই — বোঝ ব্যাপারখানা? মানুষকে ওরা শেখায় কর্তৃত্ব আমান্য করতে, কাজ বন্ধ করে দিতে, বৌ ছেলেপুলেদের ত্যাগ করতে। মানুষের কাছ থেকে কিছু নাকি দাবি করার নেই, কোনো শৃংখলা চলবে না, যার যেমন খুশি তেমনি চলবে বা শয়তান যেমন করে চালাবে তেমনি। আঃ, ঐ আলেক্সান্দারের কথাই ধর না, হতভাগা কৃমি কীট...'

কোনো কোনো সময়ে বড়ো সাকরেদ আমাকে কাজে ডেকে আনত। বুড়ো তখন খালি বারান্দায় একা-একাই ওর চারদিকের শূন্যতাকে লক্ষ্য করে বলে চলত:

'হায় রে ডানা-কাটা আত্মা, হায় রে অন্ধ কুকুরছানার দল, কার কাছে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেব আমি?'

তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে হাত দুটো হাঁটুর উপরে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শীতের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকত।

ক্রমে আমার উপরে ওর মনটা নরম হয়ে এল, আমার দিকে নজর দিতে শুরু করল। যখনই আমাকে কোনো বই পড়তে দেখত, পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলত:

'পড় পড়, পড়ে যা, ছেলে, আখেরে কাজে লাগবে। মনে হচ্ছে তোর মাথা আছে। কিন্তু তুই যে বড়োদের কথা শুনিস না সেইটেই হচ্ছে সবচাইতে খারাপ। সবার সঙ্গেই অমন লাগতে যাস কেন। তার পরিণাম কী জানিস? শেষ পর্যন্ত জেলের কয়েদীর দলে ছাড়া আর কোথাও ভিড়বার জায়গা থাকবে না। বুঝলি ছেলে, পড়, পড়ে যা তোর বই, কিন্তু ভুলিস নে — বই বই-ই, তোকে তোর নিজের মাথা খাটাতে হবে। এক কালে দানিলো নামে খ্লিস্তদের এক গুরু ছিল। সে বলত পুরনো, নতুন কোনো বই-ই ভালো নয়। তাই সে সমস্ত বই নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল। এরও কোনো মানে হয় না। তারপর আবার দেখ ঐ আলেক্সান্দার। ও মানুষের মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে চলেছে...'

ক্রমেই বুড়ো বেশি বেশি করে আলেক্সান্দারের নাম করতে শুরু

করেছিল। একদিন সে উদ্বিগ্ন ভাবে দোকানে এসে ঢুকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল বড়ো সাকরেদকে:

'আলেক্সান্দার এসেছে এই শহরে — কাল পেণছেছে। সর্বত্র খঁুজে বেড়ালাম, কিন্তু এখনো পাই নি তাকে। লুকিয়ে আছে। বসব খানিকক্ষণ এখানে। হয়ত এখানে এসেও ঢুকতে পারে।'

'ও সবের মধ্যে আমি নেই!' বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলল বড়ো সাকরেদ।

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল:

'ঠিকই বলেছিস! তুই চিনিস শুধু খদ্দের আর ব্যাপারীদের - তাছাড়া আর কেউ নেই সংসারে। বরং এক গ্লাস চা খাওয়া দেখি।'

পিতলের বড়ো চায়ের কেতলিভরা গরম জল নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম আরো কিছু অভ্যাগত এসেছে দোকানে। একজন হল বুড়ো সুকিয়ান — মনের আনন্দে দাঁত বের করে হাসছে। আর দোরের পিছনে অন্ধকার কোণের দিকে বসে রয়েছে একজন অপরিচিত লোক। পায়ে উঁচু ফেল্টের বুট, গায়ে সবুজ বেল্টওয়ালা একটা গরম কোট, টুপিটা চোখের উপরে পর্যন্ত টানা। মুখটা নির্বিকার। মনে হল লোকটি শান্ত, বিনয়ী, যেন সদ্য-বরখাস্ত-হওয়া কর্মচারী, আর সেই বরখাস্ত হওয়ার জন্যেই যেন দারুণ মনমরা।

ওর দিকে না তাকিয়েই কঠিন গম্ভীর কণ্ঠে কী যেন বলে চলেছে পিওতর ভাসিলিয়েভিচ। আর অপরিচিত লোকটি অস্থির আক্ষেপে ডান হাত দিয়ে টুপিটা নাড়াচাড়া করছে। যেন ক্রুশ করছে এমনি ভঙ্গীতে হাত তুলে ওর মাথার টুপিটায় আস্তে একটা ঠেলা দিল। তারপর আর একটা। আবার একটা — যতক্ষণে না ওটা বিশ্রী ভাবে মাথার পিছন দিকে গিয়ে ঝুলে পড়ল। তারপর আবার ওটাকে টেনে এনে চোখ ঢেকে শক্ত করে বসিয়ে দিল। ওর ঐ অস্থিরতা দেখে মনে পড়ে গেল সেই বেকুব ইগোশা-'পকেটের ভিতরে মৃত্যু'র কথা।

'অনেক মাছই আমাদের ঘোলা জল আরো ঘুলিয়ে তুলতে শুরু করেছে,' বলল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ।

কর্মচারীর মতো দেখতে লোকটি শান্তকণ্ঠে বলল:

'আমাকে লক্ষ্য করে বলছ?'

'যদি বলেই থাকি তো কী!'

লোকটি তখন আবার তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়তাভরা কণ্ঠে বলল:

'তাহলে তোমার নিজের সম্পর্কে কী বলতে চাও ভাই?'

'আমার নিজের সম্পর্কে যা বলবার তা আমি বলি শুধু ভগবানের কাছে — সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার।'

'না, হে না ভাই, ওটা আমারও ব্যাপার,' বেশ জোরের সঙ্গেই বিজয়গর্বে বলে উঠল আগন্তুক। 'সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কিংবা আত্মস্ফীতিতে চোখ দুটোকে অন্ধ করে ফেলো না। ভগবান আর মানুষের কাছে পাপ করেছ অনেক।'

যেমন করে ও পিওতর ভাসিলিয়েভিচকে ভাই বলে সম্বোধন করল তাতে খুব ভালো লাগল আমার। ওর শান্ত বিজয়ী কণ্ঠস্বরে আমার অন্তর বিচলিত হয়ে উঠল। ভালো পুরুত যেমন করে উচ্চারণ করে শোনায় 'প্রভু ভগবান, এই মর-মানবের সৃষ্টিকর্তা' তেমনি করেই ও কথা বলছিল। আর বলতে বলতে নিজের মুখের কাছে হাতটা তুলে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছিল চেয়ারের ধারের দিকে...

'আমার বিচার করবার কে তুমি? তোমার চাইতে আমি বেশি পাপী নই...'

'সামোভারটা কেমন করে গর গর ফোঁস ফোঁস করছে দেখো না!' তীক্ষ্ম বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল বুড়ো শাস্ত্রবাগীশ। কিন্তু আগন্তুক ওর কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বলতে লাগল:

'শুধু ঈশ্বরই জানেন কে পবিত্র আত্মার পূত ঝর্ণাধারার জল অপবিত্র করছে। হয়ত সেটা তোমাদেরই পাপে — বই পড়া পণ্ডিত লোকদের পাপ। বই কী আমি জানি না, শিক্ষা কাকে বলে তাও না। আমি সহজ সরল জীবন্ত মানুষ।'

'তোমার সরলতার কথা জানা আছে আমার — এসব কথা ঢের ঢের শুনেছি!'

'তোমরাই — বই-পড়িয়ে গোঁড়া ধর্মধ্বজীর দল, তোমরাই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছ। সহজ চিন্তাকে বিকৃত করে দিচ্ছ। আর আমি — বলতে পারো কী আমি প্রচার করি?'

'ধর্মদ্রোহিতা!' বলে উঠল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ। কিন্তু আগন্তুক তেমনি মুখের সামনে হাতের চেটোটা মেলে ধরে যেন ওখানে কিছু লেখা আছে এমনি করে আবেগের সঙ্গে বলে চলল:

'মানুষকে এক খোঁয়াড় থেকে আর এক খোঁয়াড়ে সরিয়ে দিয়ে ভাবছ

তোমরা তাদের অদৃষ্টের উন্নতি করলে? আমি বলছি তোমাদের, মোটেই তা নয়। আমি বলছি তোমাদের — নিজেকে মুক্ত করো হে মানব! বাড়িঘর, স্ত্রী, সম্পত্তি — কতটুকু মূল্য তার ঈশ্বরের কাছে? নিজেকে মুক্ত করো, হে মানব — যা কিছু ডেকে আনে হিংসা, নরহত্যা — সবকিছু থেকে। মুক্ত করো নিজেকে সোনা রূপো ধনদৌলতের বন্ধন থেকে। কারণ ওগুলো ধুলো মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীর মাটিতে মানুষ তার মুক্তি খুঁজে পাবে না। পাবে শুধু স্বর্গের উপত্যকায়। সবকিছুই অস্বীকার করো, আমি বলছি, যা কিছু তোমাকে এই সংসারে বেঁধে রেখেছে সে সমস্ত বাধা-বন্ধন ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলো — কারণ এ সবকিছুই হচ্ছে খৃষ্ট-দ্রোহীর সৃষ্টি। এই অন্ধকারময় সংসারকে অস্বীকার করে অটল প্রেরণায় সোজা সংকীর্ণ পথে আমার যাত্রা...'

'ভাত-জল, গায়ে ঢাকা দেবার জামা কাপড়, এগুলোও কি অস্বীকার করো? এ সবকিছুই তো এই পৃথিবীরই!' বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

কিন্তু এ কথায় আলেক্সান্দার একটুকুও বিচলিত হল না। তেমনি আবেগভরা সুরে কথা বলে চলল। ওর গলার স্বর যখন নেমে আসে মনে হয় যেন একটা পিতলের জয়ঢাক গম গম করে উঠছে:

'হে মানব! কোথায় রয়েছে তোমার ধন-সম্পদ? একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে, নিষ্কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াও গিয়ে তাঁর সামনে। আত্মার চারপাশ থেকে এই সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তাকাও তোমার ঈশ্বরের দিকে। তুমি একা। তিনিও একা। এমনি করেই এগিয়ে যাও তোমার ঈশ্বরের কাছে। এই একটি মাত্র পথই আছে তাঁর কাছে পৌঁছবার। জ্ঞানীরা বলেন: বাপ-মা, সবকিছু পরিত্যাগ করে, যে চোখ তোমাকে প্রলুব্ধ করে সে চোখ উপড়ে ফেলে মুক্তি অন্বেষণ করো। প্রভুকে পাবার জন্যে তোমার স্থূল সত্তাকে ধ্বংস করে ফেলো। শুধু আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখো যাতে স্বর্গীয় প্রেমে অনন্তকালের জন্যে তোমার আত্মা চিরভাস্বর হয়ে ওঠে...'

'ছ্যা ছ্যা, জাহান্নামে যা,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ, 'ভেবেছিলাম গত বছরের চাইতে এবারে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি অন্তত খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু দেখছি আগের চাইতেও আরো খারাপ।'

বুড়ো ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আলেক্সান্দার কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কিছুটা অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কি চলে যাচ্ছ? সে কী?'

কিন্তু ভদ্র লুকিয়ান চোখ টিপে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল:

'ঠিক আছে... ঠিক আছে...'

কিন্তু আলেক্সান্দার ফেটে পড়ল ওর উপরে:

'তুমিও এই সংসারের বিবেক-বুদ্ধিহীন মানুষ, আগাছার বীজ বুনে চলেছ। এর তাৎপর্য কী? দুবার তিনবার করে হাল্লেলুইয়া গাওয়া।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে একটু হেসে লুকিয়ানও বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। আর সে বড়ো সাকরেদের দিকে ফিরে দৃঢ় প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলল:

'আমার আত্মিক শক্তি ওরা সইতে পারল না, সইতে পারল না। আগুন থেকে যেমন ধোঁয়া পালিয়ে যায় তেমনি করে ওরা পালিয়ে গেল।'

বড়ো সাকরেদ চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তারপর শুকনো গলায় বলল:

'ওসব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে যাই না।'

আগন্তুক যেন আঁৎকে উঠল ওর কথায়। টুপি নামিয়ে বিড় বিড় করে বলল:

'মাথা না ঘামিয়ে পারবে কী করে? এসব বিষয় নিয়ে ভাবতেই হবে যে তোমাকে। সেটাই যে ওদের নিজস্ব দাবী...'

লোকটি নীরবে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর বুড়োরা ওকে ডাকতেই বিদায়টুকু পর্যন্ত না জানিয়েই তিনজনে বেরিয়ে চলে গেল।

এই লোকটি অন্ধকার রাত্রে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা একটা আগুনের মতো হঠাৎ এসে দাঁড়াল আমার চোখের সামনে। একবার জ্বলছে আবার নিভে আসছে। পার্থিব সবকিছুকে তার এই অস্বীকৃতির মধ্যে যেন কিছুটা সত্যি আছে, সে সত্য আমাকে আলোড়িত করেছিল।

সন্ধ্যাবেলা এক সুযোগে আমাদের কারখানার প্রধান ওস্তাদ ইভান লারিওনোভিচকে খুব উৎসাহের সঙ্গেই বললাম ওর কথা। খুব শান্ত ভদ্র গোছের মানুষ ইভান লারিওনোভিচ। আমার সব কথা শোনার পরে সে বলল:

'নিশ্চয়ই 'পলাতকদের' কেউ — ওটা একটা সম্প্রদায়। ওরা কোনো কিছুই স্বীকার করে না।'

'কী করে বাঁচে ওরা?'

'ঘুরে ঘুরে — দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ায়। তাই ওদের বলা হয় 'পলাতক'। ওরা বলে পৃথিবী আর পৃথিবীর সবকিছুকেই ত্যাগ করতে হবে। সেইজন্যেই পুলিস ওদের বিপজ্জনক বলে খুঁজে খুঁজে ধরে।'

আমার জীবন বেশ ভালো রকমই কটুস্বাদ। তবুও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না কেমন করে পৃথিবীর সবকিছুই পরিত্যাগ করা সম্ভব। সে সময়ে আমার চারপাশের জীবনের ভিতরে এমন বহুকিছুই দেখতে পেতাম যা প্রিয়, চিত্তাকর্ষক। আলেক্সান্দারের কথা আমার স্মৃতি থেকে অল্পদিনের মধ্যেই মুছে গেল।

কিন্তু কোনো কোনো সময়ে দুঃখের মুহূর্তে বনের দিকের সংকীর্ণ ধূসর মেঠো পথ বেয়ে পায়ে হেঁটে তার মূর্তি এসে হাজির হত আমার স্মৃতিপথে। কাজ করে নোংরা হয় নি এমন ধবধবে সাদা হাতে সে মূর্তি অস্থির ভাবে লাঠিতে ভর দিত। আর বিড় বিড় করে বলত:

'সোজা সংকীর্ণ পথে আমার যাত্রা, সবকিছুই আমি ত্যাগ করেছি! সমস্ত বন্ধন চূর্ণ করে ফেলো, সব বন্ধন...'

ওরই পাশে দেখতে পেতাম আমার বাবাকে, যে-মূর্তিতে তিনি এসে দেখা দিতেন দিদিমার স্বপ্নে। হাতে বাদাম গাছের লাঠি, ডোরা ডোরা দাগওয়ালা একটা কুকুর জিভ লক্ লক্ করে চলেছে তাঁর পিছু পিছু...

১৩

একটা আধা-পাথুরে বাড়ির দুখানা ঘর নিয়ে ছিল আইকন কারখানা। একটা ঘরের তিনটে জানালা উঠোনের দিকে আর দুটো বাগানের দিকে। অন্য ঘরটার একটা জানলা বাগানের দিকে, আর একটা রাস্তার দিকে। জানালাগুলো ছিল ছোট ছোট চৌকো। জানালার কাঁচ এত পুরনো যে সাত-রঙা রামধনুর মতো হয়ে উঠেছে। শীতের বিলীয়মান ক্ষীণ আলোর রেখা তাতে প্রায় ঢুকতেই পেত না।

দুটো ঘরই টেবিলে ভর্তি। প্রত্যেক টেবিলে এক একজন এমন কি দুজন পর্যন্ত পটুয়া মাথা নুইয়ে কাজ করে চলেছে। সিলিং থেকে দড়ির সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে জলভরা কাঁচের গোলক, যাতে বাতির আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠান্ডা সাদা আলো এসে পড়ে আইকনের চৌকো বোর্ডের উপরে।

কারখানার ভিতরটা গরম, গুমোট। পালেখ, খোলুই, মস্তেরা থেকে প্রায় জনা বিশেক 'ঈশ্বর-পটুয়া' এসে জড়ো হয়েছে এখানে। সবার গায়ে সুতোর শার্ট। গলা খোলা। পরনে মোটা কাপড়ের ট্রাউজার। পায়ে জুতো নেই।

থাকলেও তা অত্যন্ত জীর্ণ। পটুয়াদের মাথাগুলো কড়া তামাকের ধূসর ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা। তিসির তেল, বার্ণিশ আর পচা ডিমের গন্ধে বাতাস ভারি। তার সঙ্গে গরম আলকাতরার মতো ঘন স্রোতে বইত একটা ভ্লাদিমির অঞ্চলের সঙ্গীত:

হায় রে হায় — সরম তোদের নাই,
ছোঁড়াটাকে পটাতে দিলি ছুঁড়িটাকে তাই...

অন্যসব গানও গাইত — সেগুলোও এমনি আনন্দহীন। কিন্তু এই গানটাই ছিল ওদের সবচাইতে প্রিয়। গানটার দীর্ঘ একটানা সুর কারুর চিন্তায় কোনো বাধা দিত না, কোনো অসুবিধা হত না ফারের সরু তুলির টানে রেখা আঁকতে, কিংবা সাধুদের পোশাকের ভাঁজ রঙ করতে, অথবা সাধুদের হাড়-বের-করা মুখে দুঃখ ভোগের সূক্ষ্ম রেখা ফুটিয়ে তুলতে। জানালার পথে ভেসে আসত খোদাইকার গোগলেভের হাতুড়ি চালানোর খুট খুট শব্দ। বুড়ো গোগলেভ মাতাল। বিরাট টকটকে লাল নাক। হাতুড়ির তীক্ষ্ম শব্দ সেই অলস মন্থর সঙ্গীতের স্রোতকে বিদীর্ণ করত। মনে হত যেন একটা পোকা গাছের গুঁড়ির ভিতরে কুরে কুরে গর্ত করে চলেছে।

আইকন চিত্রণের কাজে কারুরই কোনো উৎসাহ ছিল না। কবে কোন এক দুষ্ট সরস্বতী সমস্ত কাজটাকে কয়েকটা ধরাবাঁধা প্রক্রিয়ায় ভাগ ভাগ করে রেখেছে। তার কোনোটার ভিতরে কোনো সৌন্দর্য ছিল না। তাই ঐ কাজের উপরে ভালোবাসা জন্মানো বা উৎসাহ জেগে ওঠা ছিল অসম্ভব। ট্যারা-চোখ ছুতোর মিস্ত্রি পানফিল ছিল সংকীর্ণচিত্ত হিংসুটে গোছের একটা লোক। সাইপ্রাস আর লিন্ডেন কাঠের তক্তা সে নিয়ে আসত প্লেন করে, শিরীষ জুড়ে। ক্ষয়-রোগী ছোকরা দাভিদভ তার ভিত বানাত। তার বন্ধু সোরোকিন তক্তাগুলোকে সোনালী রঙ করার জন্যে তৈরী করে তুলত। কোনো একটা মূল ছবি থেকে মিলিয়াশিন তার উপরে পেনসিলে নকল করত আইকনের মূর্তি। বুড়ো গোগলেভ তার উপরে সোনালী কাজ করে কারুকার্য ফুটিয়ে তুলত। পটভূমি-আঁকিয়েরা আঁকত দৃশ্যাবলী আর সাধুদের কাপড়চোপড়। তারপর আইকনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হত দেয়ালের গায়ে—মুণ্ডুহীন, হাতহীন অবস্থায়; সেটা আঁকার ভার মুখ-আঁকিয়েদের।

একটা বড়ো আইকন যেটা নাকি বেদী বা দোরের চৌখুপীর উপরে

বসানোর জন্যে তৈরী হচ্ছে সেটাকে হাত, পা আর মাথা ছাড়া শুধু দেবদূতের পোশাকবর্ম বা কোর্তায় দেখতে ভীষণ বিশ্রী লাগত। ঐ উজ্জ্বল রঙে আঁকা বোর্ডগুলোর ভিতর থেকে যেন জেগে উঠত মৃত্যুর আভাস। যে জীবন ওদের সঞ্জীবিত করে তুলবে তা এখনো ঠিক আসে নি। কিন্তু দেখে মনে হত সে জীবন যেন ছিল এক সময়ে, কাপড়চোপড়ের বোঝার ভার ফেলে রেখে তা রহস্যজনক ভাবে পালিয়ে গেছে।

মুখ-আঁকিয়েদের কাজ শেষ হয়ে গেলে পরে সেটা দেয়া হত একজন কারিগরের হাতে। সে চার-ধারের সোনালী কারুকার্যের উপরে এনামেল করত। বাণীগুলোও লেখানো হত একজন বিশেষ সুদক্ষ লোককে দিয়ে। তারপর সেই শেষ-হওয়া আইকনের উপরে ইভান লারিওনিচ নিজের হাতে লাগাত লাক্ষার বার্ণিশ। শান্ত শিষ্ট লোক ইভান লারিওনিচ, কারখানার ম্যানেজার।

ধূসর মুখ, ধূসর, রেশমী সূক্ষ্ম দাড়ি। ধূসর চোখ। মনে হত যেন বিশেষ রকমের গভীর, ব্যথাতুর। হাসত অমায়িক ভাবে। কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হত ওর হাসির প্রতিদানে হেসে ওঠা অন্যায় হবে। ওকে দেখাত ঠিক যেন সিমেওন স্তোল্পনিকের আইকনের মতো—তেমনি ক্ষীণ দেহ, শীর্ণ। দুটো চোখের স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি তেমনি ভাব-গম্ভীর, মানুষ দেয়াল—সব ছাড়িয়ে তেমনি সুদূরের পানে নিবদ্ধ।

আমি কারখানায় ভর্তি হবার কয়েক দিন পরে কারখানার ধ্বজা-পটুয়া, সুন্দর চেহারার জোয়ান এক দন কসাক কাপেনদ্যুখিন, কাজে এল মাতাল হয়ে। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে মেয়েলী সুন্দর চোখ দুটো কুঁচকে নীরবে প্রত্যেককে তার লোহার মতো শক্ত মুঠোর ঘুষিতে মারতে শুরু করল। ওর অনতিবৃহৎ নমনীয় ক্ষিপ্র দেহটা কারখানাময় ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিল ইঁদুরভরা গুদামঘরে বেড়াল যেমন ঝাঁপিয়ে বেড়ায়। লোকগুলো হতবুদ্ধি হয়ে কোণের দিকে পালিয়ে গিয়ে লুকবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সেখান থেকে একজন আর একজনকে চিৎকার করে বলতে লাগল:

'মার বেটাকে, মার!'

মুখ-আঁকিয়ে ইয়েভগেনি সিতানভ একটা টুল তুলে ওর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওর তর্জন-গর্জন থামিয়ে দিল। মেঝের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কসাক। মুহূর্তের ভিতরে সবাই মিলে ওকে পেড়ে ফেলে তোয়ালে দিয়ে কষে বেঁধে ফেল্‌ল। আর ও বাঘের মতো দাঁত দিয়ে সে

বাঁধন কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। এতে আরো খেপে গেল ইয়েভগেনি। লাফ দিয়ে একটা টেবিলের উপরে উঠে দাঁড়াল। তারপর কনুই দুটো দুপাশে চেপে ধরে কসাকের গায়ের উপরে লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হল। ওর দেহের বিরাট ভারে নিশ্চয়ই কাপেনদ্যুখিনের বুকের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যেত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোট আর টুপি পরা লারিওনিচ এসে দাঁড়াল ওর পাশে। সিতানভের দিকে আঙ্গুল নেড়ে হুমকি দিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে শান্ত সহজ গলায় বলল:

'ওকে বাইরে নিয়ে যা। নেশা কাটতে দে...'

ওরা কসাককে টেনে হিঁচড়ে কারখানা থেকে বের করে গেটের কাছে নিয়ে গেল। তারপর টেবিল চেয়ার ঠিকঠাক করে যে যার কাজে লেগে গেল। কাজ করতে করতে ওরা আলোচনা করতে লাগল কাপেনদ্যুখিনের গায়ের জোর নিয়ে, ভবিষ্যৎ বাণী করে বলল এমনি মারপিট করেই ও এক দিন খতম হয়ে যাবে।

'ওকে খতম করা খুবই শক্ত,' কোনো বিষয়ে খুব ভালো জ্ঞান থাকলে লোকে যেমন করে বলে তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলল সিতানভ।

লারিওনিচের মুখের দিকে তাকালাম আমি। ভাবছিলাম কী করে এই জোয়ান উচ্ছৃংখল লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ওর কথার অমন বাধ্য হয়ে পড়ে।

ও সবাইকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিত কেমন করে কাজ করতে হয়। এমন কি সবচাইতে দক্ষ শিল্পী যারা তারাও স্বেচ্ছায় ওর উপদেশ চাইত। কাপেনদ্যুখিনকে শেখাতেই ওর সবচাইতে বেশি সময় ও কথা ব্যয় হত।

'শিল্পী বুঝলে কাপেনদ্যুখিন, তুমি হলে শিল্পী! শিল্পী তার কাজকে করে তুলবে জীবন্ত—ইতালীয় ধরনের। তৈল চিত্রে চড়া টোনের সামঞ্জস্য আসা চাই। কিন্তু তাকিয়ে দেখো দেখি কতোখানি সাদা রঙ দিয়েছ এখানে, তাই কুমারী মাতার চোখ দুটো হয়ে পড়ছে নির্জীব ঠান্ডা। গাল দুটো গোল আর লাল, কিন্তু চোখ দুটো ঠিক খাপ খায় নি। তাছাড়া ঠিক জায়গায় বসানোও হয় নি। একটা বসেছে নাকের খুব কাছে আর একটা উঠে গেছে কপালের উপরে। সুতরাং মুখখানা পবিত্র দেবভাবসম্পন্ন না হয়ে হয়েছে ধূর্ত ধূর্ত, পার্থিব মুখ। ভালো করে মন দাও না তুমি তোমার কাজে কাপেনদ্যুখিন।'

কসাক চোখ মুখ কুঁচকে শুনত ওর কথা। পরক্ষণে ওর মেয়েলী চোখ দুটো নির্লজ্জ হাসিতে ভরে উঠত। অত্যধিক পানের জন্যে একটু ভাঙাভাঙা এবং ফূর্তিবাজ গলায় বলত-:

'বুঝলে ইভান লারিওনিচ, আমার দ্বারা এসব হবার নয়। আমি জন্মেছিলাম গান বাঁধার জন্যে আর এসে পড়েছি কিনা—এক মঠে!'

'খুব ভালো করে চেষ্টা করলে যে কোনো জিনিসেই দক্ষতা অর্জন করা যায়।'

'এ সব কাজ কি আমাকে পোষায়? আমার হওয়া উচিত ছিল তেজী তিন ঘোড়ার ত্রয়কা গাড়ির কোচোয়ান, মানে...'

তারপর মুখটা যতদূর সম্ভব হাঁ করে খুলে উদ্দাম সুরে গেয়ে উঠত:

এ-এ-এ, তিন ঘুড়িতে জোর ছুটিয়ে তিনটে ঘোড়া যুতে
ছুটিয়ে দেব ঝলমলে ঐ তুষার ঝরা পথে,
বাদামী রঙ ঘোড়াগুলো চলবে যেন উড়ে,
এ-এ-এ, ছুটিয়ে দেব প্রিয়া আমার যেথায় বহুদূরে!

হার মেনে হেসে ফেলত ইভান লারিওনোভিচ। তারপর চশমাটা করুণ ধূসর নাকের উপরে ঠিকমতো বসিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেত। সঙ্গে সঙ্গেই ডজনখানেক গলা এক সঙ্গে গেয়ে উঠত। সবার মিলিত কণ্ঠের সুরে এমন এক শক্তিশালী সুর ধারার সৃষ্টি হত, যে মনে হত যেন গোটা কারখানাটাকেই শূন্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দোলা দিয়ে চলেছে।

ঘোড়াগুলোর জানা আছে পথের নিশানা
যে-দেশেতে থাকে ওগো আমার প্রিয়তমা...

শিক্ষানবীশ পাশকা ওদিনৎসভ ডিমের কুসুম আলাদা করার কাজ বন্ধ রেখে দুহাতে দুটো ডিমের খোলা নিয়েই সুন্দর চড়া সুরে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করে দিত।

সুরের নেশায় মাতাল হয়ে ওরা সব ভুলে যেত। একই তালে বইত ওদের নিঃশ্বাস, একটি আবেগে ভরে উঠত সবগুলো বুক। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ত কসাকের মুখের উপরে। গান গাওয়ার সময় সে হয়ে উঠত

কারখানার মালিক, সর্বেসর্বা। তখন সবাই থাকত ওর দিকে ফিরে। ওর হাতের প্রত্যেকটি ভঙ্গী অনুসরণ করে ওরাও হাত নাড়ত। এমন ভাবে হাত নাড়ত কসাক, মনে হত যেন এক্ষুণি উড়ে চলে যাবে। নিশ্চয় করে বলতে পারি এই সময়ে যদি ও হঠাৎ গান বন্ধ করে চিৎকার করে বলে উঠত, 'এস ভাই—এস সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলি!' তবে তক্ষুণি সবাই—এমন কি সবচাইতে দক্ষ সম্মানিত ওস্তাদরা পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের ভিতরেই গোটা কারখানাটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিতে পারত।

খুবই কম গান করত কাপেনদ্যুখিন। কিন্তু যখনই গাইত ওর উদ্দাম সঙ্গীত থেকে যেন এক সর্বজয়ী দুর্দমনীয় শক্তি ঝরে পড়ত। যার অন্তর যতোই ভারাক্রান্ত হোক না কেন ও এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারত যে সবাই সব শক্তি দিয়ে, সবার শক্তি এক করে একটিমাত্র অমোঘ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

এই সব গান শুনে আমার হিংসে হত গায়কের ওপর, লোকের ওপর ও যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারত তার জন্যে ঈর্ষা বোধ করতাম। বিস্ময়ে কল্পনায় পূর্ণ হয়ে উঠত আমার অন্তর, ফুলে উঠত প্রায় যন্ত্রণার সীমা পর্যন্ত, কান্না পেত। যারা গাইছে ইচ্ছে হত তাদেরকে ডেকে চেঁচিয়ে বলি:

'কতো ভালোবাসি আমি তোমাদের সবাইকে!'

হলদে বিবর্ণ, সর্বাঙ্গে লোমভরা ক্ষয়-রোগী দাভিদভ পর্যন্ত সদ্য ডিম-ফোটা দাঁড়কাকের ছানার মতো হাঁ করত।

কিন্তু অমন উদ্দাম ফুর্তির গান গাইত শুধু কসাক। পটুয়ারা সাধারণত গাইত ব্যথার গান—করুণ একটানা। যেমন 'মানব হৃদয় কঠিন নিঠুর গো', 'বনের ভিতর হায়, ঐ ছোটো বনের ভিতর দিয়ে' অথবা প্রথম আলেক্সান্দারের মৃত্যুর গান: 'কেমন করে এসেছিল মোদের আলেক্সান্দার দেখতে তাহার বীর সেনানীর দল'।

আমাদের কারখানার সেরা মুখ-আঁকিয়ে ঝিখারেভের কথামতো ওরা কখনো কখনো গাইবার চেষ্টা করত গির্জার গান। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হত কদাচিৎ। ঝিখারেভ এমন গান শুনতে চাইত যা সে ছাড়া আর কেউই বুঝে উঠতে পারত না। অন্যের গানের সমালোচনা করে চলত সে অনবরত।

রোগা পাতলা মানুষ ঝিখারেভ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। টাক মাথা ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে জিপসিদের মতো কোঁকড়া চুল। গোঁফের মতো মোটা

কালো ভ্রূ। ওর গাঢ় রঙের চমৎকার অরুশ মুখে ঘন ছুঁচলো দাড়ি সত্যিই ছিল একটা অলঙ্কার বিশেষ। কিন্তু অত মোটা ভুরু থাকায় তার বাঁকানো নাকের তলায় জ্বলজ্বলে গোঁফজোড়া নিতান্তই অবান্তর বলে মনে হত। ওর নীল চোখ দুটোর ভিতরে সমতা ছিল না—বাঁ চোখটা ডাইনেটার থেকে বেশ খানিকটা বড়ো ছিল।

'পাশকা!' আমারই সঙ্গী শিক্ষানবীশকে ও ডাকত গলা ছেড়ে, 'ধর্ 'তোমার নাম গুণ গাই'—শোনো সবাই!'

এপ্রোনে হাত মুছে পাশকা শুরু করত:

'তো-মা-র না-ম...'

'প্র-ভু-র না-মে,' বহু কণ্ঠে গান উঠত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠত ঝিখারেভ:

'ও জায়গাটা খাদে ধর্ ইয়েভগেনি! গলার স্বরটাকে অন্তরের গভীরে নামিয়ে দে...'

এমন সুর বের করত সিতানভ মনে হত যেন ও পিপের তলায় পিটছে:

'প্র-ভু-র ক্রীতদাস...'

'আরে ছ্যাঃ, অমন করে নয়! এমন ভাবে গলা ছাড়তে হবে যাতে মাটি কেঁপে উঠবে, দোর জানালা আপনা থেকে খুলে যাবে!'

কী এক দুর্বোধ্য উত্তেজনায় ঝিখারেভের সমস্ত শরীর বেঁকেচুরে উঠত। অদ্ভুত ভ্রূজোড়া একবার উঠত একবার নামত। ভেঙ্গে যেত গলার স্বর। হাতের আঙুলগুলো খেলা করত যেন এক অদৃশ্য তারের ওপর।

'প্রভুর দাসানুদাসেরা—দেখতে পাচ্ছ না তোমরা?' অর্থপূর্ণ ভাবে জিজ্ঞেস করত ঝিখারেভ, 'খোসা ছাড়িয়ে সোজা মর্ম কথাটি অনুভব করতে হবে। তোরা প্রভুর গুণ গা, ওরে অধম দাসেরা। অনুভব করতে পারছ না তোমরা, ভালো মানুষেরা?'

'জানেনই তো, ঠিক ওখানটায় আমরা পেঁছতে পারি না,' খুব চতুর ভাবে জবাব দিত সিতানভ।

'ঠিক আছে তাহলে, ছেড়ে দাও!'

কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিত ঝিখারেভ। ও হচ্ছে এখানের সেরা ওস্তাদ। বাইজাণ্টীয় কিংবা ফ্রইয়াঝস্কি, বা ইতালীয় রীতি অনুসারে মুখ আঁকতে পারত সে। বেদীর উপরে স্থাপনের জন্যে যখনই কোনো আইকনের বায়না নিত লারিওনিচ তখনই

সে আলোচনা করত ঝিখারেভের সঙ্গে। মূল চিত্রের শিল্পকলার সূক্ষ্ম বিচারে ঝিখারেভ ছিল সুনিপুণ। অঘটনঘটন-পটিয়সী আইকনের যেমন—ফিওদোরভ, স্মোলেনস্ক, কাজানের কুমারী মাতার দামী দামী নকল তৈরী হত ওর হাত দিয়েই। কিন্তু মূল চিত্রগুলো লক্ষ্য করে দেখতে দেখতে সরবে অভিযোগ করত ঝিখারেভ:

'মূল ছবিগুলোর সঙ্গে আমাদের হাত পা বাঁধা, একেবারেই বাঁধা!'

পদাধিকারের দিক থেকে কারখানার ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঝিখারেভ ছিল সবচাইতে বিনয়ী। সবচাইতে বেশি সদয় ব্যবহার করত ও শিক্ষানবীশদের সঙ্গে--পাভেল আর আমার সঙ্গে। শিল্পকলা শেখাবার যা কিছু সদিচ্ছা দেখেছি তা শুধু ওর মধ্যেই।

ওকে বুঝে ওঠা ছিল খুবই কঠিন। মোটের উপর তেমন হাসি-খুশি লোক ছিল না ও। কোনো কোনো সময়ে এক নাগাড়ে হপ্তাখানেক ধরে বোবা কালার মতো মুখ বুজে কাজ করে যেত। বিস্ময়ভরা অপরিচিতের দৃষ্টি মেলে তাকাত সবার দিকে, যেন এই প্রথম সে দেখল আমাদের। গান খুব ভালোবাসলেও এই সময়টা সে থাকত চুপচাপ। মনে হত যেন অন্যের গানও তার কানে ঢুকছে না। সবাই ওকে দেখত তাকিয়ে তাকিয়ে আর পিছনে চোখ টেপাটিপি করত। আইকন বোর্ডটার একদিক হাঁটুর উপরে রেখে আর একদিক টেবিলের কিনারে ঠেকিয়ে পরম যত্নে সরু তুলির আঁচড়ে ও এঁকে চলত ওর নিজের মুখেরই মতো কালো আর অপরিচিত একখানা মুখ।

এক এক সময়ে হঠাৎ আহত কণ্ঠে সংক্ষেপে বলে উঠত:

"প্রেদতেচা'—তার মানেটা কী? প্রাচীন স্লাভনিক ভাষায় 'তেচ' মানে যাওয়া আর 'প্রেদ' মানে আগে। সুতরাং 'প্রেদতেচা' মানে 'যে আগে যায়'। অর্থাৎ অগ্রদূত, তার বেশি কিছু নয়...'

সবাই নীরবে হাসাহাসি করত আর আড়চোখে তাকাত ওর দিকে। ওর অদ্ভুত কথাগুলো ঝঙ্কৃত হতে থাকত সেই নীরবতায়:

'ওঁর গায়ে ভেড়ার চামড়ার পোশাক থাকা উচিত নয়, থাকা উচিত ডানা...'

'এই, কার সঙ্গে কথা বলছ?' কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করত।

কিন্তু সে কোনো জবাব দিত না। হয়ত প্রশ্নটা শুনতেই পেত না, নয়ত ইচ্ছে করেই জবাব দিত না। তারপর প্রতীক্ষমাণ নীরবতায় আবার শোনা যেত ওর কথা:

'তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত জানা উচিত, কিন্তু কেই বা তা জানে, কে জানে ঐ সব পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থের কথা? কী জানি আমরা? বেঁচে আছি—ডানা খসে গেছে... আত্মা কোথায়? কোথায় আত্মা? সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি আমি তোমাদের। মূল ছবি আছে আমাদের কাছে—সত্যি কথা। কিন্তু প্রাণ নেই...'

ওর ঐ সরব চিন্তায় সবার ঠোঁটেই হাসি দেখা দিত। হাসত না শুধু সিতানভ। প্রায়ই প্রতিবারই কেউ না কেউ বিদ্রূপ করে বলত:

'শনিবারে ও ঠিক মদের আড্ডায় যাবে, দেখিস।'

লম্বা পেশল দেহ, বাইশ বছরের তরুণ সিতানভ। দাড়িগোঁফহীন গোল মুখ, এমন কি ভ্রূ পর্যন্ত নেই। গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকত কোণের দিকে।

মনে আছে একদিন ঝিখারেভ ফিওদোরভ-কুমারীর শেষ-করা ছবিটা টেবিলের উপরে রেখে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠেছিল:

'শেষ হল, পুণ্যবতী জননী, অতল পানপাত্র, যার ভিতরে মানুষের হৃদয় নিংড়নো অশ্রুধারা ঝরে পড়বে...'

তারপর কার একটা কোট কাঁধের উপরে ফেলে বেরিয়ে চলে গেল সরাইখানার উদ্দেশে। তরুণেরা হেসে উঠল, শিস দিতে লাগল। বয়স্করা ঈর্ষাকাতর বুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু সিতানভ আইকনটার সামনে গিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে বলল:

'খাবেই তো মদ। ছবিটা অন্য কেউ নিয়ে যাবে এই দুঃখে মদ খাবেই তো। এ জিনিস সবাই বুঝে উঠতে পারে না।'

ঝিখারেভের মদের তোড় সাধারণত শুরু হত শনিবার। সেটা সাধারণ মদ্যপ শ্রমিকদের একটু বেশি মদ খাওয়ার ব্যাপার নয়। ঝিখারেভের মদ শুরু হত এই ভাবে: সকাল বেলা ও একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিত পাভেলের হাত দিয়ে। তারপর দুপুরের খাওয়ার একটু আগে বলত গিয়ে লারিওনিচকে:

'আজ আমি স্নানের ঘরে যাব।'

'অনেক দিনের জন্যে?'

'মানে, এখন...'

'মঙ্গলবারের বেশি দেরি করো না যেন!'

ভ্রূ নাচিয়ে আর টাকভরা মাথাটা দুলিয়ে সম্মতি জানাত ঝিখারেভ।

স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে ফুলবাবুর মতো পোশাক-আশাক পরে সেজেগুজে নিত ঝিখারেভ। পরত শার্ট-ফ্রণ্ট আর গলাবন্ধ। লম্বা একটা রুপোর চেইন ঝুলিয়ে দিত সিল্‌কের ওয়েস্ট কোটের পকেটে। তারপর পাভেলকে আর আমাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে বলে যেত:

'আজ সন্ধ্যায় কারখানাটা একটু ভালো করে যত্ন নিয়ে সাফসুফ করে রাখিস। লম্বা টেবিলগুলো চেঁছে ধুয়ে পরিষ্কার করিস।'

হঠাৎ ছুটির দিনের মেজাজ দেখা দিত সবার মনে। আঁকিয়েরা তাড়াতাড়ি তাদের টেবিল গুছিয়ে ছুটত স্নানের ঘরের দিকে। ফিরে এসে নাকে মুখে গুঁজে সেরে নিত সন্ধ্যার খাওয়া। সন্ধ্যার খাওয়ার পরে ঝিখারেভ ফিরে আসত বিয়ার, মদ, আর খাবার নিয়ে। ওর পিছনে পিছনে আসত একটি স্ত্রীলোক। বিরাট চেহারা যেন প্রায় দানবী বিশেষ। লম্বায় ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আমাদের সমস্ত চেয়ার-টুলগুলোকে ওর কাছে যেন খেলনা মনে হত। এমন কি লম্বা সিতানভকে পর্যন্ত ওর তুলনায় দেখাত যেন নেহাৎ শিশুর মতো। স্ত্রীলোকটির দেহ সুগঠিত, কিন্তু স্তন দুটো উঁচু করে থুতনির কাছ পর্যন্ত ঠেলে তুলে দেয়া। ওর চলা-ফেরার ভঙ্গী ধীর, স্থূল। যদিও স্ত্রীলোকটির বয়েস চল্লিশের উপরে কিন্তু ওর ঘোড়ার মতো বড়ো বড়ো দুটো চোখ শুদ্ধ ভাবলেশহীন গোল মুখখানা তখনো তাজা, মসৃণ। ছোট মুখখানা যেন সস্তা দামের পুতুলের মতো রঙ করা। হেসে হেসে সবার দিকে তার চওড়া উষ্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অনাবশ্যক মন্তব্য করে যেত মেয়েটা:

'কেমন আছো? বড্ডো শীত পড়েছে আজ। তোমাদের ঘরটায় কী গন্ধ! বোধ হয় রঙের গন্ধ। কেমন আছো?'

ওকে বেশ দেখতে লাগত। এমন সবল প্রশান্ত চেহারা — ঠিক যেন একটা চওড়া স্রোতস্বতী নদী। কিন্তু যখন কথা বলত তখনই বিরক্তিকর মনে হত। বোকা বোকা অবান্তর কথা বলত কেবলি। কোনো একটা কথা বলার আগে লাল লাল গাল দুটো ফুলিয়ে মুখখানা আরো গোলগাল করে তুলত।

তরুণেরা হাসত খিল খিল করে আর পরস্পর কানাকানি করত:

'মাল বটে একখানা!'

'আস্তো একখানা গির্জার চুড়ো!'

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে আর বুকের তলায় হাত দুখানা রেখে বসত

সামোভারের পিছন দিকের টেবিলে। আর সেখান থেকে তার নিরীহ গোছের ঘোড়ার মতো চোখ মেলে একে একে সবার দিকে তাকাত।

সবাই সম্ভ্রমভরা ব্যবহার করত ওর সঙ্গে। ছোকরারা তো ওর সম্মানে উঠেই দাঁড়াত ভয়ে ভয়ে। কোনো ছোকরা হয়ত ওর বিশাল দেহটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কিন্তু ওর সর্বগ্রাসী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্রই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে মাথা নিচু করত। ঝিখারেভও ওকে খুব সমাদর করত। তার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা কইত। ডাকত 'পড়শী' বলে। আর টেবিল থেকে যখনি কোনো জিনিস তুলে দিত ওর হাতে তখনই মাথা নোয়াত সম্ভ্রমের সঙ্গে।

'না, না, আমার জন্যে অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই,' মিষ্টি গলায় টেনে টেনে বলত মেয়েটা, 'কী কষ্টটাই না দিচ্ছি, সত্যি!'

কোনো কিছুতেই যেন ওর কোনো তাড়া ছিল না। ওর হাত দুটো নড়ত শুধু কনুইয়ের কাছ থেকে নিচু পর্যন্ত। আর কনুই দুটো চেপে ধরে রাখত পাঁজরার সঙ্গে। আর ওর বিশাল দেহ থেকে বেরিয়ে আসত টাটকা সেঁকা রুটির মতো গন্ধ।

বুড়ো গোগলেভ আহ্লাদে গদ গদ হয়ে ওর অশেষ স্তুতি গেয়ে চলত। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নুইয়ে ও শুনে চলত তার প্রশস্তি। যেন গির্জার পুরুত পড়ে চলেছে উপাসনার বাণী। বলতে বলতে যখনই গোগলেভ কথার খেই হারিয়ে ফেলত, ও নিজের কথা শুরু করে দিত:

'বয়েসকালে আমি দেখতে তেমন সুন্দরী ছিলাম না। রূপ খুলতে শুরু করল মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। ত্রিশ বছর বয়সে এমন সুন্দরী হয়ে উঠলাম যে ভদ্দর লোকেরা পর্যন্ত নজর দিতে আরম্ভ করল। সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক তো একটা গাড়ি আর ঘোড়া দিতে চেয়েছিলেন...'

কাপেনদ্যুখিন ইতিমধ্যেই মাতাল হয়ে পড়েছে। উস্কখুস্ক চেহারা। তীব্র দৃষ্টিতে কটমট করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠল:

'কিসের বদলে?'

'আমার ভালোবাসার বদলেই, নিশ্চয়,' অভ্যাগতা ব্যাখ্যা করল।

'ভালোবাসা,' কেমন যেন একটু বিব্রত হয়েই গজ গজ করে উঠল কাপেনদ্যুখিন, 'ভালোবাসার মানেটা কী?'

'আপনার মতো সুপুরুষের ভালোবাসার সম্বন্ধে সবকিছুই নিশ্চয় জানা আছে,' সহজ ভাবেই জবাব দিল স্ত্রীলোকটি।

উচ্চ হাসির ধমকে গোটা কারখানাটাই কেঁপে উঠল। আর সিতানভ কাপেনদ্যুখিনের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে উঠল:

'মেয়েছেলেটা নিরেট বোকা — বোকারও অধম। ওর মতো একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেমে পড়া নিতান্তই দুর্ভোগের ব্যাপার, সন্দেহ নেই...'

মদের নেশায় মুখখানা পাংশু হয়ে উঠেছে। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চতুর চোখে ফুটে উঠেছে হুঁশিয়ারি আলো। কুৎসিত নাকটা নেড়ে হাতের আঙ্গুলে ফোলা ফোলা চোখ দুটো মুছে জিজ্ঞেস করল বুড়ো গোগলেভ:

'কটা ছেলেপুলে হয়েছিল তোমার?'

'মাত্র একটি...'

একটা বাতি ঝুলছে টেবিলের উপরে, আর একটা উনুনের ওপাশে কোণের দিকে। এই অপর্যাপ্ত আলোয় কারখানার কোণে কোণে জমে উঠেছে ঘন কালো ছায়া। আর তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে মুণ্ডহীন কতগুলো মূর্তি। হাত আর মুখের জায়গার শূন্য ধূসর দাগগুলো জাগিয়ে তুলছে অলৌকিক কল্পনা। আগের চাইতেও বেশি করে মনে হচ্ছে রহস্যজনক ভাবে সাধুরা তাদের রঙ্গিন কাপড়চোপড় ম্লান-আলোয়-ভরা এই ঘরের ভিতরে ফেলে রেখে সশরীরে অন্তর্ধান করেছেন। কাঁচের গোলকগুলো তুলে আটকে দেয়া হয়েছে সিলিং'এর সঙ্গে। সেখানে ধোঁয়ার ঘন মেঘের ভিতরে সেগুলো নীলাভ দ্যুতিতে মিট মিট করছে।

সবাইকে অতিথির মতো আপ্যায়ন করে টেবিলের চতুর্দিকে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝিখারেভ। ওর টাকভরা মাথাটা একবার এরদিকে একবার ওরদিকে ঝুঁকে পড়ছে। আর হাড্ডিসার আঙ্গুলগুলো সমানে নড়ছে। ও যেন আরো কৃশ, আরো রোগা হয়ে উঠেছে। ঈগলের মতো নাকটা হয়ে উঠেছে আরো তীক্ষ্ম। যখন আলোর সামনে দাঁড়াচ্ছে গালের উপরে এসে পড়ছে ঐ বাঁকানো নাকটার লম্বা কালো ছায়া।

'প্রাণভরে খানা পিনা করো ভাই সব,' রিনরিনে গলায় বলে উঠল ঝিখারেভ।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েছেলেটিও মিষ্টি গলায় বলে উঠল যেন সেই এ ভোজ সভার গৃহকর্ত্রী:

'আহা পড়শী, কেন আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন? সবারই নিজের নিজের

হাত মুখ আছে। কেউ তো আর পেটে যা ধরে তার বেশি খেতে পারে না!'

'ফুর্তি করো ভাই সব,' উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল ঝিখারেভ, 'আমরা সবাই ঈশ্বরের দাস, বন্ধুগণ, এসো আমরা সবাই মিলে 'তোমার নাম গুণ গাই' গানটা গাই...'

গানটা জমল না। ইতিমধ্যে সবাই মদে খাবারে টইটম্বুর হয়ে আধ-মাতাল হয়ে পড়েছে। কাপেনদ্যুখিন তুলে নিয়েছে একটা একর্ডিয়ান, আর দাঁড়কাকের মতো কালো চেহারা, গম্ভীর মুখ তরুণ ভিক্তর সালাউতিন তাম্বুরিনে টোকা দিয়ে চলেছে। গম্ভীর গমগমে আওয়াজের সঙ্গে ধারের ছোট ছোট খঞ্জনীর হালকা মিষ্টি আওয়াজ জেগে উঠল।

'রুশ নাচ হোক!' ফরমাশ করল ঝিখারেভ, 'পড়শী আসুন!'

'হা আমার কপাল!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি, 'কী কষ্টটাই না করছেন আপনি!'

হেঁটে গিয়ে স্ত্রীলোকটি ঘরের মেঝের মাঝখানে এসে বিরাট গম্বুজের মতো অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরনে বাদামী রঙের চওড়া একটা স্কার্ট, গায়ে হলদে কাপড়ের ব্লাউজ আর মাথায় লাল রঙের রুমাল।

উচ্ছল সুরে বেজে উঠল একর্ডিয়ান। ছোট ছোট খঞ্জনীগুলোর ঝঙ্কার তুলে গভীর ভারি আওয়াজে বেজে উঠল তাম্বুরিন। ভারি বিশ্রী লাগছে শুনতে। মনে হচ্ছে যেন কতগুলো উন্মাদ কাঁদছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে আর মাথা কুটছে দেয়ালের গায়ে।

ঝিখারেভ নাচতে জানত না। সে শুধু তার চকচকে বুটের গোড়ালি ঠক ঠক করে পা বদলাচ্ছিল আর বেতালা ভাবে ছোট ছোট ছাগল-লাফ দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পা দুটো বুঝি ওর নিজের নয়। সমস্ত শরীরটাকে এমন সাংঘাতিক ভাবে দোমড়াচ্ছিল যেন জালের ভিতরে মাছি বা জালে-পড়া মাছ। সে এক করুণ দৃশ্য। কিন্তু সবাই এমন কি যারা মাতাল হয়ে পড়েছে তারাও একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ওর সেই অঙ্গ-বিক্ষেপের অনুকরণ করে চলেছে। তাদের চোখগুলো ওর হাত আর মুখে নিবদ্ধ। ঝিখারেভের হাবভাব ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত ভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে লাজুক বিনম্র, পরক্ষণেই আবার গর্বিত কুটিল ভ্রূকুটী। হঠাৎ কিসের জন্যে যেন বিমূঢ় হয়ে চিৎকার করে উঠে চোখ বুজছে। যখন আবার চোখ মেলছে, মনে হচ্ছে যেন দারুণ দুঃখের ভারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। কখনো বা হাত মুঠো করে চুপি চুপি

এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েমানুষটির কাছে। তারপর হঠাৎ পা ঠুকে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ভ্রূ তুলে আবেগভরা উষ্ণ হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর মুখের ওপর। মেয়েমানুষটিও তাকাচ্ছে চোখ নামিয়ে। প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবসুলভ শান্ত কণ্ঠে সাবধান করে দিল:

'আপনি নিজেকে একেবারে শেষ ফেলবেন দেখছি, পড়শী!'

চেষ্টা করল করুণাভরা মধুভঙ্গীতে চোখ বুজতে। কিন্তু তিন কোপেকী পয়সার মতো ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ কিছুতেই বন্ধ হতে চাইল না, ফলে কুঁচকনো বলিরেখা ফুটে উঠে কেমন যেন কুশ্রী দেখাল ওকে।

নাচিয়ে হিসেবে মেয়েটিও কিছু নয়। শুধু বিশাল দেহটা ধীরে ধীরে দুলিয়ে নিঃশব্দে এখান থেকে ওখানে সরে সরে যায়। বাঁ হাতে ধরা একটা রুমাল। সেটাকে দোলায় মন্থর ভাবে। ডান হাতটা কোমরের উপরে। তাতে একটা বিরাট জলের কুঁজোর মতো দেখায় ওকে।

ঐ পাথুরে মূর্তিটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচার সময়ে পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগের সংঘাত ফুটে উঠত ঝিখারেভের মুখের উপরে। মনে হত ও একজন নয়, নাচছে বিভিন্ন ধরনের দশটি লোক: একজন লাজুক, নম্র, আর একজন রুক্ষ, ভয়ংকর। তৃতীয়জন আবার নিজেই ভীত, ঐ অতিকায় কুশ্রী নারীর কাছ থেকে পিছলে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করতে করতে মৃদু চিৎকার দিয়ে উঠছে। তারপর আহত কুকুরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে সমস্ত শরীরটাকে বাঁকিয়ে কুঁকড়ে হঠাৎ এসে হাজির হচ্ছে আর একজন। এই কুৎসিত নাচ আমাকে পীড়িত করত। সেই সৈনিক, রাঁধুনী, ধোপানী আর লুচ্চামির কুৎসিত স্মৃতি জাগিয়ে তুলত।

মনে পড়ত সিদরভের সেই কথা:

'এসব ব্যাপারে সবাই মিছে কথা বলে। লজ্জা পায়, কারণ কেউ কাউকে সত্যি করে ভালোবাসে না — এ সব করে শুধু মজা লোটার জন্যে।'

'এসব ব্যাপারে সবাই মিছে কথা বলে' এ কথা বিশ্বাস করতে আমি চাইতাম না। রাণী মার্গোর সম্পর্কে কী বলব তাহলে? তাছাড়া ঝিখারেভ নিশ্চয়ই মিছে কথা বলত না। জানতাম সিতানভ একটি বেশ্যা মেয়েকে ভালোবাসে। তার কাছ থেকে এক লজ্জাকর কুৎসিত ব্যাধি পেয়েছিল সিতানভ। কিন্তু তার জন্যে বন্ধুদের পরামর্শ মতো সিতানভ তাকে মারপিট করে নি। বরং

একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল, চিকিৎসা করেছিল ডাক্তার দিয়ে। এক অদ্ভুত কোমলতা আর দরদের সঙ্গে বলত তার কথা।

বিরাট-দেহ মেয়েমানুষটি তেমনি দুলে চলেছে। তেমনি বাঁধা-ধরা হাসি তার মুখে, হাতে তেমনি ভাবেই ধরা রুমাল। ঝিখারেভ তেমনি অঙ্গভঙ্গী করে লাফাঝাঁপি করছে ওকে ঘিরে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম: যে ইভ খোদ ঈশ্বরকে পর্যন্ত প্রতারণা করেছিল তারও কি ঐ রকমই ঘোড়ার মতো চেহারা ছিল? মেয়েমানুষটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

কালো দেয়ালের গা থেকে মুণ্ডুহীন আইকনেরা তাকিয়ে রয়েছে। অন্ধকার রাত লেপটে রয়েছে জানালার কাঁচের গায়ে। গুমোট কারখানা ঘরের ভিতরে মিট মিট করে জ্বলছে আলো। পায়ের দাপাদাপি শব্দ, মানুষের কণ্ঠের মিলিত আওয়াজ সব ছাপিয়ে জেগে উঠছে হাতমুখ ধোওয়ার তামার বেসিন থেকে ময়লা জলের বালতির ভিতরে ঝরে পড়া জলের দ্রুত শব্দ।

বইয়ের জীবন আর এ-জীবনে কতোই না প্রভেদ! কী ভীষণ পার্থক্য! শীগগিরি সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কাপেনদ্যুখিন একর্ডিয়ানটা সালাউতিনের হাতে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল:

'চলে আয়! মেঝের ধুলা উড়িয়ে ছাড়ি!'

ও নাচতে লাগল ভাঙকা ৎসিগানকের মতো। যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে। তার পর পাভেল ওদিনৎসভ আর সরোকিন ক্ষিপ্রগতিতে পা চালিয়ে নাচল খানিকক্ষণ। এমন কি ক্ষয়-রোগী দাভিদভ পর্যন্ত মেঝের উপর নেতিয়ে নেতিয়ে গড়াতে লাগল আর ধুলো, ধোঁয়া, ভদ্‌কার টকো গন্ধ, ধোঁয়ানো সসেজের গন্ধে কাশতে লাগল খক্‌ খক্‌ করে। সসেজের গন্ধটা সর্বদাই ট্যান করা চামড়ার গন্ধ মনে পড়িয়ে দিত।

নেচে গেয়ে চিৎকার করে চলেছে ওরা। মনে হয় যেন সময়টাকে আনন্দে উৎসবে মাতোয়ারা করে তোলার জন্যে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। আর প্রত্যেকেই তার উদ্দীপনা আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়েছে সিতানভ। সে এক এক করে সবার কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল:

'কেমন করে ও ঐ রকমের একটা মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারে, অ্যাঁ?'

প্রত্যুত্তরে লারিওনিচ তার হাড়-বের-করা শীর্ণ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল:

'অন্যের চাইতে ও কিছু আর খারাপ নয়। কিন্তু তোর তাতে কী?'

যে দুজন সম্পর্কে কথা হচ্ছিল তারা কিন্তু ততক্ষণে কেটে পড়েছে। দু-তিন দিনের মধ্যে ঝিখারেভ আর কারখানামুখো হবে না। তারপর স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে এক নাগাড়ে দু-হপ্তা ধরে তার নিজের কোণটিতে বসে চুপচাপ কাজ করে যাবে নীরবে, নির্লিপ্ত ভাবে, ভারিক্কি মানুষের মতো।

'চলে গেছে ওরা?' ধূসর নীল দুটো চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি সারা ঘরময় একবার বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাস করল সিতানভ। সিতানভের মুখটা বুড়োটে, একটুও সুন্দর নয়। কিন্তু ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল, মমতা মাখা।

আমার প্রতি ওর প্রীতি ছিল। আর তার জন্যে ধন্যবাদ আমার কবিতা-লেখা নোটবইটাকে। ঈশ্বরে ও বিশ্বাস করত না। অবশ্য এক লারিওনিচ ছাড়া এখানে কে যে তাঁকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত তা বলা দুরূহ। ঈশ্বরের কথায় সবার গলায়ই ফুটে উঠত বিদ্রূপের সুর — যে সুরে মজুরেরা কথা বলে মালিকের সম্পর্কে। তবুও যখনই ওরা দুপুরে বা রাত্রে খেতে বসত ক্রুশ করত, বিছানায় শুতে যাবার আগে করত প্রার্থনা, রবিবার দিন সবাই যেত গির্জায়।

কিন্তু সিতানভ এসব কিছু করত না। ওকে ধরে নেয়া হয়েছিল নাস্তিক বলে।

'ভগবান বলে কিছু নেই,' জোর দিয়ে বলত সিতানভ।

'তাহলে এ সবকিছু এল কোথা থেকে?'

'তা আমি জানি না।'

একবার ওকে বলেছিলাম, 'ভগবান নেই এ কেমন করে হতে পারে?' সে প্রত্যুত্তরে বলল:

'দেখতে পাস না — ভগবান থাকেন ঐ উঁচুতে!'

লম্বা হাতটা মাথার উপরে তুলে তারপর আবার হাতটা মেঝের দিকে নামিয়ে আনল। বলল:

'আর মানুষ নিচে। তাই না? কিন্তু কথায় বলে, 'ভগবান তাঁর নিজের আকারে করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' গোগলেভের চেহারাটা কার আকারের মতো?'

এতে ঘাবড়ে গেলাম আমি। এত বয়স সত্ত্বেও নোংরা স্বভাব মাতাল গোগলেভের হস্তমৈথুনের দোষ আছে। দিদিমার বোনের কথা, ভিয়াৎকার সেই সৈনিক আর ইয়েরমোখিনের কথাও মনে পড়ল আমার। এই সব লোকের মধ্যে ভগবানের কোন লক্ষণটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

'মানুষ হচ্ছে শুয়োরের বাচ্চা,' বলল সিতানভ। কিন্তু বলে ফেলেই পরক্ষণে আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টায় আবার বলল:

'তবে ভাবনা নেই মাক্সিমিচ, ভালো মানুষও আছে — সত্যি আছে!'

ওর কাছে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতাম। সর্বদাই যে বিষয়টা জানত না, সরল ভাবেই স্বীকার করত সে কথা।

'জানি না,' বলত সিতানভ, 'ও সম্পর্কে কিছু ভাবি নি আমি!'

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। যত লোকের সংস্পর্শে আমি এসেছি, তারা সবাই মনে করত যে সবকিছুই তাদের জানা। যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই তারা মন্তব্য করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

অদ্ভুত মনে হত আমার যখন দেখতাম ওর নোটবইয়ের ভিতরে অন্তর আকুল-করে-তোলা চমৎকার কবিতার পাশে এমন সব কবিতা রয়েছে যা পড়লে লোকের গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। আমি ওকে পুশকিনের কথা বলতে ও আমাকে দেখাল 'গাভ্রিলিয়াদা'। তার কবিতা লেখা ছিল ওর নোটবইয়ে।

'পুশকিন? ওকে নিয়ে তেমন লাভ নেই। কিন্তু বেনেদিক্তভ — ঐ হল গে একটা লোক, পড়তে হলে ওর লেখাই পড়া উচিত মাক্সিমিচ।'

চোখ বন্ধ করে কোমল সুরে আবৃত্তি করে চলত ও:

সুন্দরী এই নারীর বুকের পরে
কেমন নরম যুগল স্তনের ভার...

কেন জানি চারটে লাইনের উপরে ও বিশেষ একটু জোর দিয়ে আনন্দ মেশা গর্বের সঙ্গে আবৃত্তি করত:

বর্শা তীক্ষ্ম ঈগল চক্ষু যেরে
পারে না দেখিতে এ দুয়ার ভেদ করে
কী আছে হোথায় তাহার বুকের শেষে
গুপ্ত কী ধন অন্তরতম দেশে

'বুঝলি?'

কিসে ওর এত আনন্দ তা যে আমার বোধগম্য নয় একথা লজ্জায় বলতে পারলাম না।

১৪

তেমন কিছু কঠিন কাজ করতে হত না আমাকে কারখানায়। ভোরে সবার আগে উঠে সামোভার গরম করতে হত চিত্রকরদের জন্যে। রান্নাঘরে বসে ওরা যতক্ষণ চা খেত, ততক্ষণে পাভেল আর আমি দুজনে মিলে ঘর ঝাঁট দিতাম। রঙে মেশাবার জন্যে ডিম ভেঙে কুসুম আলাদা করতাম। তারপর চলে যেতাম দোকানে। সন্ধ্যায় এসে রঙ মেশাতাম আর 'লক্ষ্য করে করে' দেখতাম পটুয়াদের কাজ। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ নিয়েই 'লক্ষ্য করতাম'। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম বেশির ভাগ পটুয়াই তাদের ঐ টুকরো টুকরো কাজ মোটেই পছন্দ করে না। দিন কাটে তাদের অসহ্য বিরক্তি আর একঘেয়েমিতে।

খুবই সামান্য কাজ করতে হত তাই সন্ধ্যাটা ওদের কাছে জাহাজী জীবন বা পড়া-বইয়ের গল্প বলে কাটিয়ে দিতাম। ফলে নিজের অজ্ঞাতেই কারখানায় পড়ুয়া ও গল্প বলিয়ে হিসেবে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসলাম।

শীগগির বুঝতে পারলাম আমি যতোটা জানি বা দেখেছি, এরা কেউই ততোটা জানেও না, দেখেও নি। এদের বেশির ভাগই নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই তাদের কারিগরির ছোট খাঁচার ভিতরে বন্দী। কারখানায় যারা কাজ করে তাদের মধ্যে একমাত্র ঝিখারেভই গিয়েছিল মস্কোয়। প্রায়ই সে ভারিক্কী চালে ভ্রূ কুঁচকে বলত:

'চোখের জল ফেলার জায়গা নয় মস্কো। চোখ দুটি খোলা রেখে চলতে হবে সেখানে।'

আর কেউই শুয়া বা ভ্লাদিমির ছাড়িয়ে যায় নি। কাজানের কথা উঠলেই ওরা জিজ্ঞেস করত আমাকে:

'অনেক রুশ আছে ওখানে? আর গির্জাও?'

ওদের ধারণায় পের্ম সাইবেরিয়ায়। কিছুতেই ওরা বিশ্বাস করে উঠতে পারত না যে সাইবেরিয়া উরাল পর্বতমালার ওপারে।

'কেন, উরালের পার্চ্ আর স্টার্জান মাছ আসে না ওখান থেকে — ঐ কাস্পীয় সাগর থেকে? তার মানে উরাল পাহাড় নিশ্চয়ই কাস্পীয় সাগরের পারে!'

ওরা যখন বলত ইংলন্ড হচ্ছে সমুদ্রের ওপারে আর বোনাপার্ট জন্মেছিলেন কালুগার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তখন মাঝে মাঝে মনে হত

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না তো। আমার নিজের চোখে দেখা জিনিসের কথা যখন বলতাম, ওরা তা বিশ্বাসই করতে পারত না অথচ ভালোবাসত জটিল প্লটের রোমাঞ্চকর গল্প, কাহিনী ইত্যাদি। বুড়োরা পর্যন্ত সত্য ঘটনার বদলে কাল্পনিক কাহিনী শুনতে চাইত। বেশ দেখতে পেতাম যতো অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য ঘটনার গল্পই বেশি মনোযোগের সঙ্গে শুনত ওরা। সাধারণত বাস্তব সম্পর্কে ওদের তেমন আগ্রহ ছিল না। সবাই আগ্রহাকুল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত ভবিষ্যতের দিকে — সবাই চাইত বর্তমানের এই কুশ্রীতা, এই দৈন্য-দারিদ্র্য মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে।

তাতে আরো অবাক লাগত আমার কেননা আমার মনে বাস্তব ও কল্পনার বিরোধ সম্পর্কে এক তীক্ষ্ন বোধ জেগে উঠেছিল। এখানে আমার সামনে রয়েছে সত্যিকারের মানুষ। বইয়ের চরিত্রের মধ্যে তাদের কাউকে আমি পাই নি: না স্মুরিকে বা ফায়ারম্যান ইয়াকভকে, না আলেক্সান্দর ভাসিলিয়েভ, ঝিখারেভ, কি ধোপানী নাতালিয়াকে।

দাভিদভের বাক্সে ছিল গলিৎসিনস্কির ছেঁড়াখোঁড়া একটা গল্প সংকলন, বুলগারিনের 'ইভান ভীঝিগিন' আর ব্যারন ব্রামবেউসের এক খণ্ড। সবগুলো বই-ই পড়ে শোনালাম পটুয়াদের। ওরা দারুণ উপভোগ করল।

'খুব ভালো! পড়াশুনো করলে ঝগড়াঝাঁটি গোলমাল সব ঝেঁটিয়ে দূর হয়ে যায়!' বলল লারিওনিচ।

বইয়ের খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম। যখনই পেতাম সবাইকে পড়ে শোনাতাম। সে সব সন্ধ্যাগুলো অবিস্মরণীয়। কারখানার ভিতরে নেমে আসত নিঝুম রাতের মতো নিস্তব্ধতা। ঠাণ্ডা সাদা তারার মতো কাঁচের গোলকগুলো ঝুলত মাথার উপরে। টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়া টাকসর্বস্ব আর এলোমেলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাগুলোর উপরে পড়ত তাদের কিরণ-রেখা। চোখের সামনে দেখতে পেতাম কতগুলো শান্ত সমাহিত মুখ। থেকে থেকে কেউ হয়ত লেখক বা নায়কের প্রশংসায় বলে উঠছে দু-একটি কথা। এখনকার এই ভীরু একাগ্রচিত্ত শ্রোতাদের সঙ্গে দিনের বেলার ওদের চেহারার এতটুকুও মিল নেই কোথাও। এ সময়ে আমার ওদের দারুণ ভালো লাগত। আর ওরাও অনুভব করত আমি ওদের একান্ত কাছের জন। মনে হত যেন আমি নিজের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি।

'বসন্তকালে প্রথম জানালা খুলে দিলে যেমন টাটকা তাজা বাতাস এসে ঢোকে ঘরে এইসব বই পড়াও ঠিক তেমনি,' একদিন সিতানভ বলল।

কোনো লাইব্রেরীতে ভর্তি না হয়ে বই যোগাড় করা দারুণ শক্ত হয়ে উঠল আমার পক্ষে। কিন্তু লাইব্রেরীর কথাটা আমাদের কল্পনার বাইরে। ভিক্ষুকের মতো লোকের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কোনো রকমে যোগাড় যন্তর করতাম। একদিন দমকল বাহিনীর কর্মচারীর কাছ থেকে যোগাড় করলাম লের্মন্তভের একটা বই। কবিতার কী শক্তি তা স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম এই বইখানা পড়ে। বুঝতে পারলাম মানুষের উপরে কবিতার প্রভাব কী অপরিসীম।

মনে পড়ে বইটা খুলে সবে 'দানব' কবিতাটা পড়তে শুরু করেছি। সিতানভ প্রথমে তাকাল বইটার দিকে, তারপর তাকাল আমার মুখের দিকে, পরে হাতের তুলিটা রেখে দিয়ে লম্বা হাত দুটো হাঁটুর তলায় গুঁজে দুলতে শুরু করে দিল। নীরব হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চেয়ারটা থেকে শব্দ উঠছিল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে।

'চুপ, ভায়ারা,' বলে উঠল লারিওনিচ। সেও তার হাতের কাজ রেখে দিয়ে এগিয়ে এল সিতানভের টেবিলে, যেখানে আমি পড়ছিলাম বইটা। কবিতাটা পড়তে পড়তে এক গভীর আনন্দে আমার অন্তর ভরে উঠল। বুজে এল গলার স্বর। চোখের জলে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেল। এর উপর ঘরের ভিতরের সেই নিঃশব্দ চুপি চুপি ভাব আর একান্ত সন্তর্পণ চলাফেরায় আরো বেশি অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। আমাকে ঘিরে সবকিছুই যেন স্ফীত হয়ে উঠেছে। যেন এক দারুণ শক্তিশালী চুম্বক সমস্ত লোকগুলোকে টেনে এনেছে আমার পাশে। প্রথম অধ্যায় যখন শেষ করলাম প্রায় সমস্ত পটুয়ারা এসে ঘন হয়ে ভিড় করে দাঁড়াল টেবিলটাকে ঘিরে। কারুর মুখে হাসি, কারুর মুখ ভ্রূকুটি কুটিল। পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে।

'পড়ে যা, পড়ে যা,' আমার মাথাটা বইয়ের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলে উঠল ঝিখারেভ।

পড়া শেষ হলে পরে সে বইটা হাতে নিয়ে নামটা পড়ল, তারপর সেটা বগলদাবা করে বলল:

'এটা আবার পড়তে হবে তোকে। কাল। এখন আমার কাছে রইল।'

চলে গেল ঝিখারেভ। বইটা তার ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়ে নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেল। স্তব্ধ নীরবতা নেমে এসেছে সমস্ত কারখানাটা জুড়ে। চুপচাপ যে যার কাজের জায়গায় ফিরে গেছে। জানালার

সামনে গিয়ে কাঁচের উপরে মাথাটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সিতানভ, নিথর নিস্পন্দ। আর ঝিখারেভ তুলিটা ফের রেখে দিয়ে কঠোর ভাবে বলে উঠল:

'একেই আমি বলি জীবন, ভগবানের দাস... সত্যিই!'

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে সে বলে চলল:

'এ দানবকেও আঁকতে পারি আমি: কালো, গাময় লম্বা চুল, আগুন রঙের পাখা—সিঁদুর বরণ—হাত পা আর মুখ ফিকে নীল, জ্যোৎস্না রাতের ঝরা-বরফের মতো।'

রাত্রের খাবারের আগে পর্যন্ত টুলের উপরে বসে কী এক নিদারুণ অস্বস্তিতে অদ্ভুত অস্থির ভাবে মোড়ামুড়ি করতে লাগল সে। আঙুল দিয়ে টেবিল বাজিয়ে অস্পষ্ট ভাবে বিড় বিড় করে বলে চলল দানবের কথা, ইভের কথা, মেয়েমানুষ আর স্বর্গের কথা। আর বলল কেমন করে সাধুরা পাপ করেছিল সেই কথা।

'ঠিকই তো! সাধুরা যদি নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে পাপ কাজ করতে পারে, তবে দানবও পবিত্র-হৃদয় সৎ লোককে প্রলুব্ধ করে বড়াই করবে না কেন!'

কেউ ওর কথার কোনো জবাব দিল না। সম্ভবত আমারই মতো কারুরই কথা বলতে এতটুকুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। ঘড়ির দিকে এক চোখ রেখে একান্ত অনিচ্ছায় ওরা কাজ করে যাচ্ছিল। ন-টার ঘণ্টা বেজে ওঠামাত্র সবাই একসঙ্গে বন্ধ করল কাজ।

সিতানভ আর ঝিখারেভ বেরিয়ে গেল উঠোনে। আমিও মিললাম ওদের সঙ্গে। আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে সিতানভ বলে উঠল:

'ছায়াপথে অসীম শূন্যে
মিছিল চলে...

এমন সব কথা ভেবে ভেবে খুঁজে বের করেছে কেমন!'

'একটা কথাও মনে নেই আমার,' তীব্র শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঝিখারেভ। 'কিছুই মনে নেই আমার, কিন্তু সবই দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত ব্যাপার, একটা মানুষ কিনা তোমার মনে দানবের প্রতি করুণা জাগিয়ে তুলছে! যেমন ধরো তুমি, তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল সিতানভ।

'মানুষ কাকে বলে দেখো!' উচ্ছল কণ্ঠে এমন ভাবে বলে উঠল ঝিখারেভ যে তা ভুলবার নয়।

দোরের সামনে ফিরে এসে ও আমাকে সাবধান করে দিল:

'বইটার কথা দোকানের কাউকে বলিস নে মাক্সিমিচ, নিশ্চয়ই ওটা নিষিদ্ধ বই!'

দারুণ আনন্দ হল আমার: পাপ স্বীকারের সময়ে এই ধরনের বইয়ের কথাই তবে পুরুত আমাকে বলেছিল!

একান্ত উদাসীন ভাবে সবাই খেতে লাগল রাত্রের খাওয়া। স্বাভাবিক গোলমাল, কথাবার্তা নেই। অত্যন্ত অপূর্ব কী যেন ঘটে গেছে যা নিয়ে সবাই মনে মনে চিন্তিত। খাওয়া শেষ হলে পরে সবাই যে যার ঘুমোতে গেল, ঝিখারেভ বইটা বের করে বলল:

'এই যে, বইটা পড় আর একবার। ধীরে ধীরে পড়িস, তাড়াহুড়ো করিস না...'

অনেকেই চুপচাপ বিছানা ছেড়ে উঠে এল টেবিলের কাছে, পোশাক খোলা, পা গুটিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল। আর একবার পড়ে যখন শেষ করলাম টেবিলের উপরে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলে উঠল ঝিখারেভ:

'একেই বলে বাঁচা! মানে, দানব, দানব... এমন অবস্থা কেমন করে হল তোমার, ভাই?'

সিতানভ আমার কাঁধে হেলে কী যেন পড়ছিল। সে হেসে হেসে বলল:

'আমার নোটবইয়ে ওগুলো টুকে নেব...'

ঝিখারেভ উঠে দাঁড়াল, বইটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল তার টেবিলের দিকে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে আহত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল:

'অন্ধ কুত্তার মতো জীবন কাটাচ্ছি আমরা, কিন্তু কিসের জন্যে? কেউ জানে না। ভগবান বা দানব কেউই চায় না আমাদের। বলতে চাও আমরা ভগবানের দাস? দাস ছিল জোব, কিন্তু ভগবান নিজে তার সঙ্গে কথা বলতেন। আর বলতেন মোজেসের সঙ্গে। কিন্তু কে আমাদের মালিক?'

বইটা তালাবন্ধ করে রেখে পোশাক পরতে আরম্ভ করল ঝিখারেভ, তারপর সিতানভকে ডেকে বলল:

'যাবে নাকি সরাইখানায়?'

'না, আমি যাচ্ছি আমার মেয়েমানুষের কাছে,' শান্ত গলায় বলল সিতানভ।

ওরা চলে যেতেই আমি দোরের কাছে মেঝের উপরে পাভেল ওদিনৎসভের পাশে শুয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে ও বিছানার ভিতরে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'কী হল?'

'ওদের জন্যে ভারি দুঃখ হয় আমার,' বলল ওদিনৎসভ, 'প্রায় চার বছর আছি ওদের সঙ্গে। ওদের সবাইকেই আমি চিনি...'

আমারও দুঃখ হত ওদের জন্যে। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের সম্পর্কে দুজনে মিলে ফিস্ ফিস্ করে আলোচনা করতে লাগলাম, ওদের প্রত্যেকের ভিতরে যে সততা দয়ামায়া আছে তার কথা স্মরণ করলাম। প্রত্যেকের ভিতরে খুঁজে বের করতে লাগলাম এমন সব গুণ যার ফলে আমাদের শিশু হৃদয় করুণায় ভরে উঠত।

পাভেল ওদিনৎসভ আর আমার ভিতরে গড়ে উঠল গভীর বন্ধুত্ব। পরে পাভেল একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশি দিন সে তার ঐ কাজে টিঁকে থাকল না। ত্রিশ বছর বয়সেই সে পাঁড় মাতাল হয়ে উঠল। আরো কিছুদিন পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মস্কোর খিত্রভ বাজারে। ও তখন ভবঘুরে। তার অল্প কিছুকাল পরেই শুনলাম পাভেল মারা গেছে টাইফাসে। আমার চোখের সামনে কতো যে সুন্দর জীবন এমনি করে অকারণে নিঃশেষ হয়ে ঝরে গেছে তা ভাবতেও ভয় হয়। সর্বত্রই দেখেছি মানুষ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তারপর মরে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাশিয়ার মতো আর কোনো দেশের মানুষ এতো তাড়াতাড়ি এমন নিরর্থক ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না...

সে সময়ে পাভেল গোল-মাথাওয়ালা একটা ছেলে। বয়সে আমার চাইতে দু-বছরের বড়ো। চতুর, চটপটে, সৎ হওয়া ছাড়াও ওর ভিতরে ছিল শিল্পীর প্রতিভা। বেড়াল কুকুর পাখি ইত্যাদি আঁকারও দক্ষতা ছিল বেশ। তাছাড়া পটুয়াদের নিয়ে মজার মজার ব্যঙ্গচিত্র আঁকত। সব সময়েই তাদেরকে আঁকত কোন না কোন পাখির মূর্তিতে। সিতানভকে আঁকত এক পায়ে দাঁড়ানো বিষণ্ণ মুখ একটি বন-মোরগের আকারে। ঝিখারেভ হল শীর্ণ ঝুঁটিওয়ালা চাঁদ-কপালে পোষা মোরগ। রুগ্ন দাভিদভ হল করুণ-মুখ পিটউইট পাখি।

ওর ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে সবচাইতে ভালো হল গোগলেভের ছবি। তাকে ও আঁকত লম্বা কানওয়ালা একটা বাদুড়। নাকটা বিরাট, আর খুদে খুদে দুটো পায়ের প্রত্যেকটায় ছ-টা করে ধারাল নখ। ওর গোল গোল কালো মুখের উপরে গোলাকার সাদা দুটো চোখ। চোখের ভিতরে মটর ডালের মতো মণি দুটো চোখের দু-পাশে দু-কোণের দিকে সরানো। ফলে সমগ্র মুখখানা ঘিরে একটা সচকিত শয়তানী ভাব ফুটে উঠেছে।

ব্যঙ্গচিত্র দেখে পটুয়ারা কেউই চটত না। কিন্তু গোগলেভের ছবিটা সবার কাছেই খুব খারাপ লাগল। ওরা একান্ত ভাবে শিল্পীকে অনুরোধ করল:

'ওটা বরং ছিঁড়ে ফেলে দে! বুড়োটা দেখতে পেলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে তোর পক্ষে!'

বুড়োটা নোংরা অশ্লীল। সব সময়ে নেশায় চুর হয়ে থাকত। যেমন নাছোড়বান্দা রকমের ভক্ত, তেমনি অক্লান্ত কুচক্রী। আর দোকানের বড়ো সাকরেদের লেজধরা। কর্ত্রী তার ভাইঝির সঙ্গে বড়ো সাকরেদের বিয়ে দেবার মনস্থ করেছিল। সুতরাং ইতিমধ্যেই সে নিজেকে কারখানার আর কারখানার লোকজনদের কর্তা ভাবতে শুরু করেছিল। বড়ো সাকরেদকে সবাই ভয় করত, ঘৃণা করত। আর সেইজন্যেই গোগলেভকেও ভয় করত সবাই।

পাভেল সব সময়েই ওর পিছনে লেগে জ্বালাতন করত। গোগলেভকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে না দেয়াটাই যেন ওর একমাত্র লক্ষ্য। এ কাজে সে আমাকে পেয়েছিল তার যোগ্য দোসর। আর আমাদের এ কাজে সবাই বেশ মজা পেত। অবশ্য কাজটা প্রায়ই একটু রূঢ়, একটু স্থূল ধরনেরই হত। কিন্তু পটুয়ারা বলত:

'হুঁশিয়ার। কুজমা-গুবরেপোকাটা মজা দেখাবে তোদের!'

কারখানার লোকদের কাছে বড়ো সাকরেদের নাম ছিল 'কুজমা গুবরেপোকা'।

কিন্তু ওদের এ হুঁশিয়ারী আমরা গ্রাহ্য করতাম না। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায়ই আমরা গোগলেভের মুখে রঙ মাখিয়ে দিতাম। একদিন ও মাতাল হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ওর স্পঞ্জের মতো নাকটায় আমরা সোনালী রঙ লেপে দিলাম। তিনদিন পর্যন্ত লোমকূপ থেকে সোনালী রঙ তুলতে পারে নি। বুড়োকে যখনই খেপিয়ে তুলতাম মনে পড়ে যেত জাহাজের সেই ভিয়াৎকা-বাসী সৈনিকটির কথা। বিবেকের দংশনে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যেত

আমার। অনেক বয়স সত্ত্বেও কিন্তু গোগলেভের গায়ে বেশ জোর ছিল। অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ এসে এক এক সময়ে আচ্ছা করে ধরে ঠুকে দিত। প্রত্যেকবার পেটানর পরেই আবার গিয়ে নালিশ করত কর্ত্রীঠাকরুনের কাছে।

কর্ত্রীঠাকরুনও সব সময়েই মদের নেশায় বিভোর। আর সেইজন্যেই বেশ হাসিখুশি, ভালোমানুষ গোছের। মোটা সোটা হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে আমাদের ভয় দেখাত:

'আবার বদমায়েসী করেছিস, শয়তানগুলো? বুড়ো মানুষ, ওকে সম্মান করে চলা উচিত তোদের! কে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছিল ওর মদের গ্লাসে?'

'আমরা দিয়েছিলাম...'

চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগল কর্ত্রীঠাকরুন।

'হা ভগবান, আবার স্বীকার করছে দেখছি! খুদে বদমাইসের দল, জানিস না বুড়োমানুষকে ভক্তি ছেন্দা করতে হয়?'

আমাদের তাড়িয়ে দিল। আর সেদিন সন্ধ্যেয়ই নালিশ করে দিল বড়ো সাকরেদের কাছে।

'এ কেমন কথা?' তীব্র কণ্ঠে সে ধমকে উঠল আমাকে। 'পড়াশুনো করিস, এমন কি বাইবেল পর্যন্ত পড়িস, তবুও তুই সব সময়েই কিছু না কিছু একটা ঘটিয়ে বসবি। সামলে চলিস ভায়া!'

কর্ত্রীঠাকরুন ছিল ভারি নিঃসঙ্গ। দেখে করুণা হত খুব। এক এক সময়ে অত্যধিক মদ খেয়ে জানালার সামনে বসে গান করত:

কেউ বোঝে নাকো আমার দুখের ভার,
কেউ জানে নাকো এ বুকে কতো যে ব্যথা,
ভালোবাসে নাকো, দেয় না তো সান্ত্বনা
বলে নাকো কেউ দুটো সোহাগের কথা।

তারপর বার্ধক্যজনিত ভাঙা ভাঙা কান্নাভরা কাঁপা গলায় চিৎকার করত:

'উ-ও-ও-ও...'

একদিন দেখলাম এক জগ দুধ হাতে করে সে নিচে নেমে আসছে। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেল, তারপর ধাপে ধাপে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসতে লাগল। প্রসারিত হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে জগটা। দুধ উপচে পড়ছে তার পোশাকের উপরে। আর জগটাকে গাল পেড়ে বলছে:

'দেখ দেখি কেমন করে দুধ পড়ে যাচ্ছে দেখ তো, শয়তান কোথাকার!'

মোটা নয় সে, কিন্তু নরম থলথলে। যেন একটি বুড়ো বেড়াল, ইঁদুর শিকারের ব্যাপারটা যার কাছে এখন অতীতের ইতিহাস মাত্র। প্রচুর পরিতৃপ্তির পর এখন শুধু এক জায়গায় জমে বসে ঘড় ঘড় করতে করতে সেদিনের ভোজ আর জয়লাভের সুখ-স্মৃতির জাবর কেটে চলেছে।

'হুঁ, হুঁ,' ভ্রূ কুঁচকে গুন গুন করত সিতানভ, 'এক সময়ে এটা খুব বড়ো কারবার ছিল। কারখানাটাও ছিল চমৎকার। আর মাথার উপরে ছিল খুবই চতুর বুদ্ধিমান একজন লোক। কিন্তু এখন সে সব গোল্লায় গেছে। যা কিছু মুনাফা সব গিয়ে ঢুকছে ঐ ব্যাটা কুজমাটার ট্যাঁকে। কী কাজটাই না করেছি আমরা, আর সব ওই লোকটার পেট ভরাতে। ভাবতে গেলেই ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। ইচ্ছে করে কাজকর্ম ফেলে দিয়ে ছাদের উপরে উঠে গোটা গরম-কালটা আকাশের দিকে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে থাকি...'

সিতানভের মনোভাব সংক্রামিত হল পাভেল ওদিনৎসভে। বড়োদের মতো সিগারেট টানতে টানতে ঈশ্বর, মাতাল, মেয়েমানুষ, আর শ্রমের অসারত্ব সম্পর্কে দার্শনিকতা শুরু করে দিত সে: কেউ সারাটা জীবনভোর কিছু একটা জিনিস গড়ে তোলে, আবার কেউ এসে সেটা ভেঙ্গে চুরে নষ্ট করে দেয়। এতটুকুও মূল্য দেয় না তার।

এই সব মুহূর্তে ওর চোখা সুন্দর মুখখানা বুড়োটে বলি-কুঞ্চিত হয়ে উঠত। যখন মেঝের উপরে ওর বিছানায় এসে বসত, তখনই প্রায়ই এই সব চিন্তা জেগে উঠত ওর মনে। দুহাতে পা দুটো জড়িয়ে ধরে জানালার চৌকো ফাঁকার ভিতর দিয়ে ম্লান তারায় ভরা শীতের আকাশ আর ঝরা তুষারের ভারে নুয়ে-পড়া ছাউনির চালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকত সে।

পটুয়ারা নাক ডাকাত, বিড় বিড় করে বকত ঘুমের ভিতরে। কাউকে হয়ত বোবায় ধরত। উপরের মাচার বিছানায় শুয়ে বাকি জীবনীশক্তিটুকু কেশে কেশে ক্ষয় করে চলত দাভিদভ। এক কোণে 'ভগবানের দাস' কাপেনদ্যুখিন, সরোকিন আর পেরসিন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমের ভারে আর মদের নেশায় হাত পা ছুঁড়ত। দেয়ালের গা থেকে তাকিয়ে থাকত হাত-পা-মুখহীন আইকনগুলো। মেঝের ফাটলে আটকে থাকা তেল, পচা

ডিম আর নোংরা আবর্জনার কুৎসিত দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত।

'এদের প্রতি এমন করুণা হয় আমার! হায় ভগবান!' ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠত পাভেল।

আমার অন্তরও ক্রমেই এই করুণায় ভারি হয়ে উঠতে লাগল। আগেই বলেছি আমাদের দুজনার চক্ষেই ওরা ছিল ভালো লোক। কিন্তু যে ভাবে ওরা জীবন যাপন করত সেটা অত্যন্ত কুৎসিত, অসহ্য একঘেয়ে, একান্ত অনুপযুক্ত ওদের পক্ষে। একঘেয়ে কর্কশ সুরে বেজে উঠত লেণ্টের ঘণ্টা, বাড়ি ঘর, গাছপালা — পৃথিবীর বুকের সব কিছুই কাঁপিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে কোঁকিয়ে বইত তুষার-ঝড়, তখন সীসের পর্দার মতো বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসত কারখানা ঘিরে। তাতে পটুয়াদের দম আটকে আসত, গলা টিপে তা যেন নিঙড়ে বের করে নিত জীবন। ওরা ছুটে যেত শরাবখানায় কিংবা মেয়েমানুষের বাহুর তলায় খুঁজে ফিরত আশ্রয়। কড়া মদের মতোই তারা ওদের ভুলিয়ে রাখত।

এমন সব সন্ধ্যায় পড়াশুনো কোনো কাজেই আসত না। পাভেল আর আমি তখন চিত্তবিনোদনের অন্য পন্থা ধরতাম। মুখে মাখতাম রঙ আর ঝুলকালি, পরতাম শণের পরচুলা আর গোঁফ। তারপর নিজেরাই উপস্থিত মতো প্রহসন রচনা করে নাটক অভিনয় করতাম। আর বীর বিক্রমে সেই বিষাদময়তার বিরুদ্ধে লড়াই করে ওদের বাধ্য করতাম হাসতে। 'এক সৈনিক কর্তৃক মহান পিটারের উদ্ধার' কাহিনীটা মনে ছিল আমার। সমস্ত গল্পটাকে কথোপকথনে রূপান্তরিত করে নিলাম। তারপর দাভিদভের মাচার উপরে উঠে পরমানন্দে কল্পিত সুইড'দের মাথা কেটে কেটে অভিনয় শেষ করলাম। দর্শকরা উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল।

পটুয়ারা সবচাইতে বেশি উপভোগ করত চীনা দৈত্য — সিঙ্গি-ইউ-তঙ্গু'র কাহিনী। পাশকা করত ঐ হতভাগ্য দৈত্যের অভিনয়, তার ইচ্ছে হয়েছিল সৎ কাজ করার। আর একা আমি করতাম: মেয়ে, পুরুষ, মঞ্চের সব জিনিসপত্তর, উপকারী অপদেবতা, সমস্ত সৎ কাজের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন মনোরথে চীনে দৈত্যটা এসে যে পাথরটার ওপর বিশ্রাম করত সেই পাথরটা পর্যন্ত বাকি সব কিছুর অভিনয়।

দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর ব্যথিত বিস্ময়ে আমি আবিষ্কার করতাম কতো সহজেই না মানুষ খুশি হয়ে ওঠে।

'ভাঁড় বটে বাপু! নাচুইয়ে বটে!' ওরা চেঁচিয়ে উঠে বলত আমাদের লক্ষ্য করে।

যতোই অভিনয় করি ততোই ফিরে ফিরে এই চিন্তাটাই মনে আসে যে, আনন্দের চাইতে দুঃখটাই এদের কাছে পৌঁছয় বেশি।

আনন্দ আমাদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী নয়। আর নিছক আনন্দ হিসেবেও তার কোনো মূল্যই আমরা দিই না। ভারাক্রান্ত রুশ মর্মব্যথার প্রতিষেধক হিসেবেই শুধু বহু আয়াসে একে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে আনন্দের নিজস্ব কোনো প্রাণ নেই, বেঁচে থাকার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু ক্ষণেকের জন্যে আসে একঘেয়ে বিষাদময় জীবনের বোঝা একটু হালকা করে দিতে, সে আনন্দে ভরসাও নেই।

তাই প্রায়ই দেখা যায় রুশবাসীদের ফুর্তি হঠাৎ অতি-অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ভাবেই নিষ্ঠুর নাটকে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। নাচের মাঝখানে নর্তক যখন একে একে তার বাঁধন খসাতে শুরু করে তখন হঠাৎ তার ভিতরের পশুটাও বেরিয়ে পড়ে আগল ভেঙ্গে। তারপর পাশবিক জ্বালায় সবার উপরে, সবকিছুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জন করে, আক্রমণ করে, চুরমার করে দিতে থাকে...

বাইরের প্রেরণায় জোর করে জাগিয়ে তোলা এই ফুর্তি আমাকে আনন্দে এমন ক্ষিপ্ত করে তুলত যে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে উন্মত্তের মতো সেই মুহূর্তের উদ্দীপনায় যা কিছু মনে আসত তাই-ই আবৃত্তি করে অভিনয় করে চলতাম। কী মরিয়া হয়েই না আমি চেষ্টা করতাম স্বতঃস্ফূর্ত মুক্ত আনন্দে ঐ লোকগুলোকে জাগিয়ে তুলতে—আমার সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই যে ব্যর্থ হত তা নয়। পটুয়ারা প্রশংসা করত, অবাক হত। কিন্তু যে বিষণ্ণতাকে মনে হত দূর করতে পেরেছি তা শুধু ফের আরো ঘন, আরো গভীর হয়ে ফিরে এসে ঠিক আগেরই মতোই গুরুভারে নিষ্পেষিত করে তুলত।

ধূসর চেহারা লারিওনিচ মৃদুকণ্ঠে বলত:

'তুই একটা আস্তো খুদে শয়তান। ভগবান তোর মঙ্গল করুন!'

'সত্যিকারের আরামদায়ক!' সায় দিত ঝিখারেভ। 'কোনো সার্কাসে বা থিয়েটারে ঢুকলেই পারিস। খুব চমৎকার ভাঁড়ের অভিনয় করতে পারবি!'

সমস্ত কারখানার মধ্যে শুধু কাপেনদ্যুখিন আর সিতানভ যেত থিয়েটারে। তাও বড়োদিনে আর পাপ-স্বীকার পর্বের সময়ে। বুড়ো পটুয়ারা এই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ওদের জর্ডনের বরফের ভিতরে বাপ্তাইজ-করা গর্তে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিত।

সিতানভ প্রায়ই বলত আমাকে:

'এ সব ছেড়ে দিয়ে অভিনেতা হ'গে যা!'

সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে শোনাত 'অভিনেতা ইয়াকভলেভের জীবন'এর করুণ মনোহর কাহিনী।

'তুইও ঠিক অমনি ভাবেই জীবন কাটাতে পারিস!'

মেরী স্টুয়ার্টের গল্প বলতে ভালোবাসত সিতানভ। তাঁকে বলত 'খেঁক-শিয়ালী'। তাছাড়া 'স্পেনের অভিজাত'এর কাহিনী বলতে তার ছিল ভারি উৎসাহ।

'দন সিজার দ্য বাজান ছিলেন সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রেষ্ঠ, বুঝলি মাক্সিমিচ। সত্যি অসাধারণ!'

ওর নিজের ভিতরেও 'স্পেনের অভিজাত'এর মতো খানিকটা ভাব ছিল। একদিন বুরুজ-ঘরের সামনের ময়দানে দমকল বাহিনীর তিনজন কর্মচারী মিলে এক চাষীকে ধরে পিটছিল। প্রায় চল্লিশজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল আর তাদের উৎসাহ দিচ্ছিল। সিতানভ লাফিয়ে গিয়ে পড়ল ঐ মারামারির ভিতরে। ওর লম্বা দুটো হাত চালিয়ে যারা মারছিল তাদের পিটে তাড়িয়ে দিল। তারপর চাষীটাকে মাটি থেকে তুলে ধাক্কা দিয়ে ভিড়ের ভিতরে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল:

'সরিয়ে নিয়ে যাও ওকে!'

ও একা রয়ে গেল তিনজনার সঙ্গে লড়তে। দমকলকর্মীদের আস্তানা ছিল মাত্র কয়েক পা দূরে। অনায়াসেই ওরা ওদের লোকজন ডাকতে পারত সাহায্যের জন্যে। আর আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে দিতে পারত সিতানভকে। কিন্তু ভাগ্যি ভালো, ওরা উঠোনের দিকে পালিয়ে গেল।

আর পিছন থেকে চিৎকার করে গাল পাড়ল সিতানভ, 'কুত্তার বাচ্ছা কোথাকার!'

প্রত্যেক রবিবার পেত্রোপাভ্‌লভস্ক কবরখানার পিছনের কাঠগোলার কাছে জোয়ান বয়সী ছেলেরা এসে জুটত স্বাস্থ্য বাহিনীর লোকদের সঙ্গে আর আশপাশের গাঁয়ের চাষীদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি লড়তে। সেই বাহিনীর লোকেরা নামকরা লড়ুইয়ে দৈত্যের মতো চেহারার এক মর্দোভীয়কে দাঁড় করিয়ে দিত। লোকটার মাথাটা ছিল লাটুর মতো, আর চোখ ভরা ঘা।

দলের লোকদের সামনে পা ফাঁক করে এসে দাঁড়াত। তারপর জামার নোংরা *হাতা দিয়ে জল-ঝরা চোখ মুছতে মুছতে শহরবাসীদের উদ্দেশ্যে ভালো* মানুষের মতো হাঁক পাড়ত:

'কেউ আসবে তো এসো, নইলে শেষে শীতে জমে যাব!'

আমাদের তরফ থেকে লড়ত কাপেনদ্যুখিন। কিন্তু মর্দোভীয় সব সময়েই ওকে হারিয়ে দিত।

'ওকে যদি না হারিয়ে দিতে পারি তবে আমার জীবনের মূল্যটা কী?' রক্তাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে বলত কাপেনদ্যুখিন।

মদ খাওয়া ছেড়ে দিল কাপেনদ্যুখিন, খাওয়ার ভিতরে মাংসই খেত বেশির ভাগ। রোজ শুতে যাওয়ার আগে বরফ দিয়ে গা ঘসত। আর দু' মণ বাটখারা নিয়ে ব্যায়াম করত মাংসপেশী শক্ত করে তোলার জন্যে। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে দস্তানার ভিতরে সীসের টুকরো পুরে সেলাই করে এ'টে নিয়ে জাঁক করে বলল সিতানভের কাছে:

'এবার মর্দোভীয় ব্যাটা শেষ!'

'ওগুলো খুলে ফেলে দে, নইলে বলে দেব আমি লড়াইয়ের আগে,' কঠোর ভাবে শাসিয়ে দিল সিতানভ।

কাপেনদ্যুখিন বিশ্বাস করতে পারে নি যে সে এ কাজ করতে পারে। কিন্তু লড়াইয়ের আগে হঠাৎ সিতানভ মর্দোভীয়কে ডেকে বলল:

'একটু দাঁড়াও, ভাসিলি ইভানভিচ! আগে আমি লড়ব কাপেনদ্যুখিনের সঙ্গে!'

রাগে লাল হয়ে উঠে চিৎকার করল কসাক:

'আমি লড়ব না তোর সঙ্গে! দূর হ এখান থেকে!'

'না, লড়তেই হবে তোকে,' তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল সিতানভ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল কাপেনদ্যুখিন, তারপর হাত থেকে দস্তানা টেনে খুলে কোটের বুকপকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

এতে উভয় দলই বিস্মিত বিরক্ত হয়ে উঠল। সম্ভ্রান্ত গোছের একটি ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল সিতানভকে:

'সাধারণ লড়াইয়ের ময়দানে এসে ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফয়সলা করা, এটা ভাই বে-আইনী!'

চতুর্দিক থেকে সবাই সিতানভকে গাল পাড়তে শুরু করে দিল।

বহুক্ষণ পর্যন্ত সে চুপ করে রইল। তারপর সম্ভ্রান্ত গোছের চেহারার ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বলল:

'একটা খুনখারাপি যদি বন্ধ করে থাকি তো সে ক্ষেত্রে কী বলবে?'

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এমন কি সে টুপি খুলে বলল:

'সে ক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'শুধু এইটুকুই আমার অনুরোধ, এ নিয়ে দয়া করে আলোচনা করো না!'

'করতে যাবই বা কেন? কাপেনদ্যুখিনের মতো লড়ুয়ে সচরাচর মেলে না। তাছাড়া বারবার মার খেলে লোকের পক্ষে চটে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেটা বুঝি আমরা। কিন্তু এখন থেকে লড়াই শুরু হওয়ার আগে ওর দস্তানাটা আমরা দেখে নেব ভালো করে।'

'সেটা তোমাদের ব্যাপার!'

ভদ্রলোকটি চলে গেলে পরে আমাদের দলের লোকজন সিতানভকে গাল পাড়তে শুরু করে দিল:

'কেন করতে গেলে ও সব, বেকুব? কসাক ওকে হারিয়ে দিত'খন, তা না, এখন আমরাই হেরে গেলাম...'

তারা প্রাণভরে অনেকক্ষণ ধরে ধিকিয়ে ধিকিয়ে গাল পাড়তে লাগল। প্রত্যুত্তরে সিতানভ শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল:

'যত সব...'

তারপর সমস্ত দর্শকদের অবাক করে দিয়ে হঠাৎ সিতানভ মর্দোভীয়কে চ্যালেঞ্জ করে বসল। মর্দোভীয় এসে জায়গা নিল। তারপর মুঠি-পাকানো হাত ঘুরতে ঘুরতে পরিহাস ভরা কণ্ঠে বলে উঠল:

'তবে একটু ধস্তাধস্তি করা যাক! নিছক একটুখানি গা গরম করা আর কি!'

কয়েকটি দর্শক হাত ধরাধরি করে পিছনের লোকদের ঠেলে জায়গা বড়ো করে দিল।

ঘুরে ঘুরে পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল লড়ুয়েরা, দুজনার জ্বলন্ত চোখ দুজনার মুখের উপরে নিবদ্ধ। ডান হাত বাড়িয়ে দেয়া, আর বাঁ হাত বুকের সঙ্গে আটকানো। অভিজ্ঞ দর্শকেরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল মর্দোভীয় লোকের চাইতে সিতানভের হাত দুটো লম্বা। সব চুপ। শুধু জেগে উঠছে ওদের পায়ের তলায় বরফ গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। সেই উদ্বেগাকুল অবস্থা

সহ্য করতে না পেরে ধৈর্যহীন অভিযোগভরা সুরে কে একজন বলে উঠল:

'খুব হয়েছে, এবার লেগে পড়ো ভাইরা।'

সিতানভ ডান হাতে ঘুষি বাগাল, মর্দোভীয় বাঁ হাত তুলল সে ঘুষি ঠেকাতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সোজা ওর পেটের উপরে জোর ঘুষি এসে পড়ল সিতানভের বাঁ হাতের। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে মর্দোভীয় পেছিয়ে গেল তারিফ করতে করতে:

'বয়েস কম হলেও বোকা নয় দেখছি।'

তারপর শুরু হয়ে গেল জোর লড়াই। খুব জোরে জোরে দুজন দুজনার বুক লক্ষ্য করে ঘুষি চালাতে লাগল। একটু পরেই দু'পক্ষই দারুণ উত্তেজনায় চিৎকার করতে শুরু করল:

'জোরসে লাগাও, দেবতার পট আঁকিয়ে — ওর মুখটা থেঁতলে দাও!'

মর্দোভীয় সিতানভের তুলনায় ঢের বেশি শক্তিশালি কিন্তু কম চটপটে। তাড়াতাড়ি সরতে ও ঘুষি চালাতে না পারার ফলে ও একটা ঘুষি মারে তো সিতানভ মারে তিনটে। কিন্তু মনে হল সেসব ঘুষিতে ওর কিছুই হচ্ছে না। কারণ ও অনবরতই সিতানভকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে চলল আর গর্জাল। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঘুষি চালিয়ে সিতানভের ডান হাতটা কাঁধের কোটর থেকে খসিয়ে দিল।

'ছাড়িয়ে দাও ওদের, সমান সমান!' জেগে উঠল এক সঙ্গে বহু কণ্ঠের আওয়াজ। দর্শকরা ছুটে এসে ওদের ছাড়িয়ে দিল।

'ওর গায়ে তেমন জোর নেই — ঐ দেবতার পট আঁকিয়ের, কিন্তু লোকটা খুব চটপটে!' ভালো মনেই বলল মর্দোভীয়। 'কালে কালে ও যে একজন ভালো লড়ুয়ে হয়ে উঠবে; একথা বলতে এতটুকুও লজ্জা নেই আমার।'

অল্পবয়েসী বাচ্চারা যারা দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারা এবার যথেচ্ছ লড়াই শুরু করে দিল। আর আমি সিতানভকে নিয়ে চলে গেলাম হাড়-বসানো ডাক্তারের কাছে। ওর এই কাজে ও আমার মনে আরো উঁচু আসন অধিকার করে বসল। ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে গেল অনেকখানি।

সিতানভ ছিল সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ। যা করেছে সেটা কর্তব্যবোধেই করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু লড়ুইয়ে কাপেনদ্যুখিন ওকে বিদ্রূপ করত:

'ছ্যাঃ, সবসময়ে অহঙ্কারে ফুলেই আছিস, ইয়েভগেনি! সামোভারের

মতো তোর মনটাকে ঘসে মেজে চকচকে করে তুলেছিস আর তাই নিয়ে জাঁক করে বেড়াস কিনা, দেখ তাকিয়ে, আমি কেমন চকচকে! কিন্তু তোর মনটা যে হচ্ছে পিতলের। আচ্ছা এক রামগড়ুরের ছানা হয়েছিস তুই।'

সিতানভ তার কাজ করে চলত, নয়ত লেরমন্তভের কবিতা টুকত নোটবইয়ে। অবকাশ সময়টা সে কবিতা নকল করে কাটাত। একদিন আমি বলেছিলাম:

'কিন্তু আপনার তো টাকা আছে। গিয়ে বইটা কিনে আনলেই তো পারেন!'

ও উত্তর দিয়েছিল:

'না, নিজের হাতে টুকে নেয়াটা ঢের ভালো!'

সুন্দর হাতের লেখায় এক পৃষ্ঠা নকল করে কালি শুকবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আস্তে আস্তে পড়ে চলত:

তুমি ছেড়ে যাও ধুলোর ধরণীতল,
মনে রাখো নাকো কোনো ক্ষোভ, কোনো শোক,
সব মাধুর্য যেথায় ক্ষণস্থায়ী
সব সুখই পলাতক...

'এই হল গে খাঁটি সত্য,' বলত সিতানভ চোখ কুঁচকে, 'কী সুন্দর ভাবেই না এই কবি সত্য কথাটাকে ধরেছেন!'

কাপেনদ্যুখিনের সঙ্গে সিতানভের ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যেতাম। কাপেনদ্যুখিন মাতাল হয়ে পড়লেই মারপিট শুরু করে দিত সিতানভের সঙ্গে। সিতানভ ধীরস্থির ভাবে চেষ্টা করত ওকে ফেরাতে:

'সরে যা! গায়ে হাত দিবি না খবর্দার!'

শেষ পর্যন্ত সে মাতাল কাপেনদ্যুখিনকে পিটতে শুরু করে দিত নির্দয় ভাবে। এমন নির্দয় ভাবে পিটত যে অন্যান্য পটুয়ারা, মারপিট দেখতেই যারা আনন্দ পেত সবচাইতে বেশি, তারা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ছাড়িয়ে দিত দুই বন্ধুকে। বলাবলি করত:

'সময়মতো ইয়েভগেনিকে না ছাড়ালে ওকে মেরেই ফেলত। এতটুকু ভাবত না নিজের কী হবে না হবে।'

এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায়ও কাপেনদ্যুখিন লেগে থাকত সিতানভের পেছনে। ওর কবিতা পড়ার উপরে প্রবল অনুরাগ আর শোচনীয় প্রেমের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত সব সময়ে। নোংরা ভাবে ব্যর্থ চেষ্টা করত

ওর ঈর্ষা জাগিয়ে তোলার। প্রত্যুত্তরে একটি কথাও না-বলে বা চটে না গিয়ে সিতানভ শুনে যেত ওর ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কোনো কোনো সময়ে কাপেনদ্যুখিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেও হাসত।

ওরা দুজনে শুত পাশাপাশি। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে মিলে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করত।

ওদের ঐ নৈশ আলোচনা আমাকে কৌতূহলী করে তুলত। অবাক হয়ে যেতাম এই ভেবে যে এমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতের দুটো লোক কী কথা নিয়ে এমন শান্ত নির্বিকার ভাবে আলোচনা করে যেতে পারে। কিন্তু যখনই ওদের কাছে যেতাম অমনি কসাক বলে উঠত:

'কী চাস এখানে?'

কিন্তু সিতানভ আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করত না।

একদিন কিন্তু ওরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল:

'মাক্সিমিচ,' বলল কসাক, 'তোর যদি অনেক টাকা থাকত, কী করতিস তুই তা দিয়ে?'

'বই কিনতাম।'

'আর কী করতিস?'

'জানি না।'

'হুঃ,' একটা হতাশাভরা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরল কাপেনদ্যুখিন।

'দেখলি তো?' শান্ত কণ্ঠে বলল সিতানভ, 'কেউ বলতে পারে না। বুড়ো, ছেলে, কেউ না। টাকাকড়ির এমনিতে তো কোনো দাম নেই, তা দিয়ে কী করছিস সেটাই হল আসল...'

'কী নিয়ে কথা হচ্ছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তেমন কিছু না। ঘুম আসছে না তাই সময় কাটাচ্ছি,' বলল কসাক।

কিন্তু পরে ওরা আমাকে ওদের আলোচনা শুনতে বাধা দিত না। আবিষ্কার করলাম যে-সব কথা নিয়ে লোকে দিনের বেলায় আলোচনা করে সেই সব কথার আলোচনাতেই ওরা রাত কাটায়: ঈশ্বর, ন্যায়বিচার, সুখশান্তি, মেয়েদের বেকুবি আর শয়তানী, ধনীদের লোভ আর সাধারণ ভাবে জীবনটার দুর্বোধ্য প্রহেলিকা নিয়ে।

আমি ছিলাম ওদের উৎসুক শ্রোতা। ওদের আলোচনা গভীর ভাবে নাড়া দিত আমাকে। জীবনটা খুবই বিশ্রী, দুঃখের, কিন্তু তাকে সুন্দর সুখের করে তুলতে হবে একথা ওরা স্বীকার করছে দেখে খুশি হয়ে উঠতাম। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতাম যে জীবনটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার শুধু সদিচ্ছাতে যে কেউ কিছু করবে তা নয়। এতে না এল কারখানার জীবনে কোনো পরিবর্তন না পটুয়াদের পরস্পরের সম্পর্কে। এসব আলোচনায় জীবন সম্পর্কে আমার অন্তর্দৃষ্টি কিছুটা খুলে গেলেও তা থেকে ফুটে উঠত শুধু এক ক্লিষ্ট শূন্যময়তা যার ভিতরে মানুষ ঝড়ো হাওয়ায় বিক্ষুব্ধ পুকুরের বুকে শুকনো পাতার মতো লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে বেড়ায়, আর সেই লক্ষ্যহীন ভেসে বেড়ানোর বিরুদ্ধে নিজেরাও অসন্তোষ বোধ করে, ধিক্কার জানায়।

পটুয়ারা সব সময়েই হয় অহংকার করত, নয় অনুতাপ করত, নয় একজন আর একজনকে দোষারোপ করত, দারুণ ঝগড়া করত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত ভীষণ ভাবে। পরলোকে ওদের কী হবে না হবে তাই নিয়েই ওরা জল্পনা-কল্পনা করে সময় কাটাত। অপর পক্ষে ইহলোকে দোরের পাশে ময়লা জলের বালতি রাখার জায়গায় মেঝের একটা তক্তা পচে গিয়ে যে গর্তটা হয়েছিল তার ভিতর দিয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটির সোঁদা গন্ধভরা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আমাদের পাগুলো জমিয়ে দিত। খড় আর ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে পাভেল আর আমি সে গর্তটা বন্ধ করেছিলাম। ওরা প্রায়ই বলত মেঝের জন্যে একটা নতুন তক্তা বসাতে হবে, কিন্তু গর্তটা ক্রমেই বড়ো হয়ে চলল। তার মধ্যে দিয়ে ঝড়ের দিনে শিঙের মতো আওয়াজ তুলে বইত বাতাস আর তারই ফলে সর্দি কাশি হত। ঘুলঘুলির ধাতুর চাকতিটা এমন কর্কশ আওয়াজ তুলত যে সবাই কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করত। কিন্তু আমি সেটা তেল দিয়ে ঠিক করে দিতে ঝিখারেভ কান খাড়া করে বলল:

'ঐ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দটা বন্ধ হয়ে আরো বিশ্রী লাগছে!'

স্নানের ঘর থেকে ফিরে এসে ওরা ওদের ঐ নোংরা বিছানায়ই গড়াগড়ি দিত। ময়লা পচা দুর্গন্ধ এখানে কেউ তেমন গায়ে মাখত না। ছোটখাটো যে-সব জিনিসে জীবন অতিষ্ঠ অথচ অতি সহজেই যা দূর করা সম্ভব তা দূর করার জন্যে কেউই কোনো চেষ্টা করত না।

প্রায়ই ওরা বলত:

'মানুষের উপরে মায়া দয়া আছে কার? কারুর না। এমন কি ভগবানেরও নেই...'

নোংরা আর পোকার কামড়ে দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছিল মৃত্যু পথযাত্রী

দাভিদভ। কিন্তু পাভেল আর আমি ওকে যখন ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম, ওরা আমাদের নিয়ে হাসি-তামাসা শুরু করল, বলল, স্নানের ঘরের চাকর। নিজেদের জামা এগিয়ে দিল উকুন বেছে দিতে। আর এমন ভাবে ঠাট্টা করতে লাগল যেন আমরা খুব একটা কৌতুকপ্রদ লজ্জাকর কাজ করে ফেলেছি।

বড়োদিন থেকে শুরু করে লেণ্ট পর্ব পর্যন্ত দাভিদভ তার মাচার উপরের বিছানায় পড়ে রইল। কাশল অনবরত। বড়ো বড়ো রক্তের ডেলা আর গয়ের তুলল। সেগুলো ময়লার বালতিটায় না পড়ে পড়ত মেঝের উপরে। রাত্রে ওর প্রলাপের চিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় প্রত্যেক দিনই ওরা বলাবলি করত:

'ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসতে হবে!'

কিন্তু প্রথমটায় দেখা গেল যে দাভিদভের পাসপোর্ট নতুন করে করিয়ে নেওয়া দরকার, নইলে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করবে না। তারপরে মনে হল ও খানিকটা ভালো হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সবাই বলতে লাগল:

'কী আর এমন এসে যাবে? ও তো মরবেই দু'চার দিনের ভিতরে!'

'হাঁ, শীগগিরই মরব,' রোগী নিজেও কথা দিল।

দাভিদভও ছিল খুব শান্ত গোছের হাস্যরসিক। সেও প্রাণপণে চেষ্টা করত কারখানার গুমোট আবহাওয়া হালকা করে তুলতে। ময়লা রঙের মুখটা মাচার কিনারা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে হিসহিসে গলায় বলত:

'হে সজ্জনেরা! যে লোক মাচার উপরে আরোহণ করেছে তার বাণী শ্রবণ করো...'

তারপর গম্ভীর মুখে এক অর্থহীন বিভীষিকার ছবি আবৃত্তি করে চলত:

'পড়ে থাকি নিজের মাচায়,
সাত সকালে উঠি,
আরশুলা মাংস ছি'ড়ে খায়
ঘুম যায় টুটি...'

শ্রোতারা তারিফ করে বলত, 'ও আদৌ ভেঙে পড়ে নি!'

কোনো কোনো সময়ে পাভেল আর আমি উঠে যেতাম ওর মাচার উপরে। জোর করা ফুর্তির ভাব টেনে এনে ও আমাদের আপ্যায়িত করত:

'কী খেতে দি তোমাদের, বলো তো বন্ধুরা? বেশ সুন্দর একটা তকতকে মাকড়সা খাবে?'

মৃত্যু আসছিল খুব ধীরে ধীরে আর তাতে ও ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছিল।

'মনে হচ্ছে মরা আমার আর হবে না!' বিরক্তি চাপার চেষ্টা না করেই বলত দাভিদভ।

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওর এই নির্ভীকতায় দারুণ ভয় পেত পাভেল। রাত্রে আমাকে ঘুম থেকে তুলে ফিস ফিস করে বলত:

'মাক্সিমিচ! বোধ হয় ও মরে গেছে... এমনি এক রাত্রে আমরা নিচে ঘুমিয়ে থাকব আর ও মরে যাবে! হায় ভগবান! মরা মানুষে আমার ভীষণ ভয়...'

নয়ত বলত:

'বিশ বছরের আগেই যদি মরতে হয় তো ও এতো দিন কেন বেঁচে থাকল?'

এক চাঁদনী রাতে পাভেল আমাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে তুলল। ভয়ে ওর চোখ দুটো ছানাবড়া। বলল:

'শোন!'

মাচার উপর থেকে শোনা যাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস টানছে দাভিদভ আর বিড় বিড় করে কিন্তু স্পষ্ট ভাবে বকছে:

'এখানে, এখানেই আনা যাক, এখানে...'

তারপর হিক্কা তুলতে আরম্ভ করল।

'মরে যাচ্ছে, হায় ভগবান, ঠিক মরে যাচ্ছে দেখে নিস!' অস্বস্তিতে ফিস ফিস করে বলল পাভেল।

সারাটা দিন সেদিন উঠোন থেকে গাড়ি গাড়ি বরফ তুলে মাঠে ফেলতে হয়েছিল আমায়। দারুণ ক্লান্ত লাগছিল। ঘুম ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকেই আমার তখন আর কোনো খেয়াল ছিল না।

'যীশুর দোহাই ঘুমোস নে!' একান্ত মিনতিভরা কণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগল পাভেল, 'লক্ষ্মীটি, ঘুমোস নে।'

তারপর আচমকা লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল:

'ওঠো! দাভিদভ মরে গেছে!'

কেউ কেউ জেগে উঠল, কেউ কেউ আবার বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও বিরক্তিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে।

কাপেনদ্যুখিন মাচার উপরে উঠে গেল। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল:

'ঠিকই তো, মনে হচ্ছে মরেই গেছে... যদিও গাটা একটু একটু গরম আছে...'

সবাই চুপ করে গেল। ঝিখারেভ ফুশ করে কম্বলটা আরো শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল:

'তাহলে, ওর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুক!'

'বরং ওকে দোরের সামনে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়া যাক,' কে একজন বলে উঠল।

নিচে নেমে এসে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল কাপেনদ্যুখিন:

'ভোর পর্যন্ত ওখানেই থাক — বেঁচে থাকতেও তো ও কোনো দিন কারো পথে বাধা দেয় নি।'

বালিশের ভিতরে মুখ গুঁজে পাভেল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সিতানভের ঘুম কিন্তু এত সবেও ভাঙল না।

১৫

মাঠের বুকে তুষার গলছে। আকাশের বুকে গলছে মেঘ। ভিজে বরফ আর বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ছে মাটির বুকে। সূর্যের দৈনন্দিন পরিক্রমা হয়ে উঠেছে দীর্ঘস্থায়ী। বাতাস তপ্ত। মনে হয় ইতিমধ্যেই বুঝি বসন্ত এসে গেছে, শুধু উদ্দাম আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শহরের বাইরে কোথায় কোন মাঠের ভিতরে যেন লুকিয়ে আছে দুষ্টুমি করে। লালচে বাদামী রঙের কাদায় ভরে উঠেছে পথের বুক। বাঁধানো রাস্তার পাশ বেয়ে কুল কুল করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত। আরেস্তানৎস্কায়া স্কোয়ারের বুকে স্থানে স্থানে জমে থাকা গলন্ত বরফের চারদিকে চড়ুইগুলো আনন্দে লাফালাফি করে ফিরছে। তাদের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠেছে মানুষ। বসন্তের এই মর্মরধ্বনি ছাপিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বেজে চলেছে লেণ্টের ঘণ্টাধ্বনি। মৃদু কোমল দোলায় দুলিয়ে দিয়ে চলেছে মানুষের অন্তর। বুড়োদের বক্তৃতার মতো ঐ ধ্বনির ভিতরে কেমন যেন একটু অভিমান লুকিয়ে রয়েছে। যেন নিস্পৃহ বিষণ্ণ কণ্ঠে ঘণ্টাগুলো বলে চলেছে:

'ব-হু-উ-উ, বহুদিন আগে, ব-হু-উ-উ...'

আমার জন্মদিনে কারখানা থেকে ঈশ্বরের আশিসপূত আলেক্সির একটা

খুব সুন্দর ছোট্ট আইকন আমাকে উপহার দেওয়া হল। ঝিখারেভ গাম্ভীর্যভরা এমন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল যা কোনো দিনও আমি ভুলব না:

'তাছাড়া তুমি কে?' ভ্রূ উঁচু করে হাতের আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে সে বলে চলল, 'বাপ-মা-হারা তেরো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। আমার বয়েস তোমার চারগুণ। তবুও সেই আমিই তোমায় বলছি, তোমার প্রশংসা করছি এইজন্যে যে জীবন-যুদ্ধে তুমি হার মানো নি। বরং সোজাসুজি তার মোকাবিলা করে চলেছ। এই হচ্ছে পথ। যা কিছুই আসুক না কেন এমনি করেই সোজাসুজি মোকাবিলা করো!'

তারপর সে ঈশ্বরের দাস আর ঈশ্বরের ভৃত্যদের সম্পর্কে কী সব বলল। কিন্তু দাস আর ভৃত্যদের পার্থক্য আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। আর সেও যে এর পার্থক্য কিছু বোঝে তাও মনে হল না। ওর বক্তৃতাটা একঘেয়ে লাগছিল। ঠাট্টা টিটকারি দিচ্ছিল সবাই। আমি আইকনটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। গভীর ভাবে বিচলিত আর বিব্রত হয়ে উঠেছি, জানি না কী করব। শেষ পর্যন্ত দারুণ বিরক্ত হয়ে কাপেনদ্যুখিন বক্তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠল:

'মনে হচ্ছে যেন আদ্যশ্রাদ্ধের মন্তর পড়ানো হচ্ছে। এবার থামো, ওর কান দুটো যে নীল হয়ে উঠেছে।'

কিন্তু তারপর সে নিজেই আমার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিতে শুরু করে দিল:

'তোর ভিতরে সবচাইতে যেটা ভালো গুণ সেটা হচ্ছে এই যে সবার প্রতি তোর নজর আছে। তোর এই গুণটা আমি সবচাইতে বেশি পছন্দ করি। কিন্তু তার ফলে যখন অন্যায় কাজ করিস, তখন তোকে বকুনি দেওয়া কি পিটুি লাগানো কঠিন হয়ে পড়ে।'

সবার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আমার মুখে। আমার বিব্রত অবস্থা দেখে স্নেহের কৌতুকে পরিহাস করছে সবাই। যদি অনুষ্ঠানটি আরো বেশিক্ষণ চলতে থাকত তবে বোধ হয় নিছক কেঁদে ফেলতাম এই আনন্দে যে এই লোকগুলির কাছে অন্তত আমার মূল্য খানিকটা আছে। অথচ সেদিন সকালেই বড়ো সাকরেদ আমাকে দেখিয়ে পিওতর ভাসিলিয়েভিচকে বলছিল:

'অপদার্থ ছোকরা, একটা কাজও করতে পারে না।'

বরাবরের মতো সেদিন সকালেও দোকানে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেলা পড়ে আসতেই বড়ো সাকরেদ আমাকে বলল:

'বাড়ি যা, গোলার ছাদের বরফ চেঁছে তুলে ঠাণ্ডা-গুদামে ভরে দে।'

ও জানত না যে আজ আমার জন্মদিন। ভেবেছিলাম কেউই জানে না।

কারখানার অভিনন্দনের পালা শেষ হতেই কাপড়চোপড় বদলে নিয়ে উঠোনে ছুটে গিয়ে গোলার ছাদে উঠে বরফ চেঁছে তুলে ফেলতে লাগলাম। সেবার শীতে বরফও পড়েছিল প্রচুর। কিন্তু উত্তেজনার চোটে আগে গুদামঘরের দরজাটা খুলে নিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ফলে আমার চেঁছে তোলা বরফের তলায় ওটা ঢাকা পড়ে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরেই শুরু করে দিলাম দরজাটা খুঁড়ে বের করতে। কিন্তু বরফ ছিল ভেজা আর শক্ত চাপচাপ। বাড়িতে কোনো লোহার বেলচা না থাকায় যে কাঠের বেলচাটা দিয়ে বরফ তুলছিলাম বরফের ভারে সেটা ভেঙে গেল। 'সুখের পিছনেই আসে দুঃখ' এই রুশ প্রবাদটাকে সত্য প্রমাণ করে ঠিক সেই মুহূর্তেই দোরের পথে এসে দাঁড়াল বড়ো সাকরেদ।

'হুঁ,' আমার কাছে এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল। 'তোফা কাজ জানিস বটে, জাহান্নামের ভূত! তোর ঐ পাগলা মাথাটা আজ আমি ফাটাব, দাঁড়া!'

বেলচার ভাঙা হাতলটা ও উঁচু করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও সরে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম:

'আপনাদের উঠোন পরিষ্কার করার জন্যে আমাকে ভাড়া করা হয় নি!'

ও লাঠিটা আমার পায়ের উপরে ছুঁড়ে মারল। আর আমিও এক তাল বরফ ছুঁড়ে মারলাম সোজা ওর মুখে। বিড় বিড় করে বকতে বকতে ও ছুটে পালিয়ে গেল। আর কাজ ফেলে আমিও সোজা চলে এলাম কারখানায়। খানিকক্ষণ পরে বড়ো সাকরেদের বাগদত্তা ছুটে নিচে নেমে এল। তরুণীটি চঞ্চল স্বভাবের, ফ্যাকাসে মুখ ব্রণে ভরা। বলল:

'মাক্সিমিচ, তোকে ডাকছে উপরে!'

'আমি যাব না,' বললাম।

'যাবি না কী?' অবাক বিস্ময়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লারিওনিচ।

সমস্ত ঘটনাটা বললাম তাকে। চিন্তিত মুখে ভ্রূ কুঁচকে সে নিজেই উপরে চলে গেল। যাওয়ার সময়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল:

'একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, রে...'

বড়ো সাকরেদের উদ্দেশে গালমন্দে কারখানা মুখর হয়ে উঠল।

'ওরা নিশ্চয়ই এবার তোকে তাড়িয়ে দেবে!' বলল কাপেনদ্যুখিন।

তাতে আমি ভয় পাই না। অনেক দিন ধরেই বড়ো সাকরেদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অসহ্য রকমের বিশ্রী হয়ে এসেছিল। ও দারুণ ঘৃণা করত আমাকে। ওর সেই ঘৃণা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, আমিও সমান ঘৃণায় তার জবাব দিতাম। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সব অদ্ভুত ব্যবহারে প্রায় হতভম্ব হয়ে যেতাম।

ইচ্ছে করেই মেঝের উপরে পয়সা ছড়িয়ে রাখত যাতে ঝাঁট দেয়ার সময়ে আমি সেগুলো কুড়িয়ে পাই। আমি অবশ্য সেগুলো তুলে রাখতাম কাউণ্টারের উপরে একটা বাটিতে যেখানে ভিখিরীদের দেয়ার জন্যে পয়সা রাখা হয়। অবশেষে ওর মতলব বুঝতে পেরে একদিন ওকে বললাম:

'অমন ভাবে পয়সা ছড়িয়ে রেখে কোনো ফল হবে না!'

সতর্কতার অবকাশ না পেয়ে রাগে লাল হয়ে চিৎকার করে সে ধমকে উঠল:

'আমাকে শেখাতে আসিস এতো বড়ো দুঃসাহস তোর! আমি কী করছি না করছি তা খুব ভালো করেই জানি আমি!'

কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলল:

'আমি ইচ্ছে করেই ছড়িয়ে রাখি, এ কথা ওঠে কিসের জন্যে? ওগুলো অমনিই পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর...'

দোকানে বসে আমার বই পড়া নিষেধ করে দিয়ে ও বলল:

'ওসব তোর মতো লোকের জন্যে নয়। কী ভাবছিস তুই, ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত হয়ে উঠবি নাকি, ব্যাটা পরগাছা?'

আমি যাতে পয়সা চুরির অপরাধে ধরা পড়ি তার জন্যে ও উঠে-পড়া লাগল। টের পেয়েছিলাম, ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে যদি একটা সিকি গড়িয়ে মেঝের ফাটলের ভিতরে গিয়েও পড়ে, তাহলে ও নির্ঘাৎ আমাকে চুরির অপবাদ দিয়ে বসবে। আবার আমি ওকে ওর এ খেলা বন্ধ করে দিতে বললাম। কিন্তু সেই দিনই সরাইখানা থেকে এক কেতলি গরম জল নিয়ে ফিরতে ফিরতে আড়াল থেকে শুনতে পেলাম ও পাশের দোকানের কর্মচারীটিকে বলছে:

'ওকে দিয়ে একখানা প্সালতির চুরি করা, শীগ্গিরই আমরা নতুন বই আনছি—তিন বাক্স ভর্তি।'

বুঝলাম আমার সম্পর্কেই পরামর্শ হচ্ছে। কেননা আমি ঢুকতেই দুজনে হকচকিয়ে গেল। তাছাড়া আগের এক অভিজ্ঞতার ফলেও কর্মচারী

যে বড়ো সাকরেদের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তা সন্দেহ করার বাড়তি কারণ জুটেছিল।

কর্মচারীটি ছিল দুর্বল ক্ষীণজীবী। চোখ দুটো ধূর্ত ধূর্ত। মাঝে মাঝে ওকে চাকরীতে বহাল করা হত, কেননা একদিকে যেমন ভালো কর্মচারী বলে ওর নাম, অন্যদিকে ও আবার পাঁড় মাতাল। মদের আড্ডায় গিয়ে বেসামাল হওয়া মাত্রই মালিক ওকে বরখাস্ত করত। যদিও পরে আবার বহাল করত নতুন করে। বাইরে ভাব করত নম্র, বিনয়ী। মনিবের এতটুকু ইচ্ছেও তামিল করত প্রাণপণে, কিন্তু ঠোঁটের কোণে সব সময়েই ফুটে থাকত একটা ধূর্ত হাসি। ভালোবাসত কাটাকাটা মন্তব্য করতে। যদিও ওর দাঁতগুলো সাদা ঝকঝকে তবুও ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খারাপ দাঁতওয়ালা মানুষের মতো পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসত।

একদিন অবাক করে দিয়ে খুব হাসি হাসি মুখ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল আমার কাছে। তারপর হঠাৎ আমার টুপিটা ফেলে দিয়ে চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরল। দুজনে মারপিট শুরু করে দিলাম। গ্যালারী থেকে ও আমাকে দোকানের ভিতরে ঠেলে নিয়ে এল। চেষ্টা করতে লাগল মেঝের উপরে দাঁড়-করানো একটা বড়ো আইকনের উপরে ঠেলে ফেলে দিতে। ও সফল হলে কাঁচটা ভেঙে ফেলতাম গুঁড়ো গুঁড়ো করে, উপরের কারুকার্য আর দামী আইকনটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতাম। কিন্তু ওর গায়ে জোর কম থাকায় অনায়াসেই আমি ওকে কাবু করে ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা মেঝের উপরে পা ছড়িয়ে আহত নাকটার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে ভীষণ ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিল।

পরদিন সকালে দুই দোকানের মনিবরা চলে যেতে আমরা যখন একা হলাম ও এসে ওর ফুলে-ওঠা নাক আর একটা চোখের নিচে হাত বুলোতে বুলোতে আপোষের সুরে বলল:

'তুই কি মনে করিস আমি ইচ্ছে করে তোকে মারতে গিয়েছিলাম? অত বোকা নই আমি। জানতাম তুই আমাকে পেড়ে ফেলবি। কারণ আমি দুর্বল, তায় মাতাল। মনিবের হুকুমে করেছিলাম। আমাকে বলেছিল, 'ওকে আচ্ছা করে ঠুকে দে, আর দেখিস যেন মারপিট করতে গিয়ে ওদের দোকানের দারুণ একটা ক্ষতি হয়ে যায়। তাহলে একটা মোটা লোকসান হবে ওদের দোকানের।' আমার কথা যদি বলিস তো—আমি নিজের ইচ্ছেয় কক্খনো

এমন কাজ করতাম না। দেখ দেখি আমার মুখখানার কী হাল করে দিয়েছিস...'

ওর কথায় বিশ্বাস হয়েছিল আমার। দুঃখ হয়েছিল ওর জন্যে। জানতাম আধ-পেটা খেয়ে ওর দিন কাটে। তাছাড়া একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে, সেও ওকে ধরে পেটে। কিন্তু তবুও জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে:

'তোমাকে যদি ওরা বলে কাউকে বিষ দিতে, দেবে?'

'ও যে বাধ্য করবে আমাকে!' প্রত্যুত্তরে একটু করুণ হাসি হেসে কোমল সুরে বলল, 'তা ও করতে পারে।'

আর একদিন আমায় এসে বলেছিল:

'একটি পয়সাও নেই আমার হাতে। খাবার কিছুই নেই ঘরে। বুড়িটা সব সময়েই জ্বালাতন করে মারছে। তুই যদি তোদের গুদাম থেকে একটা আইকন চুরি করে দিস্ আমাকে তো আমি সেটা নিয়ে গিয়ে বেচে আসতে পারি। এই কাজটুকু করবি আমার জন্যে? নইলে একখানা প্সাল্তির?'

সেই জুতোর দোকান আর গির্জার চৌকিদারের কথা মনে পড়তেই ভাবলাম: এ লোকটা নিশ্চয়ই বলে দেবে আমার নামে! কিন্তু তবুও ওকে ফিরিয়ে দিতে মন চায় নি। একখানা আইকন বের করে দিয়েছি। কেন জানি মনে হয়েছিল বহু টাকা দামের একখানা প্সাল্তির চুরি করার অপরাধ অনেক বেশি। হ্যাঁ, কথাটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের নৈতিকতার মধ্যে চাপা আছে পাটিগণিত। আমাদের ফৌজদারী আইনের যত কিছু সহজ সরল পবিত্রতার মধ্যে এই ছোট্ট গোপন কথাটাই প্রকাশ পাচ্ছে, এবং এ কথারও পিছনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরাট অন্যায় লুকিয়ে রয়েছে।

যখন শুনলাম আমাদের বড়ো সাকরেদ আমাকে দিয়ে প্সাল্তির চুরি করাবার জন্যে এই হতভাগা লোকটাকে উস্কানি দিচ্ছে, তখন সভয়ে মনে পড়ে গেল আমার সে দিনের সেই আইকন চুরির কথা। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তার ক্ষতি করে আমার এই দাক্ষিণ্য দেখাবার কথা জেনে ফেলেছে বড়ো সাকরেদ। তার মানে পাশের দোকানের লোকটা বলে দিয়েছে আমার নামে।

অন্যের ক্ষতি করে অপরকে দয়া দেখাবার এই সস্তা ব্যাপারে আর ওদের চক্রান্তের এই ক্ষুদ্রতায় নিজের উপর এবং সবার উপরে মনটা খিঁচড়ে গেল। দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম মনে মনে। নতুন বই না আসা পর্যন্ত একটা দারুণ মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটতে লাগল। অবশেষে বইগুলো

এসে পৌঁছল। গুদামঘরে বসে যখন বাণ্ডিল খুলছি তখন পাশের দোকানের লোকটাও এসে জুটল আমার সঙ্গে। তারপর একটা প্সাল্তির চাইল।

'আইকনটার কথা বলে দিয়েছ মনিবকে?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'হ্যাঁ,' অকপটে স্বীকার করল লোকটা, 'আমি ভাই কোনো কথা চেপে রাখতে পারি না...'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। মেঝের উপরে বসে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। আর ও তেমনি করুণ বিব্রত মুখে বিড় বিড় করে বলে চলল:

'তোর মনিব আন্দাজে ধরে ফেলেছিল। নয়ত আমার মনিব বুঝতে পেরে বলে দিয়েছিল তোর মনিবকে...'

বুঝলাম আমার দফানিকাশ। ওরা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। এবার হয়ত কোনো শিশু-সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দেবে! যদি তাই ঘটে, তবে অন্য কিছু পরোয়া করে লাভ কী? যদি ডুবতেই হয় তো অগাধ জলে ডোবাই ভালো। একখানা প্সাল্তির ঐ কর্মচারীর হাতে গুঁজে দিলাম। ও কোটের পকেটে বইটা লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তক্ষুণি আবার ফিরে এল। বইটা এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে।

'না, আমি নিতে পারব না এটা! তুই আমার সর্বনাশ করে ছাড়বি,' বলতে বলতে ও চলে গেল।

ওর কথার কোনো মানেই বুঝতে পারলাম না। কেন আমি ওর সর্বনাশ করে ছাড়ব? কিন্তু ও যে বইটা নিল না, তাতে মনে মনে দারুণ খুশি হয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমাদের খুদে বড়ো সাকরেদ আমাকে আরো বেশি বিদ্বেষ ও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল।

লারিওনিচ উপরে যেতেই এসব কথা ভেসে উঠল আমার মনে। একটু পরেই আরো গম্ভীর, আরো থমথমে মুখে ফিরে এল লারিওনিচ। রাত্রে খাওয়ার আগে দুজনে একা হতেই সে বলল:

'অনেক চেষ্টা করলাম যাতে ওরা তোকে দোকানের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে শুধু কারখানায়ই রাখে। কিন্তু পারলাম না, কোনো কথাই শুনতে চাইল না কুজ্মা। ও তোর উপরে বিষম খাপ্পা...'

এ বাড়িতে আরো একজন শত্রু ছিল আমার—বড়ো সাকরেদের বাগদত্তা। চালু মেয়ে। কারখানার সব তরুণ ছেলেরা নটঘট করত ওর সঙ্গে। ওরা সদর দরজার কাছে অপেক্ষা করে থাকত ওর জন্যে। আর চটকাত ওকে।

তাতে রাগ করত না একটুও, শুধু কুকুর-ছানার মতো আস্তে আস্তে কুঁই কুঁই করত। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেক আর লজেন্স চিবোত। এই সব জিনিসে ওর দু-পকেট সব সময়ে ঠাসা থাকত। ফ্যাকাসে মুখের উপরে ঘূর্ণমান দুটো ধূসর চোখ দেখাত ভারি বিশ্রী। প্রায়ই পাভেল আর আমাকে এমন সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করত যার উত্তর ইঙ্গিতপূর্ণ। কিংবা এমন সব ছড়া বলত যেগুলো তাড়াতাড়ি বলতে গেলে জুড়ে গিয়ে অশ্লীল কথা হয়ে ওঠে।

বয়স্ক এক পটুয়া একদিন বলেছিল ওকে:

'তুই তো ভারি বেহায়া ছুঁড়ি!'

তাতে একটা অশ্লীল গানের কলি আউড়ে সহর্ষে জবাব দিয়েছিল:

যে মেয়ে বড়োই লজ্জাবতী
পুরুষে তাহার নেইকো গতি...

এমন ধারা মেয়ে আগে কখনো আমার চোখে পড়ে নি। গা ঘিন ঘিন করত আমার ওকে দেখে। ভয় লাগত ওর স্থূল ঢলাঢলিতে। ওসব ব্যাপারে আমার বিতৃষ্ণা দেখে ও আরো বেশি করে লাগত আমার পেছনে।

একদিন নিচের ভাঁড়ারঘরে পাভেল আর আমি ওকে ক্ভাস ও নোনা শসার পিপেগুলো ধুতে সাহায্য করছি। ও বলল আমাদের:

'কেমন করে চুমু খেতে হয় শিখিয়ে দেব তোদের?'

'কেমন করে খেতে হয় তোমার চাইতে ঢের ভালো জানা আছে আমার,' একটু হেসে জবাব দিল পাভেল আর আমি একটু রূঢ় ভাবেই বললাম ওর নিজের বরকে গিয়ে চুমু খেতে। এতে ও রেগে গেল।

'ওরে ছোটলোক! এই বুঝি একটা মেয়ের ভালো ব্যবহারের প্রতিদান! নাক সিটকবি তুই তাকে!'

তারপর আঙ্গুল উঁচিয়ে শাসাল:

'দাঁড়া! তোর এ ব্যবহার মনে থাকবে আমার!'

আমাকে সমর্থন করে বলল পাভেল:

'তোমার এসব নষ্টামির কথা জানতে পারলে তোমার বরটি দেবে'খন আচ্ছা করে টিট করে।'

ব্রণবহুল মুখটা উদ্ধত ভঙ্গীতে কুঁচকে উঠল:

ভারি ভয় দেখাচ্ছে! যা যৌতুক আছে তাতে ওর চাইতে হাজারগুণ ভালো ঢের ঢের বর জুটবে! মেয়েদের যা কিছু ফুর্তি লোটার সময় সে তো বিয়ের আগে পর্যন্তই।'

তারপর সে পাভেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিল। আর সে দিন থেকে আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে বেড়াতে লাগল লোকের কাছে।

দোকানে কাজ করা আরো বেশি বিরক্তিকর হয়ে উঠতে লাগল। ধর্মগ্রন্থ সমস্ত পড়া হয়ে গিয়েছিল আমার। আর শাস্ত্রবাগীশদের যুক্তি শুনে শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সব সময়েই ওরা শুধু একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। একমাত্র আকর্ষণ ছিল পিওতর ভাসিলিয়েভিচ। মানুষের জীবনের অন্ধকারময় জীবন স্রোত সম্পর্কে ওর গভীর জ্ঞান আর উদ্দীপনাময় চমৎকার প্রকাশ-ভঙ্গীর অপূর্ব দক্ষতা আমাকে টানত। কখনো কখনো আমার ধারণা হত অবতার ইয়েলিসেই নিশ্চয় সমস্ত পৃথিবীময় এমনি করে প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে একাকী ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু যখনই মানুষ সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি, যা কিছু লক্ষ্য করেছি তার কথা বলতাম বুড়োর কাছে, ও শুনত মন দিয়ে। তারপর সবকিছুই বলে দিত বড়ো সাকরেদকে। সে হয় গালাগাল করত আমাকে, নয়ত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত।

একদিন বুড়োকে বললাম, আমি আমার যে নোটবইটায় কবিতা বা যে-সব বই পড়ি তা থেকে অংশবিশেষ টুকে রাখি, তাতে ও যে-সব কথা বলে তা লিখে রেখে দিই। শুনে দারুণ ঘাবড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন শুরু করে দিল:

'কেন করিস এসব? এটা ঠিক নয় বাপু। মনে রাখার জন্যে? ওরে না, না! কক্‌খনো এমন কাজ করিস না! কী বিচ্ছু রে তুই! তোর ঐ নোটবইটা আমাকে দিয়ে দে। দিবি না, অ্যাঁ?'

নাছোড়বান্দা হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে নোটবইটা আদায় করার চেষ্টা করতে লাগল। নয়ত যাতে পুড়িয়ে ফেলে দি তার জন্যে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কী যেন বলতে লাগল বড়ো সাকরেদের কানে কানে।

বাড়ি ফেরার পথে বড়ো সাকরেদ আমাকে বলল:

'কিছু নোট টোট করে রাখিস নাকি। ওসব ছেড়ে দে, বুঝলি? গোয়েন্দারাই শুধু ওসব করে থাকে।'



'আর সিতানভ?' অসতর্ক ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'সেও তো লিখে রাখে।'

'সেও রাখে? হাড়গিলে বেকুব কোথাকার!'

বহুক্ষণ চুপ করে থেকে অনভ্যস্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল:

'শোন, আমাকে তোর নোটবইটা দেখাস। সিত্অনভেরটাও। তোকে আধরুবল দেব। কিন্তু কাজটা করতে হবে চুপি চুপি। সিতানভ যেন জানতে না পারে...'

মনে হল ও যেন ধরেই নিয়েছে আমি ওর কথামতো কাজ করব। কারণ আর একটি কথাও না বলে বেঁটে বেঁটে পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

বাড়ি পেঁাছে বড়ো সাকরেদের কথা সিতানভকে বললাম। ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

'কেন বলতে গেলি ওকে?.. এবার ও কাউকে লাগাবে আমাদের নোটবই চুরি করাবার জন্যে, তোরটা আর আমারটা। শোন্, তোর নোটবইটা দে আমার কাছে, আমি লুকিয়ে রাখব'খন... শীগ্গিরই তোকে ছাড়িয়ে দেবে, দেখিস!'

আমারও তাতে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। ঠিক করলাম দিদিমা শহরে ফিরে এলেই আমি চলে যাব। এক ভদ্রলোকের মেয়েকে লেস্ বোনা শেখাবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে গোটা শীতকালটা তিনি ছিলেন বালাখ্নায়। দাদু আবার কুনাভিনোয় বাস করেছেন। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। তিনিও কালেভদ্রে শহরে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন না। একদিন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই বিরাট ভল্লুকের চামড়ার কোট গায়ে, পুরুতের মতো গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলেছেন পথ বেয়ে। আমি নমস্কার করে দাঁড়াতেই চোখ ঢাকার জন্যে হাত তুলে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন:

'আঃ, তুই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই এখন দেব-চিত্রকর হয়েছিস। বেশ, করে যা, করে যা!'

তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যথাপূর্ব গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলতে শুরু করে দিলেন।

এই সময়ে খুব ক্কচিৎ কখনো দেখা হত দিদিমার সঙ্গে। বয়সের দরুন দাদুর বায়ুরোগে ধরেছিল। তাঁকে খাওয়াতে পরাতে আর নাতিনাতনীদের পেছনে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত দিদিমাকে। দিদিমার বিশেষ

উদ্বেগ ছিল মিখাইলের ছেলে সাশাকে নিয়ে। সুন্দর চেহারা, কল্পনাবিলাসী তরুণ, বইয়ের ভক্ত, কাজ করত রঙের কারখানায়। প্রায়ই এখানে ওখানে জায়গা বদল করে বেড়াত। আর মাঝের সময়টা দিদিমার উপর ভর করে একটা কাজ খুঁজে দেয়ার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকত। সাশার বোনটিও কিছু কম বোঝা ছিল না। সে বিয়ে করেছিল একটা পাঁড় মাতাল মজুরকে। সে ওকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত।

যতোই দিদিমার সঙ্গে দেখা হত ততোই তাঁর প্রাণের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হতাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছিলাম এই বিস্ময়কর প্রাণের আবাসভূমি হচ্ছে রূপকথার দেশে। তা তাঁকে তাঁর চারপাশের তিক্ত বাস্তব সম্বন্ধে অন্ধ করে রেখেছে। আমি যে-সব ভয় আর আতঙ্কে মরি তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

'সহ্য করতে হবে রে, আলিয়শা।'

জীবনের কুৎসিত রূঢ় দিক, মানুষের সহনাতীত দুঃখভোগ—আর যাবতীয় সবকিছুর বিরুদ্ধে আমায় এমন তীব্র প্রতিবাদ করতে ও বিষয়ে ঐ একটি-মাত্র বক্তব্য ছিল তাঁর।

আমি সহ্য করার জন্যে জন্মাই নি। যদি বা কখনো কোনো সময়ে গবাদি পশু বা গাছ-পাথর সুলভ এই সৎগুণটি প্রকাশ করে ফেলে থাকি তবে তা শুধু নিজের শক্তি আর দৃঢ়তা যাচাই করার জন্যে। যে জোরে আমি শক্ত পায়ে মাটির বুকে দাঁড়িয়ে থাকি তা পরীক্ষা করার জন্যে। কখনো কখনো অল্পবয়সী ছেলেরা বয়সের অপরিপক্কতার দরুণ বোকামি করে কিংবা বড়োদের শক্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের হাড় মাংস আর পেশীর পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা তুলতে চায়। হয়ত সফলও হয়। পরিণত ব্যায়ামবীরদের মতো এক মণের ভারও তুলতে চেষ্টা করে অহঙ্কারবশত।

আমিও করতাম তাই—আক্ষরিক ও আলঙ্কারিক উভয় অর্থে, দৈহিক ও আত্মিক উভয়দিক থেকেই। ফলে এখনো যে মারাত্মক ভাবে আহত হই নি কিংবা আজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হয় নি, সে শুধু আমার ভাগ্য। কারণ সহ্যগুণ বা পারিপার্শ্বিকের শক্তির কাছে সবিনয়ে মাথা নত করার মতো আর কিছু মানুষকে অমন ভয়ঙ্কর ভাবে পঙ্গু করে তুলতে পারে না।

অবশেষে যদি একদিন পঙ্গু হয়েই ফিরে আসতে হয় মাটি মায়ের কোলে, তবে এটুকু অন্তত গর্বের সঙ্গেই বলতে পারব যে আমার আত্মাকে আবরিত

করার জন্যে সাধু লোকদের অবিচল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি অনমনীয় থেকেছি।

মানুষকে খুশি করে তোলার, আমোদ দেওয়ার, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার এক অদম্য স্পৃহা ক্রমেই আমাকে বেশি করে পেয়ে বসতে লাগল। তাতে সফলও হতাম। নিচের বাজারের ব্যবসায়ীদের বর্ণনা দেয়া, তাদের অনুকরণ করার পটুতা ছিল আমার। আমি অভিনয় করে দেখাতাম কী করে চাষী আর চাষী-বৌরা আইকন কেনে বেচে। বড়ো সাকরেদ কেমন চালাকি করে তাদের ঠকায়। কেমন করে শাস্ত্রবাগীশরা অফুরন্ত তর্ক করে চলে।

কারখানার লোকেরা হো হো করে হেসে উঠত। প্রায়ই হাতের তুলি ফেলে দিয়ে দেখত আমার অভিনয়। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে পরে লারিওনিচ বলত:

'তুই বরং সব রঙ্গ-তামাসা রাত্রের খাওয়ার পরে করিস, তাতে কাজের ক্ষতি হবে না...'

এই সব 'অভিনয়ের' পরে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতাম। মনে হত যেন একটা ভারি বোঝা নামিয়ে দিয়েছি। ঘণ্টাখানেক আশ্চর্য রকম হাল্‌কা থাকত মাথাটা, কিন্তু তার পরেই আবার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কাঁটায় তা ভরে উঠত, অসহ্য তাদের খোঁচা।

আমার যেন এক অখাদ্য জাউ ঘিরে রয়েছে আর তার ভিতরে আমি ধীরে ধীরে সিদ্ধ হচ্ছি।

'সারাটা জীবন কি এমনি ভাবেই কাটবে নাকি?' ভাবতাম মনে মনে, 'এই লোকগুলোর মতো ভালো কোনো কিছু না জেনে, ভালো কোনো কিছু না দেখে এমনি করেই কি বাঁচতে হবে আমাকে?'

'তুই বড্ডো খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিস, মাক্সিমিচ,' প্রখর দৃষ্টিতে আমার হাবভাব লক্ষ্য করে একদিন বলল ঝিখারেভ।

'কী হয়েছে বল তো?' প্রায়ই জিজ্ঞেস করত সিতানভ।

কী জবাব দেব ভেবে পেতাম না।

জীবন আমার অন্তরে যা কিছু সুন্দর ছাপ ফেলেছিল, নিজেই আবার তা মুছে দিয়ে চলেছে অবিচল রূঢ়তায় আর পরিবর্তে রেখে যাচ্ছে কতগুলি অর্থহীন হিজিবিজি দাগ। সরোষে সগর্বে আমি জীবনের এই আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছি। সবার মতো সেই একই নদীর স্রোতে আমিও চলেছি ভেসে। কিন্তু আমার মনে হত জলটা যেন আরো বেশি ঠাণ্ডা, তাতে ভেসে

থাকা অনেক বেশি কঠিন। এক এক সময়ে মনে হত যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

অথচ লোকে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। পাভেলের মতো আমাকে কেউ গালমন্দ করত না, কিংবা হুকুম করত না। ওরা আমাকে যে শ্রদ্ধা করত তা বিশেষ করে দেখাবার জন্যে সবাই আমাকে ডাকত পিতৃনাম ধরে। এ সবকিছুই ভালো লাগার কথা। কিন্তু যখন দেখি প্রায় সবাই-ই মদ খায়, মাতাল অবস্থায় অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে ওঠে, মেয়েদের সঙ্গে ওদের সম্পর্কও অতি ঘৃণ্য, তখন কষ্ট হত। যদিও এও বুঝতাম যে এরকম জীবনে মদ আর মেয়েমানুষই হচ্ছে ওদের একমাত্র আনন্দ।

দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ত অমন যে বুদ্ধিমতী সাহসী মেয়ে নাতালিয়া কজ্‌লোভ্‌স্কায়া, সেও কিনা ভাবত মেয়েমানুষ শুধু ফুর্তির বস্তু!

তাই যদি হয় তবে দিদিমার বেলায় কী বলব? আর রাণী মার্গো?

রাণী মার্গোর কথা মনে পড়তেই এক শ্রদ্ধাভরা বিস্ময়ে অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠত। যাবতীয় সমস্ত কিছু থেকে এমন আলাদা, এমন স্বতন্ত্র ছিলেন তিনি যে মনে হত তাঁকে যেন শুধু স্বপ্নের ঘোরেই দেখেছিলাম।

খুব বেশি রকম ভাবতে আরম্ভ করলাম মেয়েদের কথা। ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছি সবাই যেখানে গিয়ে ফুর্তি করে আসে, সামনের ছুটির দিনটা সেখানে কাটিয়ে এলে কেমন হয়? এটা দৈহিক কামনার বশে নয়। আমি ছিলাম যেমন সুস্থ সবল তেমনি খুঁতখুঁতে। কিন্তু এক এক সময়ে অদম্য ইচ্ছে হত এমন কাউকে বুকের ভিতরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরি, যে ভারি নরম, যে আমাকে বুঝতে পারবে, যার কাছে আমার অন্তরের যা কিছু বিক্ষোভ উজাড় করে ঢেলে দিতে পারব, যেমন করে ঢেলে দেয়া যায় মায়ের কাছে।

পাভেলকে হিংসে হত আমার। একদিন যখন পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ও বলল আমাকে রাস্তার ওপারের একটি পরিচারিকার সঙ্গে ওর ভালোবাসার গোপন কথা।

'দ্যাখ ভাই, মাত্র এক মাস আগেও ওকে আমি বরফের গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছি। কোনো প্রয়োজনই ছিল না আমার ওকে দিয়ে। আর এখন ঐ বেঞ্চের উপরে ওর পাশে বসে যখন ভাবি, মনে হয়—ওর মতো আর কেউ নেই!'

'কী কথা বলিস তুই ওর সঙ্গে?'

'সবকিছু। ও বলে আমাকে ওর সমস্ত কথা, আর আমিও বলি আমার কথা। তারপর দুজনে দুজনকে চুমু খাই... সত্যি খুবই খাঁটি মেয়ে... কতো যে ভালো ভাবতেই পারবি না!.. ছি, তুই বুড়ো সেপাইদের মতো সিগারেট খাস!'

অত্যধিক সিগারেট খেতাম আমি। তামাকের ধোঁয়া মাথায় গিয়ে আমার ভাবনা চিন্তাগুলোকে ভোঁতা করে দিত। সৌভাগ্যের কথা ভদকার স্বাদ গন্ধ আমার বরদাস্ত হত না। কিন্তু পাভেল মদ খেত সাগ্রহে। মাতাল হয়ে পড়লে করুণ সুরে ও বিলাপ করত:

'আমি বাড়ি যেতে চাই! আমাকে বাড়ি যেতে দাও...'

ও ছিল বাপ-মা-হারা। বহুদিন আগেই ওর মা-বাপ মরে গেছে। কোনো ভাইবোনও ছিল না। আটবছর বয়েস থেকেই ও পরের ঘরে মানুষ।

এই খিটখিটে অস্থির ভাব বসন্তের মায়ায় আরো বেড়ে গেল। ঠিক করলাম আবার ফিরে যাব জাহাজের কাজে, যাতে আস্ত্রাখানে পৌঁছে পালিয়ে যেতে পারি পারস্যে।

কেন যে পারস্যে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল তা মনে নেই। হয়ত নিজনি নভগরোদের মেলায় পারসী ব্যাপারীদের দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মেলায় রোদ পোয়াতে পোয়াতে ওরা গড়গড়া টানত—যেন পাথুরে মূর্তি, রঙ-করা দাড়ি আর বড়ো বড়ো কালো সবজান্তা চোখ।

হয়ত সত্যিসত্যিই চলে যেতাম। কিন্তু ইস্টার সপ্তাহে, যখন পটুয়াদের অনেকেই তাদের গাঁয়ের বাড়িতে গেছে, কিম্বা পানোৎসবে, এমন সময় দেখা হয়ে গেল আমার আগের মনিব, দিদিমার বোনপোর সঙ্গে।

সে তখন ওকার তীরে রোদেভরা মাঠে বেড়াচ্ছিল। গায়ে একটা হালকা ধূসর রঙের কোট, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো, দাঁতের ফাঁকে সিগারেট, আর টুপিটা কায়দা করে মাথার পিছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাঁটছিল। এগিয়ে যেতেই সৌহার্দ্যভরা হাসি হেসে তাকাল আমার দিকে। ওর হাবভাবে ফুটে উঠছিল একটা হাসিখুশি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের আকর্ষণ। মাঠের ভিতরে তখন সে আর আমি একা।

'পেশকভ নাকি! যীশু পুনরুজ্জীবিত হচ্ছেন!'

ইস্টার চুম্বন বিনিময়ের পরে জিজ্ঞেস করল কেমন কাটছে আমার। জবাবে অকপটে বললাম কারখানা, শহর-জীবন, এক কথায় সবকিছুর উপরেই বিরক্তি ধরে গেছে আমার। ঠিক করেছি পারস্যে চলে যাব।

'ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও,' গম্ভীরভাবে বলল মনিব, 'চুলোয় যাক পারস্য! ও সব আমার জানা আছে ভায়া, তোমার বয়সে আমারো ইচ্ছে হত কোথাও পালিয়ে চলে যাই। কোথায় তা শয়তানই জানে!'

এর কথা বলায় এই যে একটা সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়ার ধরণ এটা ভারি ভালো লাগল আমার। ওর হাবভাবে ছিল কেমন একটা চমৎকার বাসন্তী মেজাজ। ওর সবকিছুই যেন কেমন সপ্রতিভ।

'সিগারেট খাবে?' মোটা সিগারেটে ভর্তি একটা রুপোর কেস এগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল সে।

এতেই সে আমাকে সম্পূর্ণ বশ করে ফেলল!

'শোনো পেশকভ, আমার কাছে আবার এসে কাজকর্ম করলে কেমন হয়? এবার মেলায় চল্লিশ হাজার টাকার মতো কনট্রাক্ট মিলেছে। সেই মেলার মাঠেই রেখে দেব তোমাকে। এই ধরো ওভারসিয়ারের মতো কাজ। নির্মাণ কাজের মালপত্র বুঝে নেবে, সব জায়গায় ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক মালপত্র পেঁছয় কিনা তার তদারক করবে। মজুরেরা সে-সব চুরি করে কিনা লক্ষ্য রাখবে। কেমন, এ কাজ চলবে তোমার পক্ষে? মাইনে—পাঁচ রুবল মাসে, আর দুপুরের রোজ-খোরাকী পাঁচ কোপেক। আমার ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক থাকবে না তোমার। ভোরে উঠে চলে যাবে আর ফিরে আসবে সন্ধ্যায়। এর ভিতরে মেয়েদের কোনো সংস্পর্শই থাকবে না। শুধু আমাদের দেখা যে হয়েছিল সেটা ওদের কাছে বলো না। সেণ্ট-টমাস-রবিবারে সোজা চলে আসবে -- তা হলেই হবে!'

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো দুজনে বিদায় নিলাম। যাওয়ার আগে সে আমার করমর্দন করল। এমন কি দূরে গিয়েও টুপি নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

কারখানায় এসে আমি চলে যাচ্ছি একথা জানাতে ওরা দুঃখ করতে লাগল। আর তাতে নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হতে লাগল। বিশেষ করে বিচলিত হল পাভেল।

'আমাদের ছেড়ে তুই ঐ চাষাদের সঙ্গে বাস করতে যাচ্ছিস!' ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে বলল পাভেল, 'যতসব ছুতোর, কাগজ সাঁটিয়ে... আরে ছোঃ! একেই বলে হাকিম থেকে দারোগায় প্রমোশন।'

'মাছ যেমন গভীর জল খোঁজে, জোয়ানেরাও তেমনি খুঁজে বেড়ায় বিপদ আপদ...' বিড় বিড় করে বলল ঝিখারেভ।

পটুয়ারা নির্জীব, বিষণ্ণ বিদায় অভিনন্দন জানাল আমাকে।

'এ কথা ঠিক, তোকে এটা-ওটা পরখ করে দেখতে হবে,' বলল ঝিখারেভ, প্রচুর মদ খেয়ে ওর মুখখানা হলদে হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু শুরু থেকেই একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে তার পিছনে লেগে থাকাই ভালো...'

'আজীবন লেগে থাকা,' শান্ত কণ্ঠে বলল লারিওনিচ।

অনুভব করলাম ওরা এসব বলছে যেন জোর করে নিছক কর্তব্যের খাতিরে। যে বন্ধন সূত্র আমাদের একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, হঠাৎ তা যেন পচে ছিঁড়ে গেছে।

মাচার উপরে মাতাল গোগলেভ নড়াচড়া করে ওর সেই রুক্ষ কর্কশ গলায় বলে চলল:

'ইচ্ছে করলে আমি তোদের সবগুলোকে ধরে জেলে পুরে দিতে পারি! একটা গোপন কথা জানি আমি! তোরা কেউ ভগবানে বিশ্বাস করিস না, হা-হা-হা!'

দেয়ালের গায়ে তেমনি রয়েছে মুণ্ডুহীন আইকনগুলো। সিলিংয়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে কাঁচের গোলকগুলো। কিছুদিন ধরে আমরা ঐ কৃত্রিম আলো ছাড়াই কাজ করছিলাম। তাই কাঁচের গোলকগুলো আর কাজে লাগছিল না। ফলে, ওগুলোর গায়ে জমে উঠেছে ঝুলকালি আর ধুলোর ধূসর আস্তরণ। এ সবকিছুই এমন গভীর ভাবে আমার স্মৃতিতে বসে গিয়েছিল যে এখনো চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই অন্ধকার ঘরটা, ঘরের ভিতরে টেবিল, জানালার তাকে রঙের টিন, তুলির বাণ্ডিল, আইকন, কোণের দিকে নোংরা ফেলা বালতি, জেলের টুপির মতো হাত-মুখ-ধোয়ার বেসিন, আর মাচার কিনার থেকে ঝুলে-পড়া গোগলেভের মড়ার মতো নীল পাটা।

চলে যাওয়ার জন্যে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে। কিন্তু রুশরা ব্যথার মুহূর্তকে দীর্ঘায়ত করতেই ভালোবাসে। বিদায় অভিনন্দন রূপান্তরিত হয়ে ওঠে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।

ভ্রূ কুঁচকে ঝিখারেভ বলল আমাকে:

'"দানব' বইটা কিন্তু আমি তোকে ফিরিয়ে দিচ্ছি না। যদি চাস তো বিশ কোপেক পয়সা নিয়ে নে ওটার জন্যে!'

লেরমন্তভের বইটা হাতছাড়া করতে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। বিশেষ করে ওটা আমাকে উপহার দিয়েছিল দমকল বাহিনীর বুড়ো অধ্যক্ষ। একটু ক্ষুব্ধ হয়েই আমি ওর পয়সাটা প্রত্যাখ্যান করতে গম্ভীর ভাবে ঝিখারেভ পয়সাগুলো তার ব্যাগে পুরে রাখতে রাখতে অবিচলিত কণ্ঠে বলল:

'সে তোর খুশি। কিন্তু বইটা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি না। ওটা তোর জন্যে নয়। ঐ রকমের বইয়ের জন্যে হঠাৎ বিপদে পড়ে যেতে পারিস।'

'কিন্তু ও বই তো বিক্রি হয় দোকানে। আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

'তাতে কি? পিস্তলও তো দোকানে বিক্রি হয়,' দৃঢ় কণ্ঠে ও জবাব দিল। সে আর ওটা ফিরিয়ে দেয় নি।

মালিকের বিধবা স্ত্রীর কাছে বিদায় নেয়ার জন্যে উপরে যেতে দোরের কাছে দেখা হয়ে গেল তার বোন-ঝির সঙ্গে। জিজ্ঞেস করল:

'ওরা সবাই বলছে তুই নাকি আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'ভালোই করেছিস, নইলে তোকে ওরা ছাড়িয়েই দিত,' তেমন ভদ্র ভাবে না বললেও কথাটা বলল খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে।

আমার মাতাল মনিব-গিন্নী বলল:

'বিদায়, ভগবান তোকে রক্ষা করুন! তুই খারাপ ছেলে — ভীষণ রগচটা। আমার সঙ্গে অবশ্য কখনো খারাপ ব্যবহার করিস নি ঠিক, কিন্তু সবাই বলে তুই মন্দ ছেলে!'

হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে সে বিড় বিড় করে বলতে লাগল:

'হায়, আজ যদি আমার স্বামী বেচারা বেঁচে থাকত, ভাগ্যবান পুরুষ, তবে সে আচ্ছা করে তোর কান মলে দিত, মাথায় গাঁট্টা মারত, কিন্তু তোকে রেখে দিত এখানেই, তাড়িয়ে দিত না। দিনকাল সবকিছুই বদলে গেছে। কিছু একটা গোলমাল হল তো অমনি চলল। হা আমার কপাল! কী এখন হবে তোর বাছা?'

১৬

মেলার মাঠের রাস্তা দিয়ে মনিব আর আমি চলেছি নৌকো বেয়ে। বসন্তের স্ফীত নদীর জলে জেগে উঠেছে প্লাবন। দুপাশের পাথুরে দোকানের মাঝখানে দোতলা সমান উঁচু জল। আমি টানছিলাম দাঁড় আর মনিব বসেছিল হালে। একটা বৈঠাকে হাল বানিয়ে এলোমেলো ভাবে চালাচ্ছিল নৌকোটাকে। নৌকোর ডগাটা একবার এপথে একবার ওপথে ঢুঁ মেরে মেরে ঘোলাটে জলের শান্ত স্তিমিত বুকের উপর দিয়ে চলেছিল এঁকে-বেঁকে।

'এবার বসন্তে জল কী উঁচুই না হয়েছে, জাহান্নমে যাক! আমাদের

কাজকর্ম বন্ধ রাখবে দেখছি!' একটা সিগার ধরিয়ে অভিযোগভরা কণ্ঠে বলে উঠল মনিব। সিগারের ধোঁয়া থেকে আসছিল কেমন একটা নেকড়া পোড়ার গন্ধ।

'হুঁশিয়ার!' ভয়ে চিৎকার করে উঠল মনিব, 'ল্যাম্পপোস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু!'

তারপর নৌকোটা ঠিক করে নিয়ে আবার বলল:

'খুব চমৎকার নৌকোই দিয়েছে দেখছি, বেজন্মা ব্যাটারা!'

জল নেমে গেলে যেখান থেকে শুরু হবে দোকান মেরামতের কাজ সে জায়গাটা দেখিয়ে দিল আমাকে। ওকে আদৌ ঠিকেদারের মতো দেখাচ্ছিল না। পরিষ্কার কামানো মুখ, ছাঁটা গোঁফ, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। গায়ে পরেছে একটা চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে লম্বা বুট, কাঁধে ঝুলছে শিকারের থলে আর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে দোনলা একটা দামী শিকারী বন্দুক। অস্বস্তিতে সে বারবার চামড়ার টুপির ভিতরে মাথাটায় ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। কখনো বা ঠোঁট ফাঁক করে টুপিটা চোখের উপরে নামিয়ে চিন্তিত ভাবে দেখছিল চারদিকটা। পরক্ষণেই আবার টুপিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল মাথার পিছন দিকে। হঠাৎ যেন ওর বয়েস অনেকখানি কমে গেছে। কী এক মধুর চিন্তায় গোঁফের আড়ালে ফুটে উঠেছে খুশির হাসি। ব্যবসায় বাণিজ্যের ভাবনা থেকে বিমুক্ত হয়ে এমনি এক চিন্তার স্রোতে ও ভেসে চলেছে যে মনে হয় কাজের কঠোরতা, আর ধীর শ্লথ গতিতে জল নেমে যাওয়ার দুশ্চিন্তার এতটুকু চিহ্নও নেই ওর মুখে চোখে।

আর আমি, এক মৌন বিস্ময়ের অনুভূতির চাপে আমার অন্তর পিষে যাচ্ছিল। প্লাবিত মৃত নগরী আর আমাদের নৌকোর পাশ দিয়ে তার শূন্য জানালাভরা সারি সারি ইমারতগুলির নিঃশব্দে ভেসে যাওয়া দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল।

ধূসর আকাশ। সূর্য মেঘের জালে বন্দী, মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকায় — বিরাট রূপোর একটা কনকনে ঠাণ্ডা থালার মতো।

জলটাও ধূসর আর ঠাণ্ডা। স্রোত এত ক্ষীণ যে প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। যেন সারি সারি ইমারত আর নোংরা হলদে রঙের দোকানগুলোর সঙ্গে জমে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাণ্ডুর সূর্য যখন মেঘের ফাঁকে চোখ মেলে দেয় তখন সবকিছু একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জলের বুকে ভেসে ওঠে ধূসর আকাশের ছায়া। আর মনে হয় আমাদের নৌকোটা বুঝিবা দুই আকাশের

মাঝখানে শূন্যে ঝুলে রয়েছে। পাথুরে বাড়িগুলোও যেন জেগে উঠে সবার অজ্ঞাতে ক্ষীণ মন্থর গতিতে ভলগা আর ওকা নদীর দিকে চুপি চুপি ভেসে চলেছে। ভাঙা পিপে, বাক্স, ঝুড়ি, ভাঙা লাঠির টুকরো, আর খড় দুলছে জলের বুকে। কাঠ আর ডান্ডাগুলো যেন সাপের মতো ভেসে চলেছে পাশ দিয়ে।

এখানে ওখানে এক একটা জানালা খোলা। কেনা-বেচার লম্বা গ্যালারীর মাথার উপরে শুকোচ্ছে কাপড়। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফেল্টের জুতো। জানালার সামনে একটি স্ত্রীলোক ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রেলিংয়ের লোহার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা নৌকো। নৌকোটার লাল রঙা পাশটার ছায়া পড়েছে জলের বুকে তেলতেলে মাংসের মতো।

জীবনের এইসব চিহ্নের দিকে মাথা নেড়ে মনিব বলল:

'ওখানে থাকে পাহারাদার। জানলা বেয়ে ও ছাদে নামে, তারপর নৌকোয় চড়ে। ঘুরে ঘুরে দেখে কোথাও চোর ছ্যাঁচোড় আছে কিনা আশপাশে। যদি কাউকে না দেখতে পায় তবে নিজেই চুরি করে...'

নিস্পৃহ অলস কণ্ঠে বলে চলেছে ও। মনটা যেন তার দূরে অন্য কোথাও নিবদ্ধ। সবকিছুই স্তব্ধ, শূন্য, যেন স্বপ্নের মতোই অবিশ্বাস্য। ভলগা আর ওকা একাকার হয়ে গিয়ে এক বিরাট হ্রদে পরিণত হয়ে উঠেছে। দূরে একটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাহাড়ের বাগানের মাথায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে শহরের অস্পষ্ট আভাস। গাছগুলো এখনো রিক্ত কালো। কিন্তু কুঁড়ির আগমনে ফুলে উঠেছে। ফলে সমস্ত বাড়ি ঘর গির্জা সবকিছুই ছেয়ে গেছে সবুজের আভাসে। জলের বুকের উপর দিয়ে ভেসে আসছে ইস্টারের সঘন ঘণ্টাধ্বনি। শহরের অস্পষ্ট কল-কোলাহলও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে সবকিছু ঘিরেই যেন বিরাজ করছে এক পরিত্যক্ত গির্জার নিথর নিস্তব্ধতা।

কালো কালো দু সারি গাছের ফাঁক দিয়ে বড়ো রাস্তা ধরে পুরনো ক্যাথিড্রেলের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকো। মনিবের চুরুটের ধোঁয়া অনবরতই তার চোখে গিয়ে লাগছে। আর নৌকোটাও ঠোক্কর-খাচ্ছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মনিব:

'আচ্ছা নৌকো বটে বাপু!'

'হাল চালানো বন্ধ করুন।'

'তা কেমন করে হয়?' গজ গজ করে বলে উঠল মনিব, 'নৌকোয় যখন মাত্র

দ্‌জন থাকে তখন একজন হালে বসে, একজন দাঁড় টানে। ঐ দেখো তাকিয়ে — চীনে পাড়া...'

মেলার মাঠটা আমার নখদর্পণে। খ্‌ব ভালো করেই চিনতাম অদ্ভুত ছাউনিওয়ালা ঐ হাস্যকর পাড়াটাকে। তার কোণের দিকে ছিল উপবিষ্ট অবস্থায় কতগ্‌লো প্লাস্টারের ম্‌র্তি। অনেক দিন আমি আর আমার খেড়্‌রা মিলে ওগ্‌লো লক্ষ্য করে ঢিল ছ্‌ঁড়েছি। বিশেষ করে আমি ঐ সব প্লাস্টারের চীনাম্যানের ম্‌র্তির কয়েকটি হাত-ম্‌খ উড়িয়ে দিয়েছিলাম ঢিল ছ্‌ঁড়ে। অবশ্য তার জন্যে এখন আর আমার মনে এতটুকুও অহংকার বোধ নেই।

'কুঁড়েঘর,' বাড়িগ্‌লোকে দেখিয়ে বলল আমার মনিব, 'আমাকে যদি ওরা ওগ্‌লো তৈরী করতে দিত...'

একটা শিস্‌ দিয়ে উঠে টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল সে।

কিন্তু কেন যেন আমার মনে হল, ওকে যদি তৈরী করতে দিত ও-ও ঠিক অমনি বিশ্রী ভাবেই তৈরী করত। ঠিক একই জায়গায় অমনি নিচু ছাদওয়ালা। প্রত্যেক বসন্তে এমনি করেই দ্‌টো নদীর জল প্লাবিত করে দিয়ে যেত। ঐ চীনে পাড়ার মতো ঠিক অমনি বিশ্রী একটা কিছ্‌ই বার করত ভেবে ভেবে...

গল্‌ইয়ের উপর দিয়ে চুর্‌টটা ছ্‌ঁড়ে ফেলে নিদার্‌ণ বিরক্তিতে থ্‌থ্‌ ফেলল মনিব। তারপর বলে উঠল:

'জীবনটা যে খ্‌বই দ্‌র্বিষহ, ব্‌ঝলে পেশকভ, অত্যন্ত একঘেয়ে, বিরক্তিকর! একটা শিক্ষিত লোক নেই। কেউ নেই যার সঙ্গে দ্‌টো কথা বলা যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় একটু গর্ব করি, কিন্তু করব কার কাছে? কেউ নেই। শ্‌ধ্‌ ছ্‌তোরমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, চাষী, চোর এই সব...'

ডানদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যেখানে একটা সাদা মসজিদের চ্‌ড়া প্রশান্ত ভাবে মাথা তুলেছে, সেদিকে তাকিয়ে ও এমন ভাবে বলে চলল, যেন ভুলে যাওয়া কী একটা কথা ওর মনে পড়েছে:

'জার্মানদের মতো বিয়ার টানতে আর চুর্‌ট খেতে শ্‌র্‌ করেছি। জার্মানরা ভালো ব্যবসাদার—এমন কুঁদ্‌লে ম্‌রগীর ছানা ওরা, ব্‌ঝলে ভাই! বিয়ার খাওয়া—ওটা হচ্ছে অবসর সময়ের আনন্দ। কিন্তু মনে হয় চুর্‌টটা আমার তেমন ধাতস্থ হবে না। চুর্‌ট খেলেই বৌ গঞ্জনা দিতে শ্‌র্‌ করে, বলে, 'জিন তৈরী করা চামারের মতো এ কিসের গন্ধ আসছে তোমার

গা থেকে?' সত্যি জীবনটাকে একটু চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে কতো কি কান্ডই যে আমরা করি... এই যে, ঠিক করে হাল ধরো।'

নৌকোর পাশে বৈঠাটা রেখে দিয়ে ও বন্দুকটা তুলে নিল হাতে। তারপর ছাদের উপরের একটা মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। চীনাম্যানের মূর্তিটার গায়ে কোনো আঘাত লাগল না, শুধু গুলিটা ভেঙে দেয়াল আর ছাদের উপরে ছড়িয়ে গিয়ে জাগিয়ে তুলল ধুলোর মেঘ।

ফের বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে নিস্পৃহ কণ্ঠে ও বলল, 'লাগল না।'

'মেয়েদের সঙ্গ কেমন লাগে তোমার, বলো দেখি? ব্রহ্মচর্য শেষ হয়েছে? হয় নি? আমি তো তেরো বছর বয়স থেকেই প্রেম করতে শুরু করি...'

যেন স্বপ্নের কথা স্মরণ করছে, এমনি করেই সে বলতে লাগল তার প্রথম্ প্রেমিকার কথা। যে স্থপতির কাছে ও শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করত এবং থাকত, তারই বাড়ির পরিচারিকা ছিল মেয়েটি। ইমারতের কোণে আছড়ে-পড়া জলের কোমল শব্দের সঙ্গত চলেছে তার প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে। ক্যাথিড্রেলের ওপাশে বিস্তীর্ণ জলের বুকে জেগে উঠেছে ঝিকিমিকি। স্থানে স্থানে কালো কালো উইলো গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

আইকন কারখানায় পটুয়ারা প্রায়ই সেমিনারির ছাত্রদের এই গানটা গাইত:

সুনীল, নীল সাগর,
ও গো ঝড়ের সাগর...

সুনীল নীল সেই সাগরখানা খুবই একঘেয়ে হতে বাধ্য...

মনিব বলছিল, 'রাতের পর রাত ঘুমোতে পারতাম না। বিছানা থেকে উঠে কুকুর ছানার মতো কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকতাম ওর বন্ধ দোরের সামনে। বাড়িটায় হাওয়া ঢুকত প্রচুর। তাছাড়া ওর মনিবও রাত্রে আসত ওর কাছে। অনায়াসেই সে আমাকে ওখানে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাতে ভয় পেতাম না—এতটুকুও ভয় হত না।'

খুব ভেবে ভেবে বলে চলছিল, যেন কোনো পুরানো কাপড়চোপড় পরীক্ষা করে দেখছে আবার পরা চলতে পারে কিনা।

'নজর করল আমাকে। দয়া হল্ আমার উপরে। এমন কি দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল, 'চলে আয় বোকা ছেলে!...''

এসব গল্প এত শুনেছি যে ঘেন্না ধরে গেছে। তবুও সব গল্পের ভিতরেই একটা ভালো জিনিস থাকত: লোকেরা তাদের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা যখন বলত, তার ভিতরে বড়াই থাকত না, থাকত না অশ্লীলতা। আর এমন একটা দরদভরা অনুশোচনার সঙ্গে বলে যেত তাদের কাহিনী যে, অনুভব করতাম সে দিনটাই তাদের জীবনের সুন্দরতম দিন। সত্যিই, অনেকের জীবনেই এ দিনগুলি হচ্ছে একমাত্র সুখের দিন।

হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে দোলাতে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠল মনিব:

'কিন্তু এ গল্প কোনো দিনই আমি আমার বৌয়ের কাছে বলতে পারব না! না হে, না! এর ভিতরে যে কিছু অন্যায় আছে তা নয়, কিন্তু তবুও কিছুতেই বলতে সাহস হবে না তার কাছে। আচ্ছা...'

সে যে আমার কাছেই গল্প করছিল তা নয়, বলছিল তার নিজের কাছে। ও যদি চুপ করে থাকত তবে আমি কথা বলতাম। ঐ শূন্য নীরবতার ভিতরে কথা কওয়া, গান গাওয়া, 'একর্ডিয়ান বাজানো একান্তই প্রয়োজন। নইলে মানুষ হয়ত ঐ ঠান্ডা ধূসর জলের ভিতরে ডুবে মরা নগরীর মধ্যে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ত।

'প্রথমত—অল্প বয়সে বিয়ে করো না।' আমাকে সাবধান করে দিয়ে সে বলল, 'বুঝলে ভাই, বিয়েটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! যেখানে যখন যে ভাবেই থাক না কেন— তা সে পারস্যের মুশলমানদের মতোই হোক আর মস্কোর পুলিসের মতোই হোক, তাঁতই বোনো বা চুরিই করো, ভালো না লাগলে সবকিছুই বদলানো যায়, কিন্তু বৌ আর বদলানো যায় না! স্ত্রী হচ্ছে ঋতুর মতো, বুঝলে ভাই, এর আর কোনো উপায় নেই! বৌ জুতো নয় যে খুশি মতো খুলে ছুঁড়ে একপাশে ফেলে রাখবে!..'

ওর মুখের উপরে একখানি ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে ধূসর জলের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। কথা বলতে বলতে বাঁকা নাকটা ঘসছে বার বার:

'হ্যাঁ ভাই... সাবধান হতে হবে! হয়ত এমনও হতে পারে যে ঝড়ে নুয়ে পড়েছ তবুও পা দুটো শিকড়-গাঁথা হয়ে আঁকড়ে রয়েছে। কিন্তু তবুও সবার কপালেই গেরো আছেই।'

মেশ্চেরস্কয়ে হ্রদের কিনারার ঝোপের ভিতর দিয়ে চলেছি এগিয়ে। হ্রদটা এখন ভলগার সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে।

'আস্তে দাঁড় টানো,' ঝোপের দিকে লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল মনিব।

কয়েকটা সুঁটকো বন-মুরগীকে গুলি করার পরে বলল:

'কুনাভিনোর দিকে চলো! সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই থাকব। বাড়ি গিয়ে ওদের বলে দিয়ো আমার কাজ আছে ঠিকেদারের সঙ্গে...'

কুনাভিনোর একটা বস্তিতে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে এলাম। ওদিকটাও ভেসে গেছে বানের জলে। তারপর মেলার মাঠের ভিতর দিয়ে ফিরে এলাম স্ট্রেল্‌কায়। সেখানে নৌকো বেঁধে নদীর মোহনা, শহর, জাহাজ আর আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। আকাশে শাদা মেঘের পালক সজ্জা, যেন একটা অতিকায় পাখি ডানা মেলে দিয়েছে। নীল ফাটলের পথে উঁকি দিচ্ছে সোনালী সূর্য। ওর একটি কিরণ রেখাই সমগ্র পৃথিবীকে রূপান্তরিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আমাকে ঘিরে সবকিছুই এখন দ্রুত, গতিময়। স্রোতের মুখে তর তর করে ভেসে চলেছে এক সীমাহীন ভেলার সারি। ভেলার উপরে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা দাঁড় টেনে চলেছে শক্ত সমর্থ চাষীরা আর পরস্পর পরস্পরকে ডাকছে চিৎকার করে। চিৎকার করছে একটা চলন্ত জাহাজের উদ্দেশ্যে। ছোট জাহাজ একটা খালি বজরাকে টেনে নিয়ে চলেছে উজান ঠেলে। চারদিকের ঢেউয়ের দোলায় ছুঁচল ডগাটা পাইক মাছের মতো একবার এ পাশ একবার ও পাশ করছে। আর হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চাকার উপরে নির্মম ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া জল ঠেলে ঠেলে চলেছে একগুঁয়ের মতো। চারজন চাষী গায়ে গায়ে মিশে কিনার দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে বজরাটার উপরে। একজনার গায়ে লাল শার্ট। সবাই মিলে গান গাইছে। কথাগুলো অস্পষ্ট, কিন্তু গানটা আমার জানা।

মনে হল যেন এখানে, এই নদীর বুকের সবকিছুই আমার পরিচিত। সবকিছুর সঙ্গে রয়েছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সবকিছুই আমার বোধগম্য। কিন্তু পিছনের ঐ প্লাবিত নগরী যেন একটা দুঃস্বপ্ন, আমার মনিবই যেন সেটাকে বানিয়ে তুলেছে আর আমার মনিবের মতোই সে স্বপ্ন দুর্বোধ্য।

নদীর দৃশ্যে অন্তর পরিপূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এলাম। মনে মনে অনুভব করতে লাগলাম আমি যেন একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ—যে কোনো কাজ করার যোগ্যতা আমার আছে। বাড়ি ফেরার পথে ক্রেমলিন পাহাড়ের

উপরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো তাকালাম ভলগার দিকে। এখানকার চূড়া থেকে পৃথিবীকে মনে হয় যেন অসীম, অফুরন্ত সম্ভাবনাভরা।

বাড়ি ফিরে বই পড়তাম। রাণী মার্গোর ফ্ল্যাটে এখন রয়েছে একটি বড়ো পরিবার। তাদের গর্বের বস্তু হচ্ছে পাঁচটি মেয়ে—সৌন্দর্যে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। আর আছে দুটি স্কুলের ছাত্র। এই তরুণ-তরুণীরা আমাকে বই এনে দিত। লোভীর মতো পড়ে ফেললাম তুর্গেনেভ। শরতের বাতাসের মতো স্বচ্ছ তাঁর রচনাভঙ্গীর সরল সাবলীলতা, সৃষ্ট চরিত্রগুলোর পবিত্রতা আর যা কিছুই তিনি সবিনয়ে প্রচার করেছেন তার মাধুর্যে মুগ্ধ হলাম।

পড়লাম পমিয়ালভ্স্কির 'চতুষ্পাঠি'। অবাক হয়ে দেখলাম কী অদ্ভুত ভাবেই না এতে ফুটে উঠেছে আইকন কারখানার জীবনের অনুরূপ প্রতিচ্ছবি। সেই অপরিসীম ক্লান্তির কথা আমার খুব ভালো করেই জানা আছে যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মানুষ নিষ্ঠুর আমোদে মেতে ওঠে।

রুশ সাহিত্য পড়তে ভালো লাগত। তার ভিতরে পেতাম একটা করুণ বেদনাময় পরিচিত সুর। যেন পাতায় পাতায় বন্দী হয়ে রয়েছে লেণ্টের বিষাদময় করুণ ঝঙকার। মলাট খুললেই যেন সেই ক্ষীণ সঙ্গীত-ধারা মুক্ত হয়ে জেগে উঠবে।

অনিচ্ছার সঙ্গে পড়লাম 'মৃত আত্মা'। তেমনি বিতৃষ্ণার সঙ্গেই পড়লাম 'মরণ পুরীর কাহিনী'। 'মৃত আত্মা', 'মরণ পুরী', 'মৃত্যু', 'তিনটি মৃত্যু', 'জীবন্ত মমী' — এই সব বইয়ের নামের একঘেয়েমি চোখে না পড়ে পারে না। তাতে বইগুলো সম্পর্কেই অস্পষ্ট বিরক্তিকর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। 'সময়ের পদচিহ্ন', 'ধাপে ধাপে', 'কী কর্তব্য', 'স্মুরিন গাঁয়ের ইতিবৃত্ত' এ ধরনের বইগুলোও আমার আদৌ ভালো লাগল না।

কিন্তু ডিকেন্স আর ওয়াল্টার স্কট পড়তে দারুণ ভালো লাগত আমার। অপার আনন্দে এক-একখানা বই দুবার তিনবার করে পড়েছি। ওয়াল্টার স্কট যেন ছুটির দিনের এক চমৎকার সুন্দর গির্জার উপাসনা -- একটু দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, তবুও উৎসবমুখর। ডিকেন্স আজও আমি শ্রদ্ধা করি গভীর ভাবে -- শিল্প-কলার দুরূহতম যে ক্ষেত্র, মানুষকে ভালোবাসার সেই কারু-কলায় চরম দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি।

সন্ধ্যাবেলায় বড়ো একটা দল এসে জুটত বার-বারান্দায়: রাণী মার্গোর

ফ্ল্যাটের ওই ভাইবোনেরা, ভিয়াচেসলাভ সেমাশ্কো নামে একটি খাঁদা-নাক ছাত্র আর অন্য কয়েকজন। কোনো কোনো সময়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটত প্তিৎসিন নামে বড়োদরের এক সরকারী কর্মচারীর মেয়ে। আমরা বই কবিতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতাম। এ আলোচনা ছিল আমার ভারি প্রিয় আর বোধগম্যও। ওদের প্রত্যেকের চাইতে আমি বেশি পড়েছি। কিন্তু প্রায়ই আমার সঙ্গীসাথীরা আলোচনা করত তাদের স্কুলের কথা। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। শুনতে শুনতে আমার মনে হত ওদের চাইতে ঢের বেশি স্বাধীনতা আছে আমার। অবাক হয়ে যেতাম ওদের সহ্য-শক্তিতে। কিন্তু তবুও হিংসে হত আমার ওদের দেখে: ওরা লেখাপড়া করছে।

আমার সঙ্গীসাথীদের বয়েস ছিল আমার চাইতে বেশি। কিন্তু মনে হত ওদের চাইতে আমি ঢের বেশি সাবালক। অনেক বেশি আমার অভিজ্ঞতা। ওদের সঙ্গে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ইচ্ছে হত। ধুলো কালি মেখে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতাম ওদের চাইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা, অন্য জগতের ধারণায় ভরপুর হয়ে। ওদের সবকিছু অভিজ্ঞতাই ছিল মূলত একই ধরনের। ওরা মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করত প্রচুর। একজনার পর একজনার সঙ্গে প্রেমে পড়ত। চেষ্টা করত কবিতা লিখতে। এ ব্যাপারে প্রায়ই ওরা আমার সাহায্য নিত। সানন্দে কবিতা লেখার ব্যাপারে হাত লাগাতাম। অনায়াসেই ছন্দ আসত আমার মাথায়, কিন্তু কেন জানি আমার সব কবিতাই ব্যঙ্গ কবিতা হয়ে উঠত। প্তিৎসিনের মেয়েকে আমি নির্ঘাত তুলনা করে বসতাম কোনো শব্জীর সঙ্গে — সাধারণত রসুনের সঙ্গে। বেশির ভাগ কবিতা লেখা হত ওই মেয়েটিকে উদ্দেশ করেই।

সেমাশ্কো বলল:

'ওগুলোকে তুই কবিতা বলিস? ওগুলো হচ্ছে মুচির পেরেক!'

অন্যের সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে আমিও প্তিৎসিনের মেয়ের প্রেমে পড়লাম। কেমন করে আমার মনের ভাব প্রকাশ করেছিলাম তা আজ আর আমার মনে নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃখের ভিতর দিয়ে শেষ হল। একদিন জ্ভেজদিন পুকুরের বদ্ধজলে ভেলায় চড়ার জন্যে ওকে নিমন্ত্রণ করলাম, ও রাজি হয়ে গেল আমার প্রস্তাবে। ভেলাটা পারের কাছে এনে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার ভার সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল ওটার। কিন্তু লেস ফিতেয় সুসজ্জিত মেয়েটি যখন সাবলীল ভঙ্গীতে আমার উলটো দিকে উঠে দাঁড়াল, হতভাগা ভেলাটা তার ভারে ডুবে গেল। আর ও পড়ে গেল

পুকুরের ভিতরে। পরম বীরত্বের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে তাড়াতাড়ি পারে তুলে নিয়ে এলাম। কিন্তু ভয়ে আর সবুজ রঙের কাদায় তখন মেয়েটার সৌন্দর্যের এমন বিপর্যয় ঘটল যে তা আর বলবার নয়।

ভিজে মুঠির ঘুসি উঁচিয়ে চিৎকার করে সে আমাকে শাসাল:

'ইচ্ছে করেই তুমি আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছ!'

কিছুতেই ও আমার ক্ষমাপ্রার্থনায় কান দিল না এবং চিরদিনের জন্যে আমার মরণ শত্রু হয়ে রইল।

শহরের জীবনে তেমন আকর্ষণ ছিল না। বুড়ি-গিন্নী আমাকে মোটে দেখতে পারত না, মনিবের বৌ দেখত সন্দেহের চোখে। ভিক্তর দেখতে হয়েছে আগের চাইতেও বেশি ছুলিভরা। কী যেন এক গভীর বিদ্বেষ নিয়ে সে সবার উপরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াত।

মনিব অনেক আঁকা-জোঁকার কাজ নিয়েছিল, দু ভাইয়ে তা সামাল দিতে পারত না। তাই সাহায্যের জন্যে ডেকে আনা হয়েছিল আমার সৎবাবাকে।

একদিন সন্ধ্যায় একটু অস্বাভাবিক রকম সকাল সকাল ফিরে এসে খাবার ঘরে ঢুকতেই বহুদিনের ভুলে যাওয়া ঐ ভদ্রলোককে দেখলাম। চায়ের টেবিলে বসে রয়েছে আমার মনিবের পাশে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল:

'কেমন আছেন?'

সাক্ষাতের এই আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। মুহূর্তে সমস্ত অতীত যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠে আমার ভিতরে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

'ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি,' বলল মনিব।

শীর্ণ মুখে মৃদুহাসি হেসে আমার সৎবাবা আমার দিকে তাকাল। তার কালো চোখ দুটো আগের চাইতে আরো বড়ো হয়ে উঠেছে। ভীষণ রোগা দেখাচ্ছিল, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। ওর সরুসরু তপ্ত আঙ্গুলগুলোর ভিতরে আমার হাতখানা পুরে দিলাম।

'ভালো, তাহলে আবার দেখা হল আমাদের,' একটু কেশে বলে উঠল।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। যেন এইমাত্র মার খেয়ে এসেছি এমনি দুর্বল লাগছিল।

আমাদের সম্পর্ক কেমন যেন বাধো-বাধো অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে আমাকে ডাকত আমার পোষাকী নাম আর পদবী ধরে। আর সম্বোধন করত সমকক্ষের মতোই।

'যখন দোকানে যাবেন, দয়া করে আমার জন্যে এক পো লাফেরম তামাক, একশ ভিক্তর্‌সন সিগারেটের কাগজ আর আধসের সিদ্ধ সসেজ আনবেন।'

আমার হাতে যে পয়সা দিত সেগুলো সবসময়েই কেমন যেন বিশ্রী রকমের গরম লাগত। পরিষ্কার বোঝা যেত যে সে ক্ষয়রোগে ভুগছে। বেশি দিন আর বাঁচবে না। সেও জানত এ কথা। তাই ছুঁচল কালো দাড়ির ডগা মোচড়াতে মোচড়াতে গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বলত:

'আমার এ রোগের বাস্তবিক কোনো ওষুধ নেই। অবশ্য প্রচুর মাংস খেলে হয়ত সারতে পারে। কে জানে — হয়ত আমিও ভালো হয়ে যেতে পারি।'

অসম্ভব পরিমাণে খেত। যেমন খেত তেমনি সিগারেট টানত। মুখ থেকে সিগারেট সরাত শুধু মুখের মধ্যে খাবার পোরার জন্যে। প্রত্যেক দিনই ওর জন্যে আমি সসেজ, শুয়োরের মাংস, সার্ডিন মাছ কিনে আনতাম। কিন্তু দিদিমার বোন পরম পরিতোষের সঙ্গে তার চূড়ান্ত মন্তব্য জাহির করত:

'টুকিটাকি দিয়ে কি আর মরণের চিকিচ্ছে করা যায়! মরণের সঙ্গে চালাকী চলে না গো, কিছুতেই না!'

মনিবরা সর্বক্ষণ সৎবাবার দিকে এমন নজর দিত যে বিরক্ত লাগত। সারাক্ষণ নতুন কোনো ওষুধ খেতে বলত, আর পিছনে হাসি ঠাট্টা করত।

'বনেদী লোক বটে বাপু!' বলত মনিব-গিন্নী, 'বলে কিনা, টেবিল থেকে রুটির গুঁড়ো এঁটো-কাঁটা বার বার করে ঝেড়ে ফেলা উচিত। নইলে মাছি আসে!'

'বনেদী লোকই বটে!' ঘৃণাভরা অবজ্ঞার সুরে বলত বুড়ি-গিন্নী, 'দেখ না কোটটা কেমন সুতো ঝুলে ঝুলে চকচকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রুশ করা চাই। কী খ্যাঁকখেঁকে বাবা, ধুলোর দাগটুকুও সহ্য হয় না!'

'একটু না হয় সবুরই করো কুঁদুলে মুরগীর ছানারা, শীগ্‌গিরই তো ও মারা যাবে!' সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলত মনিব।

বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অজ্ঞ শহরবাসীদের মনে যে একটা অর্থহীন বিরূপতা আছে তার প্রতিবাদেই যেন আমি আমার সৎবাবার পক্ষভুক্ত হয়ে পড়লাম। ধুতরোর ফুল বিষাক্ত হতে পারে, কিন্তু তবু দেখতে তো সুন্দর!

এই লোকগুলোর ভিতরে দম-আটকে-আসা আবহাওয়ায় আমার সৎবাবাকে মনে হত যেন মুরগীর খাঁচার ভিতরে মাছের মতো। উপমাটা অবশ্য আমরা যে ভাবে জীবন কাটাচ্ছি তারই মতো খাপছাড়া।

সেই 'বাঃ বেশ' লোকটির মতোই এর ভিতরেও কতগুলো গুণ আবিষ্কার

করলাম। কোনো দিনও ভুলতে পারব না আমি তাকে। বইয়ের ভিতর থেকে বেছে বেছে যা কিছু সুন্দর সবকিছু দিয়েই 'বাঃ বেশ' আর রাণী মার্গোর স্মৃতিকে সাজিয়ে তুলেছিলাম। দুজনকে উজাড় করে ঢেলে দিতাম আমার অন্তরের যা কিছু ঐশ্বর্য সব -- যা কিছু সুন্দর রঙীন কল্পনা জেগে উঠত পড়ার ভিতর দিয়ে সে সব। 'বাঃ বেশ'এর মতোই আমার সৎবাবাও ছিল নির্লিপ্ত মানুষ। তেমনি সবারই অনাদৃত। বাড়ির সবার সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল একই রকমের। কখনো আগে কথা বলত না। আর সব কথারই জবাব দিত সংক্ষেপে, অমায়িক ভাবে। মনিবকে যখন সে কিছু শেখাত, আমার শুনতে খুবই ভালো লাগত। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে আঙুলের লম্বা নখ দিয়ে মোটা কাগজটার উপরে আস্তে আস্তে খোঁচা দিতে দিতে বুঝিয়ে বলত:

'এখানটায় একটা জোড় দিয়ে বরগাটাকে আটকে দেয়া দরকার যাতে চাপটা ছড়িয়ে পড়ে। নইলে রুয়োটা দেয়াল ভেঙ্গে বসে যাবে।'

'ঠিক কথা, চুলোয় যাক সব!' বিড় বিড় করে বলে উঠত মনিব। তারপর আমার সৎবাবা চলে গেলে পরে ওর বৌ বলত:

'ওকে তোমার উপরে অমন করে মাস্টারী করতে দাও কী করে?'

রাত্রে খাবারের পরে আমার সৎবাবা প্রতিদিন দাঁত মেজে মুখ ধুত। এমন ভাবে সে সময় সে মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে কুলি করত যে গলকণ্ঠটা বেরিয়ে পড়ত, তাতে মনিব-গিন্নীর বিশেষ রকম ধৈর্যচ্যুতি ঘটত।

'আমার মনে হয় অমন ভাবে পিছনের দিকে চিতিয়ে পড়া আপনার পক্ষে ক্ষতিকর, ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ!' একদিন রুষ্ট কণ্ঠেই বলল মনিবের বৌ।

প্রত্যুত্তরে হেসে অমায়িক ভাবে সে জিজ্ঞেস করেছিল:

'এ কথা আপনার কেন মনে হচ্ছে?'

'এই এমনিই।'

একটা ছোটো হাড়ের কাঠি বের করে সে আঙুলের নীলাভ নখগুলো পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে দিল।

'দেখো একবার! আবার নখও পরিষ্কার করা চাই!' অবাক হয়ে মন্তব্য করল মনিব-গিন্নী, 'এক পা তো গোরের পাড়ে, আর এখনো কিনা...'

'ছিঃ!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মনিব। 'কী বেকুব তোমরা, কুঁদুলে মুরগীর ছানারা!'

'কেন বলবে তুমি এমন কথা?' প্রতিবাদ করে উঠল ওর বৌ।

রাত্রে তিক্ত কণ্ঠে বুড়ি-গিন্নী নালিশ করত ভগবানের কাছে:

'সবাই মিলে ঐ পচাগলা লোকটাকে চাপিয়েছে আমার ঘাড়ে। ভিক্তরকে আবার ঠেলে ফেলে দিয়েছে পিছনে...'

ভিক্তর আমার সৎবাবার হাবভাব অনুকরণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার আস্তে চলার ধরন, অভিজাতসুলভ হাত নাড়ার নিশ্চিত ভঙ্গী, টাই বাঁধার দক্ষতা আর ঠোঁটে শব্দ না করে খাওয়ার অভ্যাস। প্রায়ই সে অভদ্রের মতো জিজ্ঞেস করত তাকে:

'মাক্সিমভ, ফরাসী ভাষায় হাঁটুকে কী বলে?'

'আমার নাম ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ,' শুধরে দিত সৎবাবা।

'ও, ঠিক ঠিক। আর স্তনকে?'

রাত্রে খাবার টেবিলে ভিক্তর মাকে হুকুম করত:

'মা ম্যের, দনে মুয়ো অ'কর দু কর্নড্‌বিফ!'

'আরে ফরাসী বাবু হয়ে গেলি যে রে,' অবাক বিস্ময়ে গদ গদ হয়ে বলত বুড়ি-গিন্নী।

নির্বিকার ভাবে মাংস চিবিয়ে চলত সৎবাবা। যেন সে কালা বোবা। চোখ তুলেও তাকাত না কারুর দিকে।

মনিব একদিন ভাইকে বলল:

'এখন তো তুই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শিখেছিস, এবার তাহলে একটা রক্ষিতাও জোগাড় করে ফেল...'

তাতে সেই প্রথম আমি আমার সৎবাবার মুখে একটু নীরব হাসি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

কিন্তু রাগের চোটে মনিব-গিন্নী হাতের চামচটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধমকে উঠল স্বামীকে:

'কী সাহসে তুমি এমন সব কুৎসিত কথা মুখে আনলে আমার সামনে?'

কোনো কোনো দিন আমার সৎবাবা পিছনের দরজার কাছে চিলেঘরের সিঁড়ির নিচে যেখানে আমি ঘুমোতাম, সেখানে এসে বসত আমার কাছে। ওখানেই ঐ সিঁড়ির জানালার সামনে বসে আমি বই পড়তাম।

'পড়ছেন?' এক দিন জিজ্ঞেস করল আমাকে। ধোঁয়া টেনে নিল সে, মনে হল তার বুকের ভিতরে জ্বলন্ত কাঠের মতো কী যেন চড় চড় করে উঠল। 'কী বই?'

বইটা দেখালাম।

'ও,' বইয়ের নামটার দিকে তাকিয়ে বলল। 'মনে হচ্ছে বইটা পড়েছি! সিগারেট খাবেন?'

জানালার পথে নোংরা উঠোনটার দিকে তাকিয়ে দুজনে সিগারেট খেতে লাগলাম। বলল:

'লেখাপড়া হচ্ছে না আপনার, ভারি খারাপ, মনে হয় আপনার যোগ্যতা আছে...'

'কিন্তু আমি তো পড়া চালাচ্ছি, প্রচুর পড়েছি...'

'ওটুকুতেই হয় না। স্কুলের শিক্ষা দরকার, দরকার একটা পদ্ধতি অনুসারে লেখাপড়া শেখা...'

ইচ্ছে হল বলি:

'আপনি তো স্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন, শিখেছেন পদ্ধতি অনুসারেই, কিন্তু মশায়, কী উপকারটা আপনার হয়েছে শুনি?'

যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই সে আবার বলল:

'যদি কারুর দৃঢ় লক্ষ্য থাকে, তবে স্কুলের শিক্ষা তাকে ভালো করেই গড়ে তোলে। শিক্ষিত লোকেরাই শুধু এই জীবনের পরিবর্তন আনতে পারে...'

অনেক বার সে আমাকে বলেছে:

'এখান থেকে চলে গেলেই ভালো হত আপনার পক্ষে। আপনার এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে বা কোনো সুবিধাই আমি দেখতে পাচ্ছি না...'

'কিন্তু মজুরদের ভালো লাগে আমার।'

'ওদের ভিতরে ভালো লাগার মতো কী দেখলেন বলুন তো?'

'ওরা নির্বোধ নয় কিন্তু।'

'হয়ত তাই...'

একদিন বলল:

'সত্যি, আমাদের মনিবরা একেবারে পশু — কী সাংঘাতিক পশু ওরা!..'

মনে পড়ে গেল কবে কী অবস্থায় মা ঠিক ঐ কথাটাই বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই আমি চুপ করে গেলাম।

'স্বীকার করেন না আপনি একথা?' একটু হেসে জিজ্ঞেস করল।

'হাঁ করি।'

'তা দেখেই বুঝতে পারছি...'

'কিন্তু তবুও মনিবকে ভালো লাগে আমার।'

'এটা ঠিক, লোকটাকে ভালোমানুষ গোছের বলে মনে হয় বটে... তবু কেমন যেন হাস্যকর।'

ভেবেছিলাম বই নিয়ে আলোচনা করব ওর সঙ্গে। কিন্তু দেখলাম ও তেমন বইয়ের ধার ধারে না।

'অতো বেশি সময় নষ্ট করবেন না বইপত্তর নিয়ে,' প্রায়ই বলত, 'বইয়ে সবকিছুই বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে লেখে, কিছু না কিছু বিকৃত করে দেখায়। বেশির ভাগ লেখকই আমাদের মনিবের মতো—তুচ্ছ লোক।'

এরকম মত প্রকাশ খুবই দুঃসাহসী বলে মনে হত আমার, তাই মনে মনে প্রশংসা করতাম তাকে।

'গন্‌চারোভ পড়েছেন?' একদিন জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'রণপোত 'পাল্লাদা', বললাম।

''পাল্লাদা' বইটা একটু একঘেয়ে। কিন্তু মোটের উপর গন্‌চারোভ হচ্ছেন রাশিয়ার সবচাইতে বুদ্ধিমান লেখক। ওঁর 'অব্‌লোমভ' বইটা পড়তে বলি—ওঁর লেখা বইয়ের ভিতরে সবচাইতে বেশি দুঃসাহসী, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী। এক কথায় রুশ সাহিত্যের সেরা বই...'

ডিকেন্স সম্পর্কে বলল:

'বাজে, যা বলছি শুনুন। কিন্তু আজকাল একটা খুব চমৎকার ভালো জিনিস বেরুচ্ছে 'নবযুগ' ক্রোড়পত্রে: 'সেণ্ট এণ্টনির প্রলোভন'। পড়া উচিত আপনার, মনে হয় গির্জা আর আধিদৈবিক ব্যাপারে আপনার খুব কৌতূহল আছে। 'প্রলোভন' বইটা পড়লে খুব উপকার হবে আপনার।'

সে নিজেই ঐ পত্রিকার এক বোঝা নিয়ে এল। আর আমিও ফ্‌লবেয়ারের চাতুর্যপূর্ণ লেখা পড়ে গেলাম। পড়তে পড়তে মনে পড়ে গেল যে সব অসংখ্য সাধু-সন্তদের জীবনী পড়েছি তাদের কথা। আর শাস্ত্রবাগীশের মুখে শোনা কিছু কিছু গল্পের কথা। কিন্তু লেখাটা আমার মনে তেমন কোনো গভীর রেখাপাত করল না। এর চাইতে ঢের বেশি আনন্দ পেলাম 'পশু-শিক্ষক উপিলিও ফেইমালির স্মৃতি' পড়ে। ওগুলোও ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এ কথা আমার সৎবাবাকে বলতে সে শান্ত কণ্ঠে বলল:

'তার মানে এ বই পড়ে বোঝার বয়স আপনার এখনো হয় নি। কিন্তু এ বইটার কথা ভুলবেন না।'

কখনো কখনো বহুক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকত আমার পাশে। একটি কথাও বলত না। শুধু কাশত আর ধোঁয়ার মেঘ ওড়াত। তার সুন্দর চোখ দুটোয় কেমন একটি ভয়ংকর আভা জ্বলত। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকতে থাকতে ভুলেই যেতাম এই যে-লোকটি বিনা অভিযোগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, এক সময়ে সে ছিল আমার মায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ, আর নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তার সঙ্গে। জানতাম ইদানিং ও বাস করে এক মেয়ে-দর্জির সঙ্গে। মেয়েটির কথা ভাবতে গিয়ে অবাক লাগত, করুণা হত। কেমন করে সে ঐ লিকলিকে কঙ্কালের আলিঙ্গনে ধরা দেয়, কেমন করে চুমু খায় কুৎসিত পূতি-গন্ধ ছড়ানো ঐ মুখে? 'বাঃ বেশ'এর মতো সৎবাবাও হঠাৎ হঠাৎ খুব উঁচুদরের সব মৌলিক মন্তব্য করে উঠত:

'শিকারী কুকুর বেশ লাগে আমার। ওগুলো নির্বোধ বটে, কিন্তু তবুও ভালোবাসি। কেননা ওরা দেখতে সুন্দর। সুন্দরী মেয়েরাও তো প্রায়ই বোকা হয়।'

একটু গর্বের সঙ্গেই মনে মনে ভাবলাম:

'রাণী মার্গোর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে ভালো হত!'

'দীর্ঘকাল একসঙ্গে যারা বাস করে আস্তে আস্তে তাদের সবাইকে একই রকম দেখতে হয়ে যায়,' একদিন বলল সে। কথাটা আমি আমার নোটবইয়ে টুকে নিলাম।

চরম আনন্দ অনুভব করার মতোই তার ঐ সব বাণী শোনার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। যে বাড়িতে সবাই নেহাৎ মামুলী রূপ-রসহীন একঘেয়ে কথাবার্তা বলে সেখানে এই সব মৌলিক কথায় খুবই আনন্দ পেতাম।

সৎবাবা কখনো আমার মায়ের কথা বলত না আমার কাছে। মনে হয় কোনো দিন তার নামও উচ্চারণ করে নি। এতে খুবই খুশি হতাম। ওর উপরে একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠত।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভগবানের কথা। কী কারণে জিজ্ঞেস করেছিলাম মনে নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে খুবই শান্ত গলায় জবাব দিল:

'আমি জানি না। ভগবানে বিশ্বাস নেই আমার।'

মনে পড়ল সিতানভের কথা। তার কথা বললাম তাকে। আমার বলা শেষ হয়ে গেলে পরে তেমনি ধীর শান্ত গলায় বলল:

'ও যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করে। যারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারা একটা না একটা কিছু বিশ্বাস করে... আমার আদৌ কোনো বিশ্বাস নেই।'

'কিন্তু সেটা তো অসম্ভব!'

'কেন? নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন — কোনো কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।'

দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু একটা জিনিসই — ও মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। ওর জন্যে যে দুঃখ হচ্ছিল সেটা বলা ঠিক হবে না, কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমার চেনা একটি লোকের মৃত্যু, সে মৃত্যুর রহস্য গভীর ভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল।

এইতো আমার পাশে বসে রয়েছে একটি লোক যার হাঁটুর ছোঁয়া এসে লাগছে আমার হাঁটুতে। সচেতন, বুদ্ধিমান, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে দেখছে মানুষকে। বিচার ও সিদ্ধান্তের অধিকার তার আছে এবং সে অধিকার নিয়েই কথা বলে চলেছে সবকিছু সম্পর্কে। তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমার একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্ততপক্ষে অপ্রয়োজনীয় কী তা সে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারে। এমন একটি প্রাণী যে নাকি অদ্ভুত রকমের জটিল, চিন্তার আগ্নেয়গিরি। ওর প্রতি আমার মনোভাব যাই হোক না কেন, ও যেন আমারও একটা অংশ, আমার ভিতরেও কোথাও যেন ওর বাস। কারণ যে মুহূর্তে আমি ওর কথা ভাবি অমনি ওর অন্তরের ছায়া এসে ছাপ ফেলে যায় আমার অন্তরে। কাল সে যাবে লুপ্ত হয়ে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। ওর মস্তিষ্কের, ওর অন্তরের যা কিছু স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল, ওর দুটি সুন্দর চোখের দৃষ্টির ভিতরে যা কিছু আমি দেখেছি বলে ভাবছি, মুছে যাবে সবকিছুই। সে চলে যাবে আর সংসারের সঙ্গে আমার অজস্র বন্ধনের একটা সূত্র যাবে কেটে, পড়ে থাকবে শুধু একটা স্মৃতি। কিন্তু সে স্মৃতির সবটুকুই থাকবে শুধু আমার অভ্যন্তরে, সে স্মৃতি পরিসমাপ্ত, পরিবর্তনহীন। জীবন্ত পরিবর্তনশীল মানুষটি চলে যাবে...

কিন্তু এ হল নিছক চিন্তা। এর পিছনে রয়েছে অব্যক্ত অবর্ণনীয় এমন একটা কিছু যা এই চিন্তাকে ধারণ করে, লালন করে, পরম ঔদ্ধত্যে যা আমাদের বাধ্য করে জীবন-জিজ্ঞাসায় আর দাবি করে এই প্রশ্নের জবাব — কেন?

'ভয় হচ্ছে শীগ্‌গিরই বুঝিবা বিছানা নিতে হয় আমাকে,' এক বর্ষার

দিনে বলল সংবাবা। 'এমন একটা বিশ্রী দুর্বলতা লাগছে! কিছু করতে ইচ্ছে করছে না...'

পরের দিন বিকেলে চায়ের সময়ে আরো যেন খুঁতখুঁতে ভাব নিয়ে টেবিল আর হাঁটুর উপর থেকে রুটির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলল। তারপর হাত নেড়ে অদৃশ্য কী যেন একটা দূরে সরিয়ে দিল। ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ি-গিন্নী ফিস ফিস করে বলল তার বৌয়ের কাছে:

'দেখ, ও নিজেকে ঝেড়ে পুঁছে তৈরী হয়ে নিচ্ছে...'

দুদিন পরে সে আর কাজে এল না। পরে বুড়ি-গিন্নী একটা বড়ো সাদা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল:

'এই নে, একটা মেয়ে কাল দুপুরে এটা দিয়ে গেছে। তোকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। মেয়েটা দেখতে শুনতে মন্দ নয়—কিন্তু কী জানি বুঝতে পারলাম না তার সঙ্গে তোর সম্পর্ক কী!'

খামের ভিতরে হাসপাতালের একটুকরা কাগজে বড়ো বড়ো করে এই সংবাদটি লেখা:

'ঘণ্টাখানেকের মতো যদি ছুটি পান তবে আমাকে দেখে যাবেন। মার্তিনভ্স্কায়া হাসপাতালে আছি। ইয়ে. ম.'

পরের দিন সকালে হাসপাতালের ওয়ার্ডে সংবাবার বিছানার পাশে পায়ের দিকে গিয়ে বসলাম। বিছানার চাইতে তার শরীরটা লম্বা। জীর্ণ ধূসর মোজা-পরা পা দুটো খাটের বাজুর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। সুন্দর চোখ দুটো দেয়াল ঘুরে এসে একবার নিবদ্ধ হচ্ছে আমার মুখের উপরে। তারপর গিয়ে পড়ছে মাথার পাশে টুলের উপরে বসা একটি মেয়ের হাতের উপরে। মেয়েটি যেই বালিশের উপরে হাত রাখছে, সংবাবা অমনি তার হাতের উপরে গাল ঘসছে আর মুখটা হাঁ হয়ে উঠছে। মেয়েটির চেহারা গোলগাল। পরনে সাদাসিধে কালো পোশাক। সুডৌল মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে অল্প অল্প চোখের জল। নীল দুটি চোখ নিবদ্ধ সংবাবার হনু, বের করা সুঁটকো নাক আর বিবর্ণ মুখের উপর।

'এ সময়ে যদি একজন পুরুত ডাকতে দিত,' ফিস ফিস করে বলল মেয়েটি, 'কিন্তু ও ডাকতে দেবে না, ও বোঝে না...'

বালিশের উপর থেকে হাত দুটো তুলে এনে মেয়েটি বুকের ওপর চেপে ধরল যেন প্রার্থনা করছে।

মুহূর্তের জন্যে সংবাবার ঘোর কেটে গেল। ভ্রূ কুঁচকে সিলিংয়ের

দিকে তাকিয়ে কী একটা কথা যেন মনে করার চেষ্টা করল। তারপর শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে:

'আপনি? ধন্যবাদ। শুনুন... আমার মনে হয়... কোনো মানে হয় না...'

এতেই দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। চোখ বুজল। তার নীলাভ নখওয়ালা সরু সরু লম্বা আঙুলগুলো আমি ধীরে ধীরে চাপড়াতে লাগলাম। মেয়েটি মৃদু অনুনয় করল:

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, রাজী হয়ে যান, কেমন?'

'আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ওর সঙ্গে,' চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল সে, 'চমৎকার মেয়ে...'

বলতে বলতে চুপ করে গেল। মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। হঠাৎ কাকের মতো একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা চিৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই বিছানার উপরে ছটফট করতে করতে কম্বল ফেলে তোশকটা আঁকড়ে ধরল। মেয়েটিও চিৎকার করে কেঁদে উঠে মুখটা বালিশের উপরে চেপে ধরল।

খুব তাড়াতাড়ি মারা গেল সৎবাবা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার সমগ্র চেহারা যেন শান্ত সৌন্দর্যে ভরে উঠল।

মেয়েটিকে বাহুলগ্না করে হাসপাতাল ছেড়ে চলে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে টলতে টলতে চলেছে মেয়েটি রোগীর মতো। এক হাতে গোল করে পাকানো একটা রুমাল। রুমালটা একবার এ চোখে আর একবার ও চোখে চেপে ধরছে আর আরো শক্ত করে তাকে পাকিয়ে চলেছে। এমন ভাবে তাকাচ্ছে রুমালটার দিকে যেন এটাই ওর একমাত্র শেষ সম্বল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার গায়ের সঙ্গে মিশে এসে অভিযোগভরা কণ্ঠে বলে উঠল:

'শীতকালটা পর্যন্তও বাঁচল না... হায় ভগবান, ভগবান, এমন কেন করলেন?'

তারপর চোখের জলের ভিতর দিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে:

'বিদায়। সব সময়েই ও আপনার সুখ্যাতি করত। কাল সৎকার।'

'বাড়ি পেঁছে দেব আপনাকে?'

চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

'কেন? এখনো তো দিনের আলো রয়েছে।'

রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে তার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। হেঁটে চলেছে ধীরে ধীরে। যেন জীবনের সবকিছু আকর্ষণই গেছে হারিয়ে।

আগস্ট মাস। পাতা ঝরছে।

সৎবাবার শেষকৃত্যের সময়ে উপস্থিত থাকার সময় পাই নি। মেয়েটিকেও আর কোনো দিন দেখি নি...

১৭

রোজ ভোর ছ'টায় উঠে কাজে চলে যেতাম মেলার মাঠে। সেখানে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হত: ছুতোর মিস্ত্রি অসিপ — পাকা চুল, জিভে খুব ধার, দক্ষ কারিগর। দেখতে ঠিক সেণ্ট্ নিকোলাইয়ের মতো। ছাদ-পিটুনে কুঁজো ইয়েফিমুশ্‌কা। পাথর-মিস্ত্রি পিওতর — ধর্মভীরু, ভাবুক গোছের। ওকেও দেখতে সাধুর মতো। সুন্দর চেহারার রাজমিস্ত্রি গ্রিগোরি শিশ্‌লিন — লালচে দাড়ি, নীল চোখ, শান্ত প্রীতি ঝরে পড়ছে সব সময়।

নকশা-নবীশের ঘরে দ্বিতীয়বার চাকুরি করতে এসেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রত্যেক রবিবার দৃঢ় প্রশান্ত পদক্ষেপে ওরা এসে ঢুকত রান্নাঘরে। ওদের কথাবার্তার ধরন সুন্দর। বলার ভিতরে থাকত এমন অনেক সুন্দর কথা যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন মনে হত আমার কাছে। এইসব ভার-ভার্তিক চেহারার চাষীরা দেখতাম সবাই খুব ভালো মানুষ। প্রত্যেকের ভিতরেই তার নিজস্ব ধরনের এক একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কুনাভিনোর মাতাল ছ্যাঁচোড় ব্যাপারীদের তুলনায় এরা প্রত্যেকেই ঢের ভালো।

সে সময় রাজমিস্ত্রি শিশ্‌লিনকে মনে মনে বেছে নিয়েছিলাম আমার প্রিয়পাত্র হিসেবে। এমন কি একদিন ওকে বলেছিলাম আমাকে ওর সাকরেদ করে নিতে। কিন্তু সাদা সাদা আঙুল দিয়ে সোনালী ভ্রূ চুলকতে চুলকতে ভদ্র ভাবেই প্রত্যাখ্যান করল আমাকে। বলল:

'তুমি এখনো বড্ডো ছোট। আমাদের কাজ খুব সোজা নয় — আর দু-এক বছর যাক,' তারপর সুন্দর মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে মন্তব্য করল:

'জীবনটা তোমার খুব কঠিন মনে হচ্ছে? তাতে কি, সইতে চেষ্টা করো, শক্ত হাতে নিজেকে ঠিক রাখো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জানি না ওর সেই সহৃদয় উপদেশে আমার কোনো লাভ হয়েছিল কিনা, কিন্তু পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কথাটা আমি স্মরণে রেখেছিলাম।

ওরা প্রত্যেক রবিবারে আমার মনিব বাড়ি আসত। রান্নাঘরের টেবিল ঘিরে বেঞ্চের উপরে বসত। আর মনিবের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আলাপ-আলোচনা করত মজার মজার। খোশ-মেজাজে কলরব করতে করতে মনিব এসে ওদের সম্ভাষণ জানাত। করমর্দন করত ওদের শক্ত হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। বসত কোণের দিকে গিয়ে। তারপর শুরু হত টাকা আর রসিদপত্রের পালা। চাষীরা তাদের বিল আর জীর্ণ হিসেবের খাতা বের করে রাখত টেবিলের উপরে। হপ্তার হিসেবপত্র চুকিয়ে দেওয়া হত।

খুব হাসি ঠাট্টা আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে করতে মনিব চেষ্টা করত ওদের ঠকাতে আর ওরাও চেষ্টা করত মনিবকে ফাঁকি দিতে। কোনো কোনো সময়ে কঠিন বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু সাধারণত পরস্পর হাসতে হাসতে আপোষ রফা করে নেওয়া হত।

চাষীরা মনিবকে বলত, 'তুমি একটা আস্তো পাজীর পা-ঝাড়া হয়ে জন্মেছ, দোস্ত!'

বোকার মতো হেসে মনিব উত্তর দিত:

'তা তোমরাও তো চুরি করতে নেহাং কম ওস্তাদ নও, কুঁদুলে মুরগীর ছানারা!'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করত ইয়েফিমুশকা। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে পিওতর বলে উঠত:

'মানুষ বেঁচে আছে তো চুরির ওপরে। তার সৎ উপার্জনের সবটুকুই তো যায় ভগবান আর জারের কাছে...'

'তাহলে তোমাদের থেকে একটু আধটু চেঁছে-ছুলে নিলে আমার দোষ কিছু নেই বলো!' হেসে উঠত মনিব।

ওরা বেশ সহজ ভাবেই নিত তার কথা:

'তার মানে তুমি আমাদের গায়ের চামড়া ছুলে নিতে চাইছ বলো?'

'ভোগা দিতে চাইছ আমাদের?'

বুকভরা ঘন দাড়ির ঝোপের ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে সুরেলা গলায় বলে উঠত গ্রিগোরি শিশলিন:

'আমরা যদি কাউকে না ঠকিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাই তো কেমন হয় ভায়ারা? সৎ হয়ে যদি চলি? সবকিছুই কী সুন্দর সহজ হয়ে যেত তবে? কী বলো ভালো মানুষেরা?'

ওর নীল চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে কালো হয়ে উঠত। এ সময়ে অপূর্ব

সুন্দর দেখাত ওকে। ওর প্রস্তাবে সবাই যেন কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করত। বিব্রত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিত সবাই।

'চাষীরা কাউকে তেমন ঠকাতে পারে না,' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ধীরস্থির অসিপ বলত। যেন চাষীদের ও করুণার চোখে দেখে।

কালো চেহারার বৃষস্কন্ধ পাথর-মিস্ত্রি টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলত:

'পাপ হল গিয়ে চোরাবালির মতো—যতোই এগবে ততই ডুববে।'

গলার স্বর ওদেরই সমপর্যায়ে নামিয়ে এনে মনিব বলত:

'তোমাদের কথায় আমিও সায় দিচ্ছি...'

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ দার্শনিকতার পরে ওরা আবার কে কার কাছ থেকে দু-পয়সা জিতে নেবে তাই নিয়ে দর-কষাকষি শুরু করে দিত। হিসেব-নিকেশ চুকে যেতে ঘেমে, হয়রান হয়ে ওরা মনিবকে ডেকে নিয়ে সরাইখানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ত চা খেতে।

মেলার মাঠে আমার কাজ ছিল কেউ যাতে ইট, কাঠ, পেরেক ইত্যাদি চুরি না করে তার তদারক করা। মনিবের কাজ ছাড়াও প্রত্যেকেরই তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা ঠিকে থাকত। তাই চেষ্টা করত নিজেদের কাজের জন্যে মালপত্তর পাচার করতে।

ওরা আমাকে বন্ধু ভাবেই গ্রহণ করল। কিন্তু শিশলিন বলল:

'মনে আছে একদিন তুমি তোমাকে আমার সাকরেদ করে নেয়ার জন্যে বলেছিলে? আর এখন দেখো তো কতো উন্নতি হয়েছে তোমার? তুমি এসেছ আমার ওভারসিয়ার হয়ে, কী বলো?'

'আরে তাতে কী আছে,' ঠাট্টা করে বলল অসিপ, 'উঁকিঝুঁকি মারো, গোয়েন্দাগিরি করো, যতো প্রাণে চায় করে যাও!'

বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলল পিওতর:

'একটা বাচ্চা বেড়ালকে ধাড়ী ইঁদুরের পেছনে লাগানো?'

কঠোর বোঝার মতো ভারি লাগত আমার কাজ। লজ্জিত হয়ে পড়তাম এই লোকগুলোর সামনে। ওদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা কাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আছে। সে জ্ঞান একমাত্র ওদেরই নিজস্ব। আর আমাকে কিনা ওদের উপরে এমন ভাবে নজর রাখতে হচ্ছে যেন ওরা চোর জোচ্চোর। প্রথম প্রথম ভারি কষ্ট হত। অসিপ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে একদিন সোজা আমার চোখে চোখ রেখে বলল:

'শোনো খোকা, অমন মুখ ভার করে থেকো না। কোনো লাভ নেই, বুঝলে?'

স্বভাবতই কিছু বুঝলাম না। কিন্তু মনে হল যেন বুড়ো আমার পদাধিকারের অসঙ্গতির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই দুজন দুজনার কাছে মন খুলে দিলাম। আমাকে একটু দূরে একটা কোণের দিকে ডেকে নিয়ে অসিপ উপদেশ দিত:

'যদি জানতে চাও তো বলি, আমাদের মধ্যে আসল চোর হল গে ঐ পাথর-মিস্ত্রি পিওতর। লোকটা লোভী। ওর পরিবারও বড়ো। খুব কড়া নজর রেখো ওর দিকে। যা পাবে তাই ও হাতাবে। তা সে এক পাউন্ড পেরেকই হোক, বা ডজনখানেক ইটই হোক, কিম্বা খানিকটা মশলা—পেলেই পাচার। অবশ্য ও লোক ভালো, ধার্মিক, নিয়ম নীতির দিক থেকেও কড়া, লিখতে পারে, পড়তে পারে, কিন্তু ঐ একটা দুর্বলতা, চুরি করা। আর ঐ ইয়েফিমুশকা—ওর ঝোঁক শুধু মেয়েমানুষের দিকে। শান্ত, নিরীহ, এতটুকু অনিষ্টও করবে না তোমার। ঘাড়ের উপরের মাথাটা খুব সাফ। কুঁজো তবে বোকা নয়। আর গ্রিগোরি শিশলিন—ও লোকটা একটু গোবর-গণেশ গোছের। অন্যেরটা নেয়া তো দূরের কথা, নিজেরটাও বুঝে নিতে পারে না। যে কোনো লোক ওকে ঠকিয়ে নিতে পারে, ও কিন্তু কাউকে ঠকাতে পারে না। ও যে কী করে না করে তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।'

'লোক কী রকম, ভালো?'

দূর থেকে অসিপ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখল। তারপর বলল একটি অবিস্মরণীয় কথা:

'হ্যাঁ, ও লোক ভালো, কুঁড়ে মানুষের পক্ষে ভালো হওয়ার মতো সোজা আর কিছুই নেই। ভালো হতে হলে তো আর মগজের দরকার করে না, বুঝলে হে ছোকরা...'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম অসিপকে।

একটুখানি হেসে জবাব দিল অসিপ:

'আমি হলাম গে একটা ছুঁড়ির মতো। যখন ঠাকুমা হব তখন বলব আমি কেমন। কিন্তু ততদিন সবুর করতে হবে। আর তা নইলে মাথা খাটিয়ে বুঝে দেখো আমি কেমন। যাও, চেষ্টা করে দেখো!'

ও আর ওর বন্ধুদের সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা পালটে দিল অসিপ।

ও যে সত্যি কথাই বলেছে সে সম্পর্কে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না আমার। দেখতে পেতাম ইয়েফিমুশকা, পিওতর আর গ্রিগোরি তাদের নিজেদের চাইতে এই শান্ত বুড়ো মানুষটিকে ঢের বেশি বুদ্ধিমান আর কাজের ব্যাপারে ঢের বেশি জ্ঞানী বলে মনে করে। সব ব্যাপারে তারা ওর পরামর্শ চাইত, মন দিয়ে শুনত ওর উপদেশ আর জানাত তাদের সম্ভ্রমভরা শ্রদ্ধা।

'দয়া করে একটু পরামর্শ দাও,' ওরা এসে বলত অসিপের কাছে। কিন্তু একদিন এ জাতের অনুরোধের পর অসিপ যখন চলে গেল, শুনতে পেলাম পাথর-মিস্ত্রি নিচু গলায় বলছে গ্রিগোরির কাছে:

'নাস্তিক!'

'ভাঁড়!' নাক সিট্‌কে বলল গ্রিগোরি।

রাজমিস্ত্রি বন্ধু ভাবেই আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল:

'বুড়োর দিকে নজর রেখো মাক্সিমিচ, ওর সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে কিন্তু তোমাকে। চোখের পলকে ও তোমাকে কড়ে আঙুলের ডগায় ঘুরিয়ে আনবে। ঐ সব বুড়োগুলো, সব সময়েই মুখ চলছে ওদের। ওরা যে কতো ক্ষতি করতে পারে তা শুধু ভগবানই জানেন!'

এ কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলাম না।

আমার মনে হল ওদের মধ্যে সবচাইতে সৎ, সবচাইতে ধার্মিক হচ্ছে পাথর-মিস্ত্রি পিওতর। ওর সবকিছু মন্তব্যই সংক্ষিপ্ত, প্রভাবশীল, ওর যা কিছু ভাবনা তা প্রায়ই ভগবান, মৃত্যু আর পরলোকের শাস্তি নিয়ে।

'হায় রে ভাই, মানুষ যতোই চেষ্টা করুক, যতোই আশা করুক না কেন একদিন তাকে কবর আর কফিনের কাছে আসতেই হবে!'

কী একটা পেটের রোগে ভুগত পিওতর। এক এক সময়ে দিনের পর দিন কিছুই খেতে পারত না। রুটির একটু ছোট টুকরোও তখন ওর পেটে পড়লে দারুণ ব্যথায় মুচড়ে উঠত, বমি হত।

কুঁজো ইয়েফিমুশকাকেও মনে হত সৎ, সহৃদয়। যদিও কেমন একটু হাস্যকর। মাঝে মাঝে ও এমন একটা সুখী-সুখী ভাব করত যে ওকে মনে হত নেহাৎ হাবার মতো। প্রায়ই প্রেমে পড়ত ইয়েফিমুশকা। আর সব মেয়েমানুষ সম্পর্কেই তার একই বর্ণনা:

'খাঁটি কথা বলছি ভাই—ও মেয়েমানুষ নয়! ও হল একেবারে মাখনের ফুল, ঠিক তাই!'

কুনাভিনোর মুখরা মেয়েগুলো যখন আসত দোকান-ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে, ছাদ থেকে নেমে এসে ইয়েফিমুশকা একটা কোণে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে ঘড় ঘড় করতে থাকত। ধূসর চোখ দুটো শক্ত হয়ে কুঁচকে উঠত। মুখটা হাঁ হয়ে এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত হাসি।

'ওঃ, কী রসের খাবারই না ভগবান আজ এনে দিয়েছেন! কী আনন্দই না আজ এসে পড়েছে আমার হাতে! ঐ মেয়েটা দেখো না সুন্দর একটা ফুল! এমন উপহারের জন্যে অদৃষ্টকে কী বলে ধন্যবাদ দেব বলো? অমন রূপে পুড়ে ছাই হয়ে যাব না তো গো?'

প্রথম প্রথম মেয়েগুলো পরস্পরকে ডেকে ডেকে হাসাহাসি করত ওকে দেখিয়ে:

'দেখ্ লো দেখ্, কুঁজোটার ঢলানি দেখ্! হা ভগবান!'

ছাদ-পিটুনে ওদের হাসি-ঠাট্টা গায়ে মাখত না। ধীরে ওর গালের হাড় ঠেলে ওঠা মুখখানা তন্দ্রালু হয়ে উঠত। প্রলাপের মতো মিষ্টি কথার মদির স্রোত ঢেলে এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করে দিত যে মেয়েগুলোও স্পষ্টতই আচ্ছন্ন হয়ে উঠত। অবশেষে ওদের মধ্যে বয়স্কামতো কেউ অবাক হয়ে বলে উঠত:

'চাষীটা এমন করছে যেন একটা ছোঁড়া!'

'পাখির মতো গান ধরেছে দেখ...'

'পাখির মতো নাকি গির্জার দোরের ভিখিরীর মতো,' রুক্ষ গলায় বলে উঠত বয়স্কা।

কিন্তু ইয়েফিমুশকার সঙ্গে ভিখারীর কোনো সাদৃশ্য ছিল না। মাটিতে পোঁতা খোঁটার মতোই দৃঢ় পায়ে ও দাঁড়িয়ে থাকত মাটির বুকে। গলার স্বর ক্রমেই মোহময় হয়ে উঠত, ক্রমেই ওর ভাষা হয়ে উঠত মন-কেড়ে-নেয়া। মুখ বন্ধ করে মেয়েরা সে কথা শুনত চুপ করে। মনে হত যেন ও বুনে চলেছে মধুমাখা কথার ইন্দ্রজাল।

তারপর সমাপ্তি ঘটত এমনি করে: হয় ও ফিরে আসত রাত্রের খাবার সময়ে কিংবা কাজের শেষে। বড়ো চৌকো মাথাটা নাড়তে নাড়তে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অবাক দৃষ্টিতে বন্ধুদের বলত:

'আঃ, কী মধুর মেয়েটা, কী চমৎকার! জীবনে এই প্রথম এমন একটা মেয়েমানুষের দেখা পেলাম!'

হৃদয়-জয়ের গল্প বলার সময় ইয়েফিমুশকা কখনো জাঁক করত না, বা অন্য সবাইয়ের মতো মেয়েমানুষটিকে নিয়ে হাসি-তামাশা করত না। শুধু সানন্দ সকৃতজ্ঞ বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে হাসত।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠত অসিপ:

'অক্লান্ত ষাঁড় কোথাকার! বয়েস কতো রে তোর?'

'চল্লিশ পেরিয়ে চার। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আজই আমার পাঁচ বছর বয়েস কমে গেছে। প্রাণের জলে ডুব দিয়ে আস্তো হয়ে উঠে এলাম। মন ভরে গেছে রে। আঃ, কী সব চমৎকার চমৎকার মেয়েমানুষই না আছে রে!'

পাথর-মিস্ত্রি কড়া করে বলেছিল:

'দেখে নিস—পঞ্চাশের কোঠায় পা দিতে না দিতে তোর এই লুচ্চামির প্রতিফল পাবি ভালো করেই!'

'তুই একটা জঘন্য জীব ইয়েফিমুশকা,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল গ্রিগোরি শিশলিন।

কিন্তু আমার মনে হল এই কুঁজো যে রমণী জয়ে পারঙ্গম তাতে এই সুপুরুষ যুবাটি বোধ হয় ঈর্ষান্বিত।

কোঁচকানো রুপোলী ভ্রূর তলা দিয়ে অসিপ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সপরিহাসে ঝঙ্কার দিত:

'সব ছুঁড়িরই নিজের ঝুড়ি — এ চায় হাঁড়িকুড়ি, ও চায় হার চুড়ি, তবে সব ছুঁড়িই হবে দিদিমা-বুড়ি।'

শিশলিন বিবাহিত। কিন্তু ওর বৌ থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। সতৃষ্ণ দৃষ্টি মেলে সেও তাকিয়ে থাকে মেঝে-ঘসা ঐ মজুরানীদের দিকে। ওরা সবাই রাজী। সবাই-ই চায় দুটো 'বাড়তি' পয়সা রোজগার করতে। দারিদ্র্য-পীড়িত এদের সমাজে অন্য যে কোনো রকম রোজগারের মতো এ পথে রোজগারটাকেও ভালো বলেই ধরে নেয়া হত। কিন্তু সুন্দর চেহারার এই চাষীটি কখনো কোনো মেয়েমানুষ ছুঁত না। এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে দূর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন ওর দুঃখ হচ্ছে হয় ওদের জন্যে, নয় ওর নিজের জন্যে। কিন্তু ওরা যখন নিজে থেকেই ওর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিত, প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করত, তখন ও শুধু বিব্রত মুখে হাসতে হাসতে পালিয়ে যেতে যেতে বলত:

'হয়েছে, হয়েছে থাক...'

'তোর কি মাথা খারাপ?' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠত ইয়েফিমুশকা, 'অমন একটা সুযোগ ছেড়ে দিলি?'

'আমার যে বৌ আছে ঘরে,' স্মরণ করিয়ে দিত গ্রিগোরি।

'বৌ তো আর কখনো জানতে পারবে না!'

'স্বামী অবিশ্বাসের কাজ করলে বৌ সে কথা জানবেই জানবে। বৌয়ের সঙ্গে চালাকী চলে না ভায়া, বুঝলি?'

'কেমন করে জানতে পারবে?'

'তা আমি জানি না। তবে সে যদি সতী হয় তবে ঠিক বুঝতে পারবে। আর আমিও যদি সৎ ভাবে থাকি আর ও যদি অসতী হয় তবে আমিও ঠিক বুঝতে পারব...'

'কেমন করে?' চেঁচিয়ে উঠল ইয়েফিমুশকা। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে গ্রিগোরি পুনরাবৃত্তি করল:

'তা আমি জানি না।'

বিরক্ত হয়ে হাত নাড়া দিয়ে উঠল ইয়েফিমুশকা।

'দেখ্ একবার! 'সৎ ভাবে থাকা,' 'আমি জানি না'... কী যে আছে তোর মগজে!'

শিশলিনের মজুরেরা বেশ আরামেই কাজ করত ওর সঙ্গে। যেন শিশলিন ওদের মনিব নয়। ওরা সব সাকুল্যে ছিল সাতজন। কিন্তু পিছনে ওরা শিশলিনকে বাছুর বলত। যদি কোনো দিন শিশলিন কাজে এসে দেখত যে ওরা কুঁড়েমি করে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছে, নিজেই সে তখন ওদের ডাক দিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে দারুণ ভাবে কাজে লেগে পড়ত। বন্ধুর মতো ডাক দিয়ে বলত:

'চলে আয় সব, চলে আয়!'

একদিন আমার ধৈর্যচ্যুত মনিবের হুকুমমতো গ্রিগোরিকে ডেকে বললাম:

'তোমার মজুরেরা কোনো কাজের নয়।'

'বটে?' ও এমন ভাবে বলে উঠল যেন এ কথাটা এর আগে কোনো দিনই ওর মনে হয় নি।

'এই কাজটা গতকালই দুপুরে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজও শেষ হবে না...'

'সে কথা ঠিক। ওদের দিয়ে হবে না,' কথাটা মেনে নিল গ্রিগোরি। কিন্তু একটু থেমেই আবার ইতস্তত করে বলল:

'কী হচ্ছে তা অবশ্য আমি জানি। কিন্তু ওদের তাড়িয়ে দিতে লজ্জা লাগে। ওরা সবাই আমার গাঁয়ের ছেলে। ভগবান আইন করে দিয়েছেন — মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খেতে হবে। আমাদের সকলের জন্যেই ওই এক আইন নয় কি? তোমার, আমার, সকলের জন্যেই? কিন্তু তুমি আমি অন্যের চাইতে কাজ করি কম। তাই ওদের তাড়িয়ে দিতে লজ্জা লাগে...'

ওর মধ্যে ভাবুকতার ঝোঁক ছিল। কখনো কখনো মেলার মাঠের কোন জনশূন্য রাস্তা ধরে চলতে চলতে অবভোদনি খালের উপরের পুলের উপরে এসে দাঁড়াত সে। তারপর রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে কখনো জলের দিকে, কখনো আকাশের দিকে, কখনো বা ওকা নদীর ওপারে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকত। কেউ যদি হঠাৎ এসে ওকে দেখে জিজ্ঞেস করত:

'কী করছ এখানে?'

ও চমকে উঠে বিব্রত মুখে বলত, 'বিশেষ কিছু না। এই একটু জিরিয়ে নিতে নিতে চারদিকটা চেয়ে দেখছিলাম...'

গ্রিগোরি প্রায়ই বলত, 'যেখানে যেমনটি দরকার ভগবান তেমনি করেই গড়েছেন সবকিছু। ঐ আকাশ, ঐ মাটি — মাটির বুকে বইছে নদী। নদীর বুকে ভাসছে স্টিমার। স্টিমারে চড়ে যেখানে খুশি যেতে পারো রিয়াজান কিংবা রীবিন্স্ক, পের্ম কিংবা আস্ত্রাখান। একবার আমি গিয়েছিলাম রিয়াজানে — শহরটা মন্দ নয় তবে বড্ডো নীরস। নিজনি নভগরোদের চাইতেও। আমাদের নিজনি কিন্তু বেশ সরস জায়গা। আস্ত্রাখানও নীরস। আসল কথা হল আস্ত্রাখানে কালমীকেরা এসে ছেয়ে ফেলেছে। ওদের মোটেই দেখতে পারি না আমি। মর্দোভীয় বা কালমীক কিংবা পার্শী বা জার্মান — এসব বিদেশী জাতগুলোকেই দেখতে পারি না!'

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ভেবে-চিন্তে কথা বলত, খুঁজত এমন একজনকে যে ওর কথায় সায় দেবে। সে সায় আসত সাধারণত পাথর-মিস্ত্রি পিওতরের কাছ থেকে।

'বিদেশী জাত নয়, ওরা হল গে বে-জাত। দুনিয়ার বার ওদের জন্ম, যীশুর বার, যীশু ছাড়াই,' সায় দিয়ে রুক্ষ মেজাজে বলে উঠত পিওতর।

গ্রিগোরির মুখখানা জ্বলজ্বলে হয়ে উঠত:

'তা যাই বলো, আমি ভাই খাঁটি রুশীকে পছন্দ করি, যারা সরল ভাবে তোমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে। ইহুদীদেরও দেখতে

পারি না। কেন যে ভগবান বিদেশীদের সৃষ্টি করেছেন, জীবনে তার কোনো মানেই খুঁজে পাই না। এ এক গভীর জ্ঞানের কথা...'

গম্ভীর মুখে পাথর-মিস্ত্রি বলল:

'গভীর হতে পারে, কিন্তু দুনিয়ায় এমন প্রচুর জিনিস আছে যা না থাকলেও আমাদের কিছু এসে যেত না...'

ওদের কথাবার্তা শুনে অসিপ তার ব্যঙ্গভরা তীব্র সুরে বলত:

'ঠিক কথা, অনেক কিছু আছে যা না হলেও চলত আমাদের -- যেমন তোদের ঐ মন্তব্য। ঠোকাঠুকি না লাগালে তোদের হয় না! দরকার তোদের ধরে চাবকানো!'

একটু আলাদা হয়ে চলত অসিপ। কার সঙ্গে ওর মতের মিল, কার সঙ্গে নেই, টের পাওয়া যেত না। এক এক সময়ে মনে হত সবার সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গেই ওর মতের মিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই দেখা যেত যে সবকিছুর উপরেই ও বিরক্ত, সবাইকেই মনে করছে বোকা বলে। পিওতর, গ্রিগোরি আর ইয়েফিমুশকাকে অসিপ বলত:

'যতো সব শুয়োরের ছানা...'

ওরা একটু হাসত। যদিও সে হাসি খুব আনন্দের, খুব একটা উল্লাসের নয়, তবুও হাসত।

মনিব আমাকে রোজ পাঁচ কোপেক করে পয়সা দিত খাওয়ার জন্যে। তাতে পেট ভরত না। ক্ষিদে থাকত পেটে। এ দেখে মজুররা ডাকত আমাকে তাদের সঙ্গে দুপুরের বা রাত্রের খাবার খেতে। ঠিকেদারেরা কোনো কোনো সময়ে চা খাওয়াতে নিয়ে যেত চাখানায়। খুশি হয়েই ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। ওদের সঙ্গে বসে ওদের ধীর কণ্ঠের আলোচনা, আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প শুনতে ভালো লাগত আমার। ধর্ম-পুস্তক সম্পর্কে আমার জ্ঞান দেখে ওরাও খুশি হয়ে উঠত।

''পেট ঠেসে বই গিলেছ। এমন ঠুসেছ যে পেট ফাটে ফাটে,' নীল চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল অসিপ। কিন্তু সে দৃষ্টির মানে খুঁজে পাওয়া শক্ত। মনে হত যেন ওর চোখের কালো মণিটা ছোট হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

'তোমার বিদ্যা জমিয়ে রেখে দাও, একদিন কাজে আসবে দেখো। বড়ো হলে সন্ন্যাসীও হতে পারো। মিষ্টি কথায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। নইলে মিলিওনারিও হতে পারো।'

'মিলিওনারি নয় মিশনারি,' শুধরে দিল পাথর-মিস্ত্রি। কেন যেন ওর গলার স্বর একটু আহত মনে হল।

'অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল অসিপ।

'তুমি ঠিকই জানো মিশনারিই বলে ওদেরকে। কালা তো নও...'

'তাই হল, মিশনারি — নাস্তিকদের বোঝাবার জন্যে। নয়ত নাস্তিকদের দলেই ভিড়ে পড়তে পারো। তাতেও দু-পয়সা আছে। মাথা খাটাতে পারলে নাস্তিকতার ভিতর দিয়েও বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিতে পারবে...'

একটু অস্বস্তির হাসি হেসে উঠল গ্রিগোরি আর দাড়ির ভিতর দিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল পিওতর:

'ডান বা নাস্তিকেরাও খুব একটা খারাপ ভাবে থাকে না...'

বাধা দিয়ে বলে উঠল অসিপ:

'ডানরা পণ্ডিত নয় — ওদের বইপড়া বিদ্যের দরকার হয় না...'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল:

'তাহলে শোনো: আমাদের অঞ্চলে একটা লোক ছিল। তার কেউ কোথাও ছিল না। তুশ্‌নিকভ ছিল তার নাম। নিতান্ত অপদার্থ গোছের লোক। পাখির পালকের মতো হাওয়ায় যখন যেদিকে উড়িয়ে নিয়ে যেত সেদিকেই যেত। না মজুর না বাউণ্ডুলে। তারপর কিছু আর করতে না পেরে একদিন চলে গেল তীর্থ যাত্রায়। বছর দুই কোনো পাত্তা নেই। হঠাৎ একদিন এসে হাজির। পরনে অন্য ধরনের পোশাক। কাঁধ পর্যন্ত বড়ো বড়ো চুল। মাথায় পুরুতের গোল টুপি। গায়ে সুতির জীর্ণ আলখাল্লা। লোকের চোখের দিকে কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠত, 'অনুতাপ কর্, অভিশপ্ত পাপী!' অনুতাপ করা ঠেকাবে এমন সাধ্যি কার — বিশেষ করে মেয়েদের? চমৎকার ব্যবসায় ফেঁদে বসল। তুশনিকভের না রইল খাওয়ার ভাবনা, না মদের। না মেয়েমানুষের, যত চাও...'

'খাবার আর মদ নিয়ে কী হবে?' বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল পাথর-মিস্ত্রি।

'তাহলে কিসে হবে?'

'বাণীতে, এই হল আসল কথা!'

'বাণীতে আমার কাজ নেই, নিজেই এত বাণী জানি যে তা দিয়ে কী করব ভেবে পাই না।'

'দিমিত্রি ভাসিলিয়েভিচ তুশ্‌নিকভকে চিনি আমরা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল

পিণ্ডতর। আর চোখ নামিয়ে গ্রিগোরি নীরবে তার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তর্ক করতে আসি নি আমি,' আপোসের সুরে বলল অসিপ, 'শুধু মাক্সিমিচকে দেখাচ্ছিলাম যে রুজিরোজগারের অনেক পথ আছে...'

'কোনো কোনো পথ আবার জেলের দরজায়ও পৌঁছে দেয়...'

'সেই পথই বেশি,' সায় দিল অসিপ, 'খুব কম পথই আছে যাতে পুরুতগিরি পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। তাতে জানতে হয় ঠিক কখন সরে পড়তে হবে...'

রাজমিস্ত্রি, পাথর-মিস্ত্রি এদের মতো ধার্মিকদের সম্পর্কে ও সব সময়েই একটু বিদ্রূপ করে কথা বলত। হয়ত ওদের তেমন পছন্দ করত না। কিন্তু সে ভাব ও লুকিয়ে চলত সযত্নে। এক কথায় মানুষ সম্পর্কে ওর মনোভাবটা বোঝা দুষ্কর।

ইয়েফিমুশকার উপরে ও ছিল ঢের বেশি সদয়। ঢের বেশি ভদ্র ব্যবহার করত ওর সঙ্গে। ভগবান, ন্যায়-বিচার, ধর্ম-সম্প্রদায়, আর জীবনের দুঃখ-শোক প্রভৃতি যে সব বিষয় ওর সহকর্মীদের কাছে একান্ত মুখরোচক, সে সব আলোচনায় ছাদ-পিটুনে কখনো যোগ দিত না। চেয়ারটা পাশকে করে নিত যাতে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে ওর কুঁজের ঘসা না লাগে। তারপর এমনি করে বসে চুপচাপ গ্লাসের পর গ্লাস চা খেয়ে যেত ইয়েফিমুশকা। কিন্তু এক এক সময়ে হঠাৎ ও সচকিত হয়ে উঠত। ধোঁয়াভরা ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকাতে শুরু করত, গণ্ডগোলের ভিতরে কী যেন শুনত কান পেতে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেত। তার মানে ইয়েফিমুশকার ডজনখানেক পাওনাদারের কেউ একজন এসে ঢুকেছে চাখানায়। পাওনাদারদের কারো কারো ঝোঁক ছিল পিটুনি দিয়ে পাওনা শোধ নেয়া, সুতরাং ছাদ-পিটুনেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হত।

'কেন যে ওরা এমন ভাবে লাঠি হাঁকায় আশ্চর্য,' অবাক হয়ে বলত ইয়েফিমুশকা, 'টাকা থাকলে তো শোধ দিয়েই দিতাম!'

'ছো, জড়পিণ্ড কোথাকার!' পেছন থেকে নাক সিটকে বলে উঠত অসিপ।

কখনো কখনো ইয়েফিমুশকা চিন্তায় ডুবে যেত। তখন আর কোনো কিছুই ওর নজরে পড়ত না, কিছুই শুনত না। শুকনো হাড্ডিসার মুখখানা নরম হয়ে আসত। চোখের কোমল দৃষ্টি হয়ে উঠত আরো কোমল।

ওরা জিজ্ঞেস করত, 'কী ভাবছ দোস্ত?'

'ভাবছি, যদি ধনী হতাম তবে একটি খাঁটি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করতাম — অভিজাত মহিলা, মাইরি বলছি — যেমন ধর্ কোন কর্ণেলের মেয়ে। আর কী ভালোই না বাসতাম তাকে! মাইরি, ওর রূপে পুড়ে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেতাম... ব্যাপারটা শোন বলি, একবার এক কর্ণেলের বাগান বাড়ির নতুন ছাদ বানাচ্ছিলাম...'

'তার একটা বিধবা মেয়ে ছিল তো। শুনেছি আমরা সে গপ্প!' বাধা দিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল পিওতর।

কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে হাত দিয়ে হাঁটু ঘসতে ঘসতে আর দুলে দুলে কুঁজ দিয়ে হাওয়া কেটে বলে চলল ইয়েফিমুশকা:

'সে আসত বাগানে। সাদা ধবধবে উড়ু-উড়ু পোশাক। ছাদের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম: ওকে ছাড়া এই সূর্য, এই পৃথিবী, এসবের মানে কী? যদি একবার ঘুঘুর মতো উড়ে গিয়ে ওর পায়ের উপরে বসে থাকতে পেতাম! ফোটা ফুলের মতো মেয়েটি — মাখনের বাটিতে ফোটা একটি মধুর নীল ফুল। হায় রে ভাই, অমনি একটি ভদ্র বাড়ির মেয়ে পেলে গোটা জীবনটাই যা হত না, যেন একখানা অফুরন্ত বাসর রাত!'

'কিন্তু খাবার জোটাতে কেমন করে?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল পিওতর। কিন্তু তাতেও এতটুকু বিচলিত হল না ইয়েফিমুশকা। বলল:

'হা ভগবান! কতোই বা খেতাম আমরা। তাছাড়া মেয়েটি যে খুবই বড়লোক!'

হেসে উঠল অসিপ।

'ওরে সর্বনাশা ইয়েফিমুশকা! এই করেই তুই দুদিনে শেষ হয়ে যাবি একেবারে, দেখে নিস।'

ইয়েফিমুশকার মুখে মেয়েমানুষের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ছিল না। তা ছাড়া মজুর হিসেবেও ওকে তেমন ভরসা করা যেত না। এক এক সময়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করত আর করতও ভালো ভাবে। কিন্তু এক এক সময়ে আবার ওর কাজে কোনো বাঁধুনি থাকত না। যেমন তেমন করে অস্থির ভাবে ওর কাঠের মুগুর পেটিয়ে চলত, সব জায়গা সমান হত না। সব সময়েই ওর গা থেকে গন্ধ-তেলের গন্ধ ভুর ভুর করত। তাছাড়া ওর নিজের গায়েরও একটা গন্ধ ছিল — টাটকা কাটা গাছের গন্ধের মতোই সে গন্ধ স্নিগ্ধ, মনোরম।

ছুতোরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা যে কোনো বিষয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক

হত, কিন্তু তেমন আনন্দদায়ক নয়। ওর কথাবার্তা সব সময়েই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। তাছাড়া কোন্‌টা ঠাট্টা করে বলছে, কোন্‌টা সত্যি সত্যি বলছে সেটা বুঝে ওঠা মুশকিল ছিল।

গ্রিগোরির সবচাইতে প্রিয় আলোচনার বিষয় ছিল ভগবান। তাঁর প্রতি ওর অগাধ ভালবাসা আর অচল বিশ্বাস।

একদিন ওকে বললাম, 'গ্রিগোরি, জানো, এমন অনেক লোক আছে যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না?'

একটুখানি হেসে উঠল গ্রিগোরি:

'সে আবার কী?'

'তারা বলে ভগবান বলে কেউ নেই।'

'ও, হ্যাঁ, তা জানি আমি।'

তারপর, যেন একটা অদৃশ্য মাছিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে একবার হাত নেড়ে বলতে লাগল:

'মনে আছে তো, রাজা ডেভিড কী বলেছিলেন, 'মূর্খেরা বলে তাদের অন্তরে ভগবান নেই।' দেখলে তো কত যুগ আগে এই সব মূর্খদের সম্পর্কে রায় দেয়া হয়ে গেছে। ভগবানকে বাদ দিয়ে কেউ চলতে পারে না...'

যেন ওর কথাতেই সায় দিচ্ছে এমনি ভাবে বলে উঠল অসিপ:

'ভগবানের প্রতি পিওতরের বিশ্বাস ভাঙ্গাবার চেষ্টা করো না বাপু, মজাটা দেখিয়ে দেবে'খন তোমাকে!'

শিশলিনের সুন্দর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। গাঁথনির মশলা জমা নখ-শুদ্ধ আঙুলগুলো ঘন দাড়ির ভিতরে ডুবিয়ে রহস্যভরা কণ্ঠে সে বলল:

'সমস্ত দেহেই ভগবানের বাস। বিবেক আর অন্তরের ঐশ্বর্য তাঁরই দান!'

'আর পাপ?'

'পাপের উৎপত্তি দেহ থেকে, শয়তান থেকে। পাপ হচ্ছে বাইরের জিনিস, বসন্তের মতো। তার বেশি কিছু নয়। যে বেশি পাপের কথা চিন্তা করে সেই বেশি পাপ করে। তোমার মন যদি পাপ-চিন্তা বর্জন করে তবে তুমি আর পাপও করবে না। দেহের মনিব শয়তানই হল পাপ-চিন্তার জন্মদাতা।'

'উঁহুঁ, আমার কেন জানি মনে হয় কথাটা ঠিক তা নয়...' সন্দেহের সুরে বলল পাথর-মিস্ত্রি।

'কথাটা ঠিকই তাই। ভগবান হলেন নিষ্পাপ। আর মানুষ হল তাঁর সমসত্তা, তাঁর প্রতিমূর্তি। পাপ করে প্রতিমূর্তিটা—সেটা দেহ। কিন্তু সমসত্তাটা পাপ করতে পারে না। সমসত্তা হল আত্মা...'

জয়ের হাসিতে ওর মুখখানা উদ্ভাসিত। কিন্তু পিওতর বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'আমার মনে হয় কথাটা ঠিক হল না...'

অসিপ পাথর-মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তোমার মত হল—পাপ বলে যদি কিছু না-ই থাকে তবে অনুতাপও নেই? আবার যদি অনুতাপ না থাকে তবে মুক্তি বলেও কিছু নেই?'

'ঠিক কথা। সেই যে বুড়োরা বলে না, চোখের আড়ে শয়তান, মনের আড়ে ভগবান...'

শিশলিন বিশেষ তেমন মদ খেত না বলে দু-ঢোঁকেই মাতাল হয়ে পড়ত। মুখখানা গোলাপী হয়ে উঠত, চোখ দুটো হয়ে উঠত শিশুর মতো আর গলার স্বর সুরেলা।

'সত্যি, ভাইসব, কী চমৎকার জীবন আমাদের—এই একটুখানি কাজ, উপবাসের ভয় নেই, হে প্রভু, তোমার গুণ গাই! কী চমৎকার জীবন আমাদের!'

কেঁদে ফেলত শিশলিন। দু-গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে ওর রেশমী দাড়ির উপরে ঝরে পড়ে মুক্তোর দানার মতো চক্ চক্ করত।

এইসব চোখের জল দেখলে আমার বিরক্তি ধরে যেত। আরো অসহ্য লাগত এই কারণে যে ও সব সময় এমনি করেই জীবনের স্তুতি গেয়ে চলেছে। দিদিমার স্তুতি গাওয়াটা এর চাইতে ঢের বেশি বোধগম্য, আরো বেশি সহজ, আর তাতে অনেক কম ভাবালুতা।

এসব আলোচনায় কেমন জানি সারাক্ষণ একটা উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কাটত। দেখা দিত অস্পষ্ট ভয়। চাষীদের কথা অনেক গল্পেই পড়েছি। বইয়ের চাষী আর জীবন্ত চাষীর জীবনের ভিতরে যে আশ্চর্য রকমের প্রভেদ রয়েছে তা আমি জানি। বইয়ের সমস্ত চাষীরাই হতভাগ্য জীব। ভালো মন্দ সব বইয়ের সমস্ত চাষীর মধ্যেই সমৃদ্ধ চিন্তা আর ভাষার অভাব। অথচ এইটেই হল সজীব চাষীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। বইয়ের চাষীরা ভগবান, ধর্ম-সম্প্রদায়, গির্জা—এসব সম্পর্কে কথা বলে কম। তার চাইতে বেশি বলে তাদের উপরওয়ালা, জমি, জীবনের অন্যায়-অবিচার

আর কঠোরতার কথা। মেয়েমানুষ সম্পর্কেও তারা কথা বলে কম, তাদের মনোভাব কম স্থূল, বেশি সহানুভূতিশীল। কিন্তু প্রকৃত চাষীর কাছে মেয়েমানুষ হচ্ছে চিত্তবিনোদনের উপকরণ। অবশ্য খুবই সাংঘাতিক ধরনের চিত্তবিনোদনের উপকরণ। ওদের সম্পর্কে চতুরতার আশ্রয় নিতে হয়। নইলে নারীরা ওদের পরাভূত করে ওদের জীবন ধ্বংস করে দেবে। বইয়ের চাষীরা ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে, কিন্তু এইখানটায় তারা সকলেই খুব খাঁটি। তার সবকিছুই সোজা সোজা। কিন্তু সত্যিকারের চাষী ভালোও নয়, খারাপও নয়, শুধু বিরাট জটিলতায় ভরা। সত্যিকারের চাষী যতোই বাচাল হোক না কেন, সব সময়েই মনে হবে যে কী যেন একটা অব্যক্ত রয়ে গেল ওর নিজের সম্পর্কে। তা শুধু সেই জানে। আর সম্ভবত এই যেটা অব্যক্ত রয়ে গেল সেটাই হচ্ছে ওর সত্তার মূলকথা।

বইয়ের চাষীদের ভিতরে 'ছুতোর সমাজ' বইয়ের পিওতরকে আমার ভালো লাগত সবচাইতে বেশি। বন্ধুদেরও পড়ে শোনাবার ইচ্ছে হল। তাই বইটা নিয়ে চলে এলাম মেলার মাঠে। প্রায়ই আমি কোনো না কোনো মজুরের আস্তানায় রাত কাটাতাম। শহরে ফেরার ইচ্ছে হত না কারণ বৃষ্টি পড়ত এবং প্রায়ই দিনের কাজের পরে এত বেশি শ্রান্ত হয়ে পড়তাম যে এতোটা পথ ভেঙ্গে আর বাড়ি ফেরার ক্ষমতা থাকত না।

ওদের যখন বললাম ছুতোরদের সম্পর্কে একখানা বই আছে আমার কাছে, সবাই দারুণ উৎসুক হয়ে উঠল। বিশেষ করে অসিপ। আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সন্দিগ্ধ ভাবে ওর সন্ন্যাসী-সুলভ মাথাটা দোলাতে লাগল।

'মনে হচ্ছে যেন আমাদের কথাই লিখেছে! ভাবো দেখি একবার! কে লিখেছে, ভদ্দরলোকদের কেউ? হুঁ, ঠিকই ভেবেছিলাম! ভদ্দরলোক আর রাজকর্মচারীরা কোনো কিছুতেই পিছপা নয়। ভগবান নিজেও যেটা বাদ দিয়ে রেখেছেন রাজকর্মচারীরা সেটাও এনে ঢোকাবে তবে ছাড়বে। এইজন্যেই তো আছে ওরা।'

'ভগবান সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলছ না কিন্তু,' বলল পিওতর।

'তাতে কী। আমার টাকের উপরে বরফের গুঁড়ো পড়াও যা ভগবানের কাছে আমার কথাও তাই। ভাবনা নেই, তুমি আমি, কেউই আমরা ভগবানের কাছ পর্যন্ত পেঁছচ্ছি না।'

হঠাৎ চটে গিয়ে যা কিছু ও ঘৃণা করে তারই বিরুদ্ধে চকমকির গা থেকে

ঝরে-পড়া আগুনের ফুলকির মতো ঝাঁঝালো কথার তুবড়ি ছোটাতে শুরু করে দিল। দিনের মধ্যে বহুবার এসে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল:

'কিছু পড়ে শোনাবে আমাদের, মাক্সিমিচ? ভালো, খুব ভালো কিছু। মাথা খেটে ওটা বানিয়েছে মন্দ নয়।'

কাজের শেষে রাত্রের খাবার খেতে ফিরে এলাম আস্তানায়। খাওয়ার পরে পিওতর ওর একজন মজুর আর্দালিয়নকে নিয়ে এসে হাজির হল। আর শিশলিন নিয়ে এল অল্প-বয়সী একটি ছোকরাকে। নাম তার ফোমা। ছাউনির ভিতরে যেখানে মজুরেরা ঘুমত সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। আমি পড়তে শুরু করলাম। ওরা শুনতে লাগল। কারুর মুখে একটিও কথা নেই, কেউ নড়াচড়াটি পর্যন্ত করছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আর্দালিয়ন বলে উঠল:

'খুব হয়েছে, যাক!'

সে বেরিয়ে গেল। সবার আগে ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগোরি মুখ হাঁ করে অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে। ছুতোররাও অনতিবিলম্বে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। কিন্তু পিওতর, অসিপ আর ফোমা আমাকে ঘিরে আরো ঘন হয়ে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

আমার পড়া শেষ হতেই অসিপ তক্ষুণি আলো নিভিয়ে দিল। তারার দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল তখন প্রায় দুপুর রাত।

অন্ধকারের ভিতর থেকে পিওতর জিজ্ঞেস করল:

'এসব বইয়ের মানে কী? কার বিরুদ্ধে লিখছে?'

'ঘুমোবার সময় হয়েছে,' জুতো খুলতে খুলতে বলল অসিপ।

ফোমা নীরবে একপাশে সরে গেল।

'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি—কার বিরুদ্ধে এটা লেখা?' নাছোড়বান্দা হয়ে পিওতর তার কথার পুনরাবৃত্তি করল।

'ওরাই জানে,' মাচার উপরে নিজের বিছানা করতে করতে জবাব দিল অসিপ।

'যদি সৎমাদের বিরুদ্ধে লেখা হয়ে থাকে তবে তার কোনো মানে নেই। এসব বই থেকে কিছু আর সৎমাদের চরিত্র সংশোধন হবে না,' বলল পাথর-মিস্ত্রি, 'আর যদি এটা পিওতরের বিরুদ্ধে লেখা হয়ে থাকে তবে তারও কোনো মানে হয় না। কপালে যাই থাক ওকে তা মাথা পেতে নিতেই হবে। একবার খুন করলে, যেতেই হবে সাইবেরিয়ায়। ন্যায় কথাই বটে।

এরকম মামলায় এ বই দিয়ে কী সাহায্য হবে... কিছুই সাহায্য হতে পারে না, পারে কি?'

অসিপ কোনো জবাব দিল না। সুতরাং পাথর-মিস্ত্রি এই বলে শেষ করল:

'লেখকদের তো আর কাজকর্ম কিছু নেই, তাই ওরা আসে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে। এক দল মেয়েছেলে এক জায়গায় হলে যেমন হয়। আচ্ছা চললাম, ঘুমোবার সময় হয়েছে...'

এক মুহূর্ত দোরের সামনে চাঁদের নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে দাঁড়িয়ে থেকে অসিপকে ডেকে জিজ্ঞেস করল:

'কী বলো অসিপ, তোমার কী মনে হয়?'

'অ্যাঁ?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল অসিপ।

'ও, আচ্ছা, ঘুমোও...'

শিশলিন যেখানে বসেছিল সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোমা এসে শুল আমার পাশে দলামোচড়া খড়ের উপরে। সমস্ত এলাকা ঘুমন্ত। দূর থেকে ভেসে আসছে রেলের বাঁশী, লোহার ভারি চাকার ঘর্ঘর শব্দ আর বাফারের ঝমঝমানি। নানান সুরের নাক ডাকার শব্দে ভরে গেছে ছাউনি। মনটা দমে গেল: আশা করেছিলাম খানিকটা আলোচনা হবে। কিন্তু কিছুই হল না...

হঠাৎ অসিপ শান্ত স্পষ্ট গলায় বলে উঠল:

'ওসব কোনো কথা বিশ্বাস করো না হে, বুঝলে! এখনো তোমাদের বয়েস অল্প, সামনে ঢের দিন পড়ে রয়েছে। নিজের ধারণাগুলো জমিয়ে রাখো। নিজের একটা চিন্তা অন্যের কাছ থেকে ধার করা দুটো চিন্তার চাইতে বেশি দামী। ঘুমিয়েছ ফোমা?'

'না,' উৎসুক কণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

'তোমরা দুজনেই পড়তে জানো। পড়ে যাও। কিন্তু খুব বেশি গুরুত্ব দিও না। ওরা যা খুশি ছেপে বের করে, ছাপার ক্ষমতা রয়েছে কিনা!'

মাচার বাইরে পা ঝুলিয়ে দিয়ে দুহাতে কিনারা ধরে আমাদের দিকে ঝুঁকে বলতে লাগল:

'বই—বইটা আসলে কী? বই হচ্ছে সংবাদদাতা মাত্র। যেন বলছে: দেখো, এই একটা সাধারণ লোক—এ ছুতোর, কিংবা এমনি কোনো

কেউ। তারপর দেখো, ভদ্দরলোকেরা কেমন, যেন ওরা অন্য সবার থেকে আলাদা। উদ্দেশ্য ছাড়া বই লেখা হয় না। লেখা হয়ে থাকে কাউকে না কাউকে রক্ষা করার জন্যে।'

'পিওতর ঠিকাদারটাকে খুন করে ঠিক কাজই করেছিল!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফোমা।

'তা কেন? মানুষ খুন কখনোই ভালো কাজ নয়। আমি জানি তুমি গ্রিগোরিকে পছন্দ করো না। কিন্তু ওসব চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। আমরা কেউই বড়ো লোক নই। আজ আমি মনিব, কাল আবার হয়ত মামুলি মজুর...'

'আমি তোমার কথা বলছি না, অসিপ খুড়ো...'

'ও একই কথা...'

'তুমি ন্যায়নিষ্ঠ লোক।'

'দাঁড়াও, বলছি আমি বইটা কী নিয়ে লেখা,' ফোমার আপত্তিভরা কথায় বাধা দিয়ে বলল অসিপ, 'বইটা খুব চালাকী করে লেখা। এই দ্যাখো না, একজন জমিদার আছে, কিন্তু তার কোনো চাষী নেই, আবার চাষী আছে তাদের জমিদার নেই। ফলে দেখো না, জমিদারের অবস্থা শোচনীয় আর চাষীর অবস্থাও সুবিধের নয়। জমিদার হয়ে পড়ছে নিরেট দুর্বল, আর চাষী হয়ে উঠছে মাতাল আত্মম্ভরী, মনে তার দারুণ রাগ আর বিক্ষোভ। এটাই হল গল্পটার বিষয়বস্তু। মানে, দেখাতে চেষ্টা করছে এর চাইতে গোলাম হয়ে থাকা ঢের ভালো: জমিদার লুকোচ্ছে চাষীর আড়ালে, চাষী জমিদারের আড়ালে—দুজনে দুজনকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। না, না, গোলামীর অবস্থায় যে জীবন ঢের বেশি সহজ ছিল তা অস্বীকার করছি না। গরীব চাষী নিয়ে জমিদারের তেমন কোনো সুবিধে নেই। তারা চায় চাষীরা ভালো থাক দাক, কিন্তু মাথায় যেন মগজ না থাকে। আমি নিজে যা জানি তাই বলছি। চল্লিশ বছর আমি জমিদারের গোলামী করে এসেছি তো। পিঠের খাল খিঁচে অনেক জ্ঞান ঢুকেছে আমার গায়ে।'

আমার মনে পড়ল গাড়োয়ান পিওতরের কথা, যে নাকি তার গলা কেটেছিল। সেও ভদ্রলোকদের সম্পর্কে এমনি কথাই বলেছিল। কিন্তু অসিপের চিন্তাধারাও সেই হিংস্র বুড়োটার চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যাবে, এটা আমার আদৌ ভালো লাগল না।

আমার হাঁটুর উপরে হাত রেখে বলে চলল অসিপ:

'নিশ্চয়ই তোমরা এই বইটার বা অন্যান্য সব লেখার মানে বুঝতে পারবে। খামকা কেউ কিছু করে না। শুধু ভান করে। বই লেখারও একটা মতলব আছেই। সেটা হল তোমার মগজটি ঘুলিয়ে দেয়া। কাঠ ফাড়া, জুতা-সেলাই সবকিছুতেই মগজ চাই।'

বলেই চলেছে অসিপ। কখনো চিত হয়ে শুয়ে, কখনো লাফিয়ে উঠে বসে নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুকে আস্তে আস্তে তার জড়তাবিহীন কণ্ঠের কথাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে:

'কথায় বলে: চাষী আর জমিদারের মধ্যে ঢের তফাৎ। কথাটা সত্যি নয়। আমরা দুই-ই এক। শুধু সে একটু উপরে এই যা। একথা ঠিক যে, জমিদার শেখে বই পড়ে আর আমি শিখি ঘা খেয়ে। শুধু ওর পিছন দিকটা একটু বেশি সাদা, তাছাড়া মোটেই বেশি ঝকঝকে নয়। না হে তা নয়, বুঝলে ছোকরারা, সময় এসেছে দুনিয়ায় নতুন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার। ওসব বইপত্তর ছুঁড়ে ফেলে দাও, দূর করে দাও। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো দেখি: কে আমি? মানুষ। আর জমিদার কে? সেও মানুষ। তবে প্রভেদ কোথায়? ভগবান কি ওর কাছে পাঁচ পয়সা বেশি চাইবেন? না হে না, যখন দেনা-পাওনার সময় আসবে তখন সবাই আমরা ভগবানের চক্ষে সমান...'

অবশেষে ভোরের দিকে দিনের আলোয় আকাশের তারা নিভে গেল। অসিপ বলল আমাকে:

'কেমন, কথা বলতে পারি না? অনেক কথা বললাম আজ রাত্রে। জীবনে কোনো দিনও এসব চিন্তা করি নি। আমার কথা কিছু আর সত্যি বলে নিও না, বুঝলে? ওসব বলব বলেই যে বলেছি তা নয়, বলেছি ঘুম আসছিল না বলে। মানুষ যখন ঘুমোতে পারে না, চোখ মেলে পড়ে থাকে, তখন মজা করার জন্যে এমনি অনেক কিছু বানিয়ে বলে: যেমন এক সময়ে একটা কাক ছিল, সে মাঠ থেকে পাহাড়ে, এক গোলা বাড়ি থেকে আর এক গোলা বাড়ি উড়ে উড়ে জীবন কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন রোগে পড়ল, মরে গেল। পচল, শুকিয়ে গেল। এ গল্পের মানে কী? কোনোই মানে নেই। আচ্ছা, এসো এবার ঘুমনো যাক। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আবার...'

সেই ফায়ারম্যান ইয়াকভের মতো অসিপও আমার চোখে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে অন্য সবার মূর্তি আচ্ছন্ন করে দাঁড়াল আমার চোখের সামনে। অনেকখানি মিল আছে ওর ইয়াকভের সঙ্গে। সেই সঙ্গে দাদু, শাস্ত্রবাগীশ পিওতর ভাসিলিয়েভিচ আর বাবুর্চি স্মুরির কথাও মনে পড়ে যায় ওকে দেখে। এদের কথা গভীর ভাবে আমার স্মৃতিফলকে আঁকা। তাদের সকলের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে অসিপ তারই পাশে ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে যে ছাপ ফেলত সেটা পিতলের বুকে এসিডের মতোই সুগভীর। একথা স্পষ্ট যে ওর চিন্তার ধারা ছিল দু-রকমের: দিনের বেলা কাজের সময়ে সহজ, ত্বরিৎ চিন্তার ধারা আর রাতের বেলা যখন সে ঘুমোতে পারত না, কিংবা সন্ধ্যায় যখন হাঁটতে হাঁটতে শহরে যেত তার কুটুম পিঠে-পসারিনী মেয়েমানুষটির কাছে তখনকার চিন্তা — এর মধ্যে প্রথমটা ছিল ঢের বেশি বাস্তব, ঢের বেশি বোধগম্য। ওর রাতের চিন্তাধারা ছিল বিশেষ এক ধরনের। লণ্ঠনের আলোর মতো চতুর্দিক থেকেই উজ্জ্বল আলোয় তা ঝলমল করত। কিন্তু কোনটা যে ঠিক দিক বা কোনটা ও পছন্দ করে সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না।

মনে হত যত লোকের সংস্পর্শে এযাবৎ এসেছি, প্রত্যেকের চাইতেও ও ঢের বেশি বুদ্ধিমান। তাই যেমন করে ফায়ারম্যান ইয়াকভের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতাম, লোকটাকে ভালো ভাবে জানবার জন্যে, বোঝবার জন্যে, তেমনি অধীর আগ্রহেই ওর পিছনেও ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু ও এঁকে-বেঁকে পিছলে বেরিয়ে যেত আমার হাত ফসকে, ওর ভিতরের প্রকৃত সত্য দিক যেটা সেটা কোথায়? ওর কোন দিকটাকে প্রকৃত বলে ধরে নেব?

মনে পড়ল একদিন অসিপ বলেছিল আমাকে:

'মাথা খাটিয়ে খুঁজে বের করো আমি কী। লাগো, চেষ্টা করে দেখো!'

সেদিন আমার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছিল। ঘা লেগেছিল আরো কিছুতে যা অহঙ্কারের চাইতেও বেশি। ঐ বুড়ো মানুষটিকে বুঝে ওঠা আমার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল।

কারণ সমস্ত রহস্যময়তা সত্ত্বেও সে ছিল স্থির প্রকৃতির মানুষ। মনে হত, আরো একশ' বছরও বেঁচে থাকলেও সে যেমনটি আছে তেমনটি থাকবে—এই অদ্ভুত পরিবর্তনশীল মানুষগুলোর ভিতরে অপরিবর্তিত।

শাস্ত্রবাগীশও এমনিই এক পরিবর্তনহীন স্থিতিশীলতার কথাই জাগিয়ে তুলত আমার মনে। কিন্তু ওর মধ্যে সেটা একান্ত বিরক্তিকর মনে হত আমার কাছে। কিন্তু অসিপের স্থিতিশীলতার ধরনই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, ঢের বেশি বাঞ্ছনীয়।

প্রতি মুহূর্তেই এই মানবিক অস্থির ভাব অনুভব করতে হয়েছে আমাকে। মানুষ হঠাৎ এক জায়গা থেকে এক অপ্রত্যাশিত জায়গায় কেমন করে চলে যায় ভেবে পেতাম না। তাদের এই দুর্বোধ্য পরিবর্তনশীলতার কথা ভেবে ইতিমধ্যে বেশ হয়রান হয়ে উঠেছিলাম। তাতে মানুষ সম্পর্কে আমার জীবন্ত আগ্রহ ধীরে ধীরে কেমন ম্লান হয়ে আসছিল, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা আসছিল বিমূঢ় হয়ে।

একদিন জুলাইয়ের প্রথম দিকে আমরা যেখানে কাজ করছিলাম সেখানে এসে দাঁড়াল একখানা ঝরঝরে ছ্যাকরা গাড়ি। কোচ-বাক্সে এক মাতাল কোচোয়ান, মাথায় টুপি নেই। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। গুম হয়ে বসে ঘন দাড়ির ফাঁকে হেঁচকি তুলছে। পিছনের আসনে একটি মোটা মেয়ে ঢুলে ঢুলে পড়া মাতাল শিশলিনকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। মেয়েটার গাল দুটো লাল। মাথায় কাচের চেরি আর লাল ফিতের ঝালর দেয়া স্ট্র-এর টুপি। খালি পায়েই গালোশ পরা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলছে মেয়েটি। একহাতে দুলছে ছোট একটা ছাতা। হাসছে আর চিৎকার করে বলছে:

'এই শয়তানেরা! মেলা তো ভেঙ্গে গেছে, মেলা নেই! আর ওরা কিনা আমাকে টেনে এনেছে মেলা দেখাতে!'

উস্কখুস্ক চেহারা গ্রিগোরি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ির ভিতর থেকে। মাটির উপরে বসল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে ঘোষণা করল:

'এই আমি হাঁটু গেড়ে বসছি — অনেক পাপ করেছি আমি! সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখলাম তারপর পাপ করলাম। দেখো একবার! ইয়েফিমুশকা বলে, 'গ্রিগোরি, গ্রিগোরি,' সে বলে... ও যা বলে সে কথা ঠিক, কিন্তু মাপ করো আমাকে। আমি তোমাদের সবাইকে খাওয়াব। ও যা বলে সে কথা ঠিক: আমরা শুধু একবারই বাঁচি... একবারের বেশি আমরা বাঁচতে পারি না...'

মেয়েটা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। আর গালোশ খুলে গিয়ে লাফাচ্ছিল থপ্ থপ্ করে। কোচোয়ান চেঁচাতে শুরু করে দিল:

'চলো, যাই আমরা! চলে এসো — ঘোড়া ধরে রাখতে পারছি না কিন্তু!'

একটা বুড়ো বেতো ঘোড়া। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। মনে হয় যেন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানেই ওর শেকড় গজিয়েছে। সমস্ত দৃশ্যটাই এমন একটা অদ্ভুত হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যে বর্ণনা করা যায় না।

গ্রিগোরির মজুরেরা তাদের মনিবের অবস্থা, তার অপূর্ব সুন্দরী মেয়েমানুষ আর কোচোয়ানকে দেখে হেসে লুটোপুটি।

হাসছিল না শুধু ফোমা। দোকানের দরজায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলছিল:

'শিকল ছিঁড়েছে, শুয়োর! দেশের বাড়িতে ওর বৌ রয়েছে—এমন সুন্দরী বৌ!'

কোচোয়ান ওদের যাবার জন্যে বার বার তাড়া দিতে লাগল। অবশেষে মেয়েটি নেমে এসে গ্রিগোরিকে টেনে তুলে নিল গাড়ির ভিতরে। ও শুয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ের কাছে। ছাতা নাড়াতে নাড়াতে মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'চললাম আমরা!'

ফোমার এক ধমকে সবাই যে যার কাজে লেগে গেল। গ্রিগোরিকে এমন ভাবে নিজেকে খেলো করতে দেখে বুঝিবা মনে মনে দারুণ আহত হয়েছিল ফোমা। মজুরেরা তাদের মনিবকে নিয়ে নিজেদের ভিতরে কিছুটা সরস আলোচনা করে নিল বটে কিন্তু মনে হল যেন একটু হিংসাও অনুভব করছিল।

'নিজেকে আবার মনিব বলে জাহির করে! একটা মাসও বাকি নেই, কাজ শেষ করে সবাই গাঁয়ে ফিরে যাব, এ কটা দিনও সবুর সইল না ওর...' গজ গজ করে বলতে লাগল ফোমা।

আমিও দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম গ্রিগোরির উপরে। মেয়েটাকে ওর পাশে অত্যন্ত বেমানান লাগছিল।

প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতাম, গ্রিগোরি শিশলিন কেন মনিব হল আর ফোমা শুধু মামুলি মজুর?

ফোমার দেহ সবল সুদৃঢ়, চেহারা সুন্দর, কোঁকড়া চুল, সরু টিকলো নাক, বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ, গোল মুখ। আদৌ ওকে চাষীর ঘরের ছেলে বলে মনে হত না। ভালো পোশাক পরিচ্ছদ যদি পরতে পেত, যে কোনো সদ্বংশীয় ব্যবসায়ীর ছেলে বলে চলে যেতে পারত। ও কেমন যেন মনমরা,

স্বল্পবাক, মামুলি। লেখাপড়া জানত বলে ও ঠিকেদারের হিসেবপত্র রাখত, আনুমানিক খরচের হিসেব তৈরী করত। ও তার সাথীদের দিয়ে কাজ করাতে পারত যদিও কাজ সম্পর্কে ওর নিজের তেমন ভালোবাসা চোখে পড়ত না।

'এক জীবনে কেউ সবকিছু করে উঠতে পারে না,' শান্ত কণ্ঠে বলত ফোমা। বই সম্পর্কে ও ছিল বিরূপ: 'ছাপা তো সবই হতে পারে। চাও তো এখানে বসেই আমিও একটা গল্প বানিয়ে দিচ্ছি, ও সবকিছু শক্ত নয়...'

কিন্তু যা কিছু আলোচনা হত শুনত মন দিয়ে। আর যদি কোনো কিছুতে মন লাগত তবে তার সবকিছু পুংখানুপুংখ ভাবে জেনে নেবার জন্যে জেদ ধরত। তারপর নিজেই নিজের মাপকাঠি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করে নিত।

একদিন ফোমাকে বলেছিলাম ওর ঠিকেদার হওয়া উচিত। তাতে আলস্যের সঙ্গে বলেছিল:

'যদি শুরু থেকেই হাজার হাজার টাকা আসত তবে সেটা খারাপ হত না, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষে কুড়োবার জন্যে একগাদা মজুরের পিছনে লেগে থেকে ঝামেলা পোয়ানোর কোনো মানে আছে? না, এমনি করে কিছুদিন দেখব তারপর শেষে ওরাঙ্কার মঠে চলে যাব। আমার লম্বা চওড়া চেহারা, দেখতে ভালো। হয়ত কোনো ধনী সওদাগরের বিধবা প্রেমে পড়ে যেতে পারে। এমন অনেকই তো ঘটে। সেরগাচের একটা লোক দু-বছরের ভিতরে ওখান থেকে বেশ ভালো বিয়ে করে ফেলল। এক শহরের মেয়েকে। সে যখন ঘরে ঘরে আইকন নিয়ে যেত তখন মেয়েটার নজরে পড়েছিল...'

এই ছিল ওর পরিকল্পনা। কেমন করে কতো লোক প্রথমে মঠের শিক্ষানবীশ হয়ে পরে সচ্ছল জীবন যাপন করছে এ সম্পর্কে অনেক গল্প ওর শোনা ছিল। এসব গল্পে আমার বিতৃষ্ণা ছিল, ফোমার পরিকল্পনাতেও। কিন্তু একথা ঠিকই বুঝলাম যে ও নিশ্চয় একদিন মঠে ঢুকবে।

তবুও যখন মেলা বসল সবাই অবাক হয়ে দেখল ফোমা এক সরাইখানায় পরিবেশকের কাজ নিয়েছে। সঙ্গীরা তাতে সত্যি অবাক হল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু সবাই ওকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। রবিবার বা ছুটির দিনে যখন সবাই দল বেঁধে চা খেত, তখন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত আর বলত:

'চলো যাই, ফোমার ব্যবসা খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে আসি।'

সরাইখানায় গিয়েই কিন্তু খুব ভারিক্কি চালে ওরা ডাকত:

'ওহে, এই ওয়েটার — ওহে কোঁকড়া চুল! এদিকে আয়!'

মুখ উঁচু করে ফোমা এসে হাজির হত। তারপর জিজ্ঞেস করত:

'কী চাই?'

'পুরানো ইয়ার দোস্তদের চিনতে পারিস না নাকি?'

'আমার বড্ডো কাজ...'

ও বুঝতে পারত ওর সাথীরা ওকে তাচ্ছিল্য করছে, ওকে খেপাতে চাইছে। শান্ত সহনশীল দৃষ্টি মেলে ফোমা তাকিয়ে থাকত ওদের দিকে। ওর চোখ-মুখের ভাব জমে গিয়ে এমন একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠত যেন বলতে চায়:

'হাসাহাসি করতে চাস জলদি করে নে বাপু...'

'মনে হচ্ছে কিছু বকশিস চাই তোর,' বলত ওরা। তারপর খুব ঘটা করে মানিব্যাগ হাতড়াত। কিন্তু চলে যেত এক কোপেকও না দিয়ে।

ফোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর ইচ্ছে ছিল সাধু হবার। কিন্তু তা না হয়ে সরাইখানার ওয়েটার হল কেন?

'কোনো দিনই সাধু হবার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার,' প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা, 'তাছাড়া বেশি দিন ওয়েটারের কাজ করারও ইচ্ছে নেই।'

কিন্তু চার বছর পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ৎসারিৎসিনে। তখনো সে চাখানার ওয়েটার। তারপর একদিন খবরের কাগজে দেখলাম ফোমা তুচকভ ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

পাথর-মিস্ত্রি আর্দালিয়নের কাহিনী বিশেষ করে আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। পিওতরের দলের সবচাইতে পুরনো ও সেরা মিস্ত্রি আর্দালিয়ন। চল্লিশ বছর বয়সের কালো দাড়িওয়ালা এই চাষীটিকে দেখেও অবাক হয়ে ভাবতাম ও মনিব না হয়ে পিওতর কেন মনিব হল। খুব কদাচিৎ মদ খেত আর্দালিয়ন এবং কখনোই মাতাল হত না। কাজকর্মে হাত ছিল খুব আর কাজ করতও খুব আগ্রহ নিয়ে। ওর হাতে ইটগুলো যেন লাল পায়রার মতো উড়ে উড়ে যেত। ওর পাশে হাড়-জিরজিরে চিররুগ্ন পিওতরকে কেউ গণ্যই করত না। পিওতর বলতে ভালোবাসত:

'অন্যের জন্যে পাকা বাড়ি তৈরী করছি কেননা নিজের জন্যে কাঠের কফিন বানাতে হবে।'

ইঁট পাততে পাততে ফুর্তির উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠত আর্দালিয়ন:

'চলে এসো ভাই, ভগবানের নাম নিয়ে হাত লাগাও!'

তারপর সে ওদের কাছে বলত যে ওর ইচ্ছে সামনের বসন্তকালে তম্স্ক্ যাবে। সেখানে ওর ভগ্নীপতি একটা গির্জা তৈরির ঠিকে নিয়েছে, তাই ওকে ফোরম্যানের ভার দিয়েছে।

'সব ঠিক হয়ে গেছে। গির্জা তৈরি — ভারি পছন্দসই কাজ আমার!' বলল আর্দালিয়ন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো আমার সঙ্গে। যারা লেখাপড়া জানে সাইবেরিয়া তাদের পক্ষে খুব রোজগারের জায়গা। লেখাপড়া জানা লোকের দাম ওখানে খুব বেশি!'

আমি রাজী হয়ে গেলাম। দারুণ খুশি হয়ে আর্দালিয়ন বলে উঠল:

'বেশ বেশ! ঠিক করে বলো কিন্তু, ঠাট্টা নয়...'

গ্রিগোরি আর পিওতরের প্রতি ওর ব্যবহার ছিল সৌহার্দ্যভরা, স্নেহপরায়ণ, শিশুদের প্রতি বয়স্কের মতো। অসিপকে বলত:

'কেবল বড়াই! তাসের খেড়ুদের মতোই ওরা দুজন দুজনার কাছে নিজের নিজের বুদ্ধির জাঁক করে। এ বলছে: দেখ্ কী হাতটাই না পেয়েছি এবার! তো ও বলছে: কেমন রং পেয়েছি দেখ্ না!'

'কেন করবে না?' ধরা ছোঁয়া না দিয়ে জবাব দিল অসিপ, 'মানুষ মাত্রেই বড়াই করে। মেয়েরাও সবাই হাঁটে বুক উঁচিয়ে...'

'ভগবান হেন ভগবান তেনো — চব্বিশ ঘণ্টা এ কথা লেগেই আছে ওদের মুখে। ওদিকে টাকার পুঁটলিটি কিন্তু ঠিকই বেঁধে চলেছে!' বুঝ না মেনে বলল আর্দালিয়ন।

'গ্রিগোরি টাকার পুঁটলি বাঁধছে একথা কিন্তু বলতে পারো না তুমি...'

'অন্যটির কথা বলছি আমি। কেন বনে চলে যাক না যেখানে জনমানিষ্যি নেই, শুধু একা একা থাকুক ভগবানের চিন্তা নিয়ে? ভগবান, এখানকার সবকিছুর উপরেই তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। আসুক বসন্তকাল, আমি বাবা চলে যাচ্ছি সাইবেরিয়ায়...'

অন্যান্য মজুরেরা আর্দালিয়নকে ঈর্ষা করে বলত:

'তোমার মতো আমাদের যদি কেউ থাকত টেনে-তোলার মতো, তোমার ঐ বোনাইয়ের মতো, তবে আমরাও সাইবেরিয়ায় যেতে ভয় পেতাম না...'

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল আর্দালিয়ন কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। এক রবিবার সে চলে গেল, তিন দিনের ভিতরে তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। কেউ জানত না তার কী হল না হল।

অবাক হয়ে সবাই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল:

'হয়ত কেউ মেরে ফেলেছে ওকে?'

'হয়ত বা সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে গেছে?'

অবশেষে ইয়েফিমুশকা একদিন এসে খানিকটা লজ্জিত ভাবেই বলল:

'আর্দালিয়ন মদ খেয়ে পড়ে আছে।'

'মিথ্যা কথা!' অবিশ্বাসের সুরে চিৎকার করে বলে উঠল পিওতর।

'মদে ডুবে আছে মাতাল হয়ে। এমন চালাল একেবারে হু হু করে, যেন খড়ের গাদার ঠিক মাঝখানে আগুন লেগেছে। মনে হচ্ছে যেন ওর বৌ মরে গেছে...'

'বহুদিন আগেই ওর বৌ মরে গেছে! কোথায় আছে সে?'

পিওতর রেগে বেরিয়ে পড়ল আর্দালিয়নকে উদ্ধার করে আনার জন্যে, কিন্তু মার খেয়ে ফিরে এল।

অবশেষে পকেটের ভিতরে দুহাত ঢুকিয়ে দিয়ে কঠিন মুখে বলে উঠল অসিপ:

'যাই, নিজের চোখেই একবার দেখে আসি ব্যাপারটা। লোকটা ভালো...'

আমিও গেলাম সঙ্গে।

'দেখো একবার,' পথে যেতে যেতে বলল অসিপ, 'লোকটা এতো কাল ধরে সসম্মানে জীবন কাটিয়ে এল, তারপর হঠাৎ একদিন লেজ উঁচিয়ে নোংরা আবর্জনার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখ দুটো খুলে রেখো মাক্সিমিচ, আর এসব দেখে শুনে শেখো...'

'আমোদ ফুর্তির শহর' কুনাভিনোর একটা শস্তা বেশ্যা পাড়ায় এসে পৌঁছালাম। সেখানে ধূর্ত চেহারার একটা বুড়ির সঙ্গে দেখা হল। অসিপ ওর কানে কানে কী যেন বলতেই ও আমাদের পথ দেখিয়ে একটা ছোট ঘরের ভিতরে নিয়ে এল। ঘরটা যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। ঠিক যেন একটা আস্তাবল। একটা মেয়েমানুষ খাটের উপরে শুয়ে ঘুমের ভিতরে এপাশ ওপাশ করছে। বুড়ি ওর পাঁজরার উপরে একটা গুঁতো দিয়ে বলে উঠল:

'বেরিয়ে যা, শুনছিস? বেরিয়ে যা এখান থেকে কোলা ব্যাং কোথাকার!'

ভয়ে লাফিয়ে উঠে মুখ চোখ কচলাতে কচলাতে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা:

'হা ভগবান, কী এসব, এরা কে?'

'গোয়েন্দা এসেছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অসিপ। মুখ হাঁ করে মেয়েমানুষটি নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। ওর পথের দিকে তাকিয়ে থুথু ফেলল অসিপ।

'শয়তানের চাইতেও গোয়েন্দা পুলিসকে ওরা ভয় করে বেশি,' আমাকে বুঝিয়ে বলল অসিপ।

বুড়ি দেয়ালের গা থেকে একটা ছোট আয়না নামিয়ে ওয়াল পেপারের একটা পর্দা তুলে দেখাল:

'দেখো তো। ঐ কি সেই লোক?'

ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকাল অসিপ:

'ওই বটে! ছুঁড়িটাকে ভাগাও...'

আমিও তাকালাম। আমরা যে ঘরটায় আছি তারই মতো নোংরা একটা ঘরের বন্ধ জানালার বাজুর উপরে একটা আলো জবলছে। আলোর কাছে দাঁড়িয়ে টেরা চোখ একটা উলঙ্গ তাতার মেয়ে একটা নৈশবাস সেলাই করছে। ওর পিছনে জোড়া বালিশের উপরে দেখা যাচ্ছে আর্দালিয়নের ফুলো ফুলো মুখটা। কালো দাড়িগুলো এলোমেলো ভাবে চারদিক বেয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাতার মেয়েটা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি গায়ে জামা গলিয়ে নিল। তারপর বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। হঠাৎ দেখি সে এসে হাজির হয়েছে আমাদের ঘরে।

ওর দিকে তাকিয়ে আবার থুথু ফেলল অসিপ।

'ছ্যা, বেহায়া খানকী কোথাকার!'

'তুই তো একটা বুড়ো বেকুব!' পালটা জবাব দিল মেয়েটা হাসতে হাসতে।

ওর দিকে আঙুল উঁচিয়ে অসিপও হেসে উঠল।

আমরা এলাম তাতার মেয়েটার ঘরে। বুড়ো বসল আর্দালিয়নের পায়ের কাছে। বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করল ওকে জাগাতে। আর্দালিয়ন শুধু বিড় বিড় করে বলতে লাগল:

'ও, ঠিক আছে... একটু সবুর কর্... চলে যাচ্ছি আমরা...'

অবশেষে সে উঠে বসে অসিপ আর আমার দিকে তাকাল চোখ বড়ো বড়ো করে। পরক্ষণেই আবার ফোলা ফোলা চোখ দুটো বুজে বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'কী খবর?..'

'কী হয়েছে?' শান্ত গম্ভীর গলায় বলল অসিপ। ওর সুরে ভর্ৎসনার কোনো রেশ ছিল না।

'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল,' ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাশির সঙ্গে জবাব দিল আর্দালিয়ন।

'কেমন করে?'

'এই এমনিই।'

'খুব খারাপ...'

'আমি জানি...'

আর্দালিয়ন টেবিলের উপর থেকে একটা মুখ-খোলা মদের বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢালতে শুরু করল। তারপর বোতলটা অসিপের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'হবে নাকি একটু? কিছু খাবারও থাকার কথা...'

বুড়ো এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করল, তারপর এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে মন দিয়ে চিবোতে শুরু করে দিল। আর আর্দালিয়ন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে চলল:

'দেখলে? এই তাতার ছুঁড়িটার সঙ্গে এসে জুটেছি। এসব হচ্ছে ইয়েফিমুশকার কাজ। ও বলেলে ছুঁড়িটা কচি — কাসিমভ থেকে এসেছে। বাপ মা নেই — মেলায় যাবার ইচ্ছে ছিল।'

দেয়ালের ওপাশ থেকে উদ্ধত কণ্ঠের ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশে আওয়াজ আসছিল ভেসে:

'তাতার সবচাইতে ভালো! কচি মুরগীর মতো। বুড়োটাকে তাড়িয়ে দাও। ও কিছু আর তোমার বাপ নয়...'

'ঐ ঐটি,' ঘোলা চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল আর্দালিয়ন।

'দেখেছি ওকে,' বলল অসিপ।

আমার দিকে ফিরে তাকাল আর্দালিয়ন:

'দেখ্ দিকি নি কী করেছি আমি, ভাই...'

আশা করেছিলাম অসিপ ওকে গাল পাড়তে শুরু করবে। কিংবা উপদেশ দেবে। আর অমনি পাপী লজ্জা পেয়ে অনুতাপ করতে আরম্ভ করবে আর্দালিয়ন। কিন্তু সে সবকিছুই হল না। ওরা পাশাপাশি বসে আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে লাগল। ঐ অন্ধকার নোংরা খুপরির ভিতরে ওদের অমন ভাবে বসে থাকতে দেখে ভারি দুঃখ লাগছিল আমার। ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ ভাষায় তাতার মেয়েটা তেমনি বক বক করে চলেছে দেয়ালের সেই ফাটলে। কিন্তু ওর কথা কেউ আমলে আনছিল না। টেবিল থেকে অসিপ একটা নোনা মাছ তুলে নিল। তারপর জুতোর উপরে ঠুকে ছাল ছাড়াতে শুরু করল।

'টাকাকড়ি সব গেছে?' জিজ্ঞেস করল অসিপ।

'পিওতরের কাছে কিছু পাওনা আছে...'

'তুমি তো শীগ্‌গিরই তম্‌স্ক যাচ্ছ। খরচ-খরচায় কুলোবে তো এখন?'

'তম্‌স্কে যাওয়া হবে কিনা এখনো কিছু ঠিক নেই...'

'কেন, মত বদলে গেছে নাকি?'

'যদি ওরা আমার আত্মীয় না হত।'

'কী?'

'আমার বোন বোনাই...'

'মানে?'

'আত্মীয়স্বজনের কাছে কাজ করাটা খুব আরামের নয় ভাই...'

'মনিব মনিব, তা আত্মীয়ই হোক আর যাই হোক।'

'তবুও...'

ওরা পরম বন্ধু ভাবে পাশাপাশি বসে এমন গম্ভীর ভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগল যে তাতার ছুঁড়িটা পর্যন্ত ওদের আর না খুঁচিয়ে চুপ করে গেল। তারপর নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে এসে পেরেকের উপর থেকে ওর পোশাকটা তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'ছুঁড়িটা কচি আছে,' বলল অসিপ।

আর্দালিয়ন প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকাল:

'এসব কিছু হচ্ছে ইয়েফিমুশকার কীর্তি। ওর মাথায় শুধু মেয়েমানুষের চিন্তা... তাতার ছুঁড়িটা ফুর্তিবাজ আছে, সব সময়েই বাজে বকর বকর করে...'

'হুঁশিয়ার থেকো, নইলে চিরদিনের মতোই ফেঁসে যাবে,' সাবধান করে দিল অসিপ। শেষবারের মতো একটা নোনা মাছ খেয়ে উঠে পড়ল অসিপ।

পথে আসতে আসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে:

'এসেছিলে কেন তুমি?'

'কী হচ্ছে না হচ্ছে শুধু সেইটুকু দেখতে। ও আমার বন্ধু। এমন ঢের ঢের ঘটনা জানা আছে আমার: একটা লোক আছে তো বেশ আছে, তারপর হঠাৎ যেন একদিন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার মতো হল,' বলছিল অসিপ। তারপর নিজের কথার খেই ধরে আবার বলে চলল, 'ভদকা থেকে দূরে থাকো!'

খানিক পরে নিজের মনেই আবার বলল:

'কিন্তু ওটা ছাড়া বড়ো একঘেয়ে লাগে!'

'ভদ্‌কা ছাড়া?'

'হ্যাঁ, একবার এক চুমুক খেলেই মনে হবে যেন অন্য এক দুনিয়ায় চলে এসেছি...'

চিরদিনের মতোই আর্দালিয়ন আটকা পড়ে গেল ওখানে। কিছুদিন পরে আবার কাজে ফিরে এল। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার কেটে পড়ল। তারপর ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার বসন্তকালে। দেখি

একদল ভবঘুরের সঙ্গে একটা নদীর বজরার চারপাশ থেকে বরফ ভাঙছে। দুজনকে দেখে দুজনারই ভারি আনন্দ হল। একসঙ্গে চা খেতে গেলাম একটা চাখানায়।

'মনে আছে কেমন একটা মজুরের মতো মজুর ছিলাম আমি?' চা খেতে খেতে জাঁক করে বলতে লাগল আর্দালিয়ন। 'অস্বীকার করার জো-টি নেই, কাজে আমি বিশ্বকর্মা ছিলাম। শ' শ' টাকা কামাতে পারতাম ইচ্ছে করলে...'

'কিন্তু কামালে না তো।'

'কামাই নি ঠিক,' গর্ব করে বলল, 'পরোয়া করি না কাজের!'

এমন তুড়ি-মেরে উড়িয়ে-দেয়া ভাবে বলতে লাগল যে চাখানার সবার দৃষ্টি এসে পড়ল ওর দিকে।

'মনে আছে, সেই মিটমিটে চোর পিওতর কাজের কথায় কী বলত? পাকা বাড়ি অন্যের জন্যে, আর কাঠের কফিন নিজের জন্য। তবেই দেখো, কাজের মূল্য তো এই!'

'পিওতর চিররোগী,' বললাম আমি, 'ও মরতে ভয় পেত।'

'আমিও রোগী,' চিৎকার করে বলে উঠল আর্দালিয়ন, 'আমার আত্মা রোগে ভুগছে!'

রবিবার রবিবার প্রায়ই আমি শহরের কেন্দ্র ছেড়ে নেমে আসতাম 'লাখপতি' পাড়ায়। এখানে ভবঘুরেদের বাস। দেখলাম কতো অল্প সময়ের ভিতরেই আর্দালিয়ন এই সমাজচ্যুতদের একজন হয়ে উঠেছে। মাত্র একবছর আগেও ও ছিল হাসিখুশি স্থিরচিত্ত শ্রমিক। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওদের মতো হল্লাবাজ স্বভাব, ওদেরই মতো চাল মেরে হাঁটার কায়দা, ওদেরই মতো ঔদ্ধত্যভরা দৃষ্টি আয়ত্ত করে ফেলেছে। যেন সবার সঙ্গে ঝগড়া মারপিট করার জন্যে মুখিয়েই রয়েছে সারাক্ষণ।

'দেখেছ তো সবাই আমাকে কেমন মানে। আমি এখানকার সর্দার!' বড়াই করে বলত।

ওর রোজগারের জমা টাকা থেকে ভবঘুরেদের ভোজ দিত। মারপিটে যে পক্ষ হেরে যাচ্ছে সে পক্ষের হয়ে লড়তে শুরু করে দিত। প্রায়ই শোনা যেত ও চিৎকার করে বলছে:

'এটা কিন্তু তোমাদের অন্যায়—ন্যায্য কাজ করা উচিত তোমাদের!'

ফলে সবাই ওর নাম দিয়েছে 'ন্যায্য'। এতে ও মহা খুশি।

এই যে লোকগুলো ঐ পুরনো নোংরা মহল্লার পাথুরে খোপের ভিতরে গাদাগাদি করে রয়েছে চেষ্টা করতাম এদের বুঝতে। এরা সবাই জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মনে হত যেন আবার নিজস্ব ধারাতেই ওরা গড়ে তুলেছে আর এক জীবন। সে জীবন ফুর্তির জীবন, স্বাধীন জীবন। ওরা সাহসী, বেপরোয়া। ওদের দেখে মনে পড়ে যেত আমার দাদুর গল্পের সেই ভল্‌গার মাঝিমাল্লাদের কথা, যারা এক নিমেষেই ডাকাত বা সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হতে পারত। কাজ না থাকলে ওরা বজরা বা স্টিমার থেকে ছোট খাটো চুরিচামারি করতে একটুও ইতস্তত করত না। কিন্তু এতে আমার মনে এতটুকুও খারাপ হত না। কারণ দেখেছি কালো সুতোয় পুরনো কোট রিপু করার মতো জীবনটাকেও চুরির সুতো দিয়ে জোড়াতালি দিতে হয়। কিন্তু এটাও দেখেছি যে কখনো কোথাও আগুন লাগলে, বা নদীর বুকে বরফ ভাঙ্গতে হলে কিংবা কোনো জরুরী মাল বোঝাই করতে হলে এই লোকগুলোই আবার অসীম উদ্দীপনায় আত্মত্যাগ করেও দেহের সবটুকু শক্তি দিয়েই কাজ করে চলত। সব মিলিয়ে ওরা ছিল অন্য সবার চাইতে ঢের বেশি স্ফূর্তিভরা।

কিন্তু আর্দালিয়নের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা জানতে পেরে পিতৃসুলভ সুরে অসিপ বলল:

'শোনো বাপু, নিচের ঐ 'লাখপতি' পাড়ার ওদের সঙ্গে তোমার ভাবসাব একটু বেশি মাত্রা ছাড়াচ্ছে যে? দেখো যেন ওরা তোমার সর্বনাশ না করে ছাড়ে...'

আমার সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে ওরা কাজ না করেও কেমন বেপরোয়া ভাবে চলে, তাই আমার ভারি ভালো লাগে ওদের।

'পাখির মতোই মুক্ত,' একটু হেসে বাধা দিয়ে বলে উঠল অসিপ, 'তার কারণ ওরা কুঁড়ে, অপদার্থ। কাজ ওদের কাছে শাস্তিবিশেষ!'

'কাজ করে কেইবা আনন্দ পায়? কথায় বলে: সৎপথে খেটে কারুর দালান কোঠা ওঠে না।'

আমিও বলে ফেললাম কথাটা। কথাটা বহুবার শুনেছি আর মনেও হত যে ওটা খাঁটি সত্যি কথা। কিন্তু দারুণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল অসিপ:

'কে বলে এসব কথা? মূর্খ, অলস যারা, তারাই! তুই বাচ্চা ছেলে — এসব কথায় তোর কান দেয়া উচিত নয়। যারা হিংসুটে বা অক্ষম, তারাই এ সব বাজে কথা বলে থাকে। উড়তে চেষ্টা করার আগে কিছু পাখনা গজানো

দরকার! তোর ঐ দোস্তি — আমি বলে দেব তোর মনিবকে। তখন নিজেই নিজের কপাল চাপড়ে মরবি!'

অসিপ বলে দিল মনিবকে। অসিপের সামনেই মনিব বলল আমাকে:

"লাখপতি' পাড়ায় যাওয়া ছেড়ে দাও পেশকভ। ও পাড়ার সবাই চোর আর বেশ্যা। শেষ পর্যন্ত হয় জেলখানায় নয়ত হাসপাতালে গিয়ে ঠেকতে হবে। ছেড়ে দাও ওদের সঙ্গ!'

'লাখপতি' পাড়ায় যাতায়াতের কথা গোপন রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু শীগ্‌গিরই বাধ্য হয়ে ও পাড়ায় যাওয়া ছেড়ে দিতে হল।

একদিন আর্দালিয়ন, তার বন্ধু 'খোকা' আর আমি একটা বাড়ির উঠোনের এক চালাঘরের ছাদের উপরে বসে আছি। খোকা তার দন তীরের রস্তভ থেকে মস্কো পায়ে হেঁটে যাওয়ার এক মজার গপ্প বলছিল আমাদের কাছে। ও আগে সৈনিক ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বাহিনীতে কাজ করত। 'সেণ্ট জর্জ' ক্রুশও পেয়েছিল। আর পেয়েছিল তুর্কী যুদ্ধে হাঁটুতে একটা জখম। তাতে জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে যায়। বেঁটে গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা। দুটো হাতে অসম্ভব শক্তি। কিন্তু হাতের সে জোর কাজে লাগাবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ খোঁড়া হওয়ার দরুণ কোনো কাজই করতে পারত না। কী একটা অসুখে ওর চুল আর দাড়ি উঠে গিয়ে মাথাটা শিশুর মাথার মতো টেকো হয়ে গিয়েছিল।

বাদামী চোখ দুটোয় ঝিলিক তুলে ও বলছিল:

'এমনি করে সেরপুখভে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম এক পুরুত তার বাড়ির পিছনের উঠোনে বসে রয়েছে। আমি তো তার কাছে গিয়ে বললাম, 'তুর্কী যুদ্ধের এক বীরের জন্যে সামান্য কিছু দান করতে পারেন কি?'

আর্দালিয়ন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল:

'ওঃ, কী মিথ্যুক রে তুই! মিথ্যুক!'

'মিথ্যুক কেন?' একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে জিজ্ঞেস করল খোকা। ভর্ৎসনাভরা অলস কণ্ঠে আর্দালিয়ন কিন্তু বলেই চলল:

'সৎ ভাবে থাকা উচিত তোর। অন্য সব খোঁড়াদের মতো তোরও উচিত একটা রাত চৌকিদারের চাকরি যোগাড় করে নেয়া। কিন্তু তা না করে তুই গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস আর মিথ্যা কথা বলছিস...'

'মজা করার জন্যেই করি -- লোককে হাসাবার জন্যে...'

'নিজেকে নিয়ে হাসতে হবে তোকে।'

রোদের দিন। তবুও উঠোনটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। একটি মেয়েছেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে কী যেন দোলাতে দোলাতে হাঁকছিল:

'কই গো মেয়েরা, স্কার্ট কিনবে কে এসো?'

মেয়েরা খুপরির ভিতর থেকে পিল্ পিল্ করে বেরিয়ে এসে বিক্রেতাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। মুহূর্তে চিনতে পারলাম, নাতালিয়া। ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে আসার আগেই দেখি প্রথম খদ্দেরের কাছে নাতালিয়া স্কার্টটা বেচে উঠোন ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

'কী খবর!' গেটের বাইরে ওর নাগাল ধরে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলাম।

'ব্যস, আর কিছু বলবে?' আড়চোখে তাকিয়ে বলে উঠল নাতালিয়া। হঠাৎ থেমে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল:

'হায় রে কপাল! তুই এখানে কী করছিস?'

ওর সেই সচকিত চিৎকারে কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ, একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। ভয় আর বিস্ময়ের ছায়া সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে মুখে। বুঝতে পারলাম ওর ভয় আমারই জন্যে। তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বললাম যে আমি এ পাড়ায় থাকি না, মাঝে মাঝে আসি একটু দেখতে।

'একটু দেখতে?' বাঁকা বিদ্রূপের সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল নাতালিয়া, 'কোন জায়গাটা দেখতে? চলন্ত মানুষগুলোর পকেটের ভিতরটা নাকি মেয়েদের ব্লাউজের ভিতরটা, এ্যাঁ?'

ওর মুখখানা শীর্ণ দেখাচ্ছিল। ঠোঁট দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখের কোল কালিভরা।

সরাইখানার সামনে এসে ও থমকে দাঁড়াল, তারপর বলল:

'আয়, একটু চা খাওয়া যাক। জামাকাপড় তো বেশ ফর্সা, ওদের মতো নয়। কিন্তু যাই বলিস তোকে বিশ্বাস নেই...'

কিন্তু সরাইখানার ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন আমার উপরে ওর আস্থা ফিরে এসেছে। চা ঢেলে নেয়ার পরে নীরস গলায় বলতে আরম্ভ করল কেমন করে ও মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে উঠেছে ঘুম থেকে। এখন পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয় নি। একটু জলও না।

'কাল রাতে গাড়োয়ানের মতো মদ টেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কোথায় কার সঙ্গে মদ খেয়েছি কিছুই মনে নেই!'

ওর জন্যে দুঃখ হল আমার। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ওর সামনে। দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মেয়ের খবর জিজ্ঞেস করি। খানিকটা চা আর ভদকা খাবার পরে ও নিজেই কথা বলতে শুরু করল ওর স্বভাবসুলভ তড়বড়ে ভঙ্গীতে, এ পাড়ার সব মেয়েদের মতোই খানিকটা অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ করে। কিন্তু যেই মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম, অমনি গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল:

'কেন জিজ্ঞেস করছিস? না বাছা না, কোনো দিনও তুই তার নাগাল পাবি না — এ জীবনেও পাবি না।'

আর খানিকটা মদ খেয়ে আবার বলতে লাগল:

'আমাকে আর দরকার নেই আমার মেয়ের। কে আমি? একটা ধোপানী। ওর মতো মেয়ের মা হওয়ার যুগ্যি আমি? ও হল শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা। কম কথা তো নয়, ভাই! তাই সে আমাকে ছেড়ে তার এক সঙ্গিনীর কাছে চলে গেছে — বড়োলোকের মেয়ে। মনে হয় গেছে গভর্নেস হতে...'

তারপর একটু থেমে নিচু গলায় বলল:

'ধোপানী তো আর কারুর কোনো কাজে লাগে না! হয়ত বেশ্যা মেয়ে তবু কিছু কাজে লাগে, কী বলিস?'

আগেই বুঝেছিলাম ও এখন পথের বেশ্যা। এ পাড়ার সব মেয়েই তাই। কিন্তু ওর নিজের মুখে নিজের সম্পর্কে কথাটা ব্যবহার করতে শুনে ভীষণ আঘাত পেলাম। লজ্জায় দুঃখে আমার চোখে জল এল। বিশেষ করে নাতালিয়ার মতো একজনের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি শুনে আমি অদ্ভুত আকস্মিক আতঙ্কে স্তম্ভিত। মাত্র ক'দিন আগেও ও ছিল সাহসী, বুদ্ধিমতী, স্বাধীন!

'বোকা ছেলে,' দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখান থেকে চলে যা! ভালোর জন্যেই বলছি, মিনতি করে বলছি এ পাড়ায় আর আসিস না! তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

তারপর টেবিলের উপরে ঝুঁকে ট্রের উপরে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে নিচু স্বরে ছাড়া ছাড়া ভাবে বলতে লাগল, যেন ও আপন মনেই বলে যাচ্ছে নিজের কাছে:

'কিন্তু আমার উপদেশ তুই কেন শুনবি? আমার নিজের পেটের মেয়েই যখন শুনল না... ওকে বলতাম, 'তুই তোর নিজের মাকে ছেড়ে চলে যাবি কী — কিছুতেই না!' কিন্তু তাতে ও বলত, 'তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

তারপর সে চলে গেল কাজানে — চেয়েছিল নার্সিং শিখতে। বেশ, ভালো। কিন্তু আমার কী হবে?.. আমি এখানেই পড়ে আছি। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? রাস্তার লোকগুলোর কাছে...'

কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেল নাতালিয়া। ঠোঁট দুটো নড়ছে নীরবে। বাহ্যত ভুলে গেছে আমার উপস্থিতি। ঠোঁটের কোণ দুটো ঝুলে পড়ে মুখটা আধখানা বাঁকা চাঁদের মতো হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের সেই কুঞ্চন আর কম্পিত বলিরেখা কী যেন এক অব্যক্ত নীরব ভাষায় কথা বলে চলেছে। দেখে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠল। ওর মুখখানা কেমন অভিমানী, শিশুর মতো। মাথার শালের ভিতর থেকে এক গোছা চুল বেরিয়ে এসে পড়েছে গালের উপরে, বেঁকে ছোট কানটিকে ঘিরে চলে গেছে পিছনের দিকে। ঠান্ডা চায়ের গ্লাসে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। দেখতে পেয়ে গ্লাসটা সরিয়ে রেখে দিল দূরে। তারপর শক্ত করে চোখ বুজে আরো দু-ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে শালের কোণা দিয়ে মুখ-চোখ মুছে ফেলল নাতালিয়া।

ওর পাশে আর বসে থাকতে পারছিলাম না। নীরবে উঠে দাঁড়ালাম।

'চললাম!'

'অ্যাঁ? দূর হ, জাহান্নামে যা!' আমার দিকে ফিরে না তাকিয়েই হাত নেড়ে আমাকে তাড়াল। বুঝিবা ভুলেই গেছে আমি কে।

আর্দালিয়নের খোঁজে আবার ফিরে এলাম উঠোনে। কথা ছিল ওর সঙ্গে একদিন কাঁকড়া ধরতে যাব। ভেবেছিলাম এই স্ত্রীলোকটির কথা বলব ওর কাছে। কিন্তু আর্দালিয়ন বা খোকা কেউই ছাদের উপরে নেই। ঐ বিশৃংখল উঠোনটার ভিতরে ওদের খুঁজতে খুঁজতে একটা হল্লা শুনতে পেলাম। এ ধরনের হল্লা এ পাড়ায় খুবই স্বাভাবিক।

গেটের বাইরে আসতেই প্রায় নাতালিয়ার গায়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম আর একটু হলেই। অন্ধের মতো টলতে টলতে ও আসছিল পাকা রাস্তাটা ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে। এক হাতে শাল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত মুখখানা মুছছে, অন্য হাতে এলোমেলো চুলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে পিছনের দিকে। ওর পিছন পিছন আসছে আর্দালিয়ন আর খোকা।

'আবার দু'ঘা দেয়া যাক মাগীকে, চল!' চেঁচিয়ে বলে উঠল খোকা।

আর্দালিয়ন ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। নাতালিয়া ঘুরে দাঁড়াল। বিকৃত মুখ। দুচোখে তীব্র ঘৃণার নীল শিখা।

'মার, যত পারিস মার!' চেঁচিয়ে বলে উঠল নাতালিয়া।

আর্দালিয়নের হাত চেপে ধরলাম। অবাক হয়ে সে তাকাল আমার মুখের দিকে, 'হল কি তোর?'

'ওর গায়ে হাত দিও না,' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম।

হো হো করে হেসে উঠল আর্দালিয়ন।

'ও কে, তোর মাগী? ওঃ নাতালিয়া, ডুবিয়েছিস তুই, বেম্মচারীকে পর্যন্ত ফাঁদে ফেলেছিস!'

খোকাও হো হো করে হাসতে হাসতে উরু চাপড়াতে আরম্ভ করল, তারপর দুজনে মিলে আমাকে অশ্লীল ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। কিন্তু এই গোলমালের ভিতরে নাতালিয়া পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল। যখন মনে হল আর আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তখন খোকার বুকের উপরে একটা ঘুসি মেরে ওকে চিত করে ফেলে ছুটে পালিয়ে গেলাম।

তারপর বহুকাল আর 'লাখপতি' পাড়ায় যাই নি, কিন্তু আর্দালিয়নের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আবার। এবার দেখা হল একটা খেয়া নৌকোয়।

'আরে!' খুশিভরা গলায় বলে উঠল আর্দালিয়ন, 'হয়েছে কি তোর?'

বললাম যে ওরা যেভাবে নাতালিয়াকে মারছিল আর আমাকে অপমান করছিল তাতে আমি দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। ও দরাজ গলায় হেসে উঠল:

'তুই কি ভাবিস আমরা সত্যি সত্যিই তাই ভেবেছি? তোকে একটু ক্ষেপাচ্ছিলাম মজা করার জন্যে। আর ওর কথা বলছিস — ওকে মারব না কেন? ও তো একটা রাস্তার বেশ্যা। লোকে যদি নিজের বৌকে ধরে পিটতে পারে তবে একটা খানকীকে ছেড়ে দেবে কেন? কিন্তু আমরা তো শুধু ঠাট্টা করছিলাম। মেরে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, সেটা আমি ভালো করেই জানি!'

'ওকে শেখাবার যোগ্যতা আছে তোমার? ওর চাইতে তুমি এমন কিছু ভালো নও!'

ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে একটা নাড়া দিল। হেসে হেসে বলল:

'গেঁড়াকল তো সেখানেই! কেউ কারুর চাইতে ভালো নয়... তা আমি বুঝি ভাই — ভিতর বার সবকিছুই দেখতে পাই। আমি তো আর তোমার গে' ঐ পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু চাষা নই...'

ও তখন মাতাল। মনটা দরাজ খুশিতে ভরা। স্নেহশীল শিক্ষক যেমন করে ক্ষমাসুন্দর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে অবুঝ ছাত্রের দিকে তাকায়, তেমনি দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে...

...কখনো-সখনো দেখা হত পাভেল ওদিনৎসভের সঙ্গে। আগের চাইতেও উচ্ছল। পোশাক পরিচ্ছদ বাবু-বাবু গোছের। আমাকে দেখত একটু কৃপার দৃষ্টিতে। একদিন একটু ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে বলল:

'অমন একটা কাজ নিলি কেন তুই? ঐ সব চাষাভুষোদের সঙ্গে কাজ করে কোনো দিন কোনো উন্নতি করতে পারবি না...'

তারপর দুঃখের সঙ্গেই বলল কারখানার সংবাদ:

'ঝিখারেভ এখনো সেই ঘুড়ীটার সঙ্গে বসবাস করছে। মনে হয় সিতানভ যেন কী এক দারুণ মনঃকষ্টের ভিতরে দিন কাটাচ্ছে। শরীরের দিক থেকে যতটা রয় সয় তার ঢের বেশি মদ খেতে শুরু করেছে। গোগলেভকে নেকড়েয় খেয়ে ফেলেছে। বড়ো দিনের ছুটিতে যখন বাড়ি গিয়েছিল তখন একদিন মাতাল হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। নেকড়েরা মিলে ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছে।'

বলতে বলতে কল্পনায় ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে পাভেল হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল:

'ওকে ছিঁড়ে খেয়ে নেকড়েগুলোও মাতাল হয়ে পড়েছিল। সার্কাসের কুকুরের মতো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে টলতে টলতে বনের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর চিৎকার করছিল ভীষণ ভাবে। পরদিন সবগুলো পড়ে মরে গেল!..'

ওর কথা শুনতে শুনতে আমিও হাসছিলাম। আর মনের গভীরে একান্ত ভাবে অনুভব করছিলাম যে কারখানা আর কারখানা-জীবনের যে সব কথা আমি ভাবতাম তা কখন যেন আমার কাছে এক অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি, ব্যাপারটা দুঃখের।

১৯

শীতকালে মেলার মাঠে কোনো কাজ ছিল না। বাড়িতে সেই আগের কাজই করতে হচ্ছিল। গোটা দিনটা কেটে যেত ঘরের কাজে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটা ফাঁকা পেতাম। আবার 'নিভা' আর 'মস্কো পত্র' থেকে উপন্যাস পড়ে শোনাতে লাগলাম পারিবারিক বৈঠকে। মনে-প্রাণে অপছন্দ করতাম সেটা। রাত্রে পড়তাম ভালো বই। আর চেষ্টা করতাম কবিতা লিখতে।

একদিন গিন্নীরা গেছে সান্ধ্য উপাসনায়। মনিবের শরীর খারাপ, তাই আমরা দ্বজনে ছিলাম বাড়িতে। মনিব বলল:

'ভিক্তর ঠাট্টা করে তোমার কবিতা লেখা নিয়ে। সত্যি লেখো নাকি পেশকভ? শোনাও তো কী লিখেছ!'

না করতে কেমন জানি খারাপ লাগল, তাই কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনালাম। ভালো লাগে নি তার ব্বঝলাম। কিন্তু বলল:

'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। হয়ত কালে কালে আর একজন প্বশ্‌কিন হয়ে উঠবে। পড়েছ প্বশ্‌কিন কখনো?

ডাইনীরা কি বিয়ে করে,
ভূতেরা যায় মরে?

ওঁর সময়ে লোকে ভূত বিশ্বাস করত। কিন্তু উনি করতেন না বলেই আমার বিশ্বাস — নিছক ঠাট্টা করেই লিখেছেন!'

'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে লেখাপড়া শেখানোই উচিত ছিল,' আপন মনে গ্বন গ্বন করতে লাগল, 'কিন্তু এখন আর সময় নেই। কী করে যে তুমি সংসারে চলবে তা শ্বধ্ব শয়তানই জানে। তোমার ঐ নোটবইটা ল্বকিয়ে রেখো, মেয়েরা যেন দেখতে না পায়। তাহলে ওরা তোমার পিছনে লাগবে। মেয়েমান্বষ, ব্বঝলে ভাই, ওরা মান্বষের ব্যথার জায়গায়ই আঘাত করতে ভালোবাসে...'

কিছ্বদিন ধরে মনিব খ্ববই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকত। থেকে থেকে আগ্রহাকুল দ্‌ষ্টি মেলে নিজের চারদিকে তাকাত। দোরের ঘণ্টা বেজে উঠলেই, চমকে চমকে উঠত। কখনো কখনো তুচ্ছ কারণেও অস্বস্থের মতো খিট খিট করে উঠত। সবাইকে গাল পাড়তে পাড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেত। ফিরে আসত গভীর রাতে মাতাল হয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কী যেন একটা গ্বর্বভার বোঝার চাপে ওর অন্তর পিষে যাচ্ছে। সেটা যে কী তা শ্বধ্ব সেই জানে। তাতে ওর উদ্যম, উৎসাহ ভেঙে পড়েছে। ফলে ও জীবনের প্রতি আস্থা অন্বরাগ সব হারিয়ে ফেলেছে। জীবন ধারণ করে চলেছে যেন শ্বধ্ব অভ্যাসের বশে।

রবিবারে দ্বপ্বরের খাওয়া দাওয়ার পরে বেরিয়ে যেতাম। সন্ধ্যা নটা পর্যন্ত বসে থাকতাম ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটের সরাইখানায়। দোকানের মালিক ছিল

স্থূলদেহ, ঘর্মাক্ত একটি জীব — গানের উপরে ছিল প্রবল ঝোঁক। তা জানা থাকায় আশপাশের সমস্ত গির্জা গায়কেরা এসে জুটত ভদ্কা বিয়ার আর চায়ের লোভে। মালিক ওদের গানের বদলে এই সব পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করত। গির্জার গায়কেরা সবাই নির্জীব মাতালের দল। শুধু ঐ ভদকা বিয়ার ইত্যাদির লোভেই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান করত। আর গির্জার গান ছাড়া অন্য কিছু গাইত না বললেই চলে। ধার্মিক মাতালেরা যখন আপত্তি করে জানাত যে সরাইখানাটা গির্জার গানের জায়গা নয়, তখন মালিক তার অতিথিদের ডেকে নিয়ে যেত নিজের খাস কামরায়। তখন দরজায় কান পেতে না থাকলে গানের সুর শোনা যেত না। কিন্তু প্রায়ই গাঁয়ের কারিগর, চাষীরা এসে গাইত ওর সরাইখানায়। গাইয়ে খুঁজে খুঁজে মালিক চতুর্দিক চষে ফেলত। হাটের দিনে যে সব চাষী শহরে আসত তাদের ভিতর থেকে খুঁজে পেতে বের করে তাদের নিমন্ত্রণ করে আনত।

সরাইখানার ভদকার পিপের সামনে একটা টুল পেতে বসতে দেয়া হত গাইয়েকে। পিপের তলার গোল ফ্রেমটা তার মাথার পেছনে একটা চক্রের মতো দেখাত।

সবচাইতে ভালো গাইয়ে ছিল ক্লেশচভ — ছোটখাটো রোগাটে এক জিনওয়ালা। ওর গানের ঝুলিতে ছিল ভালো ভালো গান। কোঁচকানো উষ্কখুষ্ক চেহারা, সর্বাঙ্গ লাল লাল চুলে ভর্তি। শবের মতো ওর নাকটা ছিল চকচকে। আর ছোট ছোট স্বপ্নালু রেশমী চোখ দুটো মনে হত যেন অচল-অনড় ভাবে কোটরের ভিতরে বসানো।

কখনো কখনো চোখ বুজে মাথাটা পিপের তলার ফ্রেমের উপরে ঠেস দিয়ে বুক চিতিয়ে কোমল কিন্তু অদম্য সপ্তকে সুর তুলে গেয়ে চলত:

হায়, কুয়াশা মাঠের বুকে বুকে
নয়ন পথে পথ-রেখা যায় ঢেকে...

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের উপরে হেলান দিয়ে মুখটা সিলিংয়ের দিকে তুলে পূর্ণ প্রাণে গেয়ে চলত:

কোন দিকে হায়, কোন দিকে যে যাই
কেমন করে পথের নিশান পাই?

ওর কণ্ঠস্বর তেমন চড়া নয়, কিন্তু অক্লান্ত। রূপোর সুতা দিয়ে যেন সে সরাইখানার ঐ একঘেয়ে নির্জীব অন্ধকার গুঞ্জনকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করে চলত। একটি মানুষও সেই ব্যথাভরা গানের করুণ ভাষা আর কান্নার ঢেউ থেকে নিষ্কৃতি পেত না। এমন কি যারা গাঢ় মাতাল হয়ে পড়েছে তারাও আশ্চর্য রকমের দায়িত্বশীল হয়ে উঠে অপলক দৃষ্টিতে সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। অপূর্ব কোন সঙ্গীত যদি অন্তঃস্থল স্পর্শ করে তাহলে যে রকম অসহ্য ভাবাবেগে হৃদয় ভরে ওঠে সেই রকম আবেগে আমার বুকখানা কানায় কানায় ভরে উঠে ফেটে পড়বার উপক্রম হত।

সরাইখানা জুড়ে নেমে আসত গির্জার নিস্তব্ধতা। গায়ক যেন সেই নীরব নিস্তব্ধ গির্জার এক বরাভয় পুরোহিত। কোনো বাণী প্রচার করতে সে আসে নি। শুধু পরম ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে প্রার্থনা করছে। নিবেদন করছে এই অভাগা মানব জীবনের যত দুঃখ, যত ব্যথা বেদনার কথা। আর চারিদিক থেকে যত দাড়িওয়ালা লোকগুলো তাকিয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে। ওদের পশুর মতো মুখে শিশুর মতো চোখগুলো ধ্যানস্থ মিট মিট করছে। থেকে থেকে কারুর বুক থেকে পড়ছে গভীর দীর্ঘশ্বাস — সে দীর্ঘশ্বাস সঙ্গীতের শক্তির নিঃসন্দেহ প্রমাণ। এমনি মুহূর্তে আমার মনে হত যেন সমস্ত মানুষ এক মিথ্যা কৃত্রিম জীবন করে চলেছে। কিন্তু সত্যিকারের জীবন — আঃ, সে জীবন এখানে!

দূরের এক কোণে বসে থাকত মুটকী-মুখো টেকো মাগী। মেয়েটা ছিল দারুণ উচ্ছৃংখল, নির্লজ্জ স্বৈরিণী। কাঁধের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নিয়ে নীরবে কাঁদতে শুরু করত। প্রগল্‌ভ দুটো চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে নেমে আসত চোখের জল। খানিকটা দূরে একটা টেবিলের উপরে এলিয়ে পড়ে থাকত গির্জার গম্ভীর-দর্শন গায়ক মিত্রোপোলস্কি। রোমশ দৈত্যের মতো চেহারা লোকটার। গভীর খাদের গলার স্বর। নেশাগ্রস্ত মুখের উপরে ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ। দেখতে জাতিচ্যুত পুরুতের মতো। সামনের টেবিলের উপরের মদের গ্লাসের দিকে তাকাত। গ্লাসটা তুলে নিত হাতে। ঠোঁটের কাছে ধরত। তারপর স্পর্শমাত্র না করে একান্ত সন্তর্পণে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে দিত টেবিলের উপরে। কেন জানি খেতে পারত না।

সরাইখানার সমস্ত লোকগুলোই নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকত যেন কান পেতে শুনছে কোন এক বিস্মৃত অতীতের ভুলে-যাওয়া একান্ত প্রিয়, অন্তরের একান্ত আপনার কোন কথা।

গান শেষ করে ক্লেশচভ বিনীত ভাবে বসে থাকত টুলের উপরে। সরাইখানার মালিক একগ্লাস ভদকা ওর হাতে তুলে দিতে দিতে পরিতৃপ্ত হাসি হেসে বলত:

'চমৎকার, সত্যি বলছি! যদিও গানটা খানিকটা কাহিনীর মতো, তবু ওস্তাদি আছে তোমার! সত্যি... এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না...'

ধীরে সুস্থে ক্লেশচভ ভদকাটুকু খেয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলত:

'গলা থাকলে যে কেউই গাইতে পারে। কিন্তু শুধু আমিই পারি গানের প্রাণকে ফুটিয়ে তুলতে!'

'থাক, অত বড়াই নাই বা করলে!'

'যার বড়াই করার কোনো কিছুই নেই সে চুপ করে থাক্,' ধীর শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিত ক্লেশচভ, কিন্তু ওর গলায় বেজে উঠত দৃঢ়তার সুর।

'নিজের সম্পর্কে তোমার খুবই উঁচু ধারণা দেখছি ক্লেশচভ!' একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠত সরাইখানার মালিক।

'আমার আত্মার মতোই উচ্চ। তার চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারি না...'

কোণের দিক থেকে মিত্রোপোলস্কি গর্জে উঠত:

'ওরে পোকা-মাকড়, ওরে সরীসৃপের দল! তোরা কী বুঝবি এই মুখপোড়া দেবদূতের গান। কী সাধ্যি তোদের?'

সব সময়েই ও সবার সঙ্গে লাঠালাঠি বাধাত, ঝগড়া করত, লোকের খুঁত ধরে বেড়াত। ফলে প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই গাইয়েরা বা অন্য যে-কেউই পারত ওকে ধরে পিটত।

সরাইখানার মালিক ক্লেশচভের গান পছন্দ করত, কিন্তু লোকটাকে ঘৃণা করত। সবার কাছেই অভিযোগ করত ওর বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে ছুতো খুঁজে ফিরত ওকে অপমান করার, কিংবা হাস্যাস্পদ করার। সরাইখানার সব খদ্দেররা এমন কি ক্লেশচভ নিজেও জানত এ কথা।

'ও গাইয়ে ভালো, কিন্তু বড্ডো আত্মম্ভরী। একটু শায়েস্তা করে দেয়া দরকার,' সরাইখানার মালিকের এই ছিল অভিমত। ওর খদ্দেররাও কেউ কেউ ওর সঙ্গে একমত ছিল।

'কথাটা খুবই সত্যি, লোকটা খুবই দাম্ভিক!'

'কিন্তু দম্ভের কী-ই বা এমন আছে! ভগবান গলা দিয়েছেন — ও নিজে তো আর সেটা তৈরী করে নি। তাছাড়া গলাও এমন কিছু নয়,' বলত মালিক।

'ঠিক কথা। গলা তেমন কিছু নয়, গলাটা খেলাতে পারে এই যা,' সবাই সায় দিত।

একদিন গান শেষ করে গাইয়ে সরাইখানা ছেড়ে চলে গেলে পরে মালিক ঢেকো মাগীকে পেড়াপীড়ি করতে লাগল:

'তুমি একবার ক্লেশ্চভকে একহাত নেবার চেষ্টা করে দেখো, মারিয়া ইয়েভদোকিমভনা — ওকে একটু থেঁতলে দাও, কী বলো? তুমি সহজেই পারবে!'

'আমার বয়েসটা যদি কম থাকত,' একটু হেসে বলল মারিয়া ইয়েভদোকিমভনা।

'আরে, ছুকরিদের দিয়ে কোন কাজ হয় না!' লোকটা জেদ ধরল। 'একমাত্র তুমিই পারো। তোমার জন্যে ও হেদিয়ে মরছে দেখলে আমার প্রাণটা খুশি হবে! ওর বুকটা ভেঙে দাও দেখি! কেমন গান গায় তখন দেখো! একটু লাগো ইয়েভদোকিমভনা, এর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দেব!'

কিন্তু সে রাজী হল না। শুধু তেমনি মেদবহুল বিরাট দেহ নিয়ে চোখ নিচু করে বসে শালের কোণে আঙুল জড়াতে জড়াতে নিষ্প্রাণ একঘেয়ে সুরে বলতে লাগল:

'এসব কাজে ছুকরিদের দরকার। আমার বয়েসটা যদি কম হত তাহলে অবিশ্যি কথা ছিল না...'

সরাইখানার মালিক চেষ্টা করতে লাগল ক্লেশ্চভকে মাতাল করে ফেলার। এক একটা গানের পর এক এক গ্লাস মদ ও খেত বটে, কিন্তু দু'তিনটে গান গাইবার পরেই প্রত্যেক বার হাতে বোনা স্কার্ফটা সযত্নে গলায় জড়িয়ে নিত। তারপর, উষ্কখুষ্ক মাথায় টুপিটা চাপিয়ে সরাইখানা ছেড়ে চলে যেত।

প্রায়ই মালিক খুঁজে পেতে ক্লেশ্চভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে লোক ধরে আনত। এমন সব দিনে জিনওয়ালার গান শেষ হবার পরে প্রশংসার ঝড় যখন থেমে যেত, তখন ভিতরের উত্তেজনা চেপে রেখে মালিক বলে উঠত:

'ভালো কথা, আজ রাতে আরো একজন গাইয়ে আছে। চলে এসো দোস্ত, দয়া করে এসো!'

কোনো কোনো বার দেখা যেত নতুন গাইয়ের গলা খুবই ভালো। কিন্তু বেঁটেখাটো নির্বিকার চেহারার ওই মানুষটির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনো আমি অমন সহজ আবেগময় সুরে গাইতে শুনি নি।

'হ্ম্, খুবই ভালো অবিশ্যি। গলা আছে তোমার। কিন্তু গানে প্রাণ...' একটু বেজার হয়েই স্বীকার করত মালিক।

সবাই হেসে উঠত।

'দেখা যাচ্ছে জিনওয়ালাকে হারাবার মতো কেউ-ই নেই!'

লাল রোমশ ভ্রূর তলা দিয়ে ক্লেশ্চভ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সরাইখানার মালিককে লক্ষ্য করে বিনীত স্থৈর্যের সঙ্গে বলত:

'যতোই চেষ্টা করো না কেন, আমার মতো গাইয়ে তুমি আর একটিও খুঁজে পাবে না। কারণ আমার প্রতিভা হল ভগবানের দেওয়া...'

'আমরা সবাই তো এসেছি ভগবানের কাছ থেকে!'

'তোমার সরাইখানার সবটুকু মদের বদলেও আর একটিও খুঁজে পাবে না তুমি...'

মালিকের মুখের উপর দিয়ে চকিতে একটা কালো ছায়া ভেসে যেত। তারপর বিড় বিড় করে বলে উঠত:

'আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে'খন...'

কিন্তু ক্লেশ্চভ বলেই চলে:

'গানটা কিছু আর তোমার ঐ মোরগের লড়াই নয়, বুঝলে?'

'তুমি কে যে শেখাতে আসছ?'

'শেখাচ্ছি না। শুধু দেখাচ্ছি: গান হল প্রাণের বস্তু।'

'ঢের হয়েছে, থামো। তার চেয়ে গান চলুক...'

'গান গাইতে আমি সব সময়েই রাজী। এমন কি ঘুমের মধ্যেও,' রাজী হল ক্লেশ্চভ। তারপর একটু কেশে গান ধরল।

মুহূর্তে যত ক্ষুদ্রতা, যত কথা আর দুরভিসন্ধির জঞ্জাল, সরাইখানার যা কিছু অশ্লীল নোংরামী সব আশ্চর্য ভাবে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার মতো। সবাই টের পেল যেন এক অন্যরকম জীবনের তাজা নিঃশ্বাস এসে পড়ছে কোথা থেকে। সে জীবন পবিত্র, বেদনাময়, সে জীবন প্রেমে ব্যথায় ভরপুর।

হিংসে হত আমার লোকটাকে। আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ওর প্রতিভাকে, মানুষের উপরে ও যে প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে হিংসে করতাম। কী অদ্ভুত ভাবেই না সে তার এই শক্তিকে কাজে লাগাত! ঐ জিনওয়ালার সঙ্গে পরিচিত হতে, ওর সঙ্গে কথা বলতে আমি অধীর হয়ে উঠতাম। কিন্তু দুটো নিষ্প্রভ চোখের এমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে সে চারদিকে তাকাত মনে হত যেন কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। তাই আর সাহসে কুলিয়ে

উঠত না। তাছাড়া ওর ভিতরে কী যেন একটা অস্বস্তিকর জিনিস ছিল যাতে আমার অন্তরাত্মা বিরূপ হয়ে উঠত ওর উপরে, যদিও শুধু গানের সময়ে নয়, অন্যান্য সময়েও ইচ্ছে হত ওকে ভালোবাসি। ওর টুপি পরার ধরনটা ছিল কেমন যেন বিশ্রী বুড়োমানুষের মতো। জাঁক করে গলায় একটা লাল স্কার্ফ জড়াতে জড়াতে বলত:

'আমার প্রেয়সী নিজের হাতে বুনে দিয়েছে আমাকে--এক তরুণী মহিলা...'

যখন গান করত না তখন নিজেকে ভারিক্কি চালে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলত, শীতে অসাড় নাকটা ঘসত, আর যেন একান্ত অনিচ্ছায় এক অক্ষর দুই অক্ষরের কথায় জবাব দিত কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে। একদিন ওর পাশে বসেছিলাম। কী যেন একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করেই বলে উঠেছিল:

'ভাগ, ছোকরা!'

ওর চাইতে ঢের বেশি ভালো লাগত আমার মিত্রোপোলস্কিকে। সরাইখানায় ঢুকেই বোঝা-কাঁধে-মানুষের মতো ভারি পায়ে কোণের দিকে এগিয়ে যেত। পায়ের ঠেলায় একটা চেয়ার সরিয়ে ধপ করে বসে পড়ত। তারপর কনুইয়ের ভর টেবিলের উপরে রেখে মোটা চুলে ভরা মাথাটা রাখত হাতের উপরে। কোনো কথা না বলে নীরবে দু' তিন গ্লাস ভদকা খেয়ে এমন জোরে ঠোঁটে চুমকুড়ি দিত যে সবাই চমকে উঠে ফিরে তাকাত ওর দিকে। থুতনিটা হাতের উপরে রেখে অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত সে। এলোমেলো চুলগুলো জংলী লতার মতো ফোলা ফোলা রক্তিম মুখের উপরে পড়ত ঝাঁপিয়ে।

'তাকিয়ে আছিস কেন? কী দেখছিস?' হঠাৎ এক সময়ে গর্জে উঠত সে।

'ভূত দেখছি!' লোকেরা কখনো কখনো জবাব দিত।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় ও নীরবে বসে বসে মদ খেত। তারপর ভারি পা দুটো টেনে টেনে নীরবেই ঘর ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে শুনতাম ধর্মপ্রচারকদের মতো ও সবাইকে গালমন্দ করছে:

'প্রভুর অপাপবিদ্ধ ভৃত্য আমি। অপাপী সেই পুরাকালের ইশাইয়ার মতো তোদের আমি ধিক্কার দিচ্ছি! আরিয়েল শহরের বুকে নেমে আসুক দুঃখের রাত, লালসার জঘন্যতার মধ্যে এখানে যতো চোর আর অপরাধীর বাস! ধিক এই পাপে-বোঝাই পৃথিবীর ভেলা যা ভেসে চলেছে বিশ্বের

দরিয়ায়। সে পাপের বোঝা হচ্ছিস তোরা! ওরে ও মাতাল, পেটুক রাক্ষসের দল, ওরে পৃথিবীর জঞ্জালরা! তোদের সংখ্যা অগণিত, হায় রে অভিশপ্তের দল, তবুও পৃথিবীর মাটি ঘৃণায় তোদের ধ্বংসাবশেষ পায়ে ঠেলবে!'

ওর গলার গমগমে শব্দে জানালার কাচগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠত। এই ব্যাপারটা ওর শ্রোতাদের খুব ভালো লাগত আর প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠত।

'ব্যাটা লোমওয়ালা শয়তান! থামতে পারে না!'

ওর সঙ্গে আলাপ করা ছিল সহজ। খাওয়াব বললেই হল। অমনি ও হাঁকিত—এক বোতল ভদকা আর লাল মরিচ দেয়া এক টুকরো গরুর মেটে। এগুলো ও ভালোবাসত, এতে পেট আর গলা দুটোই জ্বলে যেত বলে। একবার কী বই পড়া উচিত একথা জিজ্ঞেস করাতে ও দারুণ ভাবে ফেটে পড়েছিল আমার ওপর:

'পড়ে কী হবে?'

কিন্তু ওর প্রশ্ন আমাকে আহত করেছে তা বুঝতে পেরে ও নরম হয়ে এসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল:

'ধর্ম বিষয়ক কিছু পড়েছিস?'

'পড়েছি।'

'ধর্মগ্রন্থ পড়্! তাতেই হবে। দুনিয়ার যা কিছু জ্ঞান ওরই ভিতরে লেখা। শুধু তোদের হেঁড়ে মাথায় তা ঢোকে না। কেউ-ই বোঝে না। কী করিস তুই, গান গাস?'

'না।'

'না কেন? তোর গান গাওয়া উচিত। সব পেশার মধ্যে ওটাই হচ্ছে সবচাইতে বেকুবের পেশা।'

পাশের টেবিল থেকে কে যেন বলে উঠল:

'তোমার বেলায় কী তবে? তুমি নিজে কি গাইয়ে নও?'

'আমি? আমি একটা বাউণ্ডুলে। তারপর কী বলবি বল্!'

'তারপর আর কিছু না।'

'তা জানতাম। সবাই জানে যে তোর ঐ মাথাটার ভিতরে কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু হবেও না কোনো কালে। আমেন!'

ও সবার সঙ্গে এই একই সুরে কথা বলত। আমার সঙ্গেও। কিন্তু দু'তিনবার

আমি ওকে খাওয়াবার পরে ও একটু সদয় হয়েছিল আমার উপরে। এমন কি একদিন অবাক হয়ে বলল:

'যখনই আমি তোর দিকে তাকাই, ভাবতে চেষ্টা করি তুই কে, কী করিস, কেন করিস। কিন্তু তুই জাহান্নামে যা, তাতে আমার কিছু যায় আসে না!'

ক্লেশচভ সম্পর্কে ওর সত্যিকারের মত কী তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নি। খুব আনন্দের সঙ্গেই ও শুনত তার গান। এমন কি কোনো কোনো সময়ে হাসতও তৃপ্তির হাসি। কিন্তু কখনো চেষ্টা করত না ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। ওর সম্পর্কে কথা বলত তাচ্ছিল্য করে, রূঢ় অভদ্র ভাষায়।

'ওটা একটা ভাঁড়! কেমন করে নিশ্বাস নিতে হয় তা জানে, কী গায় সে সম্পর্কে জ্ঞান আছে । কিন্তু তবুও ওটা একটা গাধা!'

'কেন?'

'কারণ ও জন্ম গাধা।'

স্বাভাবিক অবস্থায় ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হয়ত আনন্দ হত। কিন্তু তখন ও শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করত আর করুণ ঘোলাটে চোখে এদিক ওদিক তাকাত। একজন লোকের মুখে শুনেছিলাম লোকটা দিন-রাত মদে ডুবে থাকে, এককালে কিন্তু ও কাজান একাদেমীর ছাত্র ছিল। ধর্মযাজক হয়ে উঠতে পারত। প্রথমে গল্পটা আমি বিশ্বাস করি নি। কিন্তু ওর সঙ্গে একদিন কথায় কথায় বিশপ ক্রিসান্‌ফের নাম করেছিলাম।

'ক্রিসান্‌ফ্‌?' বলল মিত্রোপোলস্কি মাথা নাড়তে নাড়তে, 'তাঁকে চিনতাম আমি। আমার গুরু, আমার উপকারও করেছিলেন। সেটা কাজানে, একাদেমীতে — মনে আছে আমার। ক্রিসান্‌ফ্‌ মানে হচ্ছে 'সোনার ফুল,' খাঁটি কথা বলেছিলেন পামভা বেরীন্দা। সত্যিই উনি ছিলেন সোনার, ক্রিসান্‌ফ্‌!'

'কিন্তু পামভা বেরীন্দা কে?' জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মিত্রোপোলস্কি রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল:

'তা দিয়ে তোর কী দরকার?'

বাড়িতে ফিরে এসে আমার নোটবইয়ে লিখে রাখলাম: 'নিশ্চয়ই পামভা বেরীন্দা পড়তে হবে।' কেন জানি আমার মনে হয়েছিল যে সব প্রশ্ন আমার অন্তর কুরে খাচ্ছে তার জবাব পাব পামভা বেরীন্দার কাছে।

গির্জার এই গাইয়ে যতো সব কিম্ভুতকিমাকার নাম বলতে ভালোবাসত।

আর ভালোবাসত অদ্ভুত ভাবে কথা মিশিয়ে বলতে। এতে ভারি বিরক্ত লাগত আমার।

'জীবনটা আর্নিসিয়া নয়!' একদিন ও বলল।

'আর্নিসিয়া আবার কে?'

'আর্নিসিয়া — সে ভারি দরকারী চিজ,' আমার বিব্রত ভাব দেখে মজা পেয়ে বলল।

এ রকম ভাষা প্রয়োগ আর ও যে একাদেমীতে পড়েছিল তা জানা থাকায় ভেবেছিলাম লোকটার প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু ও অমন অনিচ্ছুক রহস্যময়তার সঙ্গে কথা বলত বলে বিরক্তি লাগত। ভাবতাম হয়ত কেমন করে ওর সঙ্গে আলাপ করতে হয় তা জানি না।

তবুও আমার মনের ভিতরে ও দাগ কেটে রেখে গেছে। পয়গম্বর ইশাইয়ার মতো ওর সেই নেশাগ্রস্ত ধিক্কার বাণীর সাহস ভালো লাগত আমার।

'ওরে পৃথিবীর আবর্জনার দল!' গর্জে উঠত সে, 'আজ দুষ্টেরা পুজো পাচ্ছে আর সাধুরা পদদলিত। কিন্তু শীঘ্রই বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে আর তখন — কিছুতেই কিছু হবে না, কিছুতেই কিছু হবে না!'

এই হতাশাভরা চিৎকার শুনে আমার মনে পড়ে যেত 'বাঃ বেশ' আর ধোপানী নাতালিয়ার কথা। কী ভীষণ দুঃখজনক অধঃপতন হয়েছে নাতালিয়ার। আর রাণী মার্গোর কথা — তাঁর গলায় কতো নোংরা কুৎসার মালা। ইতিমধ্যে কতো স্মৃতিই না জমা হয়ে গেছে আমার মনে...

এই লোকটির সঙ্গে আমার অল্প দিনের পরিচয় এক দিন অদ্ভুত ভাবে শেষ হয়ে গেল।

বসন্তকালে একদিন সৈনিকদের ছাউনির কাছে মাঠের ভিতরে দেখা হল ওর সঙ্গে। ও একা একা হাঁটছিল। মুখচোখ দারুণ ফোলা ফোলা। মাথাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলছে উটের মতো।

'হাওয়া খাচ্ছিস?' হেঁড়ে গলায় ও জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'আয় একসঙ্গে হাওয়া খাই। আমিও একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। ব্যায়রাম হয়েছে ভাই, সত্যি ব্যায়রাম...'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা লোক গর্তের ভিতরে পড়ে আছে। ঠেস দিয়ে একটু হেলে বসে রয়েছে। কোটটা একটা কানের কাছে উঠে আছে। মনে হয় যেন ও সেটা খুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

'মাতাল!' রায় ঘোষণা করে ও দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু দেখা গেল একটু দূরেই কচি ঘাসের উপরে পড়ে রয়েছে একটা বড়ো রিভলবার, একটা পুরুষের মাথার টুপি আর আধখাওয়া একটা ভদকার বোতল গলা পর্যন্ত ঘাসের ভিতরে ডুবানো। লোকটির মুখখানা কোটের কলারে ঢাকা, যেন লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে।

মিনিটখানেক আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মিত্রোপোলস্কি বলে উঠল:

'গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।'

আগেই আমার মনে হয়েছিল যে লোকটা মাতাল নয়, মরে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত যে সে চিন্তাটা জোর করেই সরিয়ে রাখছিলাম। মনে আছে ঐ বিরাট চকচকে খুলি আর কলারের উপরে বেরিয়ে-থাকা নীল কানটার দিকে তাকিয়ে ভয় বা দুঃখ, কোনো অনুভূতিই জেগে ওঠে নি। এমন চমৎকার বসন্তের দিনে কেউ যে আত্মহত্যা করতে পারে এটা বিশ্বাস করাই কষ্টকর।

যেন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে এমনি ভাবে মিত্রোপোলস্কি তার হাত দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গালটা ঘসতে ঘসতে বলল:

'বুড়ো বুড়ো দেখতে। বোধ হয় বৌ পালিয়ে গেছে। নয়ত টাকাকড়ির কষ্টে পড়েছিল...'

ও আমাকে শহরে পাঠিয়ে দিল পুলিসে খবর দিতে। আর নিজে গর্তের ধারে বসল পা ঝুলিয়ে। সুতো বের-হওয়া কোটটা দিয়ে কাঁধ দুটো জড়িয়ে নিল আঁট করে। পুলিসকে ঐ আত্মহত্যার সংবাদ দিয়েই আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে এলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই গাইয়ে মৃত লোকটার ভদকার বোতলটায় যা বাকি ছিল শেষ করে ফেলেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই শূন্য মদের বোতলটা নাড়তে আরম্ভ করে দিল।

'এই যে, এই হল ওর সর্বনাশের কারণ!' চিৎকার করে বলে উঠেই ও বোতলটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

একটা পুলিস আমার পিছন পিছন ছুটে আসছিল। গর্তটার ভিতরে তাকিয়ে টুপি খুলে ফেলল। তারপর অনির্দিষ্ট ভাবে ক্রুশ করতে করতে গাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কে?'

'তা দিয়ে তোর দরকার নেই...'

একটু ভেবে নিয়ে পুলিসের লোকটি আরো নম্র ভাবে বলল:

'এ কেমন ব্যাপার! একটা মানুষ এখানে মরে পড়ে আছে আর আপনি মদ খাচ্ছেন!'

'গত বিশ বছর ধরেই আমি মদ খাচ্ছি!' গর্বভরে বুক ঠুকে বলে উঠল গায়ক।

আমার সন্দেহ ছিল না ভদকাটা খেয়ে ফেলার জন্যে নিশ্চয়ই পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করবে। আরো অনেক লোক ছুটে এল শহর থেকে। ইতিমধ্যে একজন কড়া পুলিস অফিসার এসে হাজির হল গাড়ি করে। সে গর্তের ভিতরে নেমে গিয়ে কোটটা তুলে ধরল আত্মহত্যাকারীর মুখ দেখতে।

'কে আগে দেখেছে?'

'আমি,' বলল মিত্রোপোলস্কি।

পুলিস অফিসার তীব্র দৃষ্টিতে চকিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে টেনে-টেনে ভীতিপ্রদ কণ্ঠে বলল:

'আঃ, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম, মহাশয়!'

প্রায় ডজন দুয়েক দর্শক এসে জড়ো হয়েছিল। প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে তারা গর্তের চারপাশে ভিড় করে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভিতরের দিকে। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল:

'ও একজন কেরাণী। আমাদের পাড়ার — আমি চিনি ওকে!'

পুলিস অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিত্রোপোলস্কি দুলল, অস্পষ্ট ভাবে তর্ক করল, চেঁচাল কর্কশ গলায়। অফিসার ওর বুকের উপরে একটা ধাক্কা দিতেই ও কাত হয়ে টলে গিয়ে বসে পড়ল। বাধ্যের মতো হাত দুটো পেছন দিকে এগিয়ে দিল আর আগে আসা পুলিসটা ধীরে সুস্থে একগাছা দড়ি বের করে গায়কের হাত দুটো বেঁধে ফেলল। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অফিসার ধমকে উঠল:

'ভাগ এখান থেকে নচ্ছারগুলো!'

আর একটা পুলিস, ভেজা লাল চোখ, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ছুটে এল। তারপর গায়কের হাতে বাঁধা দড়িটার শেষ প্রান্ত ধরে ওকে শহরের দিকে নিয়ে চলল।

দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়ে আমিও মাঠ ছেড়ে চলে গেলাম। স্মৃতির

ভিতরে কেবলি দাঁড়কাকের কর্কশ কা-কা ডাকের মতো সেই কথা ক'টি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল:

'আরিয়েল শহরের বুকে নেমে আসুক দুঃখের রাত!..'

ধীরে সুস্থে পুলিসটা যেভাবে পকেট থেকে দাড়টা টেনে বের করল, আর সেই ভয়ংকর-মূর্তি প্রচারক শান্ত ভাবে তার রোমশ হাত দুটো পিছনে তুলে দিল এমন ভাবে যেন হাজার বছর ধরে ও এই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে এসেছে — এ ছবিটাও আমার মন থেকে কিছুতেই মোছবার নয়...

পরে শুনেছিলাম প্রচারককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেছে। তার কিছুদিন পরে ক্লেশ্চভও চলে গেল। খুব লাভজনক একটা বিয়ে করে সে চলে গিয়েছিল গাঁয়ে, সেখানে গিয়ে জিন তৈরীর দোকান খুলে বসেছিল।

আমি প্রায়ই মনিবের কাছে ওর গানের প্রশংসা করতাম, মনিব একদিন বলল:

'আমি যাব সরাইখানায় ওর গান শুনতে।'

একদিন মনিব এল। আমার মুখোমুখি বসল একটা টেবিলে। চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল তার, বিস্ময়ে ভ্রূ দুটো কপালে উঠে গেল।

সরাইখানায় আসার পথে গোটা পথটা আমাকে খেপাতে খেপাতে এসেছে। এমন কি যখন এসে ঘরে ঢুকলাম তখনও আমাকে নিয়ে, অন্য সব খদ্দেরদের নিয়ে, তীব্র দম-আটকে-আসা দুর্গন্ধের কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

জিনওয়ালা গাইতে আরম্ভ করলে আমার মনিব মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে এক গ্লাস বিয়ার ঢালতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারপর আধপথেই থেমে গিয়ে বলে উঠেছিল:

'হুঁ... শয়তানটা করে কী!'

খুব আস্তে কাঁপা কাঁপা হাতে বোতলটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে শুনতে শুরু করেছিল সে।

'ঠিকই বলেছ ভাই,' ক্লেশ্চভের গান শেষ হতেই নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে উঠল, 'কেমন গান গাইতে ও জানে, চুলোয় যাক সব! লোকটা আমার গায়ে ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছে হে...'

আবার জিনওয়ালা গান ধরল। মাথাটা পিছন দিকে হেলানো, দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে সিলিংয়ের গায়ে:

> ধনীর গাঁয়ের পথ ধরে
> কন্যে এল প্রান্তরে...

'হ্যাঁ, গাইতে পারে বটে লোকটা,' একটু হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মনিব।

বাঁশীর মতো কাঁপা কাঁপা সুরে গেয়ে চলেছে ক্লেশ্চভ:

কন্যে তারে বললে, ওগো
অনাথিনীর কেউ নেই কো...

'অপূর্ব,' ফিস্ ফিস্ করে বলল মনিব লাল চোখ দুটো পিট পিট করতে করতে, 'চুলোয় যাক সব... লোকটা অপূর্ব!'

মনিবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। আনন্দে মন প্রাণ ভরপুর হয়ে এল আমার। গানের বেদনাভরা কথাগুলো সরাইখানার গোলমাল ছাপিয়ে ক্রমেই আরো শক্তিশালী, আরো সুন্দর, আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল:

এমন বঁধু নেইকো গাঁয়ে আমার পানে চায়
সখাসখির বাসর চলে, আমার যে কেউ নয়,
এমন কিষান একজনও নেই আমার রূপে ভোলে,
সাজার মতো বসন ভূষণ নেইকো আমার বলে,
বৌ-মরা এক বুড়ো আমায় চাইবে নিতে ঘরে
সাধ আহ্লাদ নেইকো আমার এমন ঘরে বরে!..

লজ্জা ভুলে মনিব কাঁদতে শুরু করে দিল। মাথা নুইয়ে বসে রইল ও। জোরে জোরে ফোঁপাল। হাঁটুর উপরে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ল ঝরে।

তৃতীয় গানটা শেষ হয়ে গেলে পর দারুণ বিচলিত হয়ে বলে উঠল:

'আর এখানে বসে থাকতে পারছি না — হাওয়া নেই, যা দুর্গন্ধ... চলো বাড়ি যাই!..'

কিন্তু পথে বেরিয়েই ওর মত বদলে গেল।

'জাহান্নামে যাক সব, পেশকভ! চলো হোটেলটায় গিয়ে কিছু খাই! বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না!..'

দর দাম নিয়ে কোনো খিচ্ খিচ্ না করেই একটা স্লেজে চেপে বসল ও। হোটেলে না পৌঁছন পর্যন্ত সে একটি কথাও বলল না। হোটেলে ঢুকে কোণার দিকে একটা টেবিলে বসেই ঘন ঘন চার দিকে তাকাতে তাকাতে আস্তে

আস্তে কথা বলতে আরম্ভ করল, যেন কী এক গভীর আঘাতের ব্যথায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে:

'বুড়ো ছাগলটা আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে... এমন মন খারাপ করে দিল... শোনো, তুমি অনেক পড়ো, অনেক ভাবো—কেমন করে এ জিনিসটার ব্যাখ্যা করবে বলো তো? ধরো, জীবন কাটিয়ে চলেছি। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। চল্লিশটা বছর পিছনে ফেলে এসেছি। বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে। কিন্তু এমন কেউ-ই নেই যার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলতে পারি! এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছে হয় কারুর কাছে অন্তর উজাড় করে ঢেলে দিই — যা কিছু বলার আছে সব বলি -- কিন্তু বলার কেউ নেই! যদি বলো বৌয়ের কাছে, সেটা মাথায় ঢুকবে না। তার কী? তার নিজের ছেলেপুলে আছে... ঘরদোর আছে, আছে তার নিজের ভাবনা চিন্তা! আমার আত্মার বাইরে সে। বৌ ততক্ষণই বন্ধু যতক্ষণ প্রথম ছেলে না এল... এই হল ব্যাপার। তাছাড়া, এক কথায় আমার স্ত্রী... সে তো... নিজের চোখেই তা দেখেছ... এতটুকু আনন্দের কোনো ব্যাপার নেই তার সঙ্গে... শুধুই এক তাল মাংসপিণ্ড, চুলোয় যাক! আঃ ভাই, মনের যে কী যন্ত্রণা...'

দমকে দমকে ঠাণ্ডা তিতো বিয়ার গিলে চুপ করে ও বসে বসে মাথার লম্বা চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে টেনে টেনে এলোমেলো করতে লাগল। তারপর আবার বলতে লাগল:

'এক কথায় বলতে গেলে, বুঝলে ভাই, মানুষ হচ্ছে বেজন্মার জাত! আমি দেখেছি তুমি ঐ চাষীগুলোর সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসো এটা সেটা নিয়ে... কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানি অবস্থাটা কী জঘন্য, ওরা কতো জঘন্য, সত্যি কথা ভাই। ওরা সব হচ্ছে চোর। ভাবো তোমার কথা ওরা মানে? এতটুকুও না! পিওতর আর অসিপের কথাই ধরো না কেন — ওরা আরো জঘন্য। তুমি যা কিছু বলো না কেন, ওরা এসে সব আমার কাছে বলে দেয়—এমন কি আমার নিজের সম্পর্কে যে সব কথা বলো তাও... কী বলবে ওদের?'

জবাব দেব কি আমি একেবারে হতভম্ব।

'তবেই দেখো!' একটু হেসে বলল মনিব। 'তোমার পারস্যে যাওয়ার মতলবটা ভালোই ছিল। অন্তত বুঝতে পারতে না লোকে কী বলে—বিদেশী ভাষা। কিন্তু তোমার নিজের ভাষায় শুধু নোংরামী ছাড়া আর কিছুই নেই!'

'আমি যা বলি অসিপ এসে তা বলে দেয়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই! অবাক হচ্ছ? সবার চাইতে বেশি বলে ও। ব্যাটা একটা আস্ত বাক্যবাগীশ। ভীষণ ধূর্ত, বুঝলে ভাই। না, ভাই পেশকভ, কথায় লোকের অন্তর ভেজে না। সত্য? কে শুনতে চায় সত্য? ওটা ঠিক শরৎকালের বরফের মতো — কাদায় পড়ে গলে যায়। আরো বেশি কাদা হওয়া ছাড়া আর কিছুই তার থাকে না। বরং মুখ বুজে থাকো, সেটাই ভালো।'

গ্লাসের পর গ্লাস বিয়ার টেনে চলল ও। আর মাতাল না হয়ে ক্রমেই দ্রুত আরো তিক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল:

'কথায় বলে: নীরবতা হচ্ছে সোনা, আর কথা মরচে। কী বলো, ভাই—জীবনটা বড়োই দুঃখের, বড়োই নিঃসঙ্গ... ও যা গাইল কথাটা সত্যি: এমন বঁধু নেইকো গাঁয়ে আমার পানে চায়। সব লোকে অনাথ...'

চারদিকে একবার দেখে নিয়ে গলা নিচু করে বলতে লাগল:

'কিছুদিন আগে প্রায় পেয়ে গিয়েছিলাম... একজনকে যে আমার মরমী, এখানকারই একটি মেয়েমানুষ। বিধবা, অর্থাৎ, টাকা জাল করার অপরাধে তার স্বামীর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। এখনো সে সেখানেই জেলে। তারপর, সেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হল আমার। একটি কপর্দকও ছিল না তার হাতে—সুতরাং সে ঠিক করল—মানে... এক ঘটকী আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল... চোখ তুলে একবার তাকালাম তার দিকে—কী মিষ্টিই না মেয়েটি ছিল! সত্যিকারের সুন্দরী—আর এতো অল্প বয়েস, এমন সুন্দরী! ওর কাছে যাতায়াত শুরু করলাম। একবার... দুবার... তারপর বললাম ওকে, 'এটা কেমন কথা, তোমার স্বামী জেলে গেছে, তুমি সোজা সহজ পথ বেছে নিচ্ছ না কেন? কেন তুমি তার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় চলেছ?' বুঝলে, ও সাইবেরিয়ায় যাবার মতলব আঁটছিল। কিন্তু সে আমাকে বললে, 'ও যাই কিছু হোক না কেন, আমার কাছে ও ভালোই থাকবে চিরদিন। কারণ আমি ওকে ভালোবাসি। হয়ত আমার জন্যেই ও অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে। আর আমিও ওরই জন্যে তোমার সঙ্গে এই অন্যায় কাজ করছি। ওর টাকার দরকার। ও ভদ্রলোকের ছেলে, ভালো ভাবে বাস করে এসেছে চিরকাল। আমি যদি একা হতাম তবে আমিও সৎ ভাবেই থাকতাম। তুমিও লোক ভালো। তোমাকেও আমার ভালো লাগে,' এই সব বলল সে, 'কিন্তু এমন কথা আর কোনো দিনও মুখে এনো না আমার সামনে...' চুলোয় যাক

সব!.. আমার কাছে যা কিছু ছিল সব ওকে দিয়ে এলাম—প্রায় আশি রুবলের মতো। আর বললাম, 'আমাকে মাপ করো, আর আমি তোমার কাছে আসতে পারব না। কিছুতেই পারব না!' এই করে তো চলে এলাম...'

পরে একটু থেমে, ইতিমধ্যে ও মাতাল হয়ে পড়েছে, মনে হল এক্ষুণি ঢলে পড়বে—বিড় বিড় করে বলল:

'মোট ছ'বার গেছি আমি তার কাছে... ভাবতেও পারবে না সে কী জিনিস! বোধ হয় পরেও আরো ছ'বার গেছি তার বাড়ির কাছ পর্যন্ত... কিন্তু ভিতরে ঢোকার সাহস হয় নি... কিছুতেই মন ঠিক করতে পারি নি! এখন সে চলে গেছে...'

টেবিলের উপরে হাত রেখে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিতে আরম্ভ করল সে।

'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি জীবনে আর কোনো দিনও যেন তার সঙ্গে দেখা না হয়,' ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ভগবান না করুন! তবে সেই দিনই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে! চলো বাড়ি যাই... চলে এসো!'

বাইরে বেরিয়ে এলাম। ও তখন টলছে আর বিড় বিড় করে বলছে:

'এখন বুঝলে তো ভাই...'

ওর কথায় আমি অবাক হই নি। কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে ওর জীবনে।

কিন্তু জীবন সম্পর্কে ওর মতামতে আর বিশেষ করে অসিপ সম্পর্কে ও যা বলল তাতে আমার মনটা ভীষণ ভাবে দমে গেল।

২০

তিন গ্রীষ্ম এই মৃত নগরীর শূন্য বাড়িগুলোয় 'ওভারসিয়ারের' কাজ করলাম। দেখতাম প্রত্যেক শরতে মজুরেরা ভাঙ্গছে পাথুরে দোকানঘরগুলি, আবার প্রত্যেক বসন্তে গড়ে তুলছে।

মাইনে বাবদ পাওনা পাঁচটি রুবলের প্রত্যেকটি যাতে আমি খেটে শোধ করি সেদিকে মনিবের নজর ছিল কড়া। যদি কোনো দোকানঘরের নতুন করে মেঝে তৈরী করতে হত তবে আমায় গোটা মেঝের প্রায় দু'ফিট মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলে দিতে হত। ও কাজে যে কোনো মামুলি মজুরের মজুরী এক রুবল। কিন্তু আমাকে কিছুই দেয়া হত না। কিন্তু এ কাজে ব্যস্ত থাকার

দরুন ছুতোরদের দিকে নজর রাখতে পারতাম না। এই সুযোগে ওরা স্ক্রু খুলে তালা, দোরের হাতল সরিয়ে নিত। ছোটখাটো চুরিচামারি করত। মজুরেরা, ঠিকেদারেরা সব রকমেই চেষ্টা করত আমাকে ঠকাতে। চুরি করত প্রায় চোখের সামনেই, যেন কোনো দারুণ প্রয়োজনের তাগিদেই চুরি করছে। যখন ধরে ফেলতাম, ওরা রাগত না, কিন্তু অবাক হয়ে বলত:

'পাঁচ রুবলের জন্যে তুমি এমন খাটুনি খাটছ যেন ওটা বিশ রুবল! দেখলে হাসি পায়!'

মনিবকে দেখালাম যে আমাকে দিয়ে একটা টাকা বাঁচাতে গিয়ে তার ঢের বেশি লোকসান হচ্ছে। কিন্তু চোখ মটকে সে জবাব দিল:

'আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করো না!'

বুঝতে পারলাম চোরেদের সঙ্গে আমার সাট আছে বলে ও সন্দেহ করছে। কিন্তু এতে আমি ক্ষুব্ধ হলাম না, বরং ঘেন্না ধরে গেল ওর উপরে। ব্যবস্থাটাই এমনি: সবাই চুরি করছে, এমন কি পরের জিনিস আত্মসাৎ করতে আমার মনিবেরও এতটুকুও দ্বিধা ছিল না।

মেলা ভেঙে গেলে পরে কোথায় কি মেরামত করতে হবে না হবে তা দেখার জন্যে দোকানঘরগুলি ঘুরে ঘুরে ও দেখত। প্রায়ই ভুলে-যাওয়া সামোভার, থালা, কম্বল, কাঁচি, এমন কি জিনিসপত্রে বোঝাই বাক্স-পেটরা পর্যন্ত পেত। একটু হেসে বলত:

'এগুলোর একটা তালিকা করে গুদাম ঘরে রেখে দাও!'

গুদামঘর থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র নিজের বাড়িতে চালান দিয়ে আমাকে বলত ওই জিনিসগুলোর নাম বাদ দিয়ে নতুন একটা তালিকা তৈরী করতে।

সম্পত্তির উপরে আমার লোভ ছিল না। তাই কোনো জিনিস দখল করারও ইচ্ছে হত না। এমন কি বইও বোঝা মনে হত। আমার নিজের সম্পত্তি বলতে ছিল বেরাঞ্জের একটা ছোট বই আর হাইনের কবিতা। ইচ্ছে ছিল পুশকিনের বই কিনব, কিন্তু শহরের ভিতরের একমাত্র পুরনো বইয়ের দোকানী খিটখিটে বুড়োটা অনেক দাম হাঁকল আমার কাছে। আসবাবপত্র, কম্বল, আয়না প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস দিয়ে মনিবের ঘর ঠাসা, সে সব ভালো লাগত না আমার। ওগুলোর বিশ্রী চেহারা, বার্নিশ ইত্যাদির গন্ধে বিরক্তি ধরে যেত। এক কথায় মনিবদের ঘরগুলো ভালো লাগত না আমার। দেখে মনে হত যেন নানান রকমের আবর্জনায় ভরা

একটা বাক্স। আরো বিশ্রী লাগত যখন দেখতাম মনিব অন্যের জিনিস গাড়ি বোঝাই করে বাড়িতে নিয়ে এসে নিজের চারপাশের তুচ্ছতা বাড়িয়ে চলেছে। রাণী মার্গোর ঘরও আসবাবপত্রে ঠাসা ছিল, কিন্তু সেটা অন্তত দেখতে সুন্দর ছিল।

জীবনটাই আমার অসংলগ্ন, সামঞ্জস্যহীন, অর্থহীন বাহুল্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত মনে হত। এই যে আমরা দোকানঘর মেরামত করছি—বসন্তকালের প্লাবনে এসবই ডুবে যাবে। মেঝেগুলো ফুলে ফেঁপে উঠবে, দরজাগুলো যাবে বেঁকে। যখন জল পড়বে কড়ি বর্গাগুলো যাবে পচে। বছরের পর বছর বহু বছর ধরে মেলার মাঠ এমনি প্লাবনে ডুবে যাচ্ছে, বাড়ি, বাঁধানো উঠোন সবকিছুই যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। বার্ষিক প্লাবনে বহু লোকসান হচ্ছে। আর একথাও সবারই জানা যে আপনা আপনি এটা বন্ধ হবে না।

প্রত্যেক বছর বসন্তকালে যখন বরফ ভাঙ্গত তখন কয়েক ডজন বজরা, ডিঙ্গি, নৌকো বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে যেত। মানুষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হা-হুতাশ করে আবার নতুন নৌকো গড়ত, শুধু পরের বছরের বরফ গলার সময়ে সেগুলো আবার ভেঙ্গে যাবে বলে। এমন এক দুষ্ট চক্রের ভিতরে ঘুরপাক খাওয়া মানুষ সইতে পারে কী করে!

এ সম্পর্কে অসিপকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, মনে হল ও যেন একটু অবাক হয়ে গেছে। তারপর ঠাট্টা করে বলল:

'ঐ কাকটার দিকে তাকিয়ে দেখ, কেমন করে ডাকছে! কী আসে যায় তাতে? কী ধার ধারিস তুই ওর?'

তারপর গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল। নীল চোখ দুটো ওর বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, সে চোখে তখনো ওর বিদ্রূপভরা ফুলকি নিভে যায় নি।

'খুব বুদ্ধি করে এসব জিনিস বার করছিস বটে! হতে পারে এসব জিনিসে তোর কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু আবার এমনও হতে পারে একদিন এগুলো তুই খুব ভালো কাজেই লাগাতে পারবি। বুঝতে চাস তো আবার এই দ্যাখ না...'

তারপর সে ছোট ছোট শুকনো কথায় মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম্য প্রবাদ, অপ্রত্যাশিত উপমা, আর রসিকতার আমেজ মিশিয়ে বলে চলল:

'এই দ্যাখ না নালিশ করছে: জমি নেহাৎ কম। প্রত্যেক বসন্তে ভলগা পাড় ভেঙ্গে মাটি মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলে চর তুলছে। আবার অন্য

লোকে নালিশ করছে: ভলগায় চর পড়ছে! বসন্তের বান আর গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে নালা হয়ে হয়ে সে জমি আবার ভেঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে ভলগার গর্ভে!'

ওর বলার ভিতরে অনুশোচনা নেই, নেই অভিযোগ। যেন জীবনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ যে তার জানা আছে এতেই সে খুশি। যখন দেখলাম আমার চিন্তার ধারা ওর কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তখন শুনতে দারুণ কষ্ট হতে লাগল।

'আর একটা জিনিস হল—আগুন...'

জানতাম এমন কোনো গ্রীষ্ম যায় না যেবার ভলগার ওপারের বনে আগুন লাগে না। প্রত্যেক বার জুলাই মাসে জাফরানী রঙ্গের ধোঁয়ার মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। আর তারই ফাঁক দিয়ে কিরণহীন নিস্তেজ সূর্য ঘেয়ো চোখের মতো তাকিয়ে থাকে মাটির দিকে।

ওসিপ বলল, 'বনের আগুনও কিছু নয়। বন হল গে' জমিদার আর জারের সম্পত্তি। চাষীদের কোনো বনের মালিকানা নেই। যখন কোনো বড়ো শহর পুড়ে যায় তাতেও তেমন কোনো অনিষ্ট হয় না—বড়ো শহরে বাস করে বড়ো বড়ো ধনীরা। সুতরাং ওদের জন্যে দুঃখ করার মানে নেই। কিন্তু ধর ছোট শহর আর গাঁ—এক একটা গ্রীষ্মকালে কতগুলো গাঁ পুড়ে ছাই হয়ে যায়? অন্তত শ'খানেক। সেটাই হল গে' আসল ক্ষতি!'

ওসিপ নীরবে একটু হাসল।

'আমাদের ব্যথা আছে, কিন্তু মাথা নেই। তুই আমি কী দেখছি? মানুষের মেহনতের ফল তার নিজের বা তার জমির উপকারে যাচ্ছে না। যাচ্ছে জলে আর আগুনে!'

'হাসছ কেন?'

'হাসব না-ই বা কেন? চোখের জলে তো আর আগুন নেভানো যায় না, তাতে শুধু বানই বেড়ে যাবে।'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যতো লোকের সংস্পর্শে এসেছি তাদের ভিতরে এই শান্ত বুড়ো মানুষটিই হচ্ছে সবচাইতে বেশি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। কিন্তু ওর পছন্দ-অপছন্দের হদিস আমি কিছুতেই পাই নি।

এসব কথা নিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম, আর ও সমানে আমার চিন্তার আগুনে কথার ইন্ধন যুগিয়ে চলছিল:

'দেখ, কেমন করেই না মানুষ তার শক্তি নষ্ট করে চলেছে—তার নিজের শক্তি, অন্যের শক্তি সব! ধর কেমন করে তোর মনিব তোকে নিংড়ে নিঃশেষ

করে নিচ্ছে। কিংবা, ধর কী অনিষ্টই না হচ্ছে ভদকায়। এর কোনো হিসেব নিকেশ নেই—শিক্ষিত জ্ঞানী লোকেরাও এর কোনো হিসেব পাবে না... একটা কুঁড়েঘর যদি পুড়ে যায় তবে আর একটা তৈরী করে নেওয়া যায়। কিন্তু একটা ভালো লোক যদি অধঃপাতে চলে যায় তবে আর কোনো শোধরাবার পথ নেই। যেমন ধর, আর্দালিয়ন কি গ্রিগোরি। দেখ দেখি ঐ চাষীটা কেমন করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গ্রিগোরিটা যে খুব বুদ্ধিমান ছিল তা নয়, কিন্তু মনটা ছিল দরাজ। এমন করে জ্বলে উঠল যেন একটা খড়ের গাদা। পচা মড়ার উপরে যেমন পোকা ছেঁকে ধরে তেমনি করে মেয়েমানুষগুলো ছেঁকে ধরেছে ওকে।'

'তোমাকে যে সব কথা বলি সে সব তুমি আমার মনিবের কাছে গিয়ে বলে দাও কেন?' নিছক কৌতূহল বশেই জিজ্ঞেস করলাম ওকে। আদৌ কোনো খারাপ ভাব ছিল না।

আর সেও তেমনি সহজ, এমন কি ভদ্র ভাবেই জবাব দিল:

'বলি যাতে সে জানতে পারে তোর মতিগতি কী ভীষণ ক্ষতিকর! তারই উচিত শিক্ষা দেয়া। মনিব ছাড়া কে আর তোকে শেখাবে বল্? তোর উপরে শত্রুতা করে যে বলি তা নয়, বলি দুঃখ হয় বলেই। তুই বোকা নোস। কিন্তু একটা দৈত্য আছে, সে তোর মগজের ভিতরে সবকিছু ঘুলিয়ে তোলে। তুই যদি কিছু চুরি করিস তবে তাতে আমি মুখ বুজে থাকব। ছুঁড়িদের পেছনে ঘুরিস যদি তাহলেও কিছু বলব না। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়লেও একটি কথা মুখে আনব না। কিন্তু তোর ঐ সব যতো বাজে চিন্তা—তার কথা আমি বলে দেবই দেব, এটা তুই জেনে রাখিস...'

'আর আমি কোনো কথা বলব না তো তোমার কাছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ওসিপ। হাতের তেলো থেকে আলকাতরার চটা তুলতে লাগল। তারপর স্নেহ কোমল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'বাজে কথা! বলবি নিশ্চয়ই। নইলে কার কাছে বলবি? বলার মতো একটি লোকও নেই এখানে...'

ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছদ সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ওসিপ যেন ফায়ারম্যান ইয়াকভে রূপান্তরিত হয়ে উঠল—সবার সম্পর্কে, সমস্ত কিছু সম্পর্কে তেমনি উদাসীন, নিস্পৃহ।

কোনো কোনো সময়ে ওকে দেখে মনে পড়ত শাস্ত্রবাগীশ পিওতর

ভার্সিলিয়েভিচের কথা, কখনো গাড়োয়ান পিওতরের কথা। আবার এক এক সময়ে মনে হত যেন ওর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে দাদুর সঙ্গে। একদিক থেকে না একদিক থেকে আমার চেনা জানা সমস্ত বুড়োদের সঙ্গেই ওর মিল ছিল। এই সবকটা বুড়োই অদ্ভুত রকমের আকর্ষণীয়। কিন্তু অনুভব করতাম ওদের সঙ্গে বাস করা কঠিন, বিরক্তিকর। মনে হত, ওরা যেন ওদের বিজ্ঞ উপদেশে মানুষের অন্তর কুরে কুরে খাবে, জীর্ণ করে দেবে হৃদয়। অসিপ কি ভালো লোক? না। খারাপ লোক? তাও না। স্পষ্টই দেখতে পেতাম ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ওর মনের বহুমুখীনতায় একদিকে যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম, অন্যদিকে তেমনি অনুভব করতাম ওর চিন্তাধারার একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এসে পড়ছে আমার উপরে। সবদিক থেকে সেটা আমার নিজস্ব চিন্তাধারার পরিপন্থী।

আমার ভিতরে ফুঁসে উঠতে লাগল যতো হিংস্র চিন্তা:

'যে যতোই হাসুক আর মিঠে মিঠে কথা বলুক সবাই সবার কাছে বিজাতীয়ের মতো শত্রু। সবাই বিজাতীয়। তাদের কেউই বোধ হয় ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনে জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে নি। একমাত্র দিদিমা সত্যি করেই ভালোবাসেন জীবনকে, মানুষকে। দিদিমা আর সেই অপূর্ব মহিলা—রাণী মার্গো।'

থেকে থেকে এই ধরনের চিন্তা কালো মেঘের মতো ভিড় করে এসে জীবনকে শ্বাসরোধী আর বিষণ্ণ করে তুলত। কিন্তু এছাড়া আর অন্য কী ধরনের জীবন আছে? কেমন করে নিষ্কৃতি পাব! অসিপ ছাড়া আর কেউ নেই যার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি। তাই আরো ঘন ঘন ওর সঙ্গেই কথা বলতাম।

ও আমার আবেগভরা কথাগুলো শুনত সুস্পষ্ট আগ্রহ নিয়ে। প্রশ্ন করত, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করত, তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে বলত:

'কাঠ্‌ঠোকরা জেদী পাখি, কিন্তু ভয়ংকর নয়। কেউ ওকে ভয় পায় না। আমি মন খুলে বলছি তোকে, যতোদিন না তোর উপযুক্ত বয়েস হয় ততদিন তুই কোন মঠে গিয়ে থাক। ভালো ভালো কথা বলে বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দিবি। তোর মনে শান্তি আসবে, সাধুমোহান্তদের মুনাফা বাড়বে। একান্ত আন্তরিক ভাবে তোকে বলছি, তাই কর্ গে'। এ সংসারে তুই খাপ খাইয়ে চলতে পারবি না...'

মঠে ঢোকার আদৌ কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু মনে হত

আমি যেন কী এক দুর্বোধ্যতার গোলক-ধাঁধার ভিতরে হারিয়ে গেছি। তা থেকে পরিত্রাণ চাইছিলাম। জীবন হয়ে উঠেছে যেন শরতের একটা বনভূমি। ব্যাঙের ছাতা ফুরিয়ে গেছে। পড়ে আছি এক কর্মহীন শূন্যতার ভিতরে যার প্রতিটি কোণা-খাঁচি একান্ত ভাবেই আমার চেনা।

আমি ভদকা খেতাম না। মেয়েদের সঙ্গেও প্রেম করতাম না। প্রাণ মাতোয়ারা করে তোলার এ দুটো প্রক্রিয়ার স্থান অধিকার করেছিল আমার বই। যতোই পড়তাম ততোই বেশির ভাগ লোক যেমন করে জীবন কাটায় তেমনি শূন্য, ফাঁকা, অর্থহীন ভাবে জীবন কাটানো আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠত।

সবে পনেরো পেরিয়েছি। কিন্তু এক এক সময়ে মনে হত যেন আমি বুড়ো। যে সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, আর যা কিছু পড়েছি, যা কিছু ভেবেছি এলোমেলো ভাবে, সবকিছু মিলে আমার অন্তর যেন ফুলে ভারি হয়ে উঠত। আমার স্মৃতির ভাণ্ডার যেন এক অন্ধকার গুদামঘর অসংখ্য জিনিসপত্রে ঠাস-ভরাট। আমার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই সেগুলোকে বেছে গুছিয়ে তুলি।

সংখ্যার বিপুলতার দিক থেকেই শুধু না, এই সব স্মৃতির বোঝাও এত ভারি যে আমাকে তারা দৃঢ় ভাবে খাড়া হতে দেয় না। নড়বড়ে এক পাত্র জলের মতোই আমাকে এদিক ওদিক দুলিয়ে দিয়ে চলেছে।

অভিযোগ, ক্লেশ, অমঙ্গলকে ঘৃণা করতাম আমি। পাশবিক দৃশ্য, রক্ত, মারামারি এমন কি মৌখিক গালাগালিতে পর্যন্ত আমার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিরূপতা জেগে উঠত। সহজেই সে বিরূপতা দুর্বার ক্রোধে রূপান্তরিত হত। তখন হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তাম, শুধু তারপরে এক নিষ্ঠুর অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরতাম।

এক এক সময়ে এমনি কোনো এক পীড়নকারীর গায়ের চামড়া ছুলে নেয়ার উত্তেজিত উদ্দীপনায় অন্ধের মতো মারপিটের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আজ পর্যন্ত যখনই সেই অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত মরিয়া হতাশার অন্ধ আবেগের কথা মনে পড়ে তখন লজ্জায় দুঃখে অন্তর অভিভূত হয়।

দুটো লোক বাস করত আমার ভিতরে: একটি লোক অত্যধিক পরিমাণে নোংরামো, ক্লেদাক্ততা দেখে দেখে সংকুচিত হয়ে গেছে। জীবনের ভয়ংকর তুচ্ছতা তাকে করে তুলেছে সংশয়বাদী সন্দিগ্ধ। অসহায় অনুকম্পাভরা দৃষ্টিতে সে দেখত সমস্ত মানুষকে। এমন কি নিজেকেও। এই নিঃসঙ্গ

একক মানুষটি চাইত মানুষজন শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে দূরে শান্ত কর্মহীন জীবন যাপন করতে। সে স্বপ্ন দেখত পারস্যে যাবার, মঠে ঢোকার, বনবাসীর কুঁড়েঘরে নয়ত রেলের পাহারাদারের ঘরে গিয়ে বাস করার, কিংবা শহরের বাইরে রাত-চৌকিদারের কাজ নেওয়ার। লোক সমাগম যেখানে যতো কম, যতোই দূরের জায়গা, ওর কাছে তা ততোই ভালো।

অন্য লোকটি, সত্য জ্ঞানগর্ভ বইয়ের পবিত্র প্রেরণায় দীক্ষিত হয়ে বুঝতে পেরেছিল যে জীবনের ঐ ভয়ংকর একঘেয়েমির মধ্যে এমন এক নির্মম অমোঘ শক্তি আছে যা অনায়াসেই তার নিজের মাথাটা ছিঁড়ে নিতে পারে, বা পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারে নিষ্ঠুর ভাবে। আর তাই আত্মরক্ষার তাগিদে সে দেহের সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করে দাঁত কিড়মিড় করে, ঘুসি পাকায়, সব সময়েই লড়াইয়ের জন্যে বা তর্কের জন্যে মুখিয়ে থাকে। তার অন্তরের ভালোবাসা আর করুণা অভিব্যক্তি চাইত সংগ্রামে। ফরাসী উপন্যাসের সাহসী বীরের মতোই ক্ষুদ্রতম উস্কানীতেই সে চাইত খোলা তরবারি হাতে রুখে দাঁড়াতে।

এই সময়ে আমার একজন সাংঘাতিক শত্রু হল—মালায়া পোকরোভ্স্কায়া স্ট্রীটের এক বেশ্যাপল্লীর দারোয়ান। একদিন সকালে মেলার মাঠে যাওয়ার পথে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। দেখলাম মদে বেহুঁশ একটা মেয়েকে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে। মেয়েটার পায়ের মোজা গুটিয়ে গিয়েছে। সেই পা দুটো ধরে ও এমন অশ্লীল ভাবে টানা-হেঁচড়া করছে যে মেয়েটার পা থেকে কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ। লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল, হাসতে লাগল, মেয়েটার নগ্নদেহে থুথু দিতে শুরু করল। মেয়েটার অবস্থা এলোমেলো, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে, লোকটার ধাক্কায় ধাক্কায় ছেঁচড়ে নেমে আসছিল। ওর অবশ হাত দুটো দেখে মনে হচ্ছিল যেন গ্রন্থি খুলে আলগা হয়ে গেছে। হাতখানা মাথার উপরে লম্বা হয়ে পড়ে। তারপর ধাক্কা খেল প্রথমে গাড়ির গদির সঙ্গে, পরে পা-দানির উপরে, অবশেষে বাঁধানো পথে।

কোচোয়ান চাবুক হাঁকড়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেল। আর দারোয়ান মেয়েটির পা দুটো মালগাড়ির কাঠের মতো ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। উন্মাদ ক্রোধে আমি তেড়ে গেলাম দারোয়ানের দিকে। কিন্তু ভাগ্য ভালো, আমার হাতের সাতফুট লম্বা মাপকাঠিটা হয় আমি নিজেই ছুঁড়ে ফেলে

দিয়েছিলাম হাত থেকে, নয়ত হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল। তাই দারোয়ান আর আমি উভয়েই এক সাংঘাতিক পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। পুরো দমে ওর দিকে ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় ওকে চিত করে ফেলে দিলাম, তারপর ফটকের আলিন্দের উপরে লাফিয়ে উঠে মরিয়া হয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি উদভ্রান্ত চেহারার লোক ছুটে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার কিছুই বুঝিয়ে বলতে না পেরে আমার মাপকাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেলাম।

নদীর পথের রাস্তায় কোচোয়ানের সঙ্গে দেখা। কোচ-বাক্সের উপর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে খুশিভরা কণ্ঠে বলল:

'বেশ ঢিট করে দিয়েছ ওকে!'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম তাকে মেয়েটার সঙ্গে অমন কুৎসিত নির্লজ্জ ব্যবহার দেখে ওই বা কেন কিছু করল না।

'জাহান্নামে যাক ও মাগী!' ঘৃণাভরা অবিচলিত কণ্ঠে বলল কোচোয়ান, 'মাগীটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে ভদ্দরলোকরা। আমার সম্পর্ক ঐটুকুই, ব্যস!'

'লোকটা ওকে যদি খুন করে ফেলত কী হত তাহলে?'

'ওদের জাতের মাগীকে খুন করা অত সহজ কথা নয়,' এমন দৃঢ় প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে ও বলল যেন মাতাল বেশ্যা খুন করে করে ও হাত পাকিয়ে ফেলেছে।

এর পর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হত ঐ দারোয়ানের সঙ্গে। যখনই রাস্তায় চলতাম, দেখতাম হয় ও উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে নয়ত সিঁড়ির উপরে বসে আছে যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করে। আমি এগিয়ে যেতেই ও উঠে দাঁড়াত। তারপর আস্তিন গুটিয়ে শাসাত:

'আজ যদি না তোর মাথাটা ছাতু করে দি তো কী বলেছি!'

ওর বয়েস ছিল চল্লিশের উপরে। বেঁটে পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। পেটটা গর্ভিণী মেয়ের মতো। ও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসত আমার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম ওর চোখ দুটো কেমন যেন কোমল দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মারপিটে ও আদৌ ওস্তাদ ছিল না। হাত দুটো ছিল আমার হাতের চাইতে লম্বায় খাটো। দু-তিনটে আক্রমণের পরেই ও হার মানত। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলত:

'এক মিনিট দাঁড়া বেটা বন-বেড়াল!..'

এই ধরনের মারামারি করে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল আমার। একদিন ওকে বললাম:

'শোন বেকুব, আর লাগতে আসিস না আমার সঙ্গে, বুঝেছিস?'

'তুই আগে কেন লাগতে এসেছিলি?' অনুযোগভরা কন্ঠে জবাব দিল।

জিজ্ঞেস করলাম ও কেন মেয়েটাকে অমন করে হেনস্তা করছিল।

'তোর তাতে কী? ওর উপরে দয়া হয় নাকি তোর?'

'নিশ্চয়ই দয়া হয়।'

একটু চুপ করে থেকে ঠোঁট মুছে আবার জিজ্ঞেস করল:

'বেড়ালের উপরেও দয়া হয় তোর?'

'হ্যাঁ, হয়...'

তারপর বলল:

'তুই একটা মূর্খ, মিথ্যুক! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি...'

এই পথেই আমাকে যেতে হত। কাজে যাবার এটাই ছিল সবচাইতে সোজা রাস্তা। কিন্তু আমি আরো ভোরে ভোরে উঠতে লাগলাম যাতে দারোয়ানের সঙ্গে না দেখা হয়। কিন্তু আমার চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকদিন পরে একদিন দেখি ও সিঁড়ির উপরে একটা ধূসর রঙের বেড়াল কোলে নিয়ে বসে আদর করছে। যখন আমি মাত্র তিন পা দূরে, হঠাৎ ও লাফিয়ে উঠে বেড়ালটার পিছনের পা ধরে এমন জোরে একটা পাথরের থামের উপরে আছাড় মারল যে আমার সর্বাঙ্গ গরম রক্তের ছিটায় ভরে গেল। তারপর বেড়ালটা আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল:

'কেমন?'

কী আর করার ছিল আমার? দুটো কুকুরের মতো উঠোনের উপরে জড়াজড়ি করতে লাগলাম আমরা। তারপর দুঃখে ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পথের পাশের ঝোপের ভিতরে শুয়ে দাঁত মুখ চেপে কান্না আর ফোঁপানি রোধ করতে চেষ্টা করলাম। সে কথা মনে পড়ে নিদারুণ বিতৃষ্ণায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। অবাক হয়ে ভাবি কেন সেদিন আমি পাগল হয়ে যাই নি বা কাউকে হত্যা করি নি?

এই সব ক্লেদাক্ত স্মৃতি মন্থন করছি কেন? এইজন্যেই যাতে, ভদ্র পাঠকেরা, আপনারা জানতে পারেন এ শুধু অতীতের ঘটনামাত্র নয়! আপনারা কল্পিত বীভৎসতার কাহিনী উপভোগ করে থাকেন। আনন্দ পান

ভয়ংকর কাহিনীর বই পড়তে। নিদারুণ বেদনাদায়ক কল্পনায় আপনাদের অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিতে এতটুকুও অশ্রদ্ধা নেই আপনাদের। কিন্তু সত্যিকার ভয়ংকরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, দৈনন্দিন জীবনের ভয়ংকর দিকগুলোর সঙ্গে। তাই অধিকার আছে আমার আপনাদের অনুভূতিকে একটু অপ্রীতিকর সুড়সুড়ি দিয়ে সে ভয়ংকরের কথা শোনাতে, যাতে জানতে পারেন বুঝতে পারেন কোথায় বাস করছেন, কেমন করে বাস করছেন।

আমরা এক নীচ ঘৃণ্য জীবন যাপন করে চলেছি। কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না।

মানুষকে আমি ভালোবেসেছি আর এই ভালোবাসতে গিয়ে, মানুষকে ব্যথা দেয়ার হাত থেকে দূরে সরিয়ে দিতে গিয়ে আমি দেখেছি ভাবপ্রবণ হওয়া আমাদের উচিত নয়। কঠোর সত্যকে চকচকে কথার বাক্যজালে বা মনোরম মিথ্যে দিয়ে যেন আমরা ঢেকে না রাখি। আমাদের দাঁড়াতে হবে জীবনের কাছে, আরো কাছে। আর তার ভিতরে উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে আমাদের মনপ্রাণের যা কিছু শিব, যা কিছু মানবিক সব।

মেয়েদের সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী সবচাইতে বেশি অপমানিত করে তুলত আমাকে। পড়ার ভিতর দিয়ে শিখেছিলাম যে, নারীর চাইতে সুন্দর, বা নারীর চাইতে ব্যঞ্জনাময় আর কোনো কিছুই নেই জীবনে। এ কথা যে পরম সত্য তার প্রমাণ পেয়েছি আমার দিদিমা আর তাঁর মেরীমা ও জ্ঞানী ভার্সিলিসার কাহিনী থেকে। প্রমাণ পেয়েছি হতভাগিনী নাতালিয়া ধোপানীর কাছে। আর প্রমাণ পেয়েছি শত সহস্র হাসি আর চাউনি থেকে যা দিয়ে মেয়েরা — জীবনের জননীরা — নিরানন্দ নিষ্প্রেম অস্তিত্বকে সুন্দর করে তুলেছে।

তুর্গেনেভের বই নারীর গৌরব গানে মুখর। আর মেয়েদের সম্পর্কে ভালো যা কিছু জানতে পেরেছি তারই মূর্ত প্রতীক হয়ে আমার অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আমার 'রাণী'। আমার সে ভাণ্ডারে এসে সঞ্চিত হয়েছে হাইনে আর তুর্গেনেভের অকৃপণ দাক্ষিণ্য।

মেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ক্রেমলিন প্রাচীরের পাশের একটা টিলার উপরে এসে বসতাম ভলগার বুকে সূর্যাস্ত দেখার জন্যে। আকাশের বুকে বয়ে চলত জ্বলন্ত এক স্রোত। আর আমার পার্থিব প্রিয় নদীর বুকে নেমে আসত নীলাভ রক্তিম ছায়া। এই মুহূর্তে মাঝে মাঝে আমার পৃথিবীটাকে মনে হত যেন একটা বিরাট কয়েদী-বজরা। কিংবা অতিকায়

একটা শুয়োরকে যেন কেউ এক অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই আমার চিন্তাধারা বয়ে চলত পৃথিবীর ব্যাপকতার দিকে — ধেয়ে চলত অন্য সব নগরীর দিকে যাদের কথা আমি বইয়ে পড়েছি, বয়ে চলত সেই সব দেশে যেখানে মানুষের জীবনযাত্রা চলেছে ভিন্ন খাতে। আমাকে ঘিরে যে জীবন একঘেয়ে শ্লথ গতিতে আবর্তিত হয়ে চলেছে তার চাইতে বিদেশী লেখকদের লেখা বইয়ে চিত্রিত জীবন অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, অনেক বেশি লোভনীয়, অনেক কম দুর্বিষহ। এতে আমার ভয় দূর হয়ে যেত। আর ক্রমান্বয়েই এই আশা জাগিয়ে তুলত যে এর চাইতে সুন্দর জীবনযাত্রা সম্ভব।

মনে মনে কেবলি ভাবতাম একদিন এমন কোন সহজ সরল বিজ্ঞ লোকের দেখা পাব যিনি আমাকে প্রশস্ত রৌদ্রোজ্জ্বল রাজপথে পেঁছে দেবেন।

একদিন ক্রেমলিন দেয়ালের পাশে একটা বেঞ্চের উপরে বসে আছি ইয়াকভ-খুড়ো এসে জুটল আমার সঙ্গে। আমি লক্ষ্য করি নি যে সে আসছে, চিনতেও পারি নি প্রথমটায়। একই শহরে বহু বছর ধরে বাস করলেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হত কদাচিৎ, তাও আবার দৈবাৎ ক্ষণেকের জন্যে।

'ডানা গজিয়েছে দেখছি,' গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল সে। পরক্ষণেই দুজনে এমন ভাবে আলাপ জুড়ে দিলাম যেন আমরা আত্মীয় নই, দুজন দুজনার বহু দিনের পরিচিত, আলাপী।

দিদিমার মুখে শুনেছিলাম ইয়াকভ-খুড়ো তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। এককালে সে ছিল জেল কলোনীর সেপাইয়ের সহকারী। কিন্তু এক দুঃখজনক পরিণতিতে তার চাকরি-জীবন খতম হয়। সেপাই যখন অসুস্থ ছিল, ইয়াকভ-খুড়ো কয়েদীদের তার নিজের ঘরে এনে তাদের সঙ্গে মিলে আমোদ-প্রমোদ করত। এটা ধরা পড়ে যেতেই খুড়ো চাকরি থেকে বরখাস্ত হল আর অভিযুক্ত হল রাত্রে কয়েদীদের ছেড়ে দেবার অভিযোগে। কেউ অবশ্য পালিয়ে যায় নি, কিন্তু একজন ধরা পড়েছিল এক পুরুতের সহকারীকে গলা টিপে হত্যা করতে গিয়ে। অনুসন্ধান চলেছিল বহু দিন ধরে, কিন্তু আদালত পর্যন্ত আর গড়ায় নি। কয়েদীরা আর সেপাইরা মিলে আমার দয়ার শরীর খুড়োমশাইকে সে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিল। এখন আর সে কোনো কাজ করে না, ছেলেই তার ভরণপোষণ করে। ছেলে তখনকার দিনের বিখ্যাত রুকাভিশনিকভ গির্জার গায়ক-সম্প্রদায়ের একজন। খুড়ো তার ছেলের সম্পর্কে গল্প বলল অদ্ভুত:

'ইদানিং ও খুব গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠেছে — একটা দারুণ কেউকেটা গোছের! ও হল সোলো গাইয়ে। সামোভার গরম করতে বা ওর পোশাক পরিচ্ছদ ব্রুশ করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেলে অমনি রেগে ওঠে! খুব ধোপদুরস্ত ছেলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটাই ওর অভ্যেস কিনা...'

খুড়োমশাইকে বেশ বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছিল, কেমন কাঠখোট্টার মতো। তার সেই সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলো উঠে গিয়ে পাতলা হয়ে গেছে, কান দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। চোখের সাদার উপরে আর শ্মশ্রুবিহীন চকচকে রেশমী গালে ফুটে উঠেছে লাল লাল সূক্ষ্ম শিরার জাল। পরিহাসের সুরে সে কথা বলছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন তার মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু রয়েছে যা কথা বলায় বাধা দিচ্ছে, অথচ তার দাঁতগুলো বেশ শক্ত।

কেমন করে আনন্দে থাকতে হয় তা ও জানে। যে অনেককিছু দেখেছে, অনেককিছু জানে এমন একজন লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে। আমার খুব ভালো করেই মনে আছে তার সেই দুঃসাহসী গান, আর তার সম্পর্কে দাদুর সেই মন্তব্য:

'ও গানে দাভিদ, কিন্তু কাজে আবসালোম!'

দলে দলে শহুরে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বুলভার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলেছে আমাদের পাশ দিয়ে: অফিসার, সরকারী কর্মচারী, কোমল পশমের পরিচ্ছদ পরা তরুণী। আমার খুড়োমশাইয়ের গায়ে জীর্ণ কোট, মাথায় ভাঙ্গাচোরা টুপী আর পায়ে মর্চে-রঙের বুট। নিজের বেশ-বাসের দরুণ লজ্জায় সংকুচিত হয়ে, জড়ো সড়ো হয়ে বেঞ্চের উপরে বসে পড়ল। তাই আমরা পোচাইনস্কি গলির উপরে এক সরাইখানায় ঢুকে বাজারের দিকে জানালার সামনে একটা টেবিল অধিকার করে গিয়ে বসলাম।

'মনে আছে সেই কেমন করে গাইতে:

এক ভিখারি প্যান্ট শুকোতে দিয়েছিল মেলে
আর এক ব্যাটা ভিখারি তা চুরি করে নিলে...'

গানের কথাগুলো আওড়াতে গিয়ে এই প্রথম আমি ওর ভিতরের পরিহাসটা বুঝতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল খুড়োমশাইকে বাহ্যত হাসিখুশি মনে হলেও ভিতরটা ওর কাঁটায় ভরা, তিক্ত।

কিন্তু এক গ্লাস ভদকা ঢালতে ঢালতে চিন্তাক্লিষ্ট সুরে ও বলে উঠল:

'হ্যাঁ, আমার জীবনটা তো কাটিয়ে দিয়েছি। আমোদ-ফুর্তিও করেছি, কিন্তু তেমন বেশি নয়। ও গানটা আমি বাঁধি নি। বেঁধেছিল সেমিনারির এক মাস্টার। তার নামটা যেন কী — ভুলে গেছি। আমরা দুজনে ভারি বন্ধু ছিলাম — সে আর আমি। লোকটার বিয়ে হয় নি, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মরে গেল -- ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল। কতো লোককেই না দেখেছি এমনি করে মদ খেয়ে মরে যেতে! অগুন্তি! তুই মদ খাস? খাস না, দুদিন সবুর কর্। দাদুকে দেখতে যাস মাঝে মাঝে? দুঃখী বুড়ো। মনে হয় যেন একটু মাথার দোষ হয়েছে।'

দু একবার মদ্যপান করে মুখ মুছে কাঁধ টান করল। সজীবতর মনে হচ্ছে। তারপরে আরো উৎসাহে কথা বলতে শুরু করল।

কয়েদীদের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'তাও শুনে ফেলেছিস?' গলার স্বর নিচু করে চারদিকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর বলল:

'ওরা কয়েদী তো হল কী? আমি তো আর তাদের বিচারক নই। দেখলাম ওরাও অন্য দশজন মানুষের মতোই মানুষ। তাই আমি বললাম ওদের: এসো ভাই একসঙ্গে থাকি আমরা, একটু আমোদ-ফুর্তি করি। ঐ যে গানে আছে না:

জোরসে ওড়া ফুর্তি রে ভাই, কপালে যাই র'ক,
এ দুনিয়ার চলার পথে শেষ নিশানাতক।
বেকুব সে জন দুখের বোঝায় নুয়ে পড়ে যেই;
আনন্দ আর হাসির তরে আমরা বেঁচে রই!'

হেসে উঠে সে জানালার বাইরে সারি সারি দোকানঘরে ভর্তি অন্ধকার-ঘনিয়ে-আসা পাহাড়ী নালাটার দিকে তাকাল।

'ওরা খুশি হয়েছিল তা ঠিক। জেলের ভিতরে বড্ডো বিশ্রী, একঘেয়ে,' গোঁফে তা দিতে দিতে সে বলে চলল, 'তাই গুন্তির পরে ওরা আসত আমার ঘরে। খাবার চলত আর মদ চলত। কখনো আমার কখনো ওদের। আর রুশ-জননী ভরত-পাখীর ডানায় উড়ে চলতেন! আমি নাচ গান ভালোবাসতাম। ওদের ভিতর অনেক ভালো ভালো গাইয়ে নাচিয়ে ছিল। সত্যি, খুব চমৎকার। বিশ্বাস করবি না তুই! ওদের অর্ধেকের বেশির শিকল পরানো ছিল। আমি হুকুম দিলাম শিকল খুলে ফেলতে, শিকল পরে তো নাচা যায় না,

সত্যি কথা। ওরা নিজেরাই খুলতে পারত। কামারের দরকার হত না। চালাক লোক, ভারি চালাক। কিন্তু ঐ যে লোকে বলে যে আমি রাত্রে ওদের ছেড়ে দিতাম শহরে গিয়ে চুরি করার জন্যে, এটা নেহাৎ বাজে কথা। কেউই তা প্রমাণ করতে পারত না...'

বলতে বলতে সে চুপ করে গেল, তারপর পাহাড়ী নালাটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ওখানে পুরনো জিনিসের ব্যাপারীরা তাদের দোকান বন্ধ করছে। জেগে উঠছে হুড়কোর ঘট ঘট, তালার ঝন ঝন, আর পড়ে-যাওয়া তক্তার শব্দ। তারপর হাসি হাসি মুখে চোখ মটকে আস্তে আস্তে বলতে লাগল:

'তা যদি সত্যি কথা বলি তো একটা লোক ঠিকই বেরুত রাত্রে রাত্রে। কিন্তু তার শিকল বাঁধা ছিল না। একটা স্থানীয় চোর — নিজনি নভগরোদের। ওর একটা মেয়েমানুষ ছিল কাছে-পিঠেই — পেচোরকা নদীর পারে। আর ঐ পুরুতের সহকারীর ব্যাপারটা — ওটা নেহাৎ একটা দুর্দৈব। ও পুরুতটাকে ব্যবসায়ী ভেবেছিল। শীতের এক ঝড়বাদলের রাত্রে ঘটনাটা ঘটে। সবার গায়েই ওভারকোট। কে বলবে: কে ব্যবসায়ী আর কে পুরুত।'

খুব মজা লাগল শুনে। আর সেও হাসতে আরম্ভ করল।

'অবশ্যি এটা ঠিক যে, ও চিনতে পারে নি...'

হঠাৎ, এক অদ্ভুত ঝোঁক নিয়ে খুড়োমশাই রাগে জ্বলে উঠল। প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখখানা বেজার করে বিড় বিড় করে বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরাল:

'ওরা এ ওরটা চুরি করছে, তারপর এ ওকে ধরে জেলে পুরে দিচ্ছে বা কঠোর শ্রমের সাজা দিয়ে সাইবেরিয়ায় পাঠাচ্ছে। কিন্তু আমাকে এর ভিতরে জড়ানো কেন বাপু? থুঃ থুঃ... আমার নিজের আত্মাকে আমি বাঁচিয়ে চলছি!'

সর্বাঙ্গে বড়ো বড়ো লোমে ভরা ফায়ারম্যানের মূর্তি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। সেও এমনি করেই 'থুঃ থুঃ' বলতে ভালোবাসত। আর তার নামও ছিল ইয়াকভ।

মৃদু স্বরে খুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছিস?'

'কয়েদীদের জন্যে কি দুঃখ হত তোমার?'

'দুঃখ হওয়াটাই সহজ। এমন চমৎকার চমৎকার সব লোক! সত্যি চমৎকার! কখনো কখনো ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম: তোমাদের জুতো পালিশ

করারও যোগ্যতা নেই আমার আর আমিই কিনা তোমাদের রক্ষক! শয়তানগুলো কী চালাক, শেয়ালের মতো ধূর্ত...'

মদ আর অতীতের স্মৃতি আবার ওকে চাঙা করে তুলল। জানালার পৈঠেতে কনুইয়ের ভর রেখে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট-ধরা হলদে হাতটা নাড়তে নাড়তে সরস গলায় বলতে লাগল:

'ওদের একটা লোক কেমন করে গল্প করত যদি শুনতিস! লোকটার এক চোখ কানা। ও ছিল খোদাইকর আর ঘড়ির মিস্ত্রি। টাকা জাল করতে গিয়ে ধরা পড়ে। আবার চেষ্টা করেছিল পালিয়ে যেতে। মশালের মতো জ্বলে উঠত কথায় কথায়। আর গান গাইত পাখির মতো। সে বলত, 'আচ্ছা, বুঝিয়ে দাও দেখি আমাকে, টাঁকশালে যদি টাকা তৈরী করতে পারে তবে আমি কেন পারব না? এসো বুঝিয়ে দাও!' কেউই বোঝাতে পারত না। কেউ না, এমন কি আমিও না। আর আমি কিনা ওদের রক্ষক! তারপর আর একজন ছিল মস্কোর নামজাদা চোর। বেশ শান্ত, ছিমছাম চেহারা। খানিকটা বাবু-বাবু গোছের। সব সময়েই কথা বলত অমায়িক ভাবে। সে বলত, 'মানুষ খেটে খেটে মরছে, কিন্তু আমার তা করার এতটুকুও স্পৃহা নেই। একবার চেষ্টা করেছিলাম,' সে বলল, 'খেটে খেটে হয়রানিতে হাঁদা হয়ে যাবে। কিন্তু কিসের জন্যে? নেহাৎ এক দলা ভাতের জন্যে। এক ঢোক মদ খাও, তাসে হারো এক আধ পয়সা, একটা মেয়েমানুষের সোহাগের বদলে নাম মাত্র কিছু দাও, আর তারপর আবার যে-কে সেই — সেই ভেঙে-পড়া, সেই পেটের জ্বালা। না,' ও বলত, 'ও খেলায় আমি রাজী নই...”

বলতে বলতে ইয়াকভ-খুড়ো টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ল। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে আর এতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে ছোট ছোট কান দুটো পর্যন্ত চমকে চমকে উঠছে:

'ওরা বেকুব নয়, ভায়া। ওরা ঠিক বুঝ বুঝেছে। জাহান্নামে যাক যতো ঝামেলা! এই আমাকেই ধর্: জীবনটা কী হল আমার? মনে করতেও লজ্জায় মিশে যেতে হয়। যা কিছু ভালো তা চুরি করে নিতে হয়েছে। অর্জন করেছি দুঃখ আর চুরি করেছি আনন্দ। আমার বাবা ধমকাতেন: এটা করো না, বৌ ধমকাত: ওটা করো না, আর আমি নিজের জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে ভয় পেতাম। এমনি করেই জীবন গড়িয়ে গেল। আর আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আমি আমার নিজের ছেলের খানসামা। লুকোব কেন? আমি বাধ্যের মতো তার সেবা করি আর সে খাঁটি ভদ্দরলোকের মতো আমার উপরে

তম্বি করে। ও আমাকে ডাকে 'বাবা', কিন্তু আমার কানে এসে বাজে 'খানসামা'। এরই জন্যে কি জন্মেছিলাম, এতো সব সহ্য করলাম কি শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলের খানসামা হয়ে মরতে? কিন্তু এরকম যদি নাও হত তবু আমি বাঁচলাম কিসের জন্যে? জীবনের কাছ থেকে কতটুকু আনন্দ পেয়েছি আজ পর্যন্ত?'

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না তার কথা। আমতা আমতা করে কোনো রকম না ভেবে চিন্তেই বললাম:

'আমিও জানি না কেমন করে বাঁচতে হয়!'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল খুড়ো।

'হুঁম, কে জানে? এমন একটা লোকও দেখি নি যে জানে! অভ্যাসের বশেই জীবন কাটিয়ে চলেছে মানুষ...'

আবার তার কণ্ঠে বেজে উঠল রাগ আর ক্ষোভের সুর:

'আর একটা লোক ছিল ওরেলের — নারী ধর্ষণের জন্যে তার সাজা হয়েছিল। ভদ্র ঘরের ছেলে। আর নাচত চমৎকার। ভাঙ্কার গান গেয়ে ও লোকদের যা হাসাত:

কবরখানার আশেপাশে ভাঙ্কা বেড়ায় ঘুরে
মুখটা হাঁড়ি করে,
ভাঙ্কা ভাঙ্কা কেন রে তুই হেথায় মরিস ঘুরে?
এর চেয়ে কি জায়গা ভালো
পাস না খুঁজে ওরে?

কিন্তু আমার মতে ও গানটার ভিতরে হাসবার মতো মজার কিছুই নেই। ওটা হচ্ছে খাঁটি সত্য! যতোই হা-হুতাশ কর, যতোই চিৎকার করে কাঁদ, কবরের হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই। আর যখন ওখানে হাজির হব তখন কয়েদী ছিলাম কি সেপাই ছিলাম সে খোঁজ নিতে বয়েই গেছে...'

কথা বলে বলে শ্রান্ত হয়ে ভদকাটা নিঃশেষ করে ফেলে পাখির মতো এক চোখ বুজে শূন্য গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগল। ধোঁয়াগুলো তার গোঁফের ফাঁক দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

ইয়াকভ-খুড়োর সঙ্গে পাথর-মিস্ত্রি পিওতরের একটুও মিল ছিল না।

কিন্তু সেও প্রায়ই বলত: 'মানুষ যতো চেষ্টা যতো আশাই করুক না কেন তাকে কফিনে করে কবরের তলায় আসতেই হবে একদিন।' তাছাড়া কতোই না প্রবাদ আছে এই একই কথা নিয়ে!

খুড়োমশাইকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার স্পৃহা আমার ছিল না। ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। ওর সঙ্গে বসে থেকে মন ভারি হয়ে আসছিল। বিষাদের ভিতরে সেই আনন্দ ছড়ানো তার সেই হাসির গান আর গিটারের ঝঙ্কারের কথা মনে না করে পারছিলাম না। সেই হাসিখুশি ৎসিগানকের কথাও ভুলে যাই নি। না, ভুলি নি। ঐ তোবড়ানো দেহ ইয়াকভ-খুড়োর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম:

'আজ ওর মনে আছে কি, কেমন করে দু'ভাই একদিন ৎসিগানককে ক্রুশের চাপে মেরে ফেলেছিল?'

কিন্তু সে কথা আর জিজ্ঞেস করলাম না।

নিচে পাহাড়ী খাদটার দিকে তাকালাম। শরতের কুয়াশায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তার গভীর তলদেশ থেকে জেগে উঠছে আপেল আর তরমুজের গন্ধ। শহরমুখো সরু পথের বুকে চমকে উঠছে লণ্ঠনের আলো। চারপাশের সবকিছুই আমার একান্ত পরিচিত। ঐ যে জাহাজে বাঁশী বেজে উঠল, ওটা চলেছে রীবিন্‌স্ক। ঐ যে আর একটা জাহাজ থেকে বাঁশী বাজছে, ওটা যাবে পের্‌ম...

'আচ্ছা — এখন তবে চলি,' বলল খুড়োমশাই।

সরাইখানার দোরে দাঁড়িয়ে সে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে কৌতুকভরা কণ্ঠে বলল:

'এখনই অতো মনমরা হয়ে পড়িস না। মনে হয় তুই বড্ডো ভাবিস। চাঙ্গা হয়ে ওঠ্! এখনো তোর কচি বয়েস। মনে রাখিস, 'জোরসে ওড়া ফুর্তি রে ভাই, কপালে যাই র'ক!' আচ্ছা — আসি তবে। যেতে হবে উস্‌পেনস্কি গির্জায়!'

খোশমেজাজী খুড়োমশাই চলে গেল। কিন্তু সে যা বলে গেল তাতে আমার মাথাটা আগের চাইতেও আরো বেশি ঘুলিয়ে গেল।

পাহাড়ের উপর উঠে গেলাম শহরে। তারপর মাঠের পথ ধরে হেঁটে চললাম। আকাশে ভরা চাঁদ। নিচু ভারি মেঘ চলেছে আকাশ বেয়ে। মেঘের ছায়ায় মুছে মুছে যাচ্ছে আমার নিজের ছায়া। মাঠের পথে পথে শহরটা এড়িয়ে গিয়ে ভলগার ঢালু তীরে এসে পেঁছলাম। তারপর ধুলোয় ধুসর

ঘাসের উপরে শুয়ে বহুক্ষণ নদী মাঠে আর গতিহীন স্তব্ধ মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে ভলগার বুকের উপর দিয়ে। ওপারে মাঠের কাছে পৌঁছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন জলের পথে যেতে যেতে ওরা স্নান করে নিয়েছে। আমাকে ঘিরে সবকিছুই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, নম্র। জীবন ও গতিময়তার তীব্র তৃষ্ণার ফলেই চলছে যে সবকিছু তা যেন নয়, চলছে যেন একান্ত অনিচ্ছায়, প্রয়োজনের তাগিদে।

ইচ্ছে হল এই মাটিকে আর নিজেকে এমন পদাঘাত করি যাতে সবকিছু বিঘূর্ণিত হয়ে ওঠে আনন্দের আবর্তে, আত্মহারা নৃত্যে, যেখানে নাচছে তারা যারা পরস্পরকে ভালোবাসে। ভালোবাসে এই জীবনকে, এই জীবনকেই -- আরো সৎ, আরো সাহসী, আরো সুন্দর এক জীবনের স্বপ্নে।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম:

'আমি কিছু একটা না করলে পাগল হয়ে যাব।'

শরতের নিরানন্দ দিনে আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াবার সময় অনেক দিন সূর্যের মুখ দেখতে পেতাম না। এমন কি অনুভব পর্যন্ত করতে পারতাম না। প্রায় ভুলেই যেতাম তার অস্তিত্ব। তখন পথ হারিয়ে ফেললে অধীর ভাবে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম যাতে ফিরে আসতে পারি। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে অদম্য সাহসের সঙ্গে বনের গভীরে এগিয়ে গিয়ে পায়ের তলার ঝোপঝাড় ভেঙে বিপদসঙ্কুল জলাভূমি পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতাম। আর প্রতিবার অনিবার্য ভাবেই দেখতে পেতাম শেষ পর্যন্ত ঠিক পথেই এসে পৌঁছেছি।

আমি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেললাম।

সে বছর শরৎকালেই কাজান পাড়ি দিলাম। মনে মনে আশা রইল হয়ত সেখানে গিয়ে পড়াশুনার কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

১৯১৪

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। আপনাদের পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

তিন-খণ্ডে মাক্সিম গোর্কির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসখানিকে মস্কোর প্রগতি প্রকাশভবন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করছে

তিন-খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'ছেলেবেলা' প্রকাশিত হল

বইখানি লেখা হয়েছিল বিপ্লবের আগে, কিন্তু সোভিয়েত এবং বৈদেশিক পাঠকদের মধ্যে এখনও এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। বহু সংখ্যায় বিভিন্ন সংস্করণে বইখানি প্রকাশিত হয়েছে এবং অনূদিত হয়েছে বহু ভাষায়।

এই বইয়ের নায়ক অল্প বয়সে বাপ-মরা ছোট ছেলে আলিওশা পেশকভ থাকে নিঝনি-নভগরোদ (এখন তার নাম গোর্কি) শহরে তার কড়া দাদামশাই ওস্তাদ রঞ্জক কাশিরিন-এর বাড়িতে — তিনি তাঁর প্রকাণ্ড পরিবারটাকে ভয়ানক সন্ত্রাসনের লৌহ মুষ্টিতে জর্জরিত করেন। গত শতকের শেষ ভাগের পুরন রাশিয়ার যাবতীয় নিষ্ঠুরতা আর অন্যায়ের জগৎটা এ ছোট ছেলেটির সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তবে, ছেলেটির চারপাশে একেবারে সবাইই দুষ্ট প্রকৃতির সংকীর্ণমনা আর অর্থগৃধ্নু নয়। গভীর প্রীতিভরে তিনি লিখেছেন অন্যান্যের কথাও: এই ভবিষ্যৎ লেখককে যাঁরা 'সামনের চিত্তাকর্ষক কিন্তু কঠিন' জগতের পথ ধরিয়েছিলেন তাঁদের কথা; রাশিয়ার নিসর্গশ্রী আর রাশিয়ার কাব্য আর রূপকথার সৌন্দর্যের প্রতি সেই ছোট ছেলেটির প্রথম চোখ খুলে দিয়েছিলেন দিদিমা— তাঁর কথা; খোশমেজাজী রঞ্জক শ্রমিক ৎসিগানোক-এর কথা, এবং আরও অনেক সহৃদয় মানুষের কথা। সরল শ্রমজীবী মানুষ আর তাদের উন্নত প্রকৃতির প্রতি গোর্কির যে আস্থা তাতে এই বইখানি ভরপুর।

ম. গোর্কির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসত্রয়ীর তৃতীয় খণ্ড — 'পৃথিবীর পাঠশালায়' প্রকাশিত হচ্ছে

মহান রাশিয়ান লেখক মাক্সিম গোর্কি যখন ষোল বছর বয়সের অজ্ঞাত ছেলে আলেক্সেই পেশকভ তখন, ১৮৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা পাবার আশায় এলেন কাজানে। কিন্তু, জারের রাশিয়ার ভলগা নদীর ধারে এই প্রকাণ্ড হৈ-হট্টগোলের শহরটায় তাঁর ভাগ্য ছিল কঠোর শিক্ষানবীশি। বড়-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের বদলে এল শহরের বস্তির কঠোর জীবন। 'পৃথিবীর পাঠশালায়' নামে এই বইখানিতে লেখক আমাদের বলেছেন 'জীবন-পথের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির' কথা -- যেসব কঠোর চাহিদার 'বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে তাঁকে তরুণ বয়সেই 'স্নাতক' হতে হয়েছিল। কাজানে বুদ্ধিজীবী সমাজে বিপ্লবী রাজনীতিক মহলগুলির সঙ্গে নিজের প্রথম প্রথম দেখা-সাক্ষাতের কথা, এবং নিজের দেশের মানুষের জীবন 'নতুন করে গড়ার' আর তাদের সুখী জীবনের জন্যে লড়বার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মাঝে কী ভাবে উৎসারিত হয়ে ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল সেই কথা গোর্কি এখানে বলেছেন।

১৯২৩ সালে লেখা এই বইখানা এখনও বারবার নতুন নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যাপক পরিসরে জনপ্রিয় এই বইখানা সমস্ত রকমের ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

М. Горький

В ЛЮДЯХ

Повесть

На языке бенгали

Перевод сделан по изданию:
М. Горький. Собрание сочинений
в 18 т.т. Том 9.
Государственное издательство
Художественной литературы
1962 г.